গোলাম মোস্তফা

সমগ্র

গোলাম মোস্তফা সমগ্র

প্রথম খণ্ড

www.pathagar.com

গোলাম মোস্তফা সমগ্র

প্রথম খণ্ড

নাসির হেলাল
সম্পাদিত

সুহৃদ প্রকাশন

www.pathagar.com

গোলাম মোস্তফা সমগ্র, প্রথম খণ্ড

নাসির হেলাল-সম্পাদিত

প্রকাশক

উম্মে ফারহানা খুশি

সুহৃদ প্রকাশন

বুকস্ এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স

৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল: ০১৭২ ১৫ ৩৩ ৬২

স্বত্ব ঃ ফিরোজা খাতুন

সভাপতি, কবি গোলাম মোস্তফা ট্রাস্ট

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ: মে ২০০৫

ISBN: 984-632-049-3

প্রচ্ছদ

মুবাশ্বির মজুমদার

কম্পিউটার কম্পোজ

রহমত কম্পিউটার

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রক

আল-আকাবা প্রিন্টিং প্রেস

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

দাম ঃ দুইশত টাকা মাত্র

www.pathagar.com

(জন্ম ঃ ১৮৯৭-মৃত্যু ঃ ১৯৬৪)

www.pathagar.com

উ ৎ স র্গ

শিল্পী মোস্তফা আজিজ

www.pathagar.com

সূচীপত্র
প্রবন্ধ সংকলন

ইসলাম	**পৃষ্ঠা**
বদর-যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্‌র ভূমিকা	৩০
নবী-নন্দিনী জয়নব	৪০
ইসলামে সার্বভৌমিকতা	৪২
হজরত ওসমান কি স্বজন-প্রিয় ছিলেন	৫০
ইসলাম ও সঙ্গীত	৭৩
ইসলাম ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত	৭৯
রাজনীতি	
মুসলিম জাহানের শাসনতন্ত্র	৮২
নয়া শাসনতন্ত্রের ইসলামী রূপ	৮৫
জিন্নাহ্‌ হইতে কায়েদ-ই-আযম	৯২
নয়া জিন্দেগীর আহ্বান	৯৫
আমরা কেন স্বতন্ত্র নির্বাচন চাই	৯৮
মার্কস-ইজম কি বাঁচিয়া আছে	১০২
ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষা	
আমার চোখে মাইকেল	১০৯
লেখদের ভূমিকা	১১২
অভিভাষণ	১১৯
আমাদের শিক্ষার ভবিষ্যত	১২৮
নজরুল কাব্যে দার্শনিকতা	১৩৯
বাংলা ভাষার নূতন পরিচয়	১৪৭
নজরুল কাব্যের অবাঞ্ছিত অংশ	১৬৬
ইসলামী বাংলা সাহিত্যে রাসূল্লাহ্‌র জীবনী	১৮৭
পাক বাংলা ভাষা	১৯০
বাংলা-সাহিত্যের রূপায়ণে ইসলামের প্রভাব	১৯৬
নজরুল কাব্যের অপর দিক	১৯৯
সাহিত্যে অসাম্প্রদায়িকতা	১২১
বিবিধ	
যশোর-খুলনার ইতিহাস	২২৭
প্রেমের স্বপ্ন	২৩০
ওরা যদি লড়তে আসে	২৩১
ইকবালের পয়গাম	২৩৬

আমার চিন্তাধারা

বিষয়	সন		পৃষ্ঠা
কবি ও বৈজ্ঞানি সাহিত্য	১৯১৭	....	২৪৭
আনোয়ারা ”	১৯১৮	....	২৫১

www.pathagar.com

বীরাঙ্গনা খাওলা	১৯১৮	....	২৫৩
শিশুর শিক্ষা	১৯২২	....	২৫৭
ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য	১৯২২	....	২৬১
আর্টের স্বরূপ	১৯২৬	....	২৭২
মুসলিম সাহিত্যের গতি ও লক্ষ্য	১৯২৭	....	২৮৯
দার্জিলিং ভ্রমণ	১৯২৭	....	২৯৬
কাব্য-সমালোচনা	১৯২৭	....	৩০০
শক্তি-পরীক্ষায় মুসলমান	১৯২৮	....	৩০৩
ইকবালের বাণী	১৯২৯	....	৩০৭
খুলনার স্মৃতি	১৯৩১	....	৩১৩
'মোল্লা' ও 'তরুণ'	১৯৩৮	....	৩১৫
লুৎফর রহমান	১৯৩৮	....	৩২১
ইসলাম ও সঙ্গীত	১৯৩৯	....	৩২৩
রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়বাদ	১৯৪৩	....	৩২৯
পাকিস্তানের পরে	১৯৪৭	....	৩৩৩
২৫ শে ডিসেম্বরের বাণী	১৯৪৭	....	৩৩৩
পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সম্মেলন	১৯৪৮	....	৩৩৬
আমাদের কওমী নিশান	১৯৪৮	....	৩৩৮
যশোর সমিতি	১৯৫২	....	৩৪১
মাঠের কবি	১৯৫৩	....	৩৪৬
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১৯৫৬	....	৩৪৮
পদ্মা প্রকৃতি	১৯৫৬	....	৩৫৪
মহাশ্মশান কাব্য	১৯৫৬	....	৩৫৮
আমি কেন লিখি	১৯৫৬	....	৩৬০
ইসলামী সাহিত্য	১৯৫৭	....	৩৬২
পাক-বাংলার কাব্য-সাহিত্য	১৯৫৯	....	৩৬৮
শিরাজীকে মনে পড়ে	১৯৫৯	....	৩৭৮
আমাদের হরফ-সমস্যা	১৯৬০	....	৩৮০
ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথ	১৯৬০	....	৩৮৫
পূর্ব পাকিস্তানের লেখকদের প্রতি	১৯৬০	....	৩৯৯
পাক-গণতন্ত্র ও লেখক-সমাজ	১৯৬০	....	৪০২
টু-নেশন থিওরী	১৯৬১	....	৪০৮
আর্য-সভ্যতা রাজনীতি	১৯৬২	....	৪১২
আধুনিক কবিতা সাহিত্য	১৯৬২	....	৪২৬
সমালোচনার সমালোচনা	১৯৬২	....	৪৪৪
বরিশাল সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন ইসলামী সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ			৪৫৩

www.pathagar.com

ভূমিকা

কবি গোলাম মোস্তফা তার সমসাময়িক সময়ের কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম একজন। তিনি কবি হিসেবেই সাধারণ্যে পরিচিত। তবে বিশ্বনবীর লেখক হিসেবে তিনি সম্ভবত আরও বেশি পরিচিত, গৃহীত ও নন্দিত। তবে তিনি শুধু কবিতা, এবং 'বিশ্বনবী' রচনা করেই তার দায়িত্ব শেষ করেন নি। সাহিত্যের নানা শাখায় তিনি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় তাঁর যে অমূল্য অবদান রয়েছে তা জাতি প্রায় ভুলতে বসেছে। এমন কি তরুণ প্রজন্ম তো জানেই না কবি গোলাম মোস্তফার বহুমুখী প্রতিভার কথা। এমতাবস্থায় আমরা কবির সমস্ত লেখালেখি জাতির সামনে উপস্থাপনের জন্য গোলাম মোস্তফা সমগ্র, প্রথম খণ্ড প্রকাশ করছি। এ খণ্ডে থাকছে–প্রবন্ধ সংকলন, আমার চিন্তাধারা এবং বরিশাল সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনে ১৯৫৭ সালে কবির দেয়া ইসলামী সাহিত্য শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

উল্লেখ্য যে প্রবন্ধ সংকলনটি কবিপত্নী মাহফুজা খাতুন সম্পাদনায় জুন ১৯৬৮ সালে আহমদ পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত। এতে মোট ২৮টি মূল্যবান নিবন্ধ প্রবন্ধ রয়েছে। 'আমার চিন্তাধারা' প্রবন্ধ সংকলনটিতে রয়েছে অত্যন্ত মূল্যবান ৩৭টি রচনা। এটি সংকলন করেছেন কবি নিজেই। গ্রন্থটি মার্চ ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন শ্রী রাখাল চন্দ্র দত্ত, ১২ শ্যামা প্রসাদ রায় চৌধুরী লেন, ঢাকা-১। এ ছাড়াও এখণ্ডে একটি মূল্যবান অভিভাষণ অন্তর্ভুক্ত করা হলো। অভিভাষণটির প্রকাশকাল ১৯৫৭। অন্যদিকে বইয়ের শুরুতে কবির জীবন ও কর্মের উপর একটি গবেষণাধর্মী নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ সংযোজন করা হলো। যা কবিকে নতুন করে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রবন্ধটি 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা'য় প্রকাশিত।

নাসির হেলাল

www.pathagar.com

কবি গোলাম মোস্তফা: জীবন ও কর্ম

কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর সময়ের অন্যতম প্রধান আধুনিক কবি, সাহিত্যক ও শিক্ষাবিদ। বাঙালি মুসলানের সাহিত্য ইতিহাসে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। সমসাময়িক সময়ে সাহিত্য সাংস্কৃতিক অংগনে কালের কাম্য হিসেবে তাঁর প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য।

সম্পূর্ণ রবীন্দ্র বলয়ের কবি হয়েও গোলাম মোস্তফা স্বকীয়তায় প্রোজ্জ্বল এক মহান কবি। তিনি অনগ্রসর মুসলিম সমাজকে এগিয়ে আনতে চেয়েছিলেন, তাদের মধ্যে জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ইসলামের আলো, যাতে তাদের প্রাণ সঞ্চারিত হয়। এ ক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহে ইসলামী রেনেসাঁর কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহমদ-এর পথিকৃত।

'বিশ্বাস, বিশেষত ধর্ম বিশ্বাস গোলাম মোস্তফার চিন্তার ভিত্তি ভূমি। জগত ও জীবনের প্রতিটি সত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা প্রগাঢ় ইসলামী ভাবধারায় সম্পৃক্ত। তাঁর সাহিত্যদর্শনও এই বিশ্বাসের উপফল। এই তত্ত্বাশ্রিত মন্নায় দৃষ্টি তাঁর সাহিত্য বিচারকেও নিয়ন্ত্রিত করে। তবে গতানুগতিক চিন্তাহীন ধর্মীয় আবেগ প্রকাশের সংগে এর বড় পার্থক্য এই যে, মোস্তফা-মানসের অভিব্যক্তি উদার, জ্ঞানময় এবং সুশৃংখল রুচিবান এবং নিজস্ব পরিমণ্ডলের মধ্যে বিদগ্ধ।'[১]

মাত্র ১৩ বছর বয়সে লেখালেখি শুরু করেন। দশম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে 'আদ্রিয়ানোপল উদ্ধার' কবিতা লিখে (যেটা ছিল তাঁর প্রকাশিত প্রথম কবিতা), রাতারাতি সুধিজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন তিনি। এরপর তিনি আমৃত্যু একের পর এক জাতির প্রয়োজনে, জাতির খিদমতের জন্য গদ্যে-পদ্যে সংগীতে অসংখ্য লেখা উপহার দিয়েছেন। 'বিশ্বনবী', 'ইসলাম ও কমিউনিজাম', 'ইসলাাম ও জিহাদ', 'আমার চিন্তাধারা' এবং পাঠক নন্দিত অনেকগুলো কাব্যগ্রন্থ উপহার দিয়ে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। সংগীতের ক্ষেত্রেও রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন শিক্ষক যে কারণে তিনি তাঁর লেখনির মাধ্যমে চেষ্টা করেছিলেন শিক্ষা বিভাগের কারিকুলামের আমূল পরিবর্তন করতে, কোমলমতী শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত পাঠ্য বই রচনা করতে । যে জন্য তিনি রচনা করেন আলোক মালা, পথের আলো, আলোক মঞ্জুরী, নূতন আলো, ইসলামী নীতি কথা, ইতিহাস পরিচয়, মরু দুলাল, কাব্য কাহিনী প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে-এ গ্রন্থগুলোর বেশির ভাগই সে সময়ে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিক্ষকতার ক্ষেত্রেও তিনি আদর্শ হবার গৌরব অর্জন করেন। তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার প্রধান প্রধান স্কুলের তিনি শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেন। শিশু সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে কবি ঈর্ষণীয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন। শিশুদের

---

১. কবির চিন্তাধারা ও গদ্যরীতি (প্রবন্ধ)- মুনীর চৌধুরী: কবি গোলাম মোস্তফা সংগ্রহ ও সম্পাদনা, ফিরোজা খাতুন, পৃ. ৮৭. বাংলা একাডেমী বর্ধমান হাউস ঢাকা: প্রকাশকাল ১৯৬৭ খ্রি ।

www.pathagar.com

উপযোগী করে এমন চমৎকার রচনা অন্য কেউ উপহার দিতে পারেন নি। কলকাতার 'কিশোর' পত্রিকার সম্পাদক কবির লেখা 'কিশোর' কবিতাটি হাতে পেয়ে কবিকে লিখেছিলেন–

প্রিয় মুস্তফা সাহেব,

আপনার কবিতার জন্য ধন্যবাদ। রবীন্দ্রনাথের কাব্য পরিধি মাপিলে হয়তো তিন মাইল লম্বা হইয়া যাইবে। কিন্তু দীর্ঘ পরিধির মধ্যেও এমন একটি কবিতা তাঁহার নাই যাহা কিশোর মনে স্বপ্ন সৃষ্টি করিতে পারে। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি, এই কবিতা আপনাকে অমর করিয়া রাখিবে।[২]

সত্যিই কবির প্রতিটি শিশুতোষ কবিতায় রয়েছে শিশু মনের স্বপ্ন ও সাধের সমন্বয়। যে কারণে কবিতাগুলো আজ এতকাল পরেও সমানভাবে জনপ্রিয়। পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে কবি ছিলেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কবি পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে চেয়েছিলেন তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়ন। অবশ্য বাস্তবে তা হয়নি। মূলত কবি চেয়েছিলেন পাকিস্তান হবে একটি আদর্শ কল্যাণরাষ্ট্র। যে কারণে কবি রচনা করেছিলেন 'তারানা-ই-পাকিস্তান' নামক কাব্যগ্রন্থ।

কবি ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন, পাকিস্তানের ঐক্য ও স্বাধীনতা বিনষ্ট হওয়ার ভয়ে, কিন্তু তিনি কখনই বাংলা ভাষার বিরোধি ছিলেন না। তিনি নিজেই লিখেছেন–

'উর্দু ভাষার স্বপক্ষে কিছু বলিলেই বাংলা ভাষার বিরোধিতা বোঝায় না। আজ বাংলা ভাষার জন্য যাঁহারা আন্দোলন চালাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমার চেয়ে বাংলা ভাষার অনুরাগী কয়জন আছেন, জানি না। ত্রিশ বৎসরেরও উর্দ্ধকাল ধরিয়া আমি বাংলা ভাষার সেবা করিয়া আসিতেছি এবং দেশ ও জাতির জন্য যাহা কিছু দান করিয়াছি, বাংলা ভাষাতেই করিয়াছি।"[৩]

ব্যক্তিগত জীবনে কবি ছিলেন একজন আমুদে, ভোজন রসিক ও পরিচ্ছন্ন মানুষ। তবে তিনি ভোজনের কাজটা অন্যের কাঁধে বন্দুক রেখে সারতেন না। তিনি তাঁর শান্তি নগরস্থ 'মোস্তফা মঞ্জিলে' কবি সাহিত্যেকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে আপ্যায়িত করতেন। কবি অন্যকে খাওয়ায়ে নিজে তৃপ্তি পেতেন। এ কারণে, 'মোস্তফা মঞ্জিল' সব সময় অভ্যাগতদের কলগুঞ্জনে মুখর থাকতো।

কবি ছিলেন উদার, অসাম্প্রদায়িক ও নীতির ব্যাপারে অনমনীয়। তিনি ইসলামকে তাঁর আদর্শ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। ১৯৫৭ সালে বলেছিলেন-' ইসলাম নিজেই যখন মিলন ও সমন্বয় প্রয়াসী, তখন ইসলামী সাহিত্য কেন হবে সংকীর্ণ ও অনুদার? ইসলামী কোনো জিনিসই তো সংকীর্ণ বা অনুদার নয়। দেশই হোক, জাতিই হোক,

---

২. আমার জীবন স্মৃতি (প্রবন্ধ); গোলাম মোস্তফা প্রবন্ধ সংকলন-সম্পাদনা, মাহফুজা খাতুন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা: ১, প্রথম মুদ্রণ-জুন ১৯৬৮, পৃ. ১৩০

৩. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাঃ উর্দু না বাংলা?– গোলাম মোস্তফা, মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী, ঢাকা (প্রকাশকাল উল্লেখ নেই) পৃ. ১-২

www.pathagar.com

ধর্মই হোক, সংস্কৃতি হোক, সমাজ হোক, শিল্পই হোক ইসলাম সর্বদাই মিলেছে ও মিলিয়েছে। খণ্ডতা ও ক্ষুদ্রতর স্বপ্ন যেখানেই ভিড় জমিয়েছে, সেখানেই প্রয়োজন হয়েছে ইসলামের। সকলের জন্য স্থান সংকুলান করাই তো ইসলামের কাজ। নিজেও থাকবে, অপরকে থাকতে দেবে, এই -ই হলো তার নীতি।'[৪]

আমৃত্যু গোলাম মোস্তফা ইসলামের এ নীতি অনুযায়ী পথ চলেছেন।

'১৮৯৭ সালে কবি গোলাম মোস্তফা বৃহত্তর যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) শৈলকূপা থানার মনোহরপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত কাজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম সাল নিয়ে একটু কথা আছে। তিনি নিজেই 'আমার জীবন স্মৃতি'তে লিখেছেন-

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আমার জন্ম। কিন্তু আমার মনে আছে শৈলকূপা হাই স্কুলে ভর্তি হবার সময় আমার আব্বা আমার বয়স প্রায় দুই বছর কমিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই প্রকৃত জন্ম হয়েছিল ভবত ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে। তবে এটা ঠিক যে, যেদিন আমার জন্ম হয় সে দিন বাংলা তারিখ ছিল ৭-ই পৌষ রবিবার।"

'কবির পিতার নাম কাজী গোলাম রব্বানী। তিনি একজন প্রসিদ্ধ গ্রাম্য কবি ছিলেন। তাঁর দাদা কাজী গোলাম সরওয়ার নীল বিদ্রোহের সময় নীলকরদের বিরুদ্ধে জাতীয় উদ্দীপনামূলক কবিতা লিখে ব্যাপক খ্যাতি লাভ করেন। এই গোলাম সরওয়ার সাহেবের আদি বাসস্থান ছিল ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার অন্তর্গত নিবেকৃষ্ণপুর গ্রামে। তিনি মনোহরপুর গ্রামে বিয়ে করে স্থায়ীভাবে সেখানেই থেকে যান। জানা যায় 'সুসাহিত্যিক ও দাবা গুরু' কাজী মোতাহের হোসেন ঐ পরিবারের সন্তান।[৫]

মনোহরপুরের কাজী পরিবারের বিদ্যা ও সংস্কৃতি চর্চার পূর্ব ঐতিহ্য ছিল। এ পরিবারে বহুকাল পূর্ব থেকেই আরবী, ফারসী ও বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কাজী গোলাম রব্বানী তৎকালীন সময়ে প্রকাশিত হিতবাদী, মিহির, সুধাকর ও বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। তিনি নিয়মিত সাহিত্য চর্চা করতেন। এমনকি নিত্যদিনকার সান্ধ্য আসরে গোলাম রব্বানী সাহেব সুর করে পুঁথি পাঠ করে সকলকে শোনাতেন। এ সব পুঁথির মধ্যে ছিল-জঙ্গনামা, আমীর হামজা, কাসাসুল আম্বিয়া, গুলে বাকাওলি, অন্নদা মঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর ইত্যাদি।

কবির মাতা মোছাম্মৎ শরীফা খাতুন ছিলেন একজন স্বভাব কবি। এ ব্যাপারে কবি কন্যা ফিরোজা খাতুন লিখেছেনঃ-

---

৪. ইসলামী সাহিত্য (প্রবন্ধ), আমার চিন্তাধারা- গোলাম মোস্তফা, পৃ.১৭৩ ; প্রকাশক: শ্রী রাখালচন্দ্র দত্ত, পরিবেশক: স্ট্যুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার-ঢাকা, মার্চ ১৯৬২ খ্রি.।

৫ আমার আব্বা কবি গোলাম মোস্তফা, মোস্তফা আজীজ, কবি গোলাম মোস্তফা স্মরণিকা-৯০, যশোর সমিতি ঢাকা। প্রকাশকাল : ১৯৯০।

www.pathagar.com

'একদিন খাবার সময় দাদিকে বললাম, 'ডাল খেলে না যে'? দাদি বললেন, 'ডাল? ও খাবোন কাল'। বললাম, 'কাল আলিয়ে যাবে।' দাদী বললেন, 'যদি যায় আলিয়ে দিবানে ফেলিয়ে।"[৬]

এজন্যে তিনি আরও লিখেছেন, "আমার মনে হয় আব্বার প্রতিভা ও পরিবেশ দাদির কাছ থেকেই বেশি প্রভাবিত।"[৭] কবির বাল্যজীবন নিজ গ্রাম মনেরাহরপুরেই কেটেছে। কুমার নদী বিধৌত মনোহরপুর হলো প্রকৃতির লীলা নিকেতন। গ্রামের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য গায়ে মেখেই কবি বেড়ে উঠেছিলেন। এ জন্য পরিণত বয়সে তিনি লিখেতে পেরেছিলেন-

নিখিলের এত শোভা, এত রূপ, এত হাসি গান
ছাড়িয়া মরিতে মোর কভূ নাহি চাহে মন-প্রাণ।
এ বিশ্বের সবই আমি বাসিয়াছি ভাল
আকাশ বাতাস জল রবি-শশী তারকার আলো।

(পরপারের কামনা- রক্তরাগ, পৃ. ৬৫)

মাত্র চার বছর বয়সেই পিতা মুন্সি গোলাম রব্বানীর কাছে কবির লেখা পড়ার হাতে- খড়ি হয়। মনোহরপুরের পার্শ্ববর্তী দামুদিয়া গ্রামের পাঠশালাতে প্রথমে শিশু গোলাম মোস্তফাকে ভর্তি করা হয়। এই পাঠশালাতে তিনি পণ্ডিত ত্রৈলক্ষনাথ দত্তকে শিক্ষক হিসেবে পান।

ফাজিলপুর পাঠশালায় দু'বছর লেখাপড়া করার পর তাঁকে ভর্তি করা হয় শৈলকূপা হাই স্কুলের নীচের শ্রেণীতে। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মেধাবী ছাত্র হিসেবে শিক্ষক ও ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন এবং বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরবর্তী বছরগুলোর বার্ষিক পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম স্থান অধিকার করা অব্যাহত রাখেন, সাথে সাথে পুরস্কৃতও হন। এই শৈলকূপা স্কুল থেকেই তিনি ১৯১৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি খুলনার দৌলতপুর কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯১৬ সালে সেখান থেকে আই. এ পাস করেন। আই. এ পাস করে তিনি কলকাতা রিপন কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯১৮ সালে সেখান থেকে বি. এ পাস করেন। উল্লেখ যে, ঐ ১৯১৮ সালে প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক মোহাম্মদ গোলাম হোসেন (১৮৭৩-১৯৬৪) বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসেবে বি.এ পাস করেন। তিনিও যশোরের লোক ছিলেন। রিপন কলেজে পড়াকালে পথের পাচালি'র লেখক ঔপন্যাসিক বিভূতিভুষণ বন্দোপাধ্যায় তাঁর সহপাঠি ছিলেন। শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করার পর ১৯২২ সালে গোলাম মোস্তফা ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ থেকে বি. টি পাস করেন।

আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে বি. এ পাস করার পর আর লেখাপড়া সম্ভব হয়নি। ফলে ১৯২০ সালে তিনি ব্যারাকপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এই স্কুলে থাকা অবস্থায়ই তিনি বি. টি ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। পরে ১৯২৪ সালে তিনি ব্যারাকপুর স্কুল থেকে কলকাতার হেয়ার স্কুলে বদলী হন। হেয়ার

৬. মোশররফ হোসেন খান সম্পাদিত, নতুন কলম, অক্টোবর ১৯৯৭, পৃ. ১৯
৭. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

স্কুলে তিনি একটানা ৯ বছর শিক্ষকতা করার পর কলকতা মাদ্রাসায় বদলী হন। সেখান থেকে ১৯৩৬ সালে বালিগঞ্জ গভর্ণমেন্ট ডিমনস্ট্রেশন বালিগঞ্জ হাই স্কুলে বদলী হন এবং এক সময় প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেন। উল্লেখ্য যে, আজ পর্যন্ত এক মাত্র কবি গোলাম মোস্তফা ছাড়া অন্য কোন মুসলমান শিক্ষক বালিগঞ্জ স্কুলের উক্ত পদে আসীন হননি।

বালিগঞ্জ স্কুল থেকে কবিকে বদলী করা হয় হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে। সেখান থেকে ১৯৪০ সালে তাঁকে বাঁকুড়া জেলা স্কুলে বদলী করা হয় এবং সর্বশেষ ১৯৪৬ সালে তাঁকে ফরিদপুর জেলা স্কুলে বদলী করা হয়। এই ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকেই তিনি ১৯৫০ সালে দীর্ঘ ৩০ বছর একটানা শিক্ষকতার মত মহান দায়িত্ব পালন করার পর সেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। তবে মাঝে ১৯৪৮ সালে তাদানীন্তন পূর্ব বাংলা সরকার কর্তৃক গঠিত "ভাষা সংস্কার কমিটি"র সম্পাদকের পদে যোগদান করেন এবং দায়িত্ব পালন করেন।

নিতান্ত শিশু বয়সেই কবির মধ্যে কাব্য চিন্তার উন্মেষ ঘটে। পিতা, পিতামহের পুঁথিপাঠ, বিয়ের দাওয়াত রচনা ইত্যাদি থেকে তাঁর মধ্যে কবিত্ব ভাব জেগে ওঠে। তিনি 'আমার জীবন স্মৃতি'তে–এ সম্বন্ধে লিখেছেন- "আমার বেশ মনে পড়ে, আমর কাব্য জীবনে প্রথম উন্মেষ হয় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে। আমি তখন শৈলকুপা হাই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। নীচের ক্লাস থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত আমি শৈলকূপা হাই স্কুলে পড়েছি। পঞ্চম শ্রেণীতে উঠবার পরই কেমন যেনো একটা কাব্যিক ভাব আমার মধ্যে এলো।"

১৯১১ সালে কবি যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র তখন গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটি কাটানোর পর তাঁর এক বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি কবিতায় রচনা করেন। যতদূর জানা যায় এটিই তাঁর প্রথম রচনা। কবিতাটি হল–

'এস এস শীঘ্র এস ওহে ভ্রাতৃধন
শীতল করহ প্রাণ দিয়া দরশন।
ছুটিও ফুরাল স্কুলও খুলিল,
তবে আর এত দেরি কিসের কারণ।'

এই সময়ে 'মানময়ী গার্লস স্কুলে'র রচয়িতা শ্রী রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ঐ শৈলকূপা স্কুলে কবি গোলাম মোস্তফার দু'ক্লাস ওপরে লেখাপড়া করতেন।

পত্রিকায় প্রকাশিত কবির প্রথম লেখা ছিল, 'আদ্রিয়ানোপল উদ্ধার,' শিরোনামের কবিতা। কবি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। প্রখ্যাত সাংবাদিক মওলানা আকরাম খাঁ সম্পাদিত সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতে ১৯১৩ সালে কবিতাটি ছাপা হয়। কবিতাটির রচনা ও প্রকাশের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বন্দে আলী মিয়া লিখেছেন, "পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং বন্ধু বর্গের প্রেরণায় গোলাম মোস্তফার অবরুদ্ধ কাব্য প্রবাহ ঝর্ণা প্রবাহের মতো বাইরে আত্মপ্রকাশ করলো। সেই সময়ে ইউরোপ ভূ–খণ্ডে বলকান যুদ্ধ চলছিলো। তুরস্ক সেনাবাহিনী বুলগেরিয়ানদের হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ায় সমগ্র মুসলিম জাহানে একটা বিমর্ষতার ছায়া নেমে এসেছিল। এমন সময়ে সহসা সংবাদ পাওয়া গেল, কামাল পাশা বুলগেরিয়ানদের নিকট থেকে 'আদ্রিয়ানোপল'

www.pathagar.com

পুনরুদ্ধার করেছেন। এই খবরে স্বজাতি বৎসল কিশোর কবির প্রাণ আনন্দে নেচে উঠলো। তিনি 'আদ্রিয়ানোপল উদ্ধার' নাম দিয়ে এক রাতের মধ্যে একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা লিখে ফেললেন। অতঃপর কবিতাটি তিনি 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' তে পাঠিয়ে দিলেন। পরবর্তী সপ্তাহে কবিতাটি মুদ্রিত হলো। কবিতাটি ছিল এরূপ–

'আজিকে প্রভাত কি বারতা নিয়া

ধরায় আসিল নামিয়া।'

"কবিতার ছন্দ, ভাব এবং প্রকাশভংগী তখনকার দিনে সবই ছিলো নতুন। এই কবিতায় পাঠক মহলে তাই একটা সাড়া পড়ে গেল। বাংলার মুসলিম সমাজে যে একজন আধুনিক কবির আবির্ভাব হয়েছে একথা সহজেই স্বীকৃতি লাভ করলো। গোলাম মোস্তফাও নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। সেই থেকে তিনি কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখতে শুরু করলেন।"[৮]

বাঙালি মুসলমানের জাতীয় জাগরণের পথিকৃতদের অন্যতম কবি গোলাম মোস্তফা জীবনের প্রথম থেকেই পরিকল্পিতভাবে তাঁর লেখনি চালনা করেন। তিনি নিজেই লিখেছেন-

"যে যুগে আমার জন্ম সে যুগ বাংলার মুসলমানের অবক্ষয়ের যুগ। সে যুগে আমাদের সাহিত্যের না ছিল কোন স্বাতন্ত্র্য, না ছিল কোন স্বকীয়তা। প্রত্যেক জাতির মননশক্তি, ঐতিহ্য, ধ্যান-ধারণা ও আশা– আকাংক্ষা রূপায়িত হয় তাঁর মাতৃভাষার মধ্যে। সেই হিসাবে বাংলার মুসলমাদের কোন সাহিত্যই তখন রচিত হয়নি। আমি তাই ছোট বেলা থেকেই চেয়েছিলাম মুসলিমের জাতীয় সাহিত্য রচনা করতে। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের অনুরাগী হলেও, আমার মনে জেগেছিলো আমাদের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির একটা দুর্জয় আকাঙ্খা। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির তাগিদে নয়-সহজ ভাবেই আমি বাংলা সাহিত্যে চেয়েছিলাম ইসলামী কৃষ্টির রূপায়ণ।"[৯]

উক্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখেই ১৯১৩ সালের লেখা প্রকাশ থেকে পরবর্তী পঞ্চাশ বছরকাল তাঁর লেখালেখির গতি ছিল নদীর স্রোতের মত অব্যাহত। এই অর্ধশত বছরে তাঁর ৩টি উপন্যাস, ৭টি মৌলিক কাব্য, ৪টি কাব্যনুবাদ, ২টি কাব্য সংকলন, ৪টি জীবনী, ২টি রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ, ২টি ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ, আল কোরআন-এর তারজমা, ১টি ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ, ১টি প্রবন্ধ সংকলন ও ১টি গানের সংকলন ছাড়াও অনেক লেখাই তিনি লিখেছিলেন। এর মধ্যে পাকিস্তান পূর্ব যুগে প্রকাশিত হয়: ১. রূপের নেশা (উপন্যাস, ১৩২৬ খৃ.); ২. ভাঙ্গা বুক (উপন্যাস, ১৯২১ খৃ.); ৩. রক্তরাগ (কবিতা, ১৯২৪ খৃ.); ৪.(ক) হাস্নাহেনা (কবিতা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ); (খ). হাস্নাহেনা (কবিতা সংগ্রহ, ১৯৩৭ খৃ.); ৫. খোশরোজ (কবিতা, ১৯২৯ খৃ.); ৬. সাহারা (কবিতা, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ); ৭. কাব্য কাহিনী (কবিতা, ১৯৩৮ খৃ.); ৮. মোসাদ্দস-ই-হালী

---

৮. আবদুস সাত্তার সম্পাদিত, ছোটদের জীবনীগ্রন্থ, ১২ খণ্ড, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ২৩

৯. গোলাম মোস্তফা প্রবন্ধ সংকলন, সম্পাদনা: মাহফুজা খাতুন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা : ১, প্রথম মুদ্রণ, জুন ১৯৬৮, পৃ. ১৩২

www.pathagar.com

(অনুবাদ কবিতা, ১৯৪১ খৃ.); ও ৯. বিশ্বনবী (জীবন, ১৯৪২খৃ.)। পাকিস্তান আমলে প্রকাশিত হয়-১. ইসলাম ও জিহাদ (রাজনীতি, ১৯৪৭ খৃ.); ২. মরু দুলাল (জীবনী, ১৯৪৮ খৃ.); ৩. বুলবুলিস্তান (কাব্য সংকলন, ১৯৪৯ খৃ.); ৪.ইসলাম ও কমিউনিজাম (ধর্ম, ১৯৪৯ খৃ.); ৫. তারানা-ই-পাকিস্তান (কবিতা, ১৯৫৬ খৃ.); ৬. কালাম-ই-ইকবাল (ইকবাল কাব্যের অনুবাদ, ১৯৫৭ খৃ.); ৭. আল কুরআন বাংলা কাব্য অনুবাদ, ১৯৫৭ খৃ.); ৮. বনি আদম, প্রথম খণ্ড (কবিতা, ১৯৫৮ খৃ.); ৯. বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য (জীবনী, ১৯৬০ খৃ.); ১০. শিকওয়া ও জবাব ই-শিকওয়া (অনুবাদ কবিতা, ১৯৬০ খৃ.); ১১. অবিস্মরণীয় বই (ইতিহাস সম্পাদনা, ১৯৬০ খৃ.); ১২. আমার চিন্তাধারা (প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৬২ খৃ.); ১৩. হযরত আবুবকর (জীবনী, ১৯৬৫ খৃ.); ১৪. কাব্য সংকলন (কবিতা- সৈয়দ আলী আশরাফ সম্পাদিত, ১৯৬০ খৃ.); ১৫. গীতি সঞ্চয়ন (গান-ফিরোজা খাতুন সম্পাদিত, ১৯৬৫ খৃ.); ১৬. কাব্য গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড (কবিতা-আবদুল কাদির সম্পাদিত, ১৯৭১ খৃ.); ও ১৭. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা (রাজনীতি, প্রকাশকাল উল্লেখ নেই)।

উল্লেখিত গ্রন্থসমূহের নাম থেকেই বোঝা যায় গোলাম মোস্তফা শুধু কবিই ছিলেন না, সাহিত্যের নানা শাখায় ছিল তাঁর সদম্ভ বিচরণ। তিনি ছিলেন একজন চৌকস লেখক। আর এ জন্যেই কবি বন্দে আলী মিয়া তাঁর সাহিত্যিক অবদান সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে লিখেছেন, ' গোলাম মোস্তফার সাহিত্যিক অবদান মুসলিম বাংলার এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর দান সাহিত্যের নানা শাখায় পল্লবিত হয়ে আছে। তিনি যে কেবল মাত্র কবিতা লিখেই ক্ষান্ত হয়েছেন তা নয় সাহিত্যের বিবিধ বিভাগে তিনি দান করেছেন অনেক কিছু। খণ্ডকাব্য, মহাকাব্য, গীতি কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস, রস রচনা, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও ধর্মালোচনা, সংগীত রচনা, তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা, কোরআন শরীফের অনুবাদ, নব নব ছন্দ প্রবর্তন, ইখওয়ানুস শাফা, মুসাদ্দেস-ই-হালী, ইকবালের অনুবাদ প্রভৃতি নানা দিকে গোলাম মোস্তফার দান স্বীকৃতি লাভ করেছেন।"

তিনি সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবেও জনসমাজে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। হারমোনিয়াম, পিয়ানো এবং অর্গান বাজিয়ে গান করতে পারতেন। তাঁর নিজের কণ্ঠে গাওয়া কয়েকখানি গান অবিভক্ত বাংলায় রেকর্ড হয়েছিলো।

ইংরাজী সাহিত্যেও তাঁর প্রচুর অধিকার ছিলো। The Musalman, The star of India, The Morining News, The Pakistan Observer, The Down প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি বহু তথ্যপূর্ণ মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন। Morning News তাই তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল: He is also a fine prose writer both in Bengali and English. [১০]

প্রেম ও ইসলাম তাঁর কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আবাল্য তাঁর লক্ষ্য ছিল বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে একটি ইসলামী ধারা সৃষ্টি করা। তিনি বিশ্বের সকল মুসলমানকে প্যান ইসলামীজমের ধারণায় একই জাতি মনে করেছেন।

---

১০. ছোটদের জীবনী গ্রন্থ-২২, আবদুস সাত্তার সম্পাদিত, পৃ. ২৫

www.pathagar.com

তবে তিনি কখনো সাম্প্রদায়িকতা লালন করেন নি; সর্বদায় তিনি ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনা করেছেন। তাঁর লেখা অনেক কবিতায় এর প্রমাণ রয়েছে।

"ইসলাম ও মুসলামন সম্পর্কিত তাঁর কবিতাগুলোকে কয়েকভাগে বিন্যাস করা যায়। এক শ্রেণীর কবিতায় তিনি বিভিন্ন পর্বকে (ঈদ, কোরবানী, শবেবরাত, ফতেহা ইয়াজ- দহম) অবলম্বন করেছেন, অপর এক শ্রেণীর কবিতায় প্রকাশ করেছেন আধুনিক পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের জাগরণে উল্লাস ও আনন্দ (মোস্তফা কামাল, মিসর, কলকাতা, মোহামেডান স্পোর্টিং দলের লীগ বিজয়), আরও এক শ্রেণীতে রয়েছে ইসলামের ইতিহাসের মহত্ত্ব, উদারতা সাম্য ও বীরত্বব্যঞ্জক বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিনীর বর্ণনা এবং সর্বশেষ শ্রেণী পড়ে ইসলামের বিভিন্ন উপকথাকে ভিত্তি করে রচিত কবিতাসমূহ।"[১১]

অধ্যাপক সাঈদ-উর রহমান লিখেছেন-

'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা গোলাম মোস্তফার কাব্য সাধনায় গভীর প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনা। ১৯৪৭ সালের ১৪ ই আগস্ট মধ্য রাত্রিতে ঢাকা রেডিও থেকে কোরআন তেলাওয়াতের পর গীত হয় তাঁর রচিত সকল দেশের চেয়ে পিয়ারা/ দুনিয়াতে ভাই কোন সে স্থান / পাকিস্তান সে পাকিস্তান।"[১২]

কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থের নাম 'রক্তরাগ' (১৯২৪)। এর আগে অবশ্য কবির দু'খানা উপন্যাস 'রূপের নেশা' (১৩২৬) ও 'ভাঙ্গা বুক' (১৯২১ খৃ.) প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত রচিত কবিতা 'রক্তরাগ'-এ স্থান পেয়েছিল। প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে কাব্যগ্রন্থটি প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এমন কি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাব্যগ্রন্থটি পড়ে কবিকে কবিতা লিখে অভিনন্দন জানান। গোলাম মোস্তফা তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সাথে সাথে তাঁর প্রিয় কবিকে সৌজন্য কপি পাঠালে তিনি তাঁকে নিম্নোক্ত দু' লাইন কবিতা দিয়ে বরণ করে নেন। তিনি লিখেছিলেন-

"তব নব প্রভাতের রক্তরাগ খানি
মধ্যাহ্নের জাগায় যেন জ্যোতির্ময়ী বাণী।"

আর 'সাম্যবাদী' পত্রিকার ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে মন্ত ব্য করেছিল-

'রক্তরাগ' তাঁহার কবি প্রতিভার পরিচয় বাঙ্গালি পাঠক সমাজে পূর্ণভাবেই করিয়া দিবে।'

এ কাব্যে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতগুলো প্রধানত ইসলাম ও মুসলসানদের সম্পর্কে লেখা। মোট ২৯টি কবিতা এ কাব্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। 'পরিচয়' নামক কবিতাটি ১৯১৬ সালে 'মাসিক মোহাম্মদী' তে ছাপা হয়েছিলো । কবিতাটি হল-

যে জাতি একদা উষর-ধূসর ভীষণ আরব দেশে

---

১১. সাঈদ-উর রহমনা, পূর্ব বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা, পৃ. ১৩৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নভেম্বর ১৯৮৩ খ্রি.।

১২. প্রাগুক্ত পৃ. ১৩৬

www.pathagar.com

বিরাজ করিত অতীব তুচ্ছ, অতীব ঘৃণ্য বেশে
জীবনমন্ত্র, সমাজতন্ত্র ভুলিয়া যাহারা হায়
মরার অধিক পড়িয়া রহিল সুনিবিড় তমসায়।
সহসা আবার নবীন মন্ত্রে লভিল যাহারা প্রাণ-
তারাই আজকে বিশ্বব্যাপ্ত–আমরা মুসলমান।

এই কবিতায় তিনি আরও লিখেছেন–

বিজয় করিয়া য়ুরোপ প্রথমে যাহারা লভিল মান
প্রাচ্যবর্গ হে জগদ্বাসী আমরা মুসলমান।
....
....
আমরা জগতে মরিব না কভু চিরকাল বেঁচে রব
যুগে যুগে লভি নুতন শক্তি বিশ্ববিজয়ী হব।

'রক্তরাগ' কাব্য গ্রন্থে ভিন্নধর্মী বেশ কয়েকটি কবিতাও স্থান পেয়েছে। যেমন 'হিন্দু মুসলমান' কবিতাটি। এ কবিতায় হিন্দু মুসলমানের মিলনের কথা বলা হয়েছে–

এসো ভাই দাঁড়াইয়া মাতৃবক্ষে আজি
লই দীক্ষা, করি পণ, জীবনে মরণে
এক হয়ে রবো মোরা, সমবেত ভাবে
সাধিত মায়ের কাজ, ভারত জননী
উভয়ের মুখ পানে উঠিবে বিরোধ:
ঘরে ঘরে কল্যাণের হবে অভ্যুদ্বয়
ধন্য হবো মোরা সবে। তৃপ্ত হবে প্রাণ
হেরিয়া যুগল- মূর্তি হিন্দু মুসলমান।

'কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'হাস্নাহেনা' ১৪ টি কবিতা নিয়ে এ কাব্যগ্রন্থটি ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য যে কাব্যগ্রন্থটি কবি নিজেই প্রকাশ করেন। আনন্দময়ী, প্রথম চিঠি ও ভূষণ কবিতা তিনটি যা 'হাস্নাহেনা'য় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ 'রক্তরাগে'ও ছিল। কাব্যগ্রন্থটি সম্বন্ধে ১৩৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'সওগাত' লিখেছিল- "ইহা কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবের দ্বিতীয় কবিতা পুস্তক। 'রক্তরাগে' তাঁহার যে শক্তি 'ফুটে ফুটে না' অবস্থায় দেখিয়াছিলাম 'হাস্নাহেনা'য় তাহা অনেকটায় ফুটিয়াছে বলিয়া মনে হইল। কবি গোলাম মোস্তফার কাব্য সাধনা ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহা আমরা আজ আনন্দ সহকারে ঘোষণা করিতেছি। প্রার্থনা করি, কবির শক্তি দিন দিন পরিবর্তিত হউক এবং তাহাতে দরিদ্র মুসলিম বঙ্গ সাহিত্য উত্তরোত্তর শ্রী বৃদ্ধি লাভ করুক।"

এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতা 'শ্যালিকা' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি জসীম উদ্দীন লিখেছেন, "তাঁহার 'কুড়ানো মানিক', 'শ্যালিকা' প্রভৃতি কবিতা পড়িয়া কেবলই বলিতে

www.pathagar.com

ইচ্ছে করে, কি সুন্দর! কি সুন্দর! 'শ্যালিকা' কবিতাটির অধিকাংশ লাইনের শেষ তিন অক্ষরের শব্দ যোজন করিয়া ইহার লঘু পরিহাসটি কবি কি অপূর্ব করিয়া ফুটাইয়াছেন-

বুঝে পড়ে দেখিলাম করি তালিকা
সবচেয়ে সুমধুর ছোট শ্যালিকা;
নাই তার তুল
মন মশগুল
প্রাণ পাওয়া বাসরের ফুল মালিকা।

(শ্যালিকা-হাস্নাহেনা, পৃ. ১২)

এই কবিতায় কবি কি বলিতে চাহিয়াছেন তাঁহার চাইতেও লক্ষ্য করি তিনি কেমন পরিহাস পটু করিয়া তাঁহার কথাগুলোকে এখানে ছন্দে পুরিয়া প্রকাশ করিয়ছেন। এই কবিতাটি বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে একক; কি বিষয় প্রকাশ ভঙ্গীতে সকল ভাবেই ইহা মৌলিক রচনা।"[১৩]

মূলত 'হাস্নাহেনা' কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাগুলো প্রেমের কবিতা। অনেকেই কবি গোলাম মোস্তফাকে মোল্লা কবি বললেও রসবোধের ক্ষেত্রেও তিনি সকল কিছুকে অতিক্রম করেছেন, প্রেমের জয়গান গেয়েছেন। তাঁর সময়কালের কথা চিন্তা করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ কবির সময়কালে কোন মুসলিম কবির, বিশেষ করে তাঁর মত ইসলামপন্থী কবির পক্ষে প্রকাশ্যে ধর্ম-সমাজ, নীতি-নৈতিকতাকে দূরে ঠেলে প্রেমের কথা বলা সত্যিই দুঃসাহসের ব্যাপার। ২২টি কবিতা নিয়ে ১৯২৯ সালে কবির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'খোশরোজ' প্রকাশিত হয়। এর প্রায় সবগুলোই দীর্ঘ কবিতা এবং মুসলমানদের সম্পর্কে লেখা। মুসলমানরা যে এক সময় বিশ্ববরেণ্য ছিল, বিশ্বের সেরা জাতি ছিল কিন্তু কুসংস্কার আর অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে গিয়ে এখন তারা নিগৃহীত ও পতিত জাতি। কবি মুসলমানদের আবার আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে বিশ্ব দরবারে মাথা তুলে দাঁড়ানোর জন্য আহবান জানিয়েছেন। তিনি কল্পনার রথে চড়ে দেখেছেন মুসলমানরা 'ইসলামী হুকুমতের' ছায়াতলে এসে পৃথিবীতে শক্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

আবার এ কাব্য গ্রন্থেই রয়েছে 'বঙ্গরবি আশুতোষ' নামে একটি কবিতা। যেটি আশুতোষ মুখোপধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪)-এর মৃত্যুর পর তাঁর বন্দনা করে লেখা হয়েছে। কবিতাটিতে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে বাংলার জাতীয় গৌরব বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন–

হে বঙ্গের আশুতোষ, বাঙালীর জাতীয় গৌরব।
গগনে- পবনে তুমি রেখে গেছো যে সুধা- সৌরভ,
....
....

---

১৩. ফিরোজা খাতুন সংগ্রহ ও সম্পাদিত, কবি গোলাম মোস্তফা, পৃ. ২৯-৩০, বাংলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৬৭ খ্রি.।

www.pathagar.com

হে বঙ্গের আশুতোষ। বাঙলার শ্রেষ্ঠ শের নর
মরিয়াও তুমি যে গো চিরদিন রহিবে অমর।[১৪]

১১টি দীর্ঘ-হ্রস কবিতা নিয়ে কবির চতুর্থ কাব্য গ্রন্থ 'সাহারা' ১৩৪২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এ কাব্য গ্রন্থের প্রতিটি কবিতায় প্রেম বিষয়ক। কবি যে একজন প্রেমিক পুরুষ ছিলেন তা এ কাব্য গ্রন্থের প্রতিটি কবিতায় সাক্ষ্য দেবে। যেমন কবি বলছেন-

হে মোর মানসী প্রিয়া!
তোমারে যে আমি করেছি রূপসী
কবির দৃষ্টি দিয়া
এত সুন্দর ছিলে নাকো তুমি আমার দেখার আগে,
ছিলে বনফুল পাতায় ঢাকা- সে জানি!
সহসা যেদিন হেরিনু তোমার নবপ্রেম-অনুরাগে,
সেইদিন হতে হলে তুমি ফুল রাণী।
তোমার যে আমি করেছি রূপসী কবির দৃষ্টি দিয়া ।

(সাহারা, পৃ. ২৫)

১৯৩৮ সালে ১৭ টি কবিতা নিয়ে কবির পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'কাব্য-কাহিনী' প্রকাশিত হয়। এই কাব্য গ্রন্থটি রচিত হয়েছে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কথা ও কাহিনী'র অনুসরণে। কবিতাগুলোতে ইসলামের ইতিবৃত্ত ছাড়াও কয়েকটি উপকথা ও কাহিনীর কাব্যরূপ দেয়া হয়েছে। আর 'রাখী ভাই' মোগল প্রহরী' ও 'প্রতিশোধ' শিরোনামের তিনটি কবিতায় তুলে ধরা হয়েছে হিন্দু- মুসলমানের একে অপরের প্রতি সহযোগিতা ও মিলন চিত্র। শেষ দু'টি কবিতা 'সিরাজী ও আফজাল খা' এবং 'শ্রী হিন্দগড়'-এ দেখানো হয়েছে মুসলমানদের সাথে হিন্দু মারাঠা ও শিখদের বিশ্বাসঘাতকতার চিত্র। তবে এ কাব্যগ্রন্থের বেশিরভাগ কবিতায় রয়েছে মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য, আত্মত্যাগ ও মহত্বের কথা। 'মক্কাবিজয়' কবিতায় কবি বলেছেন-

মক্কা আজিকে হয়েছে জয়,
নাহিকো শঙ্কা-নাহিকো ভয়,
কাটিয়া গিয়াছে-সব বিপদ
দীর্ঘ অষ্ট বর্ষ পর
আসিছেন ফিরে আপন ঘর।
খোদার হাবীব মোহাম্মদ।

(মক্কা বিজয়-কাব্য কাহিনী, পৃ. ৯)

কবির প্রকাশিত ৬ষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হলো 'তারান-ই পাকিস্তান'।

---

১৪. বঙ্গরবি আশুতোষ, খোশরোজ, পৃ. ৩৮ উদ্বৃত; গোলাম মোস্তফা কাব্যসমগ্র, সম্পাদনায়; ফিরোজা খাতুন, পৃ. ১১০

www.pathagar.com

এই কাব্যগ্রন্থে মাত্র তিনটি শিরোনাম-ইসলামী গজল, পাকিস্তানী গান ও বিবিধ রয়েছে। ইসলামী গজল শিরোনামে মোট ১৭ টি গজল, পাকিস্তানী গান শিরোনামে মোট ১৫ টি গান এবং বিবিধ শিরোনামে ৩০ টি গান সংকলিত হয়েছে।

গজল ১৭ টির মধ্যে রয়েছে বিখ্যাত কয়েকটি গজল। যেমন–

১. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
সকল কাজের শুরুতে বল
ওরে ও মুমিন মুসলিম॥

২. অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি/ বিচার দিনের স্বামী।
যতো গুণগান, হে চির মহান/ তোমার অন্তর্যামী॥

৩. হে খুদা দয়াময় রহমান-রহিম।
হে বিরাট, হে মহান, হে অনন্ত অসীম॥

৪. নিখিলের চির সুন্দর সৃষ্টি/ আমার মুহম্মদ রসূল।
কুল মাখলুকাতের গুলবাগে /যেন একটি ফোটা ফুল॥

৫. বাদশা তুমি দীন ও দুনিয়ায়/ হে পারোয়ার দিগার।

৬. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ রসূল।

৭. নামাযের এই পাঁচ পিয়ালী গুলাবী শরবৎ।
দান করে তোরা দিলতাজা কর, হে নবীর উম্মত।
এই কলেমা পড়বে আমার পরাণ-বুলবুল॥

৮. গো মদীনা মানোয়ারা
কে বলে তুমি মরুভূমি
কে বলে তুমি সবহারা॥

৯. তুমি যে নূরের রবি/ নিখিলের ধ্যানের ছবি
তুমি না এলে দুনিয়ায়/ আঁধারে ডুবিত সবি॥

ইত্যাদি কালোত্তীর্ণ গানগুলো কবির বিজয় ঘোষণা করছে। উল্লেখ্য যে, উদ্ধৃত গানগুলো সমকালে তো বটেই, বর্তমান সময়েও মুসলিম সমাজে সমানভাবে জনপ্রিয়। এমন কি এগুলো ধর্মীয় সভা, অনুষ্ঠানাদিতেও গাওয়া হয়ে থাকে।

১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয় কবির ৭ম কাব্যগ্রন্থ 'বনি আদম'- এর ১ম খণ্ড। তিন খণ্ডে সমাপ্ত করার ইচ্ছে নিয়ে ১৯৫১ সালে রচনা শুরু করেন 'বনি আদম' মহাকাব্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর সমাপ্ত হয়নি। এই মহাকাব্যটি সম্পর্কে কবি নিজে লিখেছেন'............মাইকেলের পরবর্তী কবিরা মাইকেলকে অনুসরণ করতে গিয়ে বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁর কারণ তাঁহারা এই যতি ভঙ্গের কলাকৌশল সম্যক আয়ত্ব করিতে পারেন নাই।.....'বনি আদম' কাব্যে অমিত্রাক্ষর পয়ার ছন্দে আমি কিছু নূতনত্ব আনিতে চেষ্টা করিয়াছি। জোড়া অক্ষরে (অর্থাৎ ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪-ই তে) যতি ত ফেলিয়াছিই, বিজোড়-অক্ষরে (অর্থাৎ ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩ তেও) যতি ফেলিয়াছি।'

www.pathagar.com

কিন্তু একথা ঠিক যে কবি গোলাম মোস্তফা ও এক্ষেত্রে সফল হতে পারেন নি। তিনিও হেম-নবীনের মতই ব্যর্থ হয়েছেন। যে কারণে 'বনি আদম' কাব্যগ্রন্থটি পাঠক মহলে খুব বেশি সাড়া জাগাতে পারেনি।

'মহাকাব্যিক ঘটনা, গঠনকল্পনা ও বিস্তৃতি থাকলেও 'বনি আদম' এ উপযুক্ত ভাষা নেই। স্বর্গ, মর্ত্য, অন্তরীক্ষে বিস্তৃতে কাহিনী বর্ণনায় এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর সংলাপে অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দ ব্যবহার করার ফলে তাতে গাম্ভীর্য ও গাড়বদ্ধতা আসেনি।"[১৫]

তবে কাব্যের শুরুতে এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন কবি। যেমন–

নিস্তব্ধ নির্জন রাতি! মহাশূন্য মাঝে
কোটি কোটি চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা দল
জেগে আছে অতন্দ্র নয়নে! মনে হয়
স্বচ্ছ নীলিমায় এক সমুদ্র- প্লাবন
ডুবাইয়া অন্তরীক্ষ-বিশ্ব চরাচর
অনন্তকালের বুকে পাতিয়াছে তাঁর
চিরন্তন অধিকার। (১-২)

গোলাম মোস্তফা গদ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে কাজী কাদের নওয়াজ লিখেছেন–

"কবির গদ্য রচনা সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, মিলটনের 'এরিও পেজেটিকা'র গদ্য যেমন জ্ঞানস্পৃহা বাড়িয়ে তোলে, গোলাম মোস্তফার গদ্য রচনাও তাই।"[১৬]

গোলাম মোস্তফা কবি হিসেবে পরিচিত ও নন্দিত হলেও তাঁর প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ 'রূপের নেশা' নামক উপন্যাস। এবং দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থও উপন্যাস (১৩২৮)। এ জন্য মরহুম মুনীর চৌধুরী গোলাম মোস্তফা সম্বন্ধে লিখেছেন–

"মরহুম গোলাম মোস্তফার সম্পূর্ণ নাম কবি গোলাম মোস্তফা। লোকের স্মৃতিতে 'কবি' তাঁর নামের অবিচ্ছেদ্য আদ্যাংশরূপে চিরকাল জাগরূপ থাকবে। কিন্তু তাঁর সমগ্র সাহিত্য কীর্তির বিচারে এই পরিচয় অসম্পূর্ণ। কবির পদ্য রচনার গুণ ও পরিমাণ কোনো অর্থেই সামান্য নয়। এমন কি এই গদ্যের কবিত্বপূর্ণ গোলাম মোস্তফার গদ্য যে কেবল কাব্যিক উদ্দামতায় বেগবান তাই নয়, ইহা গদ্য পরিণত চিন্তা ধারার সংগে সংগতি রক্ষা করে সরস, শান্তি ও সংহত রূপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম।"[১৭]

---

১৫. সাঈদ-উর-রহমান, পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১৪০

১৬. মুনীর চৌধুরী, কবিতা চিন্তাধারা ও গদ্যরীতি (প্রবন্ধ); কবি গোলাম মোস্তফা, ফিরোজা খাতুন সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৬৭, পৃ. ৮৪।

১৭. মুস্তফা মাসুদ, গোলাম মোস্তফার গদ্যে কাব্যিক আমেজ (প্রবন্ধ) ; ঐতিহ্য; (১৮৯৭-১৯৯৭, কবি গোলাম মোস্তফা জন্ম শতবর্ষ বিশেষ প্রকাশনা) হাসান আবদুল কাইয়ূম সম্পাদিত, ইফাবা, ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ৮০।

www.pathagar.com

সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখায় কবি গোলাম মোস্তফার অবাধ পদচারণা ছিল। যেহেতু তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল অধপতিত, পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজকে তাদের স্বমহিমায় দাঁড় করানো-তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য বিষয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় অনেকগুলো প্রবন্ধ রচনা করেন। যে সব প্রবন্ধ মাসিক মোহাম্মদী, সওগাত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, ইসলাম দর্শন, মোয়াজ্জিন, সত্যবার্তা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এসব প্রবন্ধ 'আমার চিন্তাধারা' (১৯৬২) নামক প্রবন্ধ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। আসলে–

'এমন এক সময় গোলাম মোস্তফার জন্ম হয়েছিল যখন তাঁর সধর্মীয় সমাজ অর্থাৎ বাংলার মুসলিম জনসমাজ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতার গভীর অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিল। শুধু তাই নয়, তারা ছিল সর্বক্ষেত্রে শোষিত, নিপীড়িত, নিগৃহীত ও অপাংতেয়।'[১৮]

এই প্রেক্ষাপটে কবি গোলাম মোস্তফা চাচ্ছিলেন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বতন্ত্র সাহিত্য ধারা গড়ে উঠুক।

প্রবন্ধকার গোলাম মোস্তফা অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ ও তথ্যনিষ্ঠ ছিলেন। যেমন 'ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রকাব্যে ইসলামী ভাবনার প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে তিনি নানা যুক্তি ও তথ্যের অবতারণা করেছেন। তিনি সরাসরি কোরআনের বিভিন্ন সূরা থেকে আয়াতের নির্দেশ পেশ করে তুলনামূলক বিচার করতে চেষ্টা করেছেন। 'ইসলাম ও কমিউনিজাম' গ্রন্থে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের অসারতা প্রমাণ করেছেন। মানব রচিত মতবাদ যে মানুষের মুক্তির সনদ হতে পারে না এ কথা তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। ইসলাম যে মুক্তির একমাত্র পথ সে কথা তিনি তুলে ধরেছেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে কমিউনিজম মুখ থুবড়ে পড়বে। যা আজ সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

নিঃসন্দেহ 'বিশ্বনবী' গোলাম মোস্তফার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি। আজ একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, কবি গোলাম মোস্তফা যদি 'বিশ্বনবী' গ্রন্থটি ছাড়া অন্য কিছু রচনা না-ও করতেন তবুও যুগের পর যুগ বাঙালি পাঠকদের কাছে তিনি বেঁচে থাকতেন, শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন থাকতেন। 'বিশ্বনবী' র কদর পাঠকের কাছে বিন্দুমাত্র কমেনি বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রথম খণ্ডে মোট ৫৮ টি পরিচ্ছদে আলোচনা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় খণ্ডে মোট ১৪টি পরিচ্ছদে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি পরিচ্ছদের আলোচনায় অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্জল। 'বিশ্বনবী' নিঃসন্দেহ একটি গবেষণা গ্রন্থ, সর্ব সাধারণের বোধগম্যও। এর কোনও আলেচনা যুক্তির ভারে ন্যূব্জ হয়ে পড়েনি, আবার আবেগের বশবর্তী হয়ে কোন অযৌক্তিক কিছুকেও প্রশ্রয় দেয়া হয়নি। বর্তমানে 'বিশ্বনবী' গ্রন্থটিকে গদ্য কাব্য হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে।

---

১৮. হাসান আবদুল কাইয়ূম সম্পাদিত, ঐতিহ্য, ১১ বর্ষ, ৭-১২ সংখ্যা।

www.pathagar.com

অনুবাদের ক্ষেত্রেও কবি গোলাম মোস্তফা ছিলেন অনন্য। তিনি উর্দু কবি আলতাফ হোসেন হালী, মহাকবি আল্লামা ইকবাল ও কোরআনের বিভিন্ন সূরার প্রাঞ্জল অনুবাদ করেছেন। এ ব্যাপারে ড. খালেদ মাসুকে রসুল লিখেছেন–

"অমর কবি ইকবালের কাব্যদর্শন ও জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ ছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা। পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা এ মহান কবি ছিলেন কবি গোলাম মোস্তফার সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক জীবনের অভ্রান্ত দিশারী। পাকিস্তানোত্তর কালে তিনি প্রাচ্যের এই মহাকবির অজস্র বাণী আমাদের সাহিত্যে পরিবেশন করেন। 'কালাম-ই-ইকবাল', 'শিকওয়া', 'জওয়াব-ই-শিকওয়া'র অনবদ্য অনুবাদ গোলাম মোস্তফার অনন্য অবদান। তিনি কুরআনের কোনো কোনো সূরারও সুললিত অনুবাদ করেছেন। ১৯২৭ সালে মাসিক 'সাহিত্যিক' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তাঁর 'এখওয়ানুস সাফার' অনুবাদ। সেই একই বছর মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হয় 'মুসাদ্দাস-ই-হালী' ধারাবাহিকভাবে।"[১৯]

সুদীর্ঘকাল শিক্ষকতার মত মহান পেশার সাথে জড়িত থাকার কারণে এবং শিক্ষা বিজ্ঞানে ডিগ্রীপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে শিশু-কিশোরদের মনের খোঁজ তিনি সহজেই পেয়েছিলেন। যে কারণে তিনি শিশুদের জন্য অজস্র লেখা উপহার দিতে পেরেছিলেন। তিনি স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের অনেক পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেছেন। যে জন্যে অনেকেই ভুল করেন, তাঁর রচিত শিশু পাঠ্য রচনা পাঠ্যপুস্তক সর্বস্ব মনে করে।

অবশ্য একথা ঠিক যে, তিনি ছাত্র ছাত্রীদের যাবতীয় বিষয়বস্তুকে নীতি উপদেশ ও ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য করার প্রয়াসী ছিলেন। তবে 'ভাব, বিষয়, ভাষাভঙ্গি, ছন্দোগতি, শব্দ লালিত্য, রচনাশৈলী এ সকল দিকেই তিনি ছিলেন স্বার্থক শিশুমনোরঞ্জক রচনারকার।

গোলাম মোস্তফা ছোটদের জন্য লিখেছেন–আলোক মালা, পথের আলো, আলোক মঞ্জুরী, নূতন আলো, ইসলামী নীতিকথা (১৯৩৫), কাব্য কাহিনী (১৯৩৮), ইতিহাস পরিচয় ও মরু দুলাল (১৯৪৮)-এর মত গ্রন্থ।

আলো অভিসারী এ কবি ছোটদের জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করার মানসিকতায় তাঁর গ্রন্থের নামকরণও সেইরূপ করেছেন, যে কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

তিনি শিশুদের জন্য খুবই আকর্ষণীয় ও মন মাতানো প্রচুর ছড়া কবিতা লিখেছেন, যা এখনো সবার মুখে মুখে ফেরে। যেমন–

ক. আমরা নতুন আমরা কুঁড়ি, নিখিল বন নন্দনে
ওষ্ঠে রাঙা হাসির রেখা জীবন জাগে স্পন্দনে।

....

ভবিষ্যতের লক্ষ্য আশা মোদের মাঝে সন্তরে

---

১৯. মুসলিম রেনেসাঁর কবি গোলাম মোস্তফা, ড. খালেদ মাসুকে রসূল, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯২ খ্রি., পৃ. ৫৩

www.pathagar.com

ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুর অন্তরে।
(কিশোর-রক্তরাগ, পৃ. ৪৯)।

খ. খুকুমনি জনম নিলো যেদিন মোদের ঘরে
পরীরা সব দেখতে এল কত খুশী ভরে।
(খুকুমনি-আমরা নতুন আমরা কুঁড়ি পৃ.৫)।

গ. এই করিনু পণ, মোরা এই করিণু পণ
ফুলের মত গড়ব মোরা মোদের এ জীবন।
(শিশুর পণ-আমরা নতুন আমরা কুঁড়ি, পৃ. ৮)।

ঘ. নূরু, পুশি, আয়েশা, শফী সবাই এসেছে,
আম বাগিচার তলায় যেন তারা হেসেছে।
(বনভোজন, আমরা নতুন আমরা কুঁড়ি, পৃ. ৬)। ইত্যাদি।

সম্পদনার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান রয়েছে। তিনি 'সাহিত্যিক' (১৯২৭, মোহাম্মদ ওয়াকুব আলী চৌধুরীর সাথে যৌথ সম্পদনা, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির মাসিক মুখপত্র), পুরবী (১৩৭৬, মুহম্মদ আবদুল হাই-এর সাথে যৌথ সম্পাদনা, পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড-এর ত্রৈমাসিক স্কুল মুখপত্র), লেখক সংঘ পত্রিকা (সম্পাদনা), নওবাহার (বির সার্বিক সহযোগিতায় কবি স্ত্রী মাহফুজা খাতুন সম্পাদনা করতেন) সম্পাদনা করেছেন।

তিনি করাচীর ইকবাল একাডেমীর আজীবন সদস্য, জীবন সদস্য বাংলা একাডেমী, নির্বাহী সদস্য, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ন্যাশনাল সেন্টার অব পাকিস্তান (ঢাকা), ইসলামিক একাডেমী (ঢাকা), উর্দু বাংলা উন্নয়ন বোর্ড (লাহোর), জাতীয় উন্নয়ন ব্যুরো, পূর্ব পাকিস্তান স্কুল টেকস্ট বুক বোর্ড, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি, পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি, পাকিস্তান মজলিস, রওনক, পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড প্রভৃতি'র সদস্য ও কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি যশোর সমিতি(ঢাকা), প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। পাকিস্তান স্বাধীন হবার পূর্বে তিনি ছয় বছর তাঁর নিজ ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট (চেয়ারম্যান) ছিলেন। আন্তর্জাতিক সংস্থা 'পি–ই-এন এর কেন্দ্রীয় পাকিস্তান শাখা এবং পূর্ব পাকিস্তান শাখার তিনি ছিলেন অন্যতম কর্মকর্তা।

তিনি ১৯৪৫ সালে ঢাকা ও কলকাতার মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী ও মুসলিম বেঙ্গল প্রেস স্থাপন করেন। যশোর বাসীর পক্ষ থেকে ১৯৫১ সালে তাঁকে 'কাব্য সুধাকর' উপাধি, ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের পুরস্কার Pride of Performancec লাভ, ১৯৬০ সালে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে 'সিতারা–ই ইমতিয়াজ খেতাব', ১৪০৪ হিজরীতে কবিকে মরণোত্তর ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

৮ই অক্টোবর ১৯৬৪ সালের দিবাগত রাতে মুসলিম বাংলার জাতীয় জাগরণের কবি গোলাম মোস্তফা হঠাৎ সেরিব্রাল থ্রম্বসিস রোগে আক্রান্ত হন এবং পক্ষাঘাত গ্রস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৩ ই অক্টোবর ১৯৬৪ সালের দিবাগত রাত ১১ টার সময় ইন্তিকাল করেন। তাঁর জানাযার ইমামতি করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তাঁকে আজিমপুর গোরস্তানে দাফন করা হয়।

www.pathagar.com

প্রবন্ধ সংকলন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

আমাদের এই সংশয়জড়িত কালে মরহুম গোলাম মোস্তফা এক উজ্জ্বল বিশ্বাসের প্রতীক। জীবন থেকে আহরিত সেই ব্যক্তিক বিশ্বাস তাঁর কাব্য ও সাহিত্যকে পরম সত্যের পথে নিঃসংশয়চিত্তে বহন করেছে। জীবন-সাধনার মতোই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি কখনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বে কিংবা সংশয়বাদিতায় পথভ্রষ্ট হননি।

কাব্যে প্রেম ও ইসলাম মূলতঃ উপজীব্য হলেও, গদ্যে তাঁর বিষয়-বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। ইসলামী চিন্তাধারাকে গদ্যরচনার ক্ষেত্রে আহ্বান করেছেন তিনি; কিন্তু ধর্মসর্বস্ব চিন্তায় তাঁকে নিঃশেষিত হতে দেখা যায় না। রাজনীতি; ভাষা-সাহিত্য-শিক্ষা–আরো বিভিন্নমুখী ধ্যানধারণা তাঁর প্রেক্ষাপটে বিধৃত।

কাব্যরচনায় গোলাম মোস্তফা মৌল আবেগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আবেগের প্রাবল্যে সংক্রমিত তাঁর কাব্য উদ্বেল ও উচ্ছল। অপর পক্ষে, গদ্য বা প্রবন্ধ রচনায় তিনি আশ্চর্যভাবে যুক্তিবাদ ও ইতিহাস-আশ্রিত। এ-জন্যে তাঁর গদ্যরচনাবলী প্রগাঢ় বাক্যচেতনায় কেবল বিশেষ ভাবের অবলম্বন নয়; বিবিধ চিন্তাময় বক্তব্যেও মুখর। অবশ্য কবির আন্তরিক আবেগ ভাষাকে প্রাঞ্জল, গতিশীল ও সাবলীল করে তুলেছে।

গোলাম মোস্তফার সাহিত্যিক-রীতি ঐতিহ্য-সূত্রে প্রাপ্ত বিশ্বাসের আলোকে উজ্জ্বল। এ-জন্যে ধর্মীয় গদ্যরচনায় তিনি চিত্তকে আবিষ্ট ও আকৃষ্ট করেন। তাঁর 'বিশ্বনবী' আমাদের সত্তার বিশ্বাসের চিন্ময় বিস্তার। অন্যান্য গদ্যে, বিশেষতঃ প্রবন্ধাবলীতেও তিনি ঐতিহ্য-আহৃত বিশ্বাস দ্বারা ধ্রুব-সত্যের আবিষ্কারে নিঃশঙ্ক অভিসার-উন্মুখ। গোলাম মোস্তফার বাক্যবাণী এহন বিশ্বাসের আশ্বাসে এক সফলতার তোরণে উত্তরণ-প্রয়াসী।

বর্তমান সংকলনে তিনি চিরন্তন সমস্যাদি উপস্থাপিত করে নতুন মূল্যবোধে যাচাই করেছেন। আবার কখনো আপাতঃ সমাধানকে নতুন সমস্যায় উজ্জীবিত করে তুলেছেন। নতুন বিষয়বস্তুকে প্রশ্নের তীক্ষ্ণ তীরে বিদ্ধ করার প্রক্রিয়া তাঁর অজ্ঞাত ছিল না; দুর্বার মানসিক শক্তিও ছিল। এদিক থেকে মরহুম গোলাম মোস্তফার প্রবন্ধ-সংকলন বিশেষ ভাবে মূল্যায়নের দাবী রাখতে পারে।

সৈয়দ আলী আহসান
চট্টগ্রাম
৬/৬/৬৮

www.pathagar.com

আরয

মরহুম কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবের "প্রবন্ধ-সংকলন" পুস্তকাকারে প্রকাশ করলাম। "প্রবন্ধ-সংকলন" মরহুম কবির বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ও সভা-সমিতিতে পঠিত প্রবন্ধসমূহের একটি সংকলন। আমার মরহুম স্বামী কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর বিবিধ প্রবন্ধের ধারাবাহিকতার ক্রমিক অনুসারে "আমার চিন্তাধারা" প্রকাশ করে গেছেন। জীবনের প্রারম্ভ থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অবিরাম লেখনী চালিয়ে তিনি যতো প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা লিখে গেছেন তার থেকে হয়তো স্বভাব কবির মানসিকতার প্রতিফলন স্বরূপ "আমার চিন্তাধারা"। কিন্তু সংকলন হিসাবে যা আজও রয়েছে অপ্রকাশিত অন্ধকারের গহ্বরে, তারও প্রয়োজন আছে বাইরে বেরিয়ে আসবার, তাই আমার মরহুম স্বামীর আরব্ধ কাজ শেষ করার অভিলাষে আমার এই প্রচেষ্টা। যে-সমস্ত প্রবন্ধ নিয়ে এই সংকলন বের করবার গুরুদায়িত্ব মাথায় নিয়েছি তার বিচারের ভার দেশবাসীর উপর রইলো।

প্রকাশিত ও অপ্রাশিত প্রবন্ধসমূহের একটি সংকলন বের করবার ইচ্ছা আমার অনেকদিন থেকে ছিল। আজ যদি কবি বেঁচে থাকতেন, তবে এই গুরুদায়িত্ব আমাকে বহন করতে হোত না।

কবির বহুমুখী প্রতিভা, তাঁর সুদূর প্রসারী চিন্তাধারা, মানবতা বোধ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর অগাধ জ্ঞানের জন্য লেখক সমাজে তিনি চির অমর হয়ে থাকবেন। কবি একাধারে সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ ও সুরশিল্পী ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি ইসলামিক ধ্যান-ধারণা, প্যান-ইসলামিজমের চিন্তাধারা ও বিশ্ব-মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের উপর আলোকপাত করে গেছেন এবং তা প্রচারের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তারই ফলস্বরূপ আল্-কুরআন "দ্বিতীয় খণ্ড" ও বিশ্বনবীর উরদু সংস্করণ অপ্রকাশিতভাবে শেষ করে গেছেন। তাঁর মননশীলতা, সহজ জীবনবোধ ও ভাবগম্ভীর প্রাঞ্জল ভাষা পাঠক-পাঠিকার চিত্ত জয় করতে সহায়তা করেছে। আবাল-বৃদ্ধবণিতা তাঁর কাব্য, সাহিত্য, প্রবন্ধ ও গল্প হতে জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান পেয়েছে। কল্পনার রঙে রাঙিয়ে জীবনকে তিনি দেখেননি, তিনি দেখেছেন সাদামাটা মানুষের জীবনের অতীত ঐতিহ্য, বর্তমানের সমস্যাবলী ও ভবিষ্যতের এক সুন্দর "মরদে-মুমিন"।

মানুষকে তিনি ভালোবেসেছিলেন এক মহাজীবনের অধিকারী হিসাবে। মানুষের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন এক মহাজীবনের আহ্বান, তারই জয়গান তিনি গেয়েছেন। কলুষ কালিমালিপ্ত যে জীবনবেদ তাকে তিনি ঘৃণা করেছেন। জাতির ঐতিহ্য, তাহ্জীব-তমদ্দুন, শিক্ষা-সংস্কৃতি রূপ পেয়েছে তাঁর কাব্যে, প্রবন্ধে ও কবিতার মাধ্যমে। মহাকবি ইকবাল, হাফিজ, রুমি, রবীন্দ্রনাথের আদর্শে তিনি প্রভাবান্বিত। তবুও তাঁর স্বাতন্ত্র্যবোধ, অনাবিল চিন্তাধারা তাঁর নিজস্ব স্বকীয়তায় পরিপূর্ণ। স্বজাত্যবোধ ও জাতীয় চিন্তাধারার উন্মেষ তাঁর চলার পথের পাথেয়।

এই 'প্রবন্ধ-সংকলন'-এ প্রাক-পাকিস্তান যুগ থেকে আরম্ভ করে সংগ্রামী যুগ পেরিয়ে পাকিস্তানে এসেছে। যুগ-প্রবাহের সঙ্গে সংযোগ রেখে তাই এগুলো পড়তে হবে। প্রবন্ধগুলো চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে- (ক) ইসলাম, (খ) রাজনীতি, (গ) ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষা এবং (ঘ) বিবিধ। বিভাগগুলো কবির চিন্তাধারার মূল্যায়নে সহায়তা করবে বলে আশা করি।

www.pathagar.com

কবির ভাষায় ঃ "পুস্তকখানি আর একটা কারণে পাঠক-পাঠিকার কাছে আকর্ষণীয় হবে বলে আশা করা যায়। এই পুস্তক লেখকের অন্তর্লোকের একটি প্রবেশ দুয়ার। এই দুয়ার দিয়ে পাঠক তার মনোলোকে প্রবেশ করবেন এবং সেই সুযোগে লেখকের অন্তর-মানুষটাকে দেখে ফেলবেন।"

কবির চিন্তাধারার বিভিন্ন দিক নজরুল ইসলামের উপর লেখা প্রবন্ধগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি। বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা এই প্রবন্ধগুলোতে নজরুল জীবনের আলোচনা ও সমালোচনা দুই-ই আছে। আশা করি পাঠক-পাঠিকা নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করে দেখবেন যে কবির মানসলোকের ভাবধারা থেকে উৎসারিত এই প্রবন্ধগুলো নজরুল-মানসের বিভিন্ন দিক বিচার করে লিখিত কিনা। মতের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়তো অনেক আছে, কবি নিজেই বলেছেনঃ "রাজনীতির ন্যায় কাব্য-সাহিত্য ও দর্শন-বিজ্ঞানেও এমন মত-পরিবর্তন স্বাভাবিক। এলিয়ট, রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল, নজরুল প্রত্যেকের চিন্তাধারাতেই পূর্বাপর কিছু না কিছু স্ববিরোধিতা আছে।"

কবির মৃত্যুর পর জনাব সৈয়দ আলী আশরাফ সাহেবের সম্পাদনায় কবির কাব্য-সংকলন বের হয়েছে এবং পাঠক সমাজে তা আদৃত হয়েছে। আশা করি আমার এই প্রচেষ্টা "প্রবন্ধ সংকলন" পাঠক সমাজে আদৃত হবে।

এই পুস্তক সংকলনে আমি অনেকের নিকট ঋণি, তার মধ্যে জনাব সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। জনাব সৈয়দ আলী আহসান সাহেব পুস্তকটির সম্পাদনার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন। এজন্যে আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। জনাব আবদুল কাদির সাহেব এবং আমার ভগ্নিপতি নারায়ণগঞ্জের ডাঃ জেড রহমান নানাভাবে সাহায্য ও সহায়তা করেছেন, তাঁদের নিকটও আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এ প্রসঙ্গে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা ফিরোজা খাতুনের নামও সমানভাবে উল্লোখযোগ্য। কেননা তার সহযোগিতা ব্যাতিরেকে এ সংকলন প্রকাশ করা আমার পক্ষে সত্যিই দূরুহ ছিল। প্রকৃতপক্ষে তারই অনুপ্রেরণায় আমি এ কাজে ব্রতী হয়েছিলাম।

পরিশেষে আমি গ্রন্থ প্রকাশক আহমদ পাবলিশিং হাউসের স্বত্বাধিকরী জনাব মহিউদ্দীন আহমদকে ঐকান্তিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশে এগিয়ে এসেছিলেন, তাতে মরহুম কবির স্মৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধেরই প্রকাশ সূচিত হয়েছে।

প্রবন্ধ-সংকলনের ২য় খণ্ড পরে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রইলো।

শেষ কথা, আমার এই প্রথম প্রচেষ্টা "প্রবন্ধ-সংকলন" আমি কবির দেশবাসীর তথা পাঠক পাঠিকার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম। কবির রুহের শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করি।

মাহফুজা খাতুন

মোস্তফা মঞ্জিল
শান্তিনগর, ঢাকা
২৬/৬/৬৮

www.pathagar.com

বদর-যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্‌র ভূমিকা

বদর-যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসের একটি যুগপ্রবর্তক ঘটনা। এ কোনো একটা সাধারণ সামরিক অভিযান নয়। রাসূলুল্লাহ্‌ খামাখাই ৩১৩ জন মুসলিম সৈন্যের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী লইয়া বদর অভিযান করেন নাই। এর পশ্চাতে ছিল একটা গভীর রাজনীতি ও কুটনীতির খেলা। রাষ্ট্র সংগঠনে বা যুদ্ধ পরিচালনায় কুটনীতির (Stratagem) প্রয়োজন হয়। সব কিছু প্রকাশ্যে খোলাখুলিভাবে করিতে গেলে অনেক প্রচেষ্টাই পণ্ড হইয়া যায়। শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহ কেন, জীবনের অধিকাংশ কাজই কৌশল ও বুদ্ধি লইয়া করিতে হয়। কাজেই, যাহারা মনে করেন-যেহেতু হযরত মুহম্মদ (সাঃ) পয়গম্বর ছিলেন, অতএব তিনি সব কাজই খোলাখুলি ভাবে করিতেন, তাহারা ভুল করিবেন। সদুদ্দেশে অনেক কাজ কৌশলে করাতে বাধা নাই। ইসলাম তাহা সমর্থন করে। ইসলাম এমন নীতি-বাক্যের ধর্ম নহে যাহা জীবনে কার্যকরী হয় না। কোরআন শরীফের একটি আয়াত এখানে উদ্ধৃত করিতেছি যাহা হইতে পাঠক সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারিবেন ইসলামের যুদ্ধনীতি কিরূপ।

যাহারা বিশ্বাসঘাতক তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ বলিতেছেন–

واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ـ

ان الله لايحي الخائنين *

অর্থাৎ ঃ যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে, বিধর্মীরা বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, তবে তোমরাও তাহাদের সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ বিশ্বাসঘাতকদিগকে ভালোবাসেন না। –(৮ ঃ ৫৮)

পাঠক এখানে লক্ষ্য করিবেন যে, যাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, তাহাদের প্রতিই পাল্টা বিশ্বাসঘাতকতা করিবার কথা এখানে বলা হইতেছেনা, শত্রুরা বিশ্বাসঘাকতা করিতে পারে–এরূপ নিশ্চিত আশঙ্কা জন্মিলেও পূর্বাহ্নেই যে কোনো চুক্তিবদ্ধ ব্যাপারে চুক্তিভঙ্গ করা যায় এবং তাহাতে কোনো দোষ হয় না। সত্য ও কল্যাণের প্রশ্নই শেষ প্রশ্ন।

যুদ্ধে যে ধোকাবাজি (Diplomacy) অসংগত নয়, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌র একটি হাদিস হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়। তিনি বলিয়াছেন ঃ

عن جابر (رض) قال رسول الله الحرب خدعة *

অর্থাৎ ঃ (জাবের বলিয়াছেন) রাসূলুল্লাহ বলিয়াছেন যুদ্ধ ধোকাবাজীপূর্ণ।

কাজেই বদর-যুদ্ধের পূর্বে এবং পরে রাসূলুল্লাহ্‌ যতোগুলি অভিযান করিয়াছেন, তাহার সবগুলিই যে প্রতিরোধ বা আত্মরক্ষামূলক (Defensive) এরূপ মনে করিবার কোনো সংগত কারণ নাই। বদর-যুদ্ধের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেক অভিযানে রাসূলুল্লাহ্‌কে সম্পূর্ণ নিরীহ দেখাইবার জন্য অনেকে শত্রুপক্ষের ক্রিয়াকলাপকেই সম্পূর্ণরূপে দায়ী করেন এবং সেগুলোকেই রাসূলুল্লাহ্‌র সমর্থনের যুক্তিরূপে ব্যবহর

www.pathagar.com

করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা সত্য বটে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়। সত্যকে জয়যুক্ত করিবার নীতি হিসাবে এবং মিথ্যাকে প্রতিরোধ করিবার প্রয়োজনেও অনেক ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্‌কে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। বদর অভিযানের মধ্যেও ছিল এমনি এক সত্য ও আদর্শের প্রশ্ন। রাসূলুল্লাহ্ যে কতো বড় কূটনীতিবিশারদ দূরদর্শী সংগঠনী নেতা ছিলেন, বদর-যুদ্ধে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা এখানে তাই বদর যুদ্ধের আনুপূর্বিক ঘটনাবলীকে কিছুটা নতুন আলোকে উদ্ঘাটিত করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

বদর-যুদ্ধ

মক্কার কোরেশদিগের সংগ্রামী মনোভাব ও গোপন সমরায়োজন লক্ষ্য করিয়া আঁ-হযরত মদিনাবাসীদিগকে অস্ত্রধারণ করিতে আহ্বান করিলেন। ইতোপূর্বে যে সনদপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহার একটি শর্ত এই ছিল যে, বহিঃশত্রুর দ্বারা যদি মদিনা আক্রান্ত হয়, তবে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলে মিলিয়া দেশ রক্ষা করিবে। কিন্তু হযরত পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের মধ্যে সে মনোভাব আদৌ নাই। বরং তাহারা এমন ব্যবহার দেখাইতে লাগিল যেন কোরেশগণ মদিনা নগরী আক্রমণ করিয়া নব-জাগ্রত মুসলিম শক্তিকে ধ্বংস করিয়া দিলেই তাহারা খুশী হয়। শুধু তাই নয়, তাহারা যে তলে তলে কোরেশদিগের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে, এ সংবাদও হযরতের অজানা নাই। আঁ-হযরত ইহাতে দমিলেন না। বুঝিলেন মুসলমানদিগকে দুই সীমান্তেই যুদ্ধ করিতে হইবে। তবে উভয় শত্রুকে এক যোগে ক্ষেপাইয়া দেওয়া বুদ্ধিমত্তার কাজ হইবে না ভাবিয়া তিনি সর্বপ্রথম কোরেশদিগকে দমন করিতেই বদ্ধপরিকর হইলেন।

এই উদ্দেশ্যে নবীজি আপন ভক্তবৃন্দকে এক পরামর্শ সভায় আহ্বান করিলেন। সমর পরিস্থিতির আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বুঝাইয়া দিলেন, আবু সুফিয়ানকে অস্ত্রশস্ত্রসহ সিরিয়া হইতে নির্বিঘ্নে মক্কায় ফিরিয়া যাইবার সুযোগ দিলে বিপদ আরও ঘনীভূত হইবে। তৎকালে মক্কা হইতে সিরিয়া যাইতে হইলে বদরের গিরিপথ দিয়া যাইতে হইত। বদর ছিল মক্কা, মদীনা ও সিরিয়ার রাজপথের সন্ধিস্থল এবং মদীনার এলাকাধীন। কাজেই মদীনার বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য মদীনার মধ্য দিয়াই শত্রুরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র লইয়া দেশে ফিরিবে অথচ মদীনাবাসীরা তাহাতে বাধা দিবে না, ইহার নাম নিজেদের মৃত্যু-পরোয়ানায় দস্তখৎ ছাড়া আর কিছু নয়। দুই দেশ যখন যুদ্ধের অবস্থায় (State of belligerency) আসিয়া যায়, তখন এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইতে দেওয়া কিছুতেই আর সম্ভব হয় না। কোনো আন্তর্জাতিক নীতিই ইহা সমর্থন করে না। রাসূলুল্লাহ্ তাই মনস্থ করিলেন, সিরিয়া হইতে রণসম্ভারসহ ফিরিবার পথে বদর-প্রান্তে তিনি আবু সুফিয়ানকে বাধা দিয়া তাহার অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইবেন।

এই ব্যাপারই পরামর্শ সভায় আলোচিত হইল। রাসূলুল্লাহ্ সকলের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। আবু বকর ও আলি রাসূলুল্লাহ্‌র কথায় সায় দিয়া বলিলেন, কালবিলম্ব না করিয়া বদর-প্রান্তরে অভিযান করা উচিত। আল্-সিক্‌দাদ নামক এক সাহাবী উঠিয়া দাঁড়াইয়া

www.pathagar.com

বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্, আল্লাহ্র নির্দেশে আপনি যেখানে খুশি চলুন, আমরা আপনার সঙ্গে যাইব। হযরত মূসার শিষ্যদিগের ন্যায় আমরা এ কথা বলিব না, হে মূসা, তুমি আর তোমার প্রভু গিয়া যুদ্ধ করো, আমরা ঘরে বসিয়া থাকি। আমাদের কথা হইতেছে ঃ আল্লাহ্র নামে আপনি যুদ্ধে চলুন, আমরাও আপনার সহিত যুদ্ধে যাইব। এই কথায় রাসূলুল্লাহ্ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

অতঃপর আনসারদিগের প্রতি চাহিয়া তিনি তাহাদের মনোভাব জানিতে চাহিলেন। তখন আনসার নেতা সাদ-বিন-মাজ উঠিয়া বলিতে লাগিলেনঃ হে রাসূলুল্লাহ্, আনসারদিগের সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন না। জীবনে-মরণে সুখে-দুঃখে ছায়ার ন্যায় আমরা আপনাকে সর্বদা অনুসরণ করিব। আপনি যেখানে যাইতে বলিবেন সেখানেই যাইব, যেখানে থামিতে বলিবেন সেখানেই থামিব। সাগরে ঝাপ দিতে বলিলে ঝাপ দিব, ডুবিতে বলিলে ডুবিব, মরিতে বলিলে মরিব।

শিষ্যদিগের এই মনোবল দেখিয়া হযরত যারপরনাই আশান্বিত হইলেন। অবিলম্বে অভিযানের জন্য তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

কিন্তু তবুও শিষ্যদিগের মধ্যে কিছুটা মত-বিরোধ দেখা দিল। একদল বলিলেন, শত্রুকে পূর্বাহ্নেই দূর হইতে বাধা দেওয়া উচিত। অন্যদল বলিলেন ঃ মদীনা নগরে যখন ইহুদী-নাসারা ও অন্যান্য গৃহশত্রু বিদ্যমান তখন সমস্ত মুসলমানের একযোগে নগর ত্যাগ করিয়া দূরে যাওয়া কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হইবে না। হযরত দেখিলেন দুই দিকেই সত্য আছে। তখন তিনি মুসলমানদিগকে দুই দলে বিভক্ত করিলেন। যাহারা মদীনায় থাকিবার পক্ষপাতি ছিলেন তাহাদিগকে মদীনাতেই রাখিয়া দিলেন আর যাহারা অভিযানে যাইতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে লইয়া তিনি একটি স্বেচ্ছাবাহিনী বাহিনী গঠন করিলেন। এরূপ যিন্দাদিল দুঃসাহসিক মুসলিম বীরের সংখ্যা মিলিল মাত্র ৩১৩। তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র আবার নিতান্ত মামুলী ধরনের। অশ্বারোহী সৈন্য মাত্র দুইজন। আর যানবাহনের জন্য পাওয়া গেল মাত্র ৭০টি উট।

এই ক্ষুদ্র বাহিনী লইয়াই হযরত আজ বাহির হইলেন সেনাপতির বেশে। আজ তাঁহার বীরমূর্তি। হাতে নাঙ্গা তলোয়ার। শিরে বাঁধা আমামা। রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে তাঁহারা গৃহত্যাগ করিলেন। নিজেদের গতিবিধি গোপন করিবার জন্য উটের গলার ঘন্টাগুলি কাটিয়া দেওয়া হইল। মুষ্টিমেয় এই সত্যের সৈনিকদল নীরবে বদর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ইসলাম আজ সর্ব প্রথম দৃপ্ততেজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। তাহার প্রচ্ছন্ন রণমূর্তি আজ জগতে আত্মপ্রকাশ করিল। তুমি অন্যায় করিয়া আমার গালে চড় মারিবে আর আমি তোমার দিকে অন্য গালটি ফিরাইয়া দিব, ইসলাম তাহা নহে। তুমি দিনের পর দিন অত্যাচার করিয়া চলিবে, আর আমি তাহা নীরবে সহ্য করিয়া যাইব, ইসলাম তাহা নহে। দুনিয়ার ঝন্‌ঝাট ঝামেলা হইতে নিরাপদে থাকিবার জন্য সন্ন্যাসী সাজিয়া বনে যাইব, ইসলাম তাহাও নহে। ইসলাম জীবনের ধর্ম। আত্মবিলপ্তি বা পশ্চাদপসরণ তাহার বাণী নহে। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা হিযরতও তাহার মূলনীতি নহে-কৌশল মাত্র। প্রয়োজন হইলে

www.pathagar.com

সাময়িক ভাবে অত্যাচার সহ্য করিতে হয়, অথবা হিযরত করিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে গিয়া উদ্দেশ্য সাধনের নূতন পথ খুঁজিতে হয়। হিযরতের অর্থ তাই পলায়ন বা আত্মগোপন নহে–প্রতিশোধ গ্রহণেরই এ এক প্রক্রিয়া বিশেষ। সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হও–ইহাই তাঁহার বাণী। যালিমকে বাধা দাও, মযলুমকে রক্ষ করো, সত্য ও আদর্শের জন্য তরবারি ধরো–প্রয়োজন হইলে মরো–প্রয়োজন হইলে মারো– ইহাই ইসলাম। ইসলামের তরবারি তাই নিরপরাধকে আঘাত করিবার জন্য নয়–আত্মরক্ষার জন্য। ন্যায়নীতি ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য–অন্যায়ের যথাযোগ্য প্রতিকারের জন্য। জীবন বিমুখতা, কাপুরুষতা ভীরু হৃদয়ের মিনতি ইসলামে নাই। ইসলাম বলিষ্ঠ ধর্ম–স্বভাবের তটভূমিতে তাহার প্রতিষ্ঠা। স্বভাবে যাহা আছে, ইসলামেও তাহা আছে।

এই মহাসত্যকেই রাসূলুল্লাহ্ আজ প্রথম রূপ দিলেন। এতদিন তাঁহার এক হাতে ছিল কুরআন অপর হাত ছিল শূন্য। সেই শূন্য হাতে এবার তিনি তুলিয়া লইলেন তরবারি। এক হাতে কুরআন অপর হাতে তলোয়ার–মানুষের এই মহিমময় মূর্তি দেখিয়া কোন্ অর্বাচীন ইহাকে নিন্দা করে? এর চেয়ে সুন্দরতর মূর্তি আর কী হইতে পারে? সত্যের সহিত শক্তির এই যে মিলন–একি ঘৃণার? একি নিন্দার? কিছুতেই নয়। শক্তি ছাড়া সত্য দাঁড়াইতেই পারে না। পক্ষান্তরে শক্তি যদি সত্যাশ্রয়ী না হয়, তাহা হইলেও মানুষের অশেষ দুর্গতি ও অকল্যাণ ঘটে। সত্যহীন শক্তি যুলুমে রূপান্তরিত হয়। জগতে বৃহত্তর কল্যাণের জন্য সত্য ও শক্তির সমন্বয়ের তাই একান্ত প্রয়োজন। ইহাতে শক্তিও সুনিয়ন্ত্রিত, সত্যও উন্নত শিরে তাহার পথ কাটিয়া চলে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে তাই চাই সত্য ও শক্তির যুগপথ সাধনা। সত্যের আলো যদি আমাকে পথ দেখায়, সকল মিথ্যা, সকল ভ্রান্তি, সকল অসুন্দর হইতে সে যদি আমাকে বাঁচাইয়া চলে, সঙ্গে সঙ্গে আমার তরবারি যদি আমাকে দেয় সকল বাধা-বিঘ্নকে জয় করিবার বিপুল প্রেরণা; সকল ভীরুতা দুর্বলতাকে দূর করিয়া সে যদি দেয় আমার অন্তরে অসীম সাহস ও মনোবল, তবে আমর ভয় কি? লক্ষ্যস্থলে আমি পৌছিবই। ইসলামের সহিত তরবারির এমনই সম্বন্ধ।

কুরআন ও তরবারি তাই আদৌ অসামঞ্জস্য নয়। দুই বিরুদ্ধশক্তির সমন্বয়ই তো ইসলাম।

বস্তুতঃ ইসলাম মুসলামানকে দুইটি বস্তুই দান করিয়াছে। একটি কুরআন অন্যটি তলোয়ার। সত্য ও শক্তির, দীন ও দুনিয়ার-দুই চমৎকার প্রতীক এই কুরআন ও তলোয়ার।

ইহাই মুসলমানের সাচ্চা চেহারা–ইহাই তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

এই একহাতে তলোয়ার–আর এক হাতে কুরআনধারী নও–মুসলিমকেই আজ আবার আমরা সারা প্রাণ দিয়া কামনা করি।

হযরত মুহম্মদকে আমরা দেখিলাম আজ এই আদর্শ মুসলিম বেশে।

এই বেশেই বীর নবী চলিলেন যুদ্ধ-অভিযানে।

কাফেলা প্রথমতঃ মক্কার পথ ধরিয়া চলিল, কিন্তু কিছুদূর গিয়া বদরের দিকে মুখ ফিরাইল। দুইদিন পথ-প্রবাস করিবার পর তৃতীয় দিন সন্ধ্যাকালে হযরত সদলবলে বদর গিরি-প্রান্তরে আসিয়া উপণীত হইলেন।

www.pathagar.com

বদর-গিরি উপত্যকার তিন দিকে ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়। পূর্ব দিকের একটি পাহাড় হইতে একটি ঝরণা-ধারা ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। ওয়াকিফহাল সাহাবাদিগের পরামর্শে হযরত সেই ঝর্ণার উৎস-মুখ অধিকার করিয়া ঘাঁটি গাড়িলেন। একটি টিলার উপর খর্জুর শাখা ও পত্রাদির দ্বারা হযরতের জন্য একটি ছাউনি প্রস্তুত করা হইল। সেই ছাউনির মধ্যে হযরত রাত্রি যাপন করিলেন। সাদ-বিন-মাজ সারা রাত্রি সেই ছাউনি পাহারা দিলেন।

সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইলে কাফেলা আত্মগোপন করিয়া আবু সুফিয়ানের প্রতীক্ষায় রহিল। মাঝে মাঝে দুই একজন সাহাবী নিম্নে নামিয়া ছদ্মবেশে এদিক ওদিক গিয়া খোঁজ খবর লইতে লাগিলেন।

কিন্তু আবু সুফিয়ানও কম ধুরন্দর ছিল না। সিরিয়া হইতে ফিরিবার পথে বদরের সন্নিকটে আসিলেই সে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিল। সে ছিল, একজন পাকা গোয়েন্দা। বদর সীমান্তে পদার্পণ করিবার পূর্বেই তাহার সন্দেহ হইল হয়তো-বা মদীনাবাসীরা বদরে আসিয়া এবার তাহাকে বাধা দিবে। সেই আশঙ্কায় সে গোয়েন্দাগিরি শুরু করিয়া দিল। একটি বাজারের সন্নিকটে দুইজন উটওয়ালার সন্ধান পাইয়া সে তাহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে লাগিল। কিয়দ্দূর গিয়া উটের খানিকটা শুষ্ক বিষ্ঠা দেখিতে পাইল। সেই বিষ্ঠা লইয়া গিয়া ধৌত করিয়া সে দেখিল তাহার ভিতর যে খেজুরের আঁটি রহিয়াছে, তাহা আকারে ছোট। বলা বাহুল্য, মদীনায় যে খেজুর হয়, তাহার আঁটি মক্কার খেজুরের আঁটি অপেক্ষা অনেক ছোট। কাজেই আবু সুফিয়ানের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে এ অঞ্চলে মদীনার লোকেরা ঘোরাফেরা করিতেছে। এই ইংগিত পাইয়া আবু সুফিয়ান বদরের পথ ছাড়িয়া তাহার কাফেলাকে অন্য পথে পরিচালিত করিল। সঙ্গে সঙ্গে জমজম নামক জনৈক কোরেশ দূতকে দ্রুতগামী এক উটে মক্কায় পাঠাইয়া দিল। দূত গিয়া আবু জহলকে এই জরুরী খবর দিল যে, আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে হামলা করিবার জন্য মুহম্মদ সসৈন্যে বদরে উপস্থিত। মক্কা হইতে যথেষ্ট সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র না পাঠাইলে আবু সুফিয়ানের আর রক্ষা নাই।

সংবাদ পাওয়া মাত্র আবু জহল ত্রস্তব্যস্তভাবে সমুদয় মক্কাবাসীকে আহ্বান করিয়া এই বিপদ সংবাদ জানাইল এবং তৎক্ষণাৎ যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া আসিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিল। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী রণরঙ্গিনী হিন্দ স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় সিংহীর ন্যায় গর্জিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ আপন পিতা ওৎবা, চাচা শায়রা, ভ্রাতা অলিদ ও অন্যান্য বীর পুরুষদিগকে যুদ্ধ যাত্রার জন্য অনুপ্রাণিত করিতে লাগিল। নাখলায় নিহত ও বন্দী কোরেশদিগের আত্মীয় স্বজনও উৎসাহের সঙ্গে সেনাদলে আসিয়া যোগ দিল। মদীনাবাসীদের দুঃসাহস ও স্পর্ধাকে দমন করিতেই হইবে; ইহাই হইল তাহাদের দৃঢ় পণ। অনতিবিলম্বে প্রায় এক হাজার সৈন্যের এক পরাক্রান্ত বাহিনী গঠিত হইয়া গেল। তন্মধ্যে ১০০ অশ্বারোহী ৭০০ উষ্ট্রারোহী ও অবশিষ্ট পদাতিক। এই সেনাবাহিনীর পরিচালক হইল সত্তর বৎসর বয়স্ক কোরেশ নেতা আবু জহল।

মুসলিমদিগের মনের অবস্থা তখন যে কিরূপ তাহা একটু চিন্তা করিলেই অনুমান করা যায়। অকস্মাৎ এমন পটপরিবর্তন ঘটিবে, কে জানিত। রাসূলুল্লাহ্ও চিন্তিত হইয়া

www.pathagar.com

পড়িলেন। তাঁহারা আসিয়াছিলেন আবু সুফিয়ানের নিরস্ত্র কাফেলাকে আক্রমণ করিতে। কিন্তু সে কাফেলা কোথায় মিলাইয়া গেল, তদস্থলে ভাসিয়া উঠিল সশস্ত্র এক কোরেশ বাহিনী। এর জন্য রাসূলুল্লাহ্ ঠিক প্রস্তুত হইয়া আসেন নাই। এখন বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে এই কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হইতে হইল। কোরেশ বাহিনীর মুকাবেলা করা ছাড়া উপায়ই বা কী ছিল? শত্রু তো তখন ঘাড়ের উপর চাপিয়া বসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ নেতৃস্থানীয় সাহাবীদিগের সহিত পুনরায় পরামর্শ করিলেন। তিনি দেখিলেন, ভক্তবৃন্দ পূর্বের প্রতিজ্ঞায় অটল রহিয়াছেন। আল্লাহ্ ও রসুলের জন্য, ইসলামের জন্য তাঁহারা প্রত্যেকে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ্ তখন দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

দ্বিগুণ বেগে কোরেশ বাহিনী বদর পানে অগ্রসর হইল। অর্ধপথ অতিক্রম করিবার পর আবু সুফিয়ানের নিকট হইতে দ্বিতীয় দূত আসিয়া খবর দিল, আবু সুফিয়ানের কাফেলা মুহম্মদের লোক-লস্করকে এড়াইয়া নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়াছে। এখন সে অন্য পথ দিয়া মক্কায় ফিরিয়া যাইতেছে। কাজেই মক্কা হইতে আর সাহায্য পাইবার কোনো প্রয়োজন নাই।

এই সংবাদে কোরেশ বীরদলের অনেকেই নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িল। অনেকে ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিল। কিন্তু আবু জহল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অন্যরূপ যুক্তি দেখাইল। তাহারা বলিল, আমরা যখন এত কষ্ট করিয়া বদরের কাছাকাছিই আসিয়া গিয়াছি তখন মদীনাবাসীদিগকে শায়েস্তা না করিয়া যাইব না। মুহম্মদের সঙ্গে কতোই বা লোক-লস্কর আছে, যুদ্ধই বা কয়জন জানে? কাজেই এ সুযোগ ছাড়া হইবে না। এখান হইতে ফিরিয়া গেলে সকলেই আমাদিগকে কাপুরুষ বলিবে। আমরা তাই কিছুতেই ফিরিব না। আমাদের সঙ্গে নর্তকী আছে, গায়ক-গায়িকা আছে, আমরা বরং বদরে গিয়া আবু সুফিয়ানের নিরাপত্তা ও রণ-চাতুর্যের জন্য আনন্দোৎসব করিব আর মুহম্মদ ও তাহার লোক-লস্করকে আমরা যে পরাজিত করিব, ইহা তো সুনিশ্চিত!

ইহাই ভাবিয়া কোরেশগণ দ্বিগুণ উৎসাহে বদর পানে অগ্রসর হইল। গ্রীষ্মকাল। রমযান মাস। কোরেশগণ হাঁফাইতে বদরে আসিয়া উপনীত হইল। পানির সন্ধানে কতিপয় সৈন্যকে সামনে অগ্রসর হইবার জন্য আবু জহল নির্দেশ দিল।

কয়েকজন লোক ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ঝরণার ধারে আসিয়া যেই পানি খাইতে নামিয়াছে অমনি বীরবর হামজা গুপ্তস্থান হইতে তাঁহার দল লইয়া সেই লোকগুলিকে আক্রমণ করিলেন। হামজা নিজে কোরেশদের সর্দারকে হত্যা করিলেন। কয়েকজন বন্দী হইল এবং একজন পলাইয়া আবু জহলকে এই সংবাদ দিল। আবু জহল বিচলিত হইয়া উঠিল। তাহারা যে শত্রু সৈন্যের এত কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা ভাবিতেই পারে নাই। কোরেশ দলে তখন সাজ-সাজ রব পড়িয়া গেল।

শুক্রবার। প্রভাত হইতে না হইতেই বেলালের কণ্ঠে ফযরের আযান ধ্বনিত হইল। মুসলমানেরা কাতার-বন্দী হইয়া রসুলে-করিমের ইমামতিতে নামায পড়িলেন। নামাযান্তে হযরত যুদ্ধের জন্য সকলকে সজ্জিত হইতে আদেশ দিলেন। যেখানে যাহাকে মোতায়েন করা দরকার, করিলেন। যাহাকে যে উপদেশ দিবার ছিল, দিলেন। মুসলিম সৈন্য প্রান্তর-

www.pathagar.com

বুমি সম্মুখে রাখিয়া একটি অনুচ্চ পর্বতগাত্রে স্থান নিলেন। পানির ঝর্ণাটি তাহাদের অধিকারে রহিল।

কোরেশ সৈন্য প্রান্তরে ব্যূহ রচনা করিল। বিচিত্র বর্ণের পোষাক ও বর্মে সুসজ্জিত হইয়া তাহারা কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া গেল। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় ও যোদ্ধাদের রণ-হুঙ্কারে বদর-প্রান্তর মুখরিত হইতে লাগিল।

যুদ্ধ আসন্ন জানিয়া রাসূলুল্লাহ্ আপন শিবিরে প্রবেশ করিলেন। তথায় গিয়া আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন হইলেন। এই সংকট মুহূর্তে জীবনের চরম ও পরম বন্ধুর শরণ লইলেন। প্রাণের সকল আবেগ মিশাইয়া মুনাজাত করিলেনঃ "হে আমার প্রভু, আমার সহিত তুমি যে ওয়াদা করিয়াছিলে, তাহা পূরণ করো।[১] হে প্রভু! এই মুষ্টিমেয় সত্যের সৈনিকদলটিকে তুমি কি বাঁচাইবে না? ইহারা যদি আজ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, তবে দুনিয়ায় তোমার নামের মহিমা প্রচার বন্ধ হইয়া যাইবে।" বলিতে বলিতে হযরত একেবারে ভাবাবেশে তন্ময় হইয়া পড়িলেন। গায়ের উত্তরীয় খসিয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া আবু বকর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বলিলেনঃ হযরত যথেষ্ট হইয়াছে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই আপনার প্রার্থনা কবুল করিবেন।

এই প্রার্থনার উত্তরে আল্লাহ্ তাঁহার রসুলকে এই আশ্বাসবাণী শুনাইলেন ঃ-

"ন্যায়বানদিগকে সুসংবাদ দাও। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু বিশ্বাসীদিগের নিকট হইতে শত্রুদিগকে দূরে রাখিবেন, কারণ আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদিগকে ভালোবাসেন না।" (২২ ঃ ৩৮)

হযরত উৎফুল্ল হইয়া বাহিরে আসিলেন। আবু বকরকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ যুদ্ধ আরম্ভ করো। নিশ্চয়ই আমরা জয়যুক্ত হইব।

ওদিকে আবু জহল মুসলমানদিগের সংখ্যা নির্ণয় করিবার জন্য ওমায়ের নামক জনৈক অশ্বারোহীকে আদেশ দিল। ওমায়ের দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া মুসলমানদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া বলিল ঃ মুসলমানের সংখ্যায় তিন শতের বেশী হইবে না।

শুনিয়া আবু জহল নিশ্চিত বিজয়ের গর্বে একেবারে অধীর হইয়া উঠিল।

কালবিলম্ব না করিয়া সে যুদ্ধারম্ভের আদেশ দিল।

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কোরেশ শিবির হইতে রণ-ভেরী বাজিয়া উঠিল। তখনকার রীতি অনুসারে প্রথমে যুগ্মযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কোরেশদিগের মধ্য হইতে ওৎবা, তাহার ভ্রাতা শায়বা এবং পুত্র অলিদ বাহির হইয়া আসিয়া আস্ফালন করিতে করিতে বলিতে লাগিলঃ ওরে কাপুরুষ মুসলমানগণ, কার এমন বুকের পাটা, আয়তো দেখি। যুদ্ধ কারে বলে একবার দেখে যা এখানে।

এই আহ্বান শুনিয়া আনসারদিগের মধ্য হইতে তিনজন বীর লাফাইয়া উঠিলেন।

---

১. আ-হযরত মক্কায় অবস্থানকালে আল্লাহ্‌তা'লা একটি আয়াতের মাধ্যমে তাঁহাকে এই আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, অচিরেই কোরেশ ও মুসলমানদিগের মধ্যে একটি যুদ্ধ হইবে এবং সে যুদ্ধে আল্লাহ্ রসুলুল্লাহ্‌কে জয়যুক্ত করিবেন। সে আয়াতটি সুরা আল্-কমরের ৪৫ নং আয়াত ঃ "শীঘ্রই শত্রুদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিবে।" এই ওয়াদার কথাই এখানে বলা হইয়াছে।

www.pathagar.com

কিন্তু মহানুভব রাসূলুল্লাহ্ তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। তিনি ভাবিলেন, প্রথমেই যদি আনসারগণ যুদ্ধে নামে এবং যদি তাহাদের কেহ নিহত হয়, তবে লোকে বলিবে মোহাজেরদিগকে নিরাপদে রাখিয়া হযরত আনসারদিগের দ্বারাই যুদ্ধ চালাইতেছেন। ইহাই ভাবিয়া তিনি আপন পরমাত্মীয় হাম্জা, ওবায়দা ও আলিকে আহ্বান করিলেন। আদেশক্রমে তৎক্ষণাৎ বীরত্রয় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ওৎবার সহিত হামজার, শায়বার সহিত ওবায়দার এবং অলিদের সহিত আলির যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মুহূর্ত মধ্যে বীর কেশরী আলির এক আঘাতেই অলিদের শির ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তদৃষ্টে ওৎবা অধিকতর ক্ষিপ্ত হইয়া ভীম-বিক্রমে হামজাকে আক্রমণ করিল, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই হামজা তাহাকে জাহান্নামে পাঠাইয়া দিলেন। পয়ষট্টি বর্ষীয় বয়োবৃদ্ধ ওবায়দাও শায়বাকে নিহত করিলেন বটে কিন্তু শায়বার তরবারির আঘাতে তিনিও গুরুতররূপে আহত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই শাহাদত লাভ করিলেন।

ওৎবাকে এত শীঘ্র সবংশে নিহত হইতে দেখিয়া কোরেশগণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে কোনো ফল হইবে না ভাবিয়া এইবার তাহারা সমবেত আক্রমণ আরম্ভ করিল। এদিকে মুসলমানগণও বিজয়ের প্রথম সূচনায় অধিকতর অনুপ্রাণিত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে শত্রুনিপাতে অগ্রসর হইলেন।

তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অস্ত্রের ঝন্ঝনায় ও সৈন্যদিগের রণ-হুংকারে বদর-প্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠিল।

মুসলিম বীরবৃন্দ তখন বিপুল বেগে যুদ্ধ করিতেছেন। দুর্বার গতিতে তাহারা ব্যূহ ভেদ করিয়া শত্রুদিগকে নেস্তনাবুদ করিয়া চলিয়াছেন। এক এক জন বীর চার পাঁচ জন শত্রুকে নিপাত করিয়া তবে শহীদ হইতেছেন।

এই সময়ে মো'আজ ও আবদুল্লাহ্ নামক দুই জন মুসলিম তরুণ আপন ত্যাগ ও অসামান্য বীরত্ব দ্বারা এই যুদ্ধকে আশু পরিসমাপ্তির দিকে আগাইয়া দিলেন। আবুজহলকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহারা জীবন-পণ করিয়া অগ্রসর হইলেন। আবুজহল তখন ব্যূহ বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। যুবকদ্বয় বিদ্যুৎ গতিতে সেই ব্যূহ ভেদ করিয়া অতর্কিতে আবু জহলকে আক্রমণ করিলেন। মো'আজের এক আঘাতে আবুজহলের একটি পদ ছিন্ন হইয়া গেল। বাধ্য হইয়া সে ভূতলশায়ী হইল। পিতার এই মারাত্মক বিপদ দেখিয়া ইকরামা ছুটিয়া আসিয়া মো'আজকে আঘাত করিল; সেই আঘাতে মো'আজের একটি বাহু ছিন্নপ্রায় হইয়া ঝুলিতে লাগিল। মো'আজ দেখিলেন তাঁহার আপন বাহুই তাঁহার শত্রু হইয়াছে; তৎক্ষণাৎ তিনি দোদুল্যমান বাহুটিকে পদতলে চাপিয়া ধরিয়া এমন জোরে ঝট্‌কা টান্ দিলেন যে বাহুটি ছিন্ন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। তখন মো'আজ স্বচ্ছন্দ চিত্তে অপর হস্ত দ্বারা তরবারী চালনা করিতে লাগিলেন। মো'আজের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আবদুল্লাহ্ তৎক্ষণাৎ তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আবু জহল তখনও জীবিত ছিল, আবদুল্লাহ্‌র এক আঘাতে তাহার ছিন্ন মস্তক ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।

আবু জহলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কোরেশ সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পালয়ন করিতে আরম্ভ করিল। মুসলিমগণ সাফল্যের সূচনায় দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া কোরেশদিগের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। অনেককে নিহত করিলেন, অনেককে বন্দী করিলেন। মুসলিম

www.pathagar.com

সৈন্যরা ইচ্ছা করিলে এই সুযোগে আরো বহু শত্রুকে নিহত করিতে পারিতেন। কিন্তু প্রেম-করুণার মূর্ত ছবি মুহম্মদ! বাহিরে কঠোর হইলেও অন্তর তাঁহার হতভাগ্য মানুষের বেদনায় কাঁদিয়া ফিরিতেছিল। তৎক্ষণাৎ তিনি আদেশ দিলেনঃ উহাদিগকে মারিও না। বেচারাদের অনেকেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে।

আল্লাহ্‌র এ কী খেলা! রাসূলুল্লাহ্‌ কী করিতেই বা আসিলেন আর কীই-বা করিয়া গেলেন। আসিয়াছিলেন বদর-সীমান্তে টহল দিতে এবং বিশেষ করিয়া সিরিয়া হইতে প্রত্যাগমনরত আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে আক্রমণ করিতে। সেই হিসাবে ৩১৩ জনের সেনাবাহিনীই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কোন্‌ অদৃশ্য শক্তির ইংগিতে আবু সুফিয়ান সমুদয় অস্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম লইয়া নির্বিঘ্নে মক্কায় পৌঁছিয়া নিষ্ক্রিয় ভাবে বসিয়া রহিল, আর অন্য পথ দিয়া ইসলামের মারাত্মক শত্রুগুলি রাসূলুল্লাহ্‌র সামনে আসিয়া হাযির হইল। আবু সুফিয়ানের দল আবু জহলের দলের সহিত মিলিতেই পারিল না। আল্লাহ্‌ যেন সুকৌশলে দুই দলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলেন। পঞ্চাশ হাজার টাকার অস্ত্রপাতি ও রসদপত্র তাই বিফলেই গেল। দুই দল এক যোগে আসিলে বদর যুদ্ধের ইতিহাস হয়তো অন্যরূপে লিখিত হইত।[২]

বদর যুদ্ধে কোরেশদের নিহত সংখ্যা ছিল ৭০। বন্দী সংখ্যাও ছিল ৭০। মুসলমানদিগের নিহত সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪ জন। যে কয়জন কোরেশ নেতা আঁ-হযরতের প্রধান শত্রুরূপে এতকাল তাঁহার বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধন করিয়া আসিতেছিল, তাহাদের অধিকাংশই এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইল। বহু অস্ত্রশস্ত্র এবং রসদপত্রও মুসলমানদিগের হস্তগত হইল।

কোরেশদিগের পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে বদর-প্রান্তর পুনরায় শান্ত হইল। সত্যের বিজয়ে এবং মিথ্যার পরাজয়ে সারা প্রকৃতি যেন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

বদর-যুদ্ধ ইতিহাসে এক যুগপ্রবর্তক ঘটনা। যে সমস্ত মুসলিম বীর যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন পরবর্তী কালে তাঁহারা আরও অনেক বড় বড় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন; অনেক দেশও তাঁহাদের দ্বারা বিজিত হইয়াছিল; কিন্তু সে সব জয়-গৌরবকে কোনো মূল্য না দিয়া বদর-যুদ্ধে জড়িত থাকাকেই তাঁহারা জীবনের পরম সৌভাগ্য ও গৌরব বলিয়া মনে করিতেন। ইরাকের শাসনকর্তা, কুফা নগরীর স্থাপয়িতা পারস্য বিজয়ী মহাবীর সাদ অশীতি বর্ষ বয়সে মরণ-শয্যায় শায়িত অবস্থায় বলিয়াছিলেন, "বদর-যুদ্ধের পরিহিত বর্ম আমাকে পরাইয়া দাও; এই বেশে মরিব বলিয়া আমি উহা এতদিন সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছি।" বাস্তবিকই, বদর-যুদ্ধের গুরুত্ব এবং গৌরব মিথ্যা নয়। মক্কা বিজয়ের ইহাই প্রথম পদক্ষেপ। ইসলামের ইতিহাসের এখান হইতেই মোড় ফিরিয়াছে। এতদিন সে ছিল নিরীহ, এখন সে হইল নির্ভীক। এতদিন সে ছিল শান্ত ও সংযত; এখন সে হইল

---

২. এই 'দুই দলের ' প্রসঙ্গে কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌ নিম্নলিখতভাবে বর্ণনা করিয়াছেনঃ "এবং যখন আল্লাহ্‌ দুইটি দলের একটিকে তোমার হাতে দিবেন বলিয়া তোমার সঙ্গে ওয়াদা করিলেন এবং তুমি চাহিয়াছিলেন যে নিরস্ত্র দলটিই তোমার হউক, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। তিনি চাহিয়াছিলেন তাঁহার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়া তোমাকে জয়যুক্ত করিবেন এবং অবিশ্বাসীদিগের মূলোচ্ছেদ করিবেন।" (৮ ঃ ৭)

www.pathagar.com

দুর্বার, প্রাণ-মাতানো ও গতিশীল। আল্লাহ্‌তা'লা এই জন্য বদর বিজয়ের দিনকে 'মুক্তির দিন' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সত্যই ইহা মুক্তির দিন। বিধর্মীরা ইসলামকে কবলিত করিবার জন্য যে সমস্ত আয়োজন করিয়াছিল, কিন্তু ইসলাম সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া এই দিন বিজয়ীর বেশে বাহির হইয়া আসিয়াছে।

বস্তুতঃ বদর-যুদ্ধের উপর অনেক কিছু নির্ভর করিয়াছিল। হযরত যদি এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিতেন, তবে কোরেশগণ মদিনা আক্রমণতো করিতই, অধিকন্তু নগরের পৌত্তলিক ইহুদী ও মুনাফিকগণও তাহাদের সহিত যোগ দিত। এইরূপ বহু বিপদের সম্ভাবনা হইতেই ইসলাম সেদিন মুক্তি পাইয়াছে।

পক্ষান্তরে বদর বিজয়ে মুসলামানগণ এক নূতন জীবনের সন্ধান পাইলেন। তাহাদের মধ্যে যে অসীম শক্তি ও সম্ভাবনা লুকাইয়া আছে, অগণিত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াও তাঁহারা যে জয়ী হইতে পারেন, শত্রু সেনার সংখ্যা দেখিয়া তাঁহারা যে মোটেই শংকা মানেন না, তাঁহারা যে দুর্বার-দুর্দমনীয়, এই বিশ্বাস তাঁহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল। ইসলাম যে আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম, হযরত যে সত্য সত্যই আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসুল, আল্লাহ্ যে বিশ্ববাসীদিগকে ভালোবাসেন ও সাহায্য করেন, এই কথা সকলের মনেই দাগ কাটিয়া বসিল। হযরত এতদিন যে দাবী করিয়া আসিতেছিলেন, এবং যে আশার বাণী শুনাইতেছিলেন, বদর-যুদ্ধে তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইল। আরও একটি সত্য মুসলমানেরা উপলব্ধি করিতে পারিলেন ঃ যুদ্ধ না করিলে কোনো জাতি বড় হইতে পারে না।

এখানে একটা প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিকঃ রাসূলুল্লাহ্‌র বদর অভিযান কি আক্রমণমূলক (Aggressive) না আত্মরক্ষামূলক (Defensive)? এক কথায় এর জবাব দেওয়া যায়ঃ যুদ্ধটি সংঘটিত হইল কোন্ এলাকায়– মক্কা না মদিনায়? রাসূলুল্লাহ্ যদি মক্কায় অভিযান করিতে যাইতেন, তবেই না তাহা আক্রমণাত্মক হইত! আপন দেশে শত্রুকে রোধ করার নামও কি আক্রমণ? বদর যুদ্ধের কথা তো দূরে থাক, সিরিয়া হইতে প্রত্যাগমনরত আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে হামলা করিয়া তাহার যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইলেও রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষে তাহা আত্মরক্ষামূলকই হইত। এই সূত্র ধরিয়া ইহাও বলা যায়, আক্রমণকারী দুষমনকে হটাইতে হটাইতে তাহার দেশে লইয়া আক্রমণ করিলে অথবা তাহার দেশ জয় করিয়া লইলেও তাহাতে আক্রমণ করিলে অথবা তাহার দেশ জয় করিয়া লইলেও তাহাতে আক্রমণের (Aggression) অপরাধ হয় না; আত্মরক্ষারই উহা শেষ পর্যায়। মারাত্মক শত্রুকে ঘায়েল করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া নিরাপদ নয়। ন্যায়নীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাকে সম্পূর্ণ জয় করাই যুক্তিযুক্ত। ইসলামের যুদ্ধনীতি তাই অন্যরূপ। আক্রমণ বা আত্মরক্ষার শব্দগত অর্থ সে গ্রহণ করে না। তার মূল লক্ষ্য হইল জগতে শান্তি, ইন্‌সাফ, ভ্রাতৃপ্রেম, মানবতা ও অন্যান্য আদর্শের প্রতিষ্ঠা। সেই উদ্দেশ্য সাধনের পথে যখন বাধা আসিবে, তখন তাহা জয় করিতেই হইবে। সে জয় সম্ভব হয় কখনও বা আত্মরক্ষা দ্বারা, কখনও বা আক্রমণ দ্বারা। বৃহত্তর মানব-কল্যাণের জন্য ইসলামে তাই আক্রমণ নিষিদ্ধ নয়।

বদর-যুদ্ধ এই নীতির সূচনা এবং মক্কা বিজয়ে এর পরিসমাপ্তি।

মদীনা–সীরাতুন্নবী সংখ্যা, ১৯৬২

www.pathagar.com

নবী-নন্দিনী জয়নব

ইসলামের উদারতা, সহনশীলতা ও মানব-প্রীতির বহু নিদর্শন হযরত মুহম্মদের (সা.) জীবনে আমরা বহুভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহার পারিবারিক জীবনেও এই সব মহান আদর্শ যে কতোখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, একটি ঘটনায় তাহা সুস্পষ্ট হইয়া আছে। জীবন-সংগ্রামের কঠোরতার অন্তরালে স্নেহ-প্রীতি, প্রেম ও মহানুভবতা ও অন্যান্য সুকুমার বৃত্তিগুলি ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হইয়াছিল বলিয়াই ইসলামের জয়যাত্রা এমন দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছিল।

ঘটনাটি ষষ্ঠ হিজরীর। মক্কা হইতে একদল বণিক সিরিয়ায় গিয়াছিল। ফিরিবার পথে মদীনার মুসলমানদের সহিত হঠাৎ তাহাদের সংঘর্ষ বাধিল। ফলে তাহারা পরাজিত ও বন্দী হইয়া মদীনায় আনীত হইল। এই বন্দীদিগের মধ্যে ছিলেন হযরতের জামাতা আবুল আ'স্। আ'স্ ছিলেন বিবি খাদিজার ভ্রাতুষ্পুত্র। সম্ভ্রান্ত ও ধনী গৃহেই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল।

খাদিজা আ'স্‌কে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। খাদিজার ইচ্ছা অনুসারেই হযরত আপন কন্যা জয়নবকে আ'সের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বিবাহ হযরতের নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্‌র নবুয়ত লাভের সঙ্গে সঙ্গেই বিবি খদিজা ও তাঁহার পুত্র-কন্যারাও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আ'স্ ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। কোরেশদিগের পূর্ব ধর্মেই তিনি অটল রহিলেন। কন্যা মুসলমান, জামাতা পৌত্তলিক। হযরত ও বিবি খাদিজার মন ইহাতে বিচলিত হইলেও তাঁহারা কোনো দিনই ইসলাম গ্রহণের জন্য জামাতার উপর পীড়াপীড়ি করেন নাই; অথবা জয়নবকে আ'সের নিকট হইতে মুক্ত করিয়া আনিতেও চান নাই। কোরেশগণ কিন্তু ইহার বিপরীত ব্যবহার করিয়াছে। হযরতকে অধিকতর বিপন্ন ও হেয় করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা জয়নবকে তালাক দিয়া অন্য একটি কোরেশ কুমারীকে বিবাহ করিবার জন্য আ'স্‌কে যথেষ্ট প্ররোচনা ও উৎসাহ দিয়াছে। অনেক প্রকার প্রলোভন ও ভীতি-প্রদর্শনও করিয়াছে। কিন্তু আ'স্ সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। পক্ষান্তরে জয়নবের চরিত্র মাধুর্য ও মনোবলও লক্ষ্যণীয়। হযরত যখন আপন পরিবারবর্গকে মদীনায় স্থানান্তরিত করিলেন, তখন জয়নব মদীনায় না গিয়া মক্কায় স্বামীর গৃহেই রহিয়া গেলেন। ঠিক এই অবস্থায় বদর যুদ্ধে কোরেশদিগের স্বপক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিয়া আ'স মদীনায় মুসলমানদিগের হস্তে বন্দী হইলেন। বন্দীগণ মদীনায় আনীত হইলে অন্যান্য কোরেশ বন্দীর ন্যায় আ'সেরও মুক্তিপণ নির্ধারিত হইল। তখন সংবাদ পাইয়া বিবি জয়নব মক্কা হইতে স্বামীর মুক্তিপণ বাবদ কিছু অর্থ ও একটি মূল্যবান স্বর্ণহার পাঠাইয়া দিলেন। এই হার বিবি খাদিজা জয়নবের বিবাহের সময় তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। হযরত সেই হার দেখিয়া বিচলিত হইয়া পড়িলেন। সাহাবাদিগকে বলিলেনঃ তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে, তবে আ'স্‌কে বিনাপণে মুক্তি দাও এবং এই হারও তাহাকে ফিরাইয়া দাও। সকল সাহাবাই এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তবে একটি শর্ত এই দেওয়া হইল যে, আ'স্ মক্কায় ফিরিয়া গিয়া জয়নবকে যেন একবার মদীনায় পাঠাইয়া দেন। আ'স তাহাতে রাজী হইলেন।

www.pathagar.com

মক্কায় ফিরিয়া গিয়া আ'স্ তাঁহার ভ্রাতা কেনানার তত্ত্বাবধানে জয়নবকে মদীনায় পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু একটু অগ্রসর হইতে না হইতেই কতিপয় কোরেশ দুর্বৃত্ত তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। আবু জহলের পুত্র ইকরামা ছিল ইহাদের দলপতি। জয়নব যে উটের পৃষ্ঠে বসিয়াছিলেন, ইকরামা বর্শা দ্বারা সেই উটটিকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। জয়নব পড়িয়া গিয়া দারুণ আঘাত পাইলেন। ঠিক এই সময় আবু সুফিয়ান তথায় উপস্থিত হইয়া কেনানাকে বলিতে লাগিল ঃ দেখ কেনানা, এরূপভাবে জয়নবকে মদীনায় পৌঁছাইয়া দেওয়া তোমাদের খুবই অন্যায়। প্রকাশ্যভাবে যদি মুহম্মদের কন্যাকে আমরা যাইতে দিই, তবে সকলে ভাবিবে আমরা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। গোপনে পাঠাইবার ব্যবস্থা করো, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিবে না। যাও, এখনকার মতো মক্কায় ফিরিয়া যাও; তারপর অন্য সময়ে আসিও।

কেনানা তাহাই করিল। আ'স্ও ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইলেন। জয়নবকে পাঠানো স্থগিত রাখা হইল। ইহার কিছুদিন পর জায়েদ আসিয়া তাঁহাকে মদিনায় লইয়া গেলেন।

তিন বৎসর পর সেই আ'স্ সিরিয়া হইতে মক্কায় ফিরিবার পথে পুনরায় বন্দী অবস্থায় নীত হইলেন। আ'স্ গোপনে জয়নবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জয়নবের মধ্যবর্তিতায় হযরত মুহম্মদ (দঃ) আ'স্কে এবারও মুক্তি দিলেন। তাঁহার সমুদয় লুণ্ঠিত দ্রব্যও ফিরাইয়া দেওয়া হইল। আ'সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সঙ্গীরাও মুক্তি পাইল। হযরতের এই সদয় ব্যবহার এবং ইহার অন্তরালে জয়নবের একনিষ্ঠ প্রেম বিফলে গেল না। আ'সের গোপন হৃদয় বিগলিত হইতে আরম্ভ করিল। মনে মনে তিনি তখনই ইসলাম গ্রহণ করিলেন; কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিলেন না। একটা পরাজয়ের অনুভূতি তাঁহার দুর্ধর্ষ কোরেশ আভিজাত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। কিছুতেই তিনি এই অভিমানকে অতিক্রম করিতে পরিলেন না। যদি রাসূলুল্লাহ্ বা তাঁহার কন্যা আসিয়া তাঁহাকে ইসলাম গ্রহণ করিতে একটু অনুরোধ করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার এই অভিমান কিছুটা শান্ত হইতে পারিত, কিন্তু তেমন কোনো অনুরোধ কাহারও নিকট হইতে আসিল না। ধর্মের এই মুক্ত স্বাধীনতা আজ তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিল। হযরতের পক্ষ হইতে অথবা জয়নবের পক্ষ হইতে একটু কিছু চাপ বা পীড়াপীড়ির জন্য আজ তাঁহার অন্তর উন্মুখ হইয়া রহিল। কিন্তু তেমন কোনো ভাবভঙ্গীই বিপক্ষ দল হইতে আসিল না। আপন আপন মর্যাদায় উভয় পক্ষই যেন অটল। আ'স্ তাই কিছুতেই মদিনার বুকে দাঁড়াইয়া ইসলাম গ্রহণ করিতে পরিলেন না। সেরূপ করিলে মক্কার কোরেশগণও যে তাঁহাকে কাপুরুষ কলিয়া মনে করিবে। তাই দারুণ মানসিক বিক্ষোভের মধ্যে তিনি মদিনা ত্যাগ করিলেন।

মক্কায় ফিরিয়া গিয়া কোরেশদিগের সমক্ষেই তিনি ইসলামের মূল কলেমা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন। অতঃপর অল্পদিনের মধ্যেই আ'স্ মদিনায় ফিরিয়া আসিয়া জয়নবের সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলেন।

অকৃত্রিম ভালোবাসা দিয়া এইরূপে জয়নব স্বমীর হৃদয় জয় করিয়া লইলেন। তাঁহাকে আলোকের পথে ফিরাইয়া আনিলেন। কিন্তু বেশীদিন স্বামীর সঙ্গে বাস করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই। উট হইতে পড়িয়া যাওয়ায় তিনি যে গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার কাল হইল। এক বৎসর পরেই তিনি ইন্তিকাল করিলেন।

মদিনা–জুলাই, ১৯৬২

www.pathagar.com

ইসলামে সার্বভৌমিকতা

ইসলামে সার্বভৌমিকতা কার-এ প্রশ্নের আলোচনা করতে গেলেই আগে বুঝতে হবে সার্বভৌমিক (Sovereign) অথবা সার্বভৌমিকতা (Sovereignty) শব্দ দ্বারা আমরা কি বুঝি বা বর্তমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কথাটার অর্থ ও তাৎপর্য কি। তারপর ইসলামী রাষ্ট্রে কে সেই সার্বভৌম ক্ষমতা চালনা করে তা বুঝা বা বুঝানো আমাদের পক্ষে সহজ হবে। অপরিচ্ছন্ন কোনো প্রস্তাবনা (Premise) নিয়ে যুক্তি-তর্ক আরম্ভ করলে তার সিদ্ধান্ত বা অনুমান (Inference) ও অস্বচ্ছ থেকে যাবে। অবশ্য সেই হিসাবে 'ইসলাম' এবং 'ইসলামী রাষ্ট্র' সম্বন্ধেও সঠিক সংজ্ঞার প্রয়োজন দেখা দেবে, কারণ ইসলাম কি এবং ইসলামী রাষ্ট্রই বা কি তারও কোনো সর্বজন গ্রাহ্য সংজ্ঞা পাওয়া যাবে না। মামুলী মত ও প্রগতিশীল মতে অনেক পার্থক্য আছে। আপাততঃ সে দিকটার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে 'sovereignty' থেকেই আমরা শুরু করি।

সভ্‌রিন বা সভ্‌রিনটি কথাটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে কোনো দেশের রাষ্ট্র-বিধানে কথাটির কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। ষোড়শ শতাব্দীতে ফরাসীদেশের রাষ্ট্রচিন্তাবিদ- Bodin সর্বপ্রথম তাঁর পুস্তক Republics-এ কথাটির আলোচনা করেন। Sovereign শব্দটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ "the supreme power over citizens and subjects unrestrained by law.' আরেকজন চিন্তাশীল লেখক (Blackstone) বলেন ঃ সভ্‌রিনটি হচ্ছে "the supreme irresistible absolute uncontrolled authority." অন্য আরেকজন একে বলেছেন "the underived and independent power to command and compel obedience." Grotius বলেন, "The supreme political power vested in him whose acts are not subject to any other and whose will can not be overidden."

সবগুলো সংজ্ঞাকে এক সঙ্গে মিলালে এই বুঝা যায় যে, একটা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা হচ্ছে সেই ক্ষমতা যাকে কেউ প্রশ্ন করতে পারেনা, বাধা দিতে পারেনা, সব আইন সব হুকুম সব নিয়ম-শৃঙ্খলা যেখান থেকে উৎসারী হয়।

এখন কথা উঠবেঃ এই সার্বভৌম প্রভুত্ব থাকবে কার হাতে-বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ্‌র হাতে, না মানুষের হাতে? আল্লাহ্‌ই যদি আমাদের সর্বময় প্রভু হন, তবে প্রজা-সাধারণের আচার-বিচারে, শাসনকার্যে, দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপে তাঁর আইন-কানুন কি ভাবে কার দ্বারা কার্যকরী করা হবে, আবার মানুষই যদি বা সে ক্ষমতা পরিচালনা করে, তবে সে ক্ষমতা কি একজনের হাতে থাকবে, না গণমানুষের হাতে থাকবে, সে প্রশ্ন তখন জাগবে। অন্য কথায় রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র, ডিক্টেটরশিপ ইত্যাদি বিভিন্ন রাষ্ট্ররূপের কথা তখন আমাদের ভাবতে হবে।

মোটামুটি ভাবে বলা যায়, সার্বভৌম ক্ষমতা নিয়ে এখন দুই দলের মধ্যে dispute চল্‌ছে ঃ (১) আল্লাহ্‌; (২) মানুষ। কেউ বলছেন, sovereignty একমাত্র আল্লাহ্‌র।

www.pathagar.com

আবার কেউ বলছেনঃ সে ক্ষমতা মানুষের। জনগণই হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রকৃত সভ্‌রিন। যে রাষ্ট্রবিধানে আল্লাহ্‌র সভ্‌রিনটি স্বীকার করা হয়, সে হয় ধর্মরাষ্ট্র–Theocracy; আর মানুষকে (people) যারা সভ্‌রিন বলে মানেন, তাঁদের রাষ্ট্রকে বলা হয় Democracy.

এখন দেখা যাক ইসলামী রাষ্ট্রে এই সার্বিক ক্ষমতা বা প্রভুত্ব কার– আল্লাহ্‌র, না মানুষের।

ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা

উলেমা সমাজের অধিকাংশের মতঃ আল্লাহ্ যখন বিশ্ব-নিখিলের সর্বময় প্রভু তখন ইসলামী রাষ্ট্রের বেলায়ও একমাত্র তিনিই হবেন তার পরম নিয়ন্তা। তাঁরই রাজ্য, তাঁরই আইন, তাঁরই শাসন। মানুষের আইন প্রণয়নের বা আল্লাহ্‌র আইনের রদবদল করবার কোনো হাত নেই। আল্লাহ্ অবশ্য নিজে দেশ শাসন করেন না। যুগে যুগে দেশে দেশে তিনি বহু পয়গম্বর পাঠিয়ে তাঁদের মধ্যবর্তিতায় নিজের রাজ ও শাসন কায়েম করেছেন। নবী-রসুলেরা তাই আল্লাহ্‌র খলিফা বা Viagerint, অন্য কথায় রাজ-প্রতিনিধি হয়ে আসেন। খলিফাদেরও নিজের কোনো স্বাধীন ইচ্ছা থাকে না; আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধকেই তাঁরা যথারীতি পালন করে যান। তাঁদের শাসন তাই একটা পবিত্র আমানত (Sacred Trust) ছাড়া আর কিছু নয়। শেষ নবী হযরত মুহম্মদের (সা.) ইন্তিকালের সঙ্গে সঙ্গে নবী-রসুলের জামানা শেষ হয়েছে; আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ খলিফা আসার দরজাও বন্ধ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্‌র পরে ইসলামী রাষ্ট্রের যাঁরা শাসক ছিলেন, তারাও খলিফা নামে অভিহিত হতেন বটে, কিন্তু তাঁরা কেউ সাক্ষাৎ আল্লাহ্‌র খলিফা ছিলেন না; তাঁরা ছিলেন খলিফার খলিফা। রাসূলুল্লাহ্‌র জীবদ্দশায় ইসলামী শাসনের আইন-গ্রন্থ ছিল কুরআন এবং আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রাপ্ত 'অহি' বা ঐশীবাণী–কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর থেকে ইসলামী শাসনের মূল ভিত্তি শুধু কুরআন নয়, হাদিসও।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইসলামী রাষ্ট্রবিধানে সার্বভৌমিক ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র।

ইসলামে sovereignty সম্বন্ধে বিখ্যাত চিন্তাশীল আলিম জনাব মওদূদী বলেন ঃ

"The belief in the unity and the sovereignty of Allah is the foundation of the social and moral systems propounded by the Prophets. It is the very starting point of the Islamic political philosophy....... None is entitled to make laws on his own authority and none is obliged to abide by them. This right vests in Allah alone."

এই যুক্তি পরম্পরায় তিনি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন ঃ

"According to this theory, sovereignty belongs to Allah. He alone is the law-giver..... The Prophet himself is subject to God's commands."

এরূপ অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্র যে একটি ধর্মরাষ্ট্র (Theocracy) বা আল্লাহ্‌র রাজ্য (Kingdom of God), তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। জনাব মওদূদী একথা নিজেও স্বীকার করেন ঃ

www.pathagar.com

"A more apt name for the Islamic polity would be the 'Kingdom of God' which is described in english as Theocracy."

অবশ্য ধর্মরাষ্ট্র থেকে ইসলামকে তিনি কিছুটা রেহাই দিয়াছেন এই জন্যে যে, এর মধ্যে ইজমা, কিয়াস, ইসতিহাদ প্রভৃতির স্থান আছে। মওদূদী সাহেব বলেন ঃ বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইজমা কিয়াস ইত্যাদি দ্বারা কিছু কিছু নূতন বিধানও সংযোজিত হতে পারে। কিন্তু থিওক্র্যাসির মূল কাঠামোর তাতে পরিবর্তন ঘটে না। সেই যে, "power of the invisible over the visible"–এ বিশেষত্ব ঠিকই থাকে।

বিচার

এইবার বিচারে আসা যাক।

গোড়াতেই বলে রাখা ভালো–আমাদের আজকার আলোচ্য বিষয়টির শিরোনামা একটু বিভ্রান্তিকর হয়েছে। 'Concept of sovereignty in Islam' এক কথা, আর 'Concept of sovereignty in Islamic State আরেক কথা। ইসলামে সার্বভৌমিক প্রভু যে একমাত্র আল্লাহ্ এ-কথায় কোনো দ্বিমত নাই। ইসলাম যে মানবে, তাকে স্বীকার করতেই হবে যে– আল্লাহ্ হচ্ছেন বিশ্ব-নিখিলের একমাত্র প্রভু, পালয়িতা ও নিয়ন্তা। আমাদের সমস্যা সেখানে নয়। আমাদের সমস্যা ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা নিয়ে। কাজেই ধরে নিতে হবে, আজকের আলোচনা শেষোক্ত প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

যুক্তি-তর্কে বিরুদ্ধ পক্ষ না থাকলে সত্য নিরূপিত হয় না। আমি তাই বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করবো।

আমার প্রথম কথা এই ঃ একই সত্যকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়। জীবন-দর্শন বা আধ্যাত্মিক তথ্যের দিক দিয়ে যদি কেউ প্রশ্ন করেনঃ বিশ্ব জগতের সার্বভৌমিকতা কার? আমি অকুণ্ঠ চিত্তে বলবো–একমাত্র আল্লাহ্র। কিন্তু রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা কার? এ প্রশ্ন যদি কেউ করেন, তবে বলবো–রাষ্ট্র যার দ্বারা বা যাদের দ্বারা চালিত হয়, তার বা তাদেরই। রাষ্ট্র হলো একটি জাগতিক ব্যাপার। এর গঠন এবং পরিচালনায় মানুষের হাত আছে; কাজেই রাষ্ট্র-ক্ষমতা যেখান থেকে আসে, সেখানেই সার্ভৌমিকতা আরোপ করা উচিত। অন্যান্য দৈনন্দিন কাজে, সামাজিক কাজে আমরা সেরূপ করি, রাষ্ট্রকে তা করবো না? আল্লাহ্ আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং "ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইন কাদির– (অর্থাৎ সব কিছুর উপরেই আল্লাহ্র অধিকার)–এ কথা মেনেই কি আমরা সব কাজ করি? বউটি কার? কোনো অতিরিক্ত আল্লাওয়ালা মুসলমান স্বামীও বলবে না যে বউটি আল্লাহ্র! এ বাড়ীটি কার?–আল্লাহ্র; এ টাকাকড়ি কার? –আল্লাহ্র; ছেলেটি কার?–আল্লাহ্র;–আল্লাহ্র; এ যখন বলেন না, তবে খামাখা কেন বলবেন– ইসলামী রাষ্ট্র আল্লাহ্র। আল্লাহ্রই রাজ্য, আল্লাহ্রই আইন, আল্লাহ্রই এ রাজ্য চালান–মানুষের কোনো হাত নেই–কোনো ক্ষমতা নেই; এমন কি আল্লাহ্র রসুল বা খলিফাদেরও কোনো ক্ষমতা নেই–শুধু তাঁরা ছবির মতো আল্লাহ্র হুকুম মেনে চলেন! একি কখনো কেথাও হয়েছে? গোটা ধারণাটাই মানব জাতির প্রতি এক চমক লাঞ্ছনা। আর এ লাঞ্ছনা কুরআন পাকের

www.pathagar.com

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বিধানের সম্পূর্ণ বরখেলাপ। আল্লাহ্ দিলেন মানুষকে তাঁর 'খলিফার' মর্যাদা, অথচ মানুষ বলে, তার কোনো কিছু করবার ক্ষমতা নেই– 'Man is a born subject.' আল্লাহ্‌কে 'মালিকুল্ মুল্‌ক্' স্বীকার করেও বলতে হবে–রাষ্ট্রের ব্যাপারে, মানবীয় ব্যাপারে মানুষের হাতেই আছে সার্বভৌমিক ক্ষমতা–চাই সে ক্ষমতা একজনের উপরেই থাকুক, দশজনের উপরেই থাকুক বা জনগণের উপরেই থাকুক। এই শাসনশক্তি, এই ক্ষমতা–আল্লাহ্ ইচ্ছা করেই মানুষকে দিয়েছেন–এটা হচ্ছে তাঁরই প্রদত্ত ক্ষমতা (delegated power)। আল্লাহ্‌র মূলনীতি ও নির্দেশ অনুসারে মানুষ স্বাধীন ভাবে দুনিয়া শাসন করবে এটা তাঁরই ইচ্ছা (it is His will). একে অস্বীকার করার অর্থ আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে অস্বীকার করা।

বস্তুতঃ এ এক শোচনীয় অদৃষ্টবাদের (fatalism) মোহ ছাড়া কিছু নয়। কথায় ও কাজে এমন অসামঞ্জস্যও আর কোথাও দেখা যায় না। তেরো শ' বছর ধরে এই মিথ্যা দর্শন আমাদিগকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে।

কুরআন এবং হাদিস আমাদের অবশ্য অনুসরণীয়–কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিঃ কুরআন-মজিদে বা হাদিস-শরীফে রাষ্ট্রের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে সার্বভৌম প্রভু বলে মেনে নিতে হবে, এরূপ কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে কি? অনেক কথাই মনগড়া এবং অপপ্রয়োগ মাত্র। আল্লাহ্ নিজে রাজ্য চালাবেন, সবকিছু আইন-কানুন তিনি দেবেন, খলিফা পাঠিয়ে রাজ্য শাসন করবেন, শেষ খলিফার মৃত্যুর পরেও খলিফার সিলসিলা চলতেই থাকবে–এসব কথা কোথায় আছে আমি জানিনা।

আশ্চর্যের বিষয়, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌র জীবন, খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসন এবং পরবর্তী খলিফা বা শাসন কর্তাগণের ইতিহাস এই প্রবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। হযরত মুহম্মদ (সাঃ) নিজেই ছিলেন একজন পুরোদস্তুর sovereign. S. A. Q. Husaini দৃঢ় কণ্ঠে বলছেন ঃ

"As long as the prophet lived, he was the sovereign of the muslim state. He was a diterminate human superior, not in the habit of 'obedience to a like superior' receiving habitual obedience from the bulk of the muslim society. Hence he was the sovereign of that society. The prophet recognised Allah alone as his superior and according to the accepted definition of a sovereign, obedience to God did not detract from the full sovereignty of a human potentate."

আল্লাহ্‌র বাণী তিনি যথাযথ ভাবে সকলকে পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে জাগতিক ব্যাপারে তাঁর যে কোনেরূপ স্বাধীন ইচ্ছাই ছিল না, এ ধারণা ভুল। তিনি ছিলেন একাধারে–

"Prophet, law-giver, religious leader, chief judge, commander of the army and civil head of the state."

এরই নামই তো আল্লাহ্‌র খলিফা! আল্লাহ্‌র খলিফা কি একটা অকর্মণ্য ক্রীতদাস নাকি! আল্লাহ্ সভ্‌রিন, তাঁর খলিফাও সভ্‌রিন। বড় আর ছোট–এই যা প্রভেদ।

www.pathagar.com

ব্যাপারটা আরও একটু পরিষ্কার করে বলি। আমি বলছি না যে, রাসূলুল্লাহ্ আল্লাহ্র কোনো তোয়াক্কা না রেখেই স্বাধীন ভাবে যা খুশী তাই করতেন। তা ঠিক নয়। আমার বক্তব্য এই যে, কতকগুলি fundamental principles আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে দিয়েছিলেন, সেগুলি ঠিক রেখে যখন যেরূপ প্রয়োজন, তিনি তাই করতেন। এমন কি এরূপও ঘটেছে যে কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন একরূপ, কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় রসুল করেছেন অন্যরূপ। শুধু রসুল কেন, হযরত ওমরও অবস্থা বিশেষে কুরআনের নির্দেশকে অতিক্রম করেছেন। হাতকাটা আইনের ব্যাপারে, যুদ্ধের অংশ দান করার ব্যাপারে, তালাকের ব্যাপারে তিনি স্বাধীন ভাবে কাজ করেছেন। একটা কথাই আছে যে, "The Sunnah can dispense with the Quran, but not the Quran with the Sunnah".

এর দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাষ্ট্রের ব্যাপারে আল্লাহ্ defacto sovereign নন, defacto sovereign হচ্ছে মানুষ। জাগতিক ব্যাপারে মানুষের সভ্রিনটি আল্লাহ্ স্বীকার করে নিয়েছেন। আল্লাহ যে বলেছেনঃ "আমাকে মানিলে রসুলকে মানো এবং রসুলকে মানিলে আমাকে মানা হয়"–এ কথার গূঢ় তাৎপর্য এইখানে। এখানেই তো দেখা যাচ্ছে ইসলামে দ্বৈত শাসন। দুই সভ্রিনে এমন মিতালি আছে যে, একজনের ইচ্ছা আরেকজন মেনে নেয়।

মানুষের সভ্রিনটিতে তাই আল্লাহ্র কোনো ভয় নাই। মানুষ ভালোই জানে যে, তার ক্ষমতা সীমিত। পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী সে নয়। মানুষের sovereignty সম্পূর্ণ স্বয়ংস্বাধীন হতে পারে না। শাশ্বত আল্লাহ্র বিচারের কাছে ('Eternal judgments of God') তাকে নতি স্বীকার করতেই হবে। মানুষের সার্বভৌমিকতা তাই চিরন্তন নৈতিক নিয়মের ('Eternal principle of the moral law') দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাছাড়া প্রাকৃতিক নিয়মে (Laws of Nature) এবং আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা (International Laws), জাতীয় ঐতিহ্য ইত্যাদি দ্বারা খর্বিত।

Garner-এর ভাষায় তাই বলা যায়ঃ প্রত্যেক রাষ্ট্রক্ষমতাই স্বয়ং-সীমিত, স্বয়ং-নির্দ্ধারিত এবং স্বয়ং-নিয়ন্ত্রিত (auto-determination, autolimitation and auto-obligation)।

এই থিওরী অনুসারে আমি বলতে চাই যে, রাসূলুল্লাহ্ থেকে আরম্ভ করে অন্য যতো জনই রাষ্ট্রপতি হয়েছেন, তাঁরা চাই খলিফাই হউন, আর রাজাই হউন, আমীরই হউন বা বাদশাই হউন, ডিক্টেটরই হউন আর প্রেসিডেন্টই হউন সবাই ছিলেন sovereign. এ-sovereignty মানুষ লাভ করেছে আল্লাহ্র কাছ থেকে delegated power স্বরূপ। এটার ফয়সালা আদমের জন্ম সময়েই হয়ে গেছে। আদমের শ্রেষ্ঠত্ব যখন প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন আল্লাহ্ তামাম ফিরিশতাকে বললেনঃ তা হলে আদমকে সিজদা দাও। ইবলিসের মনে খট্‌কা লাগলো। সিজদার অধিকারী তো একমাত্র আল্লাহ্। এতকাল তো তিনি এই শিক্ষাই আমাদের দিয়ে এসেছেন। আজ আবার কেন বলেন যে আদমকেও সিজদা দাও? কিছুতেই তা হতে পারে না। এই ভেবে ইবলিস আদমকে সিজদা দিল না,

www.pathagar.com

কিন্তু তামাম ফিরিশতা দিল। আল্লাহ্‌র অনুরূপ দ্বিতীয় একটা সিজদা যে আদমেরও প্রাপ্য একথা সেদিন প্রতিপন্ন হলো। এর গূঢ় তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্‌ই স্বেচ্ছায় আদমকে তাঁর শাসন ক্ষমতা delegate করলেন এবং সেটা মেনে নেবার জন্য তামাম ফিরিশতাকে আদেশ দিলেন। কিন্তু ইবলিস সে বিধান না মেনে আল্লাহ্‌র sovereignty মানতে গেল। ফলে আল্লাহ্‌ তাকে expel করলেন। সে শয়তান হয়ে গেল।

তারপর আল্লাহ্‌ যখন আদম এবং হাওয়াকে বেহেশতের বাগিচায় রাখলেন, তখন যা ঘটলো, তাতেও একই সত্য পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। আল্লাহ্‌ আদমকে সবকিছু খেতে বললেন; কেবল একটা বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করলেন। এতেই বুঝা যায় তিনি মানুষকে প্রায় পরিপূর্ণ স্বাধীনতাই দিলেন; একে বলা যায় controlled freedom. আল্লাহ্‌ গন্দম ফল ভক্ষণের হুকুমও ইচ্ছা করলে আগেই দিতে পারতেন, কিন্তু আদমকে পরীক্ষা করবার জন্যই তা দেননি। এইখানেই ছিল মানুষের নবসৃষ্টি ও উদ্ভাবনী শক্তির পরীক্ষা। মানুষ আল্লাহ্‌র আদেশ লংঘন করে অজানার পথে পা বাড়ায় কিনা, এইটে তিনি দেখতে চাইলেন। সে পরীক্ষায় আদম যখন উত্তীর্ণ হলেন তখন আল্লাহ্‌ মনে মনে খুশীই হলেন এবং তার পরই পরম ভরসায় তাকে দুনিয়ায় পাঠালেন। ভক্ত-প্রবর ইবলিসকে তার লক্ষ লক্ষ বৎসরের এবাদৎ-বন্দিগী সত্ত্বেও তাকে দিলেন তিনি 'শয়তানের' তক্‌মা গলায় ঝুলিয়ে নির্বাসন। কেন? তাকে খলিফা করলেই তো পারতেন! আল্লাহ্‌ তা করেন নি, কারণ তিনি দেখলেন ইবলিসটা হয়েছে একটা "His Master's Voice'. কেবল 'হুজুর' 'হুজুর' করে। সৃষ্টির উল্লাস নেই, ভুল করার কৌতূহল নেই, বিধি-নিষেধ উল্লঙ্ঘন করার দুঃসাহস নেই। তাকে কেন তিনি খলিফা পদ দেবেন? শয়তান সে কথা ভোলেনি। কৌশলে সে মানুষকে ধ্বংস করবার চেষ্টায় আছে। আল্লাহ্‌তে সার্বভৌমিকতা আরোপের এই ব্যগ্রতার মধ্যে শয়তান তার কলকাঠি ঘুরাচ্ছে কিনা, কে জানে!

রাজ্যশাসনে আল্লাহ্‌র শক্তি ও ক্ষমতার কথা– অর্থাৎ, তাঁর sovereignty-র কথা, মুসলমানেরাই যে প্রথম উত্থাপন করেছে, তা নয়। প্রাচীন কাল থেকেই এরূপ একটা সংস্কার চলে আসছে। গ্রীসের Aristotle ও Plato-র কাছেও কথাটা অবিদিত ছিল না। প্লেটোর 'Ideal State' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে এটা হবে 'Kingdom of Heaven'–তবে পাপ-মলিন ধরার বুকে এ রাজ্য স্থাপন করা সম্ভব হবে না; 'its pattern is laid up in heaven." ইহুদীরাও এরূপ কল্পনা করেছিল। যিহোভাই প্রকৃত পক্ষে তাদের রাজা, তিনিই ইহুদী রাজ্যের সর্বময় কর্তা, এই ধারণা নিয়েই তারা চলতো। হিন্দুদের 'রামরাজ্য' বা 'ধর্মরাজ্যও সেইরূপ। মধ্যযুগে 'divine right of kings' নিয়ে ইউরোপে পোপদের মধ্যে এবং রাজাদের মধ্যে যে সব তুমুল কাণ্ড ঘটে গেছে, ইতিহাস-পাঠক তা জানেন। সে সব সংস্কারের যুগ মানুষ অতিক্রম করেছে। তার ফলে মানুষ এখন বড় বড় চিন্তা, আবিষ্কার ও সংগঠনে আত্মনিয়োগ করতে পারছে। কিন্তু আজ দৈবক্রমে পাকিস্তান হাতে পেয়ে আবার আমরা সেই পুরাতন কাসুন্দী ঘাটতে আরম্ভ করেছি। পাকিস্তানে আমরা ইসলামী রাষ্ট্র–খেলাফত চাই, আল্লাহ্‌র সার্বভৌমিকতা চাই–এই নিয়ে আমরা এখন ব্যস্ত।

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া

জগত আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এমনদিন বেশি দূরে নয়– যেদিন আমরা 'World State'-এর অধিবাসী হবো। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আমাদের ক্রমেই ঘনিষ্ট হচ্ছে। শরীরের একটা অঙ্গে কোনো কিছু আঘাত লাগলে যেমন অপর অঙ্গেও তার প্রতিক্রিয়া জাগে, আজকার পৃথিবীর দশাও তাই। নিরপেক্ষ ভাবে কোনো কাজ করবার উপায় এখন নেই। যে ভেবে-চিন্তে করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্র এবং খেলাফতী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব কিনা এবং তার ফল শুভ না অশুভ হবে, তা আমাদিগকে বিশেষ ভাবে ভেবে দেখতে হবে। State ও Sovereignty-র ধারণা এখন আর তীক্ষ্ণ নয়। State বা Sovereignty নিজেই তো একটা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্যের উপায় স্বরূপ। উদ্দেশ্য সফল হলে এগুলো আপনা আপনি খসে পড়বে। বৃহত্তর মানব কল্যাণের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, State ও State-এর সঙ্গে ভৌগলিক জাতীয়তাবোধের সম্বন্ধ আছে। বিশ্ব-শান্তির পক্ষে এই স্বদেশিকতা যে কতো মারাত্মক, গত দুই মহাযুদ্ধে তা আমরা দেখেছি। Harold Laski কি সুন্দরই না বলেছেন ঃ

"Externally, surely the concept of an absolute and independent sovereign state which demands an unqualified allegiance to government from its members, and enforces that allegiancee by the power of its command, is incompatible with the interests of humanity .... In a creative civilisation what is important is not the historical accident of separate states, but the scientific fact of world-interdepedence. The real unit of allegiance is the world."

অন্যত্র তিনি বলেছেন ঃ

"In such an aspect the nation of an independent sovereign state is, on the international side, fatal to the well-being of humanity."

এই সব উদার মহামানবতার বাণী আজ মুসলমানের কণ্ঠে উচ্চারিত হওয়াই উচিত ছিল না কি? কিন্তু আজ তার উল্টা হচ্ছে। অমুসলমানেরা আজ গণ্ডী ভেঙে বিশ্ব-মানুষের কথা চিন্তা করছে আর মুসলমানেরা বিশ্বমানবতার চিন্তা ছেড়ে আনুষ্ঠানিক ইসলামী স্টেট ও তার সভ্‌রিন নিয়ে মশ্‌গুল আছে।

প্রতিক্রিয়া

বর্তমান পৃথিবীতে ইসলামী সভ্‌রিন স্টেটের তাই কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। যে আদর্শের জন্য এর প্রয়োজন ছিল, অমুসলমান জাতিরা তার প্রায় সবগুলিই এখন গ্রহণ করে ফেলেছে। বহু জাতির constitution (constitution of the world) আমার সম্মুখে বিদ্যমান। তাতে দেখতে পাচ্ছি, যে সব বৈশিষ্ট্য ইসলামী বলে এতদিন আমরা দাবী করে এসেছি, তা প্রায় সব সভ্য দেশের শাসনতন্ত্রেই বিদ্যমান।

www.pathagar.com

সাম্য, মৈত্রী, বাক-স্বাধীনতা, আইনের চোখে সমদর্শিতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, দুর্নীতি দমন, সমাজ-কল্যাণ ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সমঝোতা-ইত্যাদি ব্যবস্থা সব শাসনতন্ত্রেই একরূপ সমান। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রের আবেদন বহির্জগতের কাছে আজ নাই বললেই চলে। বাকী যেটুকু (অর্থাৎ ঃ 'Sovereignty belongs to Allah,' 'No law shall be enacted which is repugnant to the Quran and Sunnah' ইত্যাদি), আমাদের রাষ্ট্রের কপালে এঁটে দেওয়ায় বরং ক্ষতিই হচ্ছে বেশী। ঐ সমস্ত লেবেল দ্বারা মুসলিম রাষ্ট্রকে অহেতুক গণ্ডী-সংকীর্ণতার মধ্যে টেনে আনা হচ্ছে এবং উৎকট ধর্মান্ধতার ছাপ দিয়ে একে সাম্প্রদায়িক করে তোলা হচ্ছে। ফলে অন্যান্য রাষ্ট্র আমাদিগকে ভয়ের চোখে দেখা আরম্ভ করেছে। ইসলামী স্টেটের নাম শুনেই প্রতিবেশী ভারত আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধন করছে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় মুসলিম প্রজাদের উপর কঠোর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু যে অমুসলমানদেরই বিষ-দৃষ্টিতে আমরা পড়েছি তা নয়; মুসলিম দেশগুলিও একই কারণে পাকিস্তানকে ভালো চোখে দেখে না। Bugdad Pact বা United Arab Republic কাশ্মীর প্রশ্নেও পাকিস্তানকে সমর্থন করে নাই। কাজেই কুট-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিকল্পনা সঙ্গত কি অসঙ্গত হচ্ছে, তা বিশেষ ভাবে আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

ইসলামী রাষ্ট্র নিয়ে বেশি গোঁড়ামি দেখানো ভালো নয়। অনেকে মনে করেন খোলাফায়ে-রাশেদীনের বেশী কড়াকড়ির ফলেই তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এলো রাজতন্ত্র। হযরত ওমরের হত্যা, হযরত ওসমানের হত্যা, হযরত আলির হত্যা–একে সহজ ভাবে নিলে চলবে না। কোন্ কোন্ বিক্ষোভের এগুলি বহিঃপ্রকাশ, তা অনুসন্ধান করলে অনেক কিছু ধরা পড়বে। অত্যধিক গোঁড়ামির ফলে খোলাফায়ে রাশেদীনের শেষ ভাগে যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তা ইসলামের ইতিহাসে দুরপনের কলঙ্ক তো বটেই, বাইরেও তার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অত্যন্ত শোচনীয়। একজন ইংরাজ লেখক মদিনার এই গৃহযুদ্ধকেই "ইউরোপের মুক্তি" (Salvation of Europe) বলে অভিহিত করেছেন। এই গৃহযুদ্ধ না ঘটলে ইউরোপ মুসলমানদের পদানত হতো। তেমনি ভাবে খামাখা ইসলামী রাষ্ট্রের খোলস ও সার্বভৌমিকতার লেবেল নিয়ে মারামারি করে আমরা কোথায় কোন্ বৃহত্তর সুযোগ হারাচ্ছি কে জানে। আল্লাহ্ যে বিশ্ব নিখিলের সর্বময় প্রভু এ তো জানা কথা। আর ইসলামী রাষ্ট্র দিয়ে কী হবে?

প্রগতিশীল মন নিয়ে ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদের ইসলামী রাষ্ট্র-দর্শন গড়ে তুলতে হবে। আজ এক নতুন যুগ এসেছে। শুধু আমাদের কথা চিন্তা করলেই হবে না, বহির্বিশ্বের কথাও ভাবতে হবে। Harold Laski-র আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করে এ আলোচনা শেষ করি ঃ

"If men are to live in the great society they must learn the habits of co-operative intercourse. They must learn to think of their platoon as a part of the great regiment of mankind.

ইসলামেও তো এই কথাই বলে–

"সমগ্র মানবমণ্ডলী এক জাতি।"

২৯, সেপ্টম্বর, ১৯৬২

www.pathagar.com

হযরত ওসমান কি 'স্বজন-প্রিয়' ছিলেন?

ইতিহাসের অধিকাংশ ছাত্রের বিশ্বাস ঃ তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান অত্যন্ত 'স্বজন-প্রিয়' ছিলেন এবং তাঁহার রাজ্যশাসনেও ছিল দুর্বল হস্তের পরিচয়। Von Kremer, Hitty এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ হযরত ওসমানের বহু গুণের প্রশংসা করিলেও তাঁহার 'স্বজন-প্রীতি' ও অক্ষমতার কথা উল্লেখ করিতে ছাড়েন নাই। এমন কি মিঃ আমীর আলীও তাঁহার "History of the Saracens"-এ হযরত ওসমানের এই ক্রটির কথা খুব জোরের সঙ্গেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই সব ইতিহাস পড়িয়া সকলের মনেই এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, হযরত ওসমান খলিফা পদের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই।

কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমরা দেখাইব আত্মত্যাগে, জনসেবায়, কর্মবহুলতায়, রাষ্ট্র গঠনে, রাষ্ট্র পরিচালনায় এবং উজ্জ্বল চরিত্র-মাধুর্যে হযরত ওসমানের মতো সার্থক, সুন্দর ও বলিষ্ঠ জীবন ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল! তাঁহার 'স্বজন-প্রীতি' এবং শাসন-দৌর্বল্যের অভিযোগও ভিত্তিহীন।

পরিচয়

হযরত ওসমান ছিলেন হযরত মুহম্মদের (সাঃ) ফুফাতো বোনের ছেলে অর্থাৎ ভাগিনেয়। বনি-উমাইয়া গোত্রে তাঁহার জন্ম। হাশেমীদিগের ন্যায় উমাইদীরাও আরবের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। বলা বাহুল্য এই প্রতিপত্তির কারণেই উভয় গোত্রের মধ্যে ভীষণ রেষারেষি জাগিয়া ছিল। হযরত মুহম্মদের অন্যতম প্রধান শত্রু আবু সুফিয়ান এই উমাইয়া গোত্র হইতেই উদ্ভূত। কোরেশ জাতির জাতীয় পতাকা বহন করিবার গৌরব উমাইয়া বংশকেই দেওয়া হইয়াছিল। হযরত আলির ইন্তেকালের পর এই উমাইয়া বংশ পূর্ণ এক হাজার বৎসর ইসলাম জগতের উপরে আদিপত্য বিস্তার করিয়া ছিলেন।

হযরত ওসমান ছিলেন বড় ঘরের সন্তান। রাসূলুল্লাহ্ অপেক্ষা বয়সে তিনি মাত্র ছয় বৎসরের ছোট ছিলেন। তাঁহার চেহারা ছিল অতি সুন্দর। বাল্যকাল হইতেই তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও বিনয়ী। তিনি লেখাপড়া জানিতেন। যৌবনে ব্যবসা করিয়া তিনি প্রভূত ধন-সঞ্চয় করেন। স্বচ্ছ নির্মল চরিত্রের জন্য তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন। হযরত আবুবকরের সঙ্গে ছিল তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব।

হযরত মুহম্মদ যখন ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন, তখন হযরত ওসমানের বয়স ৩৪ বৎসর। পুরুষদিগের মধ্যে হযরত আবুবকরই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। ইহার কিছুদিন পরেই হযরত ওসমান দীক্ষিত হন। হযরত ওসমানের চাচা যখন এ কথা জানিতে পারেন, তখন তিনি তাঁহাকে হাত পা বাঁধিয়া ভীষণ ভাবে প্রহার করিতে থাকেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি তাঁহার মত পরিবর্তন করাইতে পারেন নাই।

রাসূলুল্লাহ্ তাঁহার কন্যা রোকাইয়াকে হযরত ওসমানের সঙ্গে বিবাহ দেন। রোকাইয়ার মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা উম্মে কুলসুমকেও ওসমানের হস্তে

www.pathagar.com

সমর্পণ করেন। কোনো পয়গম্বরের দুইটি কন্যা বিবাহ করিবার সৌভাগ্য ও মর্যাদা ইতিহাসে আর কোনো ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটে নাই।

আল্লাহ্ ও রসুলের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল প্রগাঢ়। আল্লাহ্‌র নামে রসুলের নামে তিনি তাঁহার জান ও মাল সম্পূর্ণ কোরবান করিয়া দিয়াছিলেন। কোরেশদের অমানুষিক অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া রাসূলুল্লাহ্ যখন একদল নও-মুসলিমকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করিতে নির্দেশ দেন, তখন এই তরুণ যুবক ওসমান তাঁহার স্ত্রী রোকাইয়াকে সঙ্গে লইয়া অকাতরে সেই বিপদ-সঙ্কুল দেশে হিজরত করেন। রাসূলুল্লাহর হিজরতের সময়েও তিনি মক্কা হইতে মদিনায় হিজরত করিয়াছিলেন। এইরূপে ধর্মের জন্য দুই-দুইবার তিনি দেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ ও রসুলের আহ্বানে যে কোনো মুহূর্তে তিনি যে সাড়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন, এই দুইটি ঘটনা হইতে তাহার প্রমাণ মিলে। মদিনায় পৌঁছিয়াও হযরত ওসমান নানা ভাবে ইসলামের প্রচার কার্যে সাহায্য করিয়াছেন। মোহাজেরিনদিগের সংখ্যাধিক্য বশতঃ মদিনায় মুসলমানদিগের মধ্যে যখন ভীষণ পানির কষ্ট দেখা দিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ অমুসলমানদিগের একটি কূপ কিনিয়া লইয়া সর্বসাধারণের ব্যবহারে লাগাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হযরত ওসমান তৎক্ষণাত ৩৫,০০০ দিরহাম দিয়া সেই কূপটি কিনিয়ে লইয়া হযরতের ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। তাবুক অভিযানে যখন রাসূলুল্লাহ্ সাহাবাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য আবেদন জানাইলেন, তখন ওসমান নগদ ১০,০০০ দিরহাম এবং এক হাজার উট দান করেন। মদিনা মসজিদের আয়তন বৃদ্ধির জন্য রাসূলুল্লাহ্ যখন মসজিদ-সংলগ্ন জমি কিনিতে চাহিলেন, তখন হযরত ওসমান নিজ ব্যয়ে সে জমি ক্রয় করিলেন। তাঁহার নিজের খেলাফত সময়ে এই জমির উপরেই তিনি নিজ ব্যয়ে মসজিদের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া দেন। বস্তুত হযরত ওসমান তাঁহার সমস্ত ধন-সম্পত্তি এবং সমগ্র জীবন ইসলামের সেবাতেই ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

শুধু যে অর্থ সাহায্য দ্বারাই তিনি ইসলামের খিদমত করিয়াছিলেন, তাহা নহে; ইসলামের প্রায় সমুদয় যুদ্ধেই তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। একমাত্র বদর যুদ্ধেই তিনি যোগদান করিতে পারেন নাই। বদর যুদ্ধে যখন সেনাদল রওয়ানা হইল, তখন ওসমানের স্ত্রী রোকাইয়া মরণ শয্যায় শায়িতা। প্রিয় কন্যার মৃত্যু-শয্যার শিয়রে বসিয়া দুইটি সান্ত্বনা বাক্য শুনাইবার অবসরও মহাপুরুষদের নাই! কর্তব্যের আহ্বান রাসূলুল্লাহ্ তাই চলিলেন বদর-প্রান্তরে সেনাপতির বেশে । কিন্তু পশ্চাতের এই মানবতার আহ্বানও তো তুচ্ছ করিবার নয়। তিনি তখন ওসমানকে বলিলেন, তুমি যুদ্ধে যোগ দিও না, রোকাইয়ার সেবা–শুশ্রূষার জন্য মদিনায় থাকিয়া যাও। হযরত ওসমান তাই বাধ্য হইয়া বদর যুদ্ধে যোগ দিতে পারিলেন না। কয়েকদিন পর যখন বিজয়-সংবাদ লইয়া কাসেদ মদিনায় পৌঁছিল, তখন রোকাইয়া আর ইহজগতে নাই।

হযরত ওসমান বদর-যুদ্ধে যোগ দিতে না পারিয়া যারপরনাই মর্মাহত হন। রাসূলুল্লাহ্ ইহা বুঝিতে পারিয়া যুদ্ধ-লব্ধ গণিমতের মাল হইতে একটি হিস্সা হযরত ওসমানকে দান করেন এবং ইহা দ্বারা তিনিও যে বদরে উপস্থিত ছিলেন, এই কথা প্রতিপন্ন করেন। সত্যই তো তাই। দৈহিক ভাবে না হইলেও আত্মিকভাবে হযরত ওসমান তো বাস্তবিকই বদর-প্রান্তরে উপস্থিত ছিলেন। এই আত্মিক সংযোগ উপেক্ষা করিবার নয়।

www.pathagar.com

তারপর ওহুদ ও অন্যান্য প্রত্যেক যুদ্ধে হযরত ওসমান কার্যতঃ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ্ হযরত ওসমানকে দূতরূপে মক্কায় কোরেশদের নিকট প্রেরণ করেন, কিন্তু সেখানে কোরেশরা তাঁহাকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে বন্দী করে। পরে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এইরূপে নানা অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়া হযরত ওসমানের কর্ম-জীবন অতিবাহিত হয়। ইসলাম প্রচারের ইতহাসে এই ত্যাগী-বীরের সেবা ও দান অক্ষয় হইয়া আছে।

খেলাফত

দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তিনি কাহাকেও খলিফা মনোনীত করিয়া যান নাই; তবে তিনি ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া একটি পরামর্শ-সভা (মজলিস-ই-সূরা) গঠন করিয়া দিয়া যান এবং বলিয়া যান যে, তাঁহারাই যেন পরামর্শ করিয়া একজনকে খলিফা মনোনীত করিয়া লন। জ্ঞানে গুণে সেবা ও মহত্ত্বে এই ছয় জনই ছিলেন তখনকার দিনে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এই ছয় জনের নাম–আবদুর রহমান, ওসমান, আলি, সা'দ, তালহা এবং জুবায়ের। আশ্চর্যের বিষয়, রাষ্ট্রের এই সর্বপ্রধান পদটি অধিকার করিবার জন্য এই ছয়জন মনীষীর মধ্যে এখনকার মতো কোনোই বিকৃত প্রতিযোগিতা দেখা যায় নাই। প্রথমেই আবদুর রহমান এ-পদ গ্রহণ করিবেন না বলিয়া ঘোষণা করেন। এ কারণে তাঁহাকেই এ কমিটির সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। তিনি তখন অবশিষ্ট সদস্যদিগের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। এই সময় তাল্হা মদিনার বাহিরে ছিলেন, কাজেই তিনি সেই পরামর্শ সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বাকী চার জনের মধ্যে সা'দ হযরত ওসমানকে ভোট দেন, জুবায়ের ওসমান ও আলি উভয়কেই ভোট দেন; হযরত ওসমান হযরত আলিকে ভোট দেন। পক্ষান্তরে হযরত আলি হযরত ওসমানকে ভোট দেন। এইরূপে চারজনের মধ্যে তিনজনেই হযরত ওসমানকেই মনোনীতি করেন। আবদুর রহমান মদিনার অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মতামতও গ্রহণ করেন এবং একবাক্যে সকলেই হযরত ওসমানকে ভোট দেন। তখন আবদুর রহমান হযরত ওসমানেই খলিফা বলিয়া ঘোষণা করেন এবং একে একে সকলেই তাঁহার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। ইহার কিছু পরেই তাল্হা ফিরিয়া আসেন। ওসমান তখন তাঁহার খলিফা-পদ লাভ করিবার ইতিবৃত্ত তাঁহাকে শুনান এবং বলেন যে, তিনি (তাল্হা) যদি ভিন্ন মত পোষণ করেন, তবে তখনও তিনি (ওসমান) তাঁহার খলিফা পদ ছাড়িয়া দিতে রাজি আছেন। তাল্হাও সর্বান্তঃকরণে হযরত ওসমানকেই ভোট দেন। এইরূপে সর্বসম্মতিক্রমেই হযরত ওসমান খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন।

হযরত ওসমান ১২ বৎসর খেলাফতী করেন। প্রথম ছয় বৎসর তাঁহার খেলাফত বা কার্যাবলীর কোথাও কোনো সমালোচনা বা বিরুদ্ধতা দেখা যায় নাই। কিন্তু শেষের ছয় বৎসর তাঁহার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং ইহারই ফলে তিনি বিদ্রোহীদের হস্তে শহীদ হন।

www.pathagar.com

হযরত ওসমানের খেলাফত সার্থক ও গৌরবমণ্ডিত হইয়াছিল। এমনকি আরববাসীরা হযরত ওমর অপেক্ষা হযরত ওসমানের শাসনকেই বেশী পছন্দ করিতেন। হযরত ওমরের শাসন ছিল কর্তব্য ও দায়িত্বে সুকঠোর; কিন্তু হযরত ওসমানের শাসনে ছিল কঠোরের সহিত কোমলের সমাবেশ। তাই অনেকের মতে হযরত ওমর অপেক্ষা হযরত ওসমানই ছিলেন অধিকতর জনপ্রিয়।

হযরত ওসমানের খেলাফতের সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের কোনো ক্ষতি তো হয়ই নাই, বরং ইহার সীমানা আরও বিস্তৃত হয় এবং ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হয়। পারস্য, মিসর, সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে পারশিকরা ও রোমানরা বিদ্রোহ উপস্থিত করে বটে, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি না হইয়া লাভই হয়। হযরত ওসমান সুদৃঢ় হস্তে সেই সব বিদ্রোহ দমন করিবার ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া অনেক নূতন দেশও তাঁহার সময়ে বিজিত হয়। খোরাসান, মার্ভ, তুস, বলখ, তুর্কীস্থান, হীরাট, কাবুল, কান্দাহার, আজার বাইজান প্রভৃতি দেশে ইসলামের হিলালী ঝাণ্ডা উড়িতে থাকে। অন্যদিকে তিফলিস ও কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। ইসলামের প্রথম নৌ-যুদ্ধের গৌরবও হযরত ওসমানের প্রাপ্য। সাইপ্রাস দ্বীপ তাঁহারই উদ্যোগে বিজিত হয়। এইরূপে হযরত ওসমানের খেলাফত সময়ে দিকে দিকে ইসলামের লাল মশাল জ্বলিয়া ওঠে।

হযরত ওসমানের 'স্বজন-প্রীতি' (?)

কিন্তু এত গুণ থাকা সত্ত্বেও হযরত ওসমানের প্রতি ঐতিহাসিকগণ 'স্বজন-প্রীতির' দোষারোপ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই কারণেই তাঁহার পতন ঘটে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক বলেন ঃ হযরত ওসমান বড় বড় রাজপদে অপর সকলের দাবী উপেক্ষা করিয়া নিজের আত্মীয়-স্বজনকে নিযুক্ত করেন। ইহাতেই জনসাধারণের মনে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং কালে এই অসন্তোষই ধূমায়িত হইয়া দারুণ বিদ্রোহের আকারে আত্মপ্রকাশ করে এবং তাঁহার জীবনকে একটা শোচনীয় পরিণতিতে টানিয়া আনে।

এই অভিযোগ কতদূর সত্য, নিরপেক্ষ ইতিহাসের আলোকে এইবার আমরা তাহা বিচার করিয়া দেখিব।

অভিযোগকারীরা বলেন, হযরত ওসমান পারশ্যে, মিসরে এবং কুফায় নিজের আত্মীয়-স্বজনকে গবর্নর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বসরার গভর্নর ছিলেন আবু মূসা আশারী। হযরত ওমর ইহাকে নিযুক্ত করেন, কিন্তু হযরত ওসমানের সময়ে বসরার লোকেরা আবু মূসার উপরে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে এবং হযরত ওসমানের নিকট অন্য আর একজন গবর্নর নিয়োগের প্রার্থনা জানায়। হযরত ওসমান তাহাদের ইচ্ছানুসারে তাহাদেরই মনোনীত এক ব্যক্তিকে তদস্থলে গবর্নর নিযুক্ত করেন। কিন্তু নূতন গবর্নরও সন্তোষজনক ভাবে কার্য করিতে না পারায় হযরত ওসমান তদস্থলে আবদুল্লাহ্ বিন আমেরকে গবর্নর নিয়োগ করিয়া পাঠান। এই আবদুল্লাহ্ ছিলেন হযরত ওসমানের দুধ-ভাই।

কিন্তু এই নিয়োগ আদৌ অযৌক্তিক হয় নাই, অথবা 'স্বজন-প্রীতি'র দ্বারাও ইহা অনুপ্রাণিত হয় নাই। স্বজন-প্রীতি তখনই গর্হিত হয়– যখন যোগ্যতর ব্যক্তিকে রাখিয়া

www.pathagar.com

অযোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয় এবং তাহার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই কানে তোলা হয় না। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি গুণে-জ্ঞানে উপযুক্ত হয়, তবে স্বজন হইলেও তাহাকে কোনো যোগ্যপদ দান নিন্দার্হ হইতে পারে না। বরং যোগ্য হইলে স্বজনকেই দায়িত্বপূর্ণ পদ দেওয়া বুদ্ধিমত্তার কার্য। যেখানে দলাদলি বা সাম্প্রদায়িক শত্রুতা বিদ্যমান, সেখানে বিশেষ পদগুলিতে (key posts) বিশ্বাসী নিজের লোক লওয়াই দরকার; যোগ্যতায় সে যদি অপরের অপেক্ষা কিছু খাটোও হয়, তাহাতেও কিছু আসে যায় না। এই হিসাবে দেখিলে দেখা যাইবে, আবদুল্লাহ্‌র নিয়োগ কোনোক্রমেই অন্যায় বা অসঙ্গত হয় নাই। এই আবদুল্লাহ্‌র দ্বারাই পারশ্যের সমস্ত বিদ্রোহ প্রশমিত হয় এবং মুসলিম বাহিনী একদিকে বল্‌খ্‌ ও তুর্কীস্থান দখল করে, অন্যদিকে হীরাট, কাবুল এবং গজনীও তাদের পদানত হয়। এমন কি তুর্কীদের আজারবাইজান প্রদেশও আবদুল্লাহ্‌র সেনাদল দখল করিয়া লয়। এইরূপে আবদুল্লাহ্‌র হস্তে ইসলাম সাম্রাজ্যের উত্তর ও পূর্ব সীমান্ত কোনোরূপ ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া আরও শক্তিশালী হয়। দুধ-ভাই বলিয়া তাহাকে নিয়োগ না করিলেই কি ভালো হইত?

তারপর সিরিয়ার কথা। সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন মাবিয়া। ইনি হযরত ওসমানের আত্মীয় ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাকে হযরত ওসমান নিয়োগ করেন নাই; হযরত ওমরের দ্বারাই তিনি উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কাজেই, এই নিয়োগের জন্য হযরত ওসমানকে স্বজন-প্রীতির দোষ দেওয়া যায় না। অন্যান্য সকলের তুলনায় মাবিয়া ছিলেন যোগ্যতায় শ্রেষ্ঠ। কাজেই হযরত ওসমান তাহাকে নিজ পদেই বহাল রাখিয়াছিলেন। এই মাবিয়াই দুর্ধর্ষ এজিদের পিতা। কিন্তু হইলে কি হয়, তাহার যোগ্যতা ছিল প্রচুর। তাহার দ্বারাই ইসলামী সাম্রাজ্য সুদৃঢ় ও বিস্তৃত হয়। সিরিয়া হইতে তিনি রোমান-বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেন। শুধু তাই নয়, নৌ-যুদ্ধে সাইপ্রাস দ্বীপ অধিকার করার মূলেও ছিলেন তিনি। মুসলমানদিগের ইহাই প্রথম নৌ-যুদ্ধ। হযরত ওমরের শাসন সময়েই মাবিয়া একবার এই সাইপ্রাস দ্বীপ অধিকার করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন; কিন্তু ওমর নৌ-যুদ্ধ করিতে সাহস পান নাই। মাবিয়ার সে সাধ হযরত ওসমান পূর্ণ করেন। তিনি মাবিয়াকে সাইপ্রাস দখল করিবার নির্দেশ দেন। মাবিয়া তদনুসারে মিশরের শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্‌র সহিত একযোগে প্রয়োজনীয় রণতরীর ব্যবস্থা করেন। অচিরেই একটি নৌ-যুদ্ধ হয় এবং আশ্চর্যের বিষয়, এই প্রথম নৌ-যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যই জয়লাভ করে।

এইরূপে মাবিয়া খেলাফত-রাষ্ট্রের শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করেন। এশিয়া মাইনরের মধ্য দিয়া তিফলিস্‌ এবং কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত তিনি আধিপত্য বিস্তার করেন।

এখানেও দেখা যাইতেছে, মাবিয়ার নিয়োগের জন্য হযরত ওসমান দায়ী ছিলেন না এবং দায়ী হইলেও যোগ্যতা ও সফলতার দিক দিয়া এই নিয়োগকে কোনোক্রমেই অসঙ্গত বলিবার কোনো হেতু ছিল না। মাবিয়া তৎকালে সত্যই একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন।

সিরিয়ার দেখাদেখি মিসরেও বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া ওঠে। রোমানরা বিরাট শক্তি লইয়া আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করে। মিসরের শাসনকর্তা আমর বিন-আস্‌ অচিরেই

www.pathagar.com

রোমানদিগকে তাড়াইয়া দিয়া আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন। কিন্তু মিসরের পশ্চিম সীমান্তে তখনও রোমানরা দমিত হয় নাই। ঠিক এই সময়ে আমরের পদচ্যুতি ঘটে। ওসমানের এক পালিত ভ্রাতা আবদুল্লাহ্-বিন-সা'দ ছিলেন উচ্চ মিসরের (Upper Egypt) রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী। হযরত ওমর ইহাকে নিযুক্ত করিয়া যান। শাসন সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে শাসনকর্তা আমরের সহিত তাহার বিরোধ বাধে। এই বিরোধের বিচার-মীমাংসার ভার পড়ে স্বয়ং খলিফার উপর। হযরত ওসমান তদন্ত করিয়া দেখেন আমরই এই ব্যাপারে দায়ী। হযরত ওমরও ইতোপূর্বেই আমরের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। হযরত ওসমান তাহা জানিতেন। কাজেই তিনি আমরকে সরাইয়া আনেন এবং তদস্থলে আব্দুল্লাহ্-বিন-সা'দকেই মিসরের গবর্নর নিযুক্ত করেন। হযরত ওমরের শাসন সময়ে আফ্রিকার ত্রিপলি এবং বারকা পর্যন্ত মুসলিম শাসন বিস্তৃত হয়; কিন্তু অন্যান্য রোমক শক্তি অব্যাহত থাকে। হযরত ওসমান নব নিযুক্ত শাসনকর্তা আবদুল্লাহকে আদেশ দেন রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া আরও অগ্রসর হইবার। এই উদ্দেশ্যে মদিনা হইতে তিনি নূতন একদল সৈন্য পাঠাইয়াও আবদুল্লাহকে সাহায্য করেন। আবদুল্লাহ্ নব উদ্যমে রোমান শক্তিকে আক্রমণ করেন। কয়েকটি যুদ্ধের পর রোমান সেনাপতি গ্রেগরী মুসলমানদের হস্তে নিহত হন এবং রোমান সৈন্য পরাজিত হয়। আবদুল্লাহ্ রোমানদের সহিত নৌ-যুদ্ধে করিবার জন্য একটা রণতরী বহরও সৃষ্টি করেন এবং নৌ-যুদ্ধে রোমানদিগকে পরাজিত করেন। এইরূপে আফ্রিকা মহাদেশের বহু স্থান মুসলিম অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কুফার শাসনকর্তা নিয়োগেও হযরত ওসমানকে দোষী করা যায় না। হযরত ওমরের সময় কুফার শাসনকর্তা ছিলেন পারশ্য-বিজয়ী সা'দ। কিন্তু কোনো ত্রুটির জন্য হযরত ওমর তাহাকে সরাইয়া আনেন, এবং তদস্থলে মুগীরাকে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। মৃত্যু-শয্যায় হযরত ওমর এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া যান যে, সা'দকে যেন পুনরায় কুফার শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করা হয়। তদনুসারে হযরত ওসমান খেলাফতের প্রারম্ভেই মুগীরাকে ফিরাইয়া আনিয়া সা'দকে পুণর্নিয়োগ করেন। কিন্তু এবারও সা'দ বেশী দিন শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন নাই। কুফার খাজাঞ্চি ইবনে মাসুদের সঙ্গে সা'দের বিরোধ বাধে। সা'দ সরকারী তহবিল হইতে কিছু টাকা ধার নেন। সেই টাকা খাজাঞ্চি তলব করিলে সা'দ তাহা পরিশোধ করিতে অসমর্থ হন। ইহাই উভয়ের মধ্যে বিরোধের কারণ। এই বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া বেশ একটা দলাদলির সূত্রপাত হয়। একদল আসিয়া হযরত ওসমানের নিকট সা'দের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। খলিফা তদন্ত করিয়া সা'দকেই অপরাধী সাব্যস্ত করেন এবং তাহাকে পুনরায় ফিরাইয়া আনেন এবং তদপরিবর্তে অলিদ-বিন-আক্কাসকে গবর্নর নিযুক্ত করেন। অলিদ খলিফার আত্মীয় ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ ব্যাপারেও খলিফার পক্ষপাতিত্বের বা স্বজন-প্রীতির কোনো কথা আসে না, কারণ এ নিয়োগও তাঁহার খেলাফতের প্রারম্ভে দেওয়া হইয়াছিল। হযরত ওসমানের অতি বড় শত্রুরাও একথা স্বীকার করেন যে, হযরত ওসমান প্রথম ছয় বৎসর যে সব নিয়োগ বা বরখাস্ত করেন, তাহার মধ্যে কোনো অসঙ্গত স্বজন-প্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব ছিল না। জনসাধারণ সকলেই খলিফার কার্যাবলীকে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। কাজেই অলিদের এই নিয়োগও অসঙ্গত হয় নাই। সরল মনে যোগ্যতার বিচার করিয়াই

www.pathagar.com

তিনি তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে যদি কোনো স্বজন-প্রীতিই থাকিত, তবে এই অলিদের বিরুদ্ধেই লোকেরা যখন আবার মদ্যপানের অভিযোগ আনিল, তখন অমনি খলিফা তাহাকে বরখাস্ত করিয়া প্রকাশ্যে বেত্রদণ্ড দান করিলেন। ইহা নিশ্চয়ই কোনো স্বজন-প্রীতির লক্ষণ নয়। একজন প্রাদেশিক গভর্নরকে আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও বরখাস্ত করিয়া বেত্রদণ্ড দিবার মতো মনোবল যাঁহার ছিল, তাঁহার উপর কি পক্ষপাতিত্বের দোষারোপ করা চলে? তারপর অলিদের শূন্যপদে হযরত ওসমান অলিদ-বিন-আ'স নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। খলিফার সহিত তাহারও আত্মীয়তা ছিল। কিন্তু এই অলিদও যখন অযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হইলেন, তখন তাহাকেও তিনি বরখাস্ত করিয়া আবু মুসা আশারীকে তদস্থলে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। এই আশারীর সহিত খলিফার কোনোই সম্পর্ক ছিল না।

হযরত ওসমানের যে সমদর্শিতা ও ন্যায়বোধ ছিল তাহার আর একটি প্রমাণঃ মিশরের শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যখন তুমুল আন্দোলন শুরু হইল, তখন খলিফা তাঁহাকে সরাইয়া তাঁহার স্থানে বিদ্রোহীদের মনোনীত প্রার্থী হযরত আবুবকরের পুত্র মুহাম্মদকে মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। এ কথা আমরা পরে বলিব।

এই সমস্ত ঘটনা হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইবে যে, হযরত ওসমান যে কোনোরূপ স্বজন-পোষণ নীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। অনাত্মীয় যোগ্য লোকের অভাবেই তিনি উক্ত পদসমূহে যোগ্য আত্মীয়-স্বজনদিগকেই নিয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার দাবী অপেক্ষা যোগ্যতার দাবীকেই তিনি উর্ধ্বে স্থান দিয়াছিলেন। হযরত ওসমানরে সাথে মদিনার সম্ভ্রান্ত ও উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের আত্মীয়তা থাকা খুবই স্বাভাবিক ছিল। কাজেই উপযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে গেলেই আত্মীয়তার বন্ধন তিনি এড়াইতে পারেন নাই। গোত্রগত রাজনীতি (party politics) এর আওতার মধ্যে; এই নীতির যৌক্তিকতাও অস্বীকার করা যায় না। পক্ষান্তরে ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে, বিদ্যা-বুদ্ধি ও যোগ্যতাতেও উমাইয়া বংশের লোকেরা হাশেমী বংশের লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। হযরত আলীর পরে উমাইয়া বংশই দীর্ঘ এক হাজার বৎসর ইসলামী সাম্রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন। ইহা নিশ্চয়ই তাহাদের শক্তিমত্তার পরিচয়। কাজেই খলিফার স্বজন-প্রীতির জন্যই যে লোকেরা বিদ্রোহী হইয়াছিল, তাহা ঠিক নহে। বিদ্রোহের আরও বহু কারণ ছিল। আমরা কতিপয় কারণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বিদ্রোহের কারণ

খলিফার অতিমাত্রায় সরলতা ও গণতান্ত্রিক মনোভাবই ছিল সমুদয় বিদ্রোহের মূল কারণ। হযরত ওসমান অত্যন্ত সহজলভ্য ছিলেন। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারেও লোকেরা তাঁহার নিকট বিচার প্রার্থনা করিতে পারিত। খলিফার দরজা সব সময়েই খোলা থাকিত। প্রাদেশিক গভর্নরদের উপরও এই আদেশ তিনি জারী করিয়াছিলেন। ইহাতে অসৎ লোকেরা গণ্ডগোল বাধাইবার সুযোগ পাইত। খলিফা নিজেকে জনসাধারণের একজন নগণ্য খাদেম বলিয়া মনে করিতেন। সুমার্জিত গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে এই মনোভাব আদর্শ-

www.pathagar.com

স্থানীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই মুক্তা তিনি উলুবনে ছড়াইয়াছিলেন বলিয়া ইহার মূল্য কেহই দেয় নাই। দীর্ঘ দিন রাসূলুল্লাহ্‌র সংস্পর্শে থাকার ফলে মদিনার মুসলমানদের মনে ইসলামের সত্যিকার সাম্য ও ভ্রাতৃভাব স্থায়ী রেখাপাত করিয়াছিল; কাজেই মদিনায় এ আদর্শ অনেকটা কার্যকরী হইয়াছিল। কিন্তু বিজিত দেশের নব-দীক্ষিত মুসলমানদের মন তখনও বন্য প্রকৃতির ছিল। অনেক কুচক্রী লোকও নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির আশায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। এই মুনাফেক দল তলে তলে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল। অন্য একটি কারণও ছিল। পদচ্যুত কর্মচারীগণ স্থির হইয়া বসিয়া ছিলেন না। তাহারাও দল পাকাইতে ছিলেন। স্বজন-প্রীতির অভিযোগ তাহারাই করিয়াছিলেন, কারণ এই অজুহাত হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টির পক্ষে খুবই অনুকূল ছিল। এইরূপ নানা কারণেই হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে একটা ষড়যন্ত্র মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল।

খলিফার হত্যা

এই ষড়যন্ত্রের ফলেই খলিফা হযরত ওসমান শত্রুদের হস্তে অতি নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হন। হযরত ওসমানের খেলাফতের ৮ম বর্ষে ইবনে সাবা নামক ইয়েমেন প্রদেশের একজন ইহুদী বসরা নগরীতে আসিয়া মুসলমান হয়। তাহার এই ধর্মগ্রহণ একটা ছলনা মাত্র। মুসলমান বেশে সে বসার, কুফা, সিরিয়া এবং মিসর পরিভ্রমণ করে এবং জনসাধারণের মন খলিফার বিরুদ্ধে বিষাক্ত করিয়া তোলে। একমাত্র সিরিয়া প্রদেশেই মাবিয়ার বিচক্ষণতায় সে কোনো সুবিধা করিতে পারে নাই। মিসরে আসিয়া সে প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করে যে, হযরত ওসমান খলিফার গদি অন্যায় ভাবে দখল করিয়া বসিয়া আছেন, হযরত আলীই প্রকৃত খলিফা। এই মত ধীরে ধীরে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। বসরা এবং কুফায় একদল লোক তার সহকর্মী হইয়া দাঁড়ায়। সীমান্তের দুর্ধর্ষ প্রকৃতির মুসলমানেরাও এই আন্দোলনে যোগ দেয়। হুজুগপ্রিয় লোকেরা যাহা শুনে তাহাই বিশ্বাস করে। বেদুঈনরাও তাই বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয়। ষড়যন্ত্রকারীরা তাহাদিগকে বলে যে, সমস্ত বড় বড় রাজপদ শুধু কোরেশরাই উপভোগ করিতেছে। বিভিন্ন গোত্রের নিকট বলা হয় যে, ওসমান শুধু বনি-উমাইয়াদিগকেই সমস্ত পদমর্যাদা ও সুখ-সুবিধা দান করিতেছেন। এইরূপে কুচক্রীদের প্রোপ্যাগাণ্ডা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে চলিতে থাকে।

হযরত ওসমানের আরও কতকগুলি কাজ চক্রান্তকারীদের সহায়তা করিল। আবু জার গিফারী নামক একজন সাহাবী ছিলেন একটু গোঁড়া প্রকৃতির। সারা জীবন তিনি ভোগ-বিলাসশূন্য সাত্ত্বিক জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। অর্থ-সম্পদকে চিরদিন তিনি নিন্দা করিয়া আসিয়াছেন। অর্থ-সঞ্চয়কে তিনি গায়ের-ইসলামী বলিয়া মনে করিতেন। দামেস্কে গিয়া তিনি খুব জোরে শোরে এই মত প্রচার করিতে থাকনে। কুরআন শরীফের এই আয়াতের উপর তিনি খুব জোর দেনঃ "যাহারা স্বর্ণ-রৌপ্য মজুত করিয়া রাখে এবং আল্লাহ্‌র রাহে খরচ না করে, তাহাদিগকে (দোজখের) ভীষণ শাস্তির কথা ঘোষণা করো।" -(৯ ঃ ৩৪) এই আয়াতের বরাত দিয়াই তিনি প্রচার করেন যে, কোনো মুসলমানই স্বর্ণ-

www.pathagar.com

রৌপ্য বা টাকা-কড়ি সঞ্চয় করিতে পারিবে না, সমস্তই বিলাইয়া দিতে হইবে। অন্যান্য ওলামারা কিন্তু এ মত পোষণ করিলেন না। তাহারা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, উক্ত আয়াতের অর্থ এ নয় যে, স্বর্ণ-রৌপ্য বা টাকা-কড়ি কিছুই সঞ্চয় করা যাইবে না। যাহারা ধন-সম্পদ উপার্জন করিবে, তাহারা যদি তাহা হইতে যথারীতি যাকাত না দেয় বা আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় না করে, তবে সেই মজুদকারীদিগেরই সাজা হইবে; কিন্তু তাহারা যদি সেই অর্থ হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ যাকত দেয় এবং সৎ কাজ করে তবে ধন-সম্পদে কোনো দোষ নাই। কিন্তু আবুজার তাহা না মানিয়া তাঁহার মতই প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহাতে নানা স্থানে অশান্তি ও অসন্তোষ দেখা দিতে লাগিল। পাওয়ার দল তাহাকে সমর্থন করিতে লাগিল। একটা সামাজিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা করিয়া মুয়াবিয়া তাহাকে মদিনায় পাঠাইয়া দিলেন। খলিফা বৃথাই বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, কুরআনের উপরক্ত আয়াত হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঠিক হইবে না। নির্দিষ্ট যাকাত ছাড়া স্টেট কাহারও সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে পারে না। কিন্তু আবু জার সে কথাও শুনিলেন না। তখন খলিফা শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে অন্যত্র নির্বাসিত করিলেন। এই নির্বাসনদণ্ড ষড়যন্ত্রকারীদের কাজে লাগিল। তাহারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতে লাগিল যে, আবুজারের মতো একজন মানব-প্রেমিক ত্যাগী পুরুষকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া খুব অন্যায় হইয়াছে।

অন্য একটি ঘটনাও চক্রান্তকারীরা নিজেদের কাজে লাগাইল। হযরত ওসমান দেখিলেনঃ বিভিন্ন গোত্রের বিভিন্ন বাক্‌-ভঙ্গির দরুন কুরআনের পাঠে কিছু তারতম্য ঘটিয়াছে। পঠনের তারতম্য হইতে লেখনেও তারতম্য আসিয়াছে। তখন তিনি সমস্ত কুরআনের মধ্যে সামঞ্জস্য (uniformity) রক্ষার জন্য তৎপর হইলেন। সমগ্র মুসলিম জাহানে একই কুরআন প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করিলেন এবং স্থির করিলেন, বিবি হাফসার ঘরে হযরত আবুবকর কর্তৃক অনুমোদিত যে কুরআন শরীফ রক্ষিত আছে, তাহার আরও কতিপয় সংখ্যা নকল করিয়া বিভিন্ন কেন্দ্রে তিনি পাঠাইবেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সরকারী তত্ত্বাবধানে কুরআন শরীফের অনেকগুলি অভ্রান্ত নকল প্রস্তুত করানো হইল। হযরত ওসমান তখন দেখিলেনঃ সর্বত্র একই কুরআন প্রচার করিতে হইলে ভুল নকলগুলি নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত, নচেৎ কালে কালে আসল-নকল লইয়া মতবিরোধ দেখা দিবে। ইহাই ভাবিয়া তিনি যেখানে যে ভুল কুরআন ছিল, সমস্তই আনাইয়া পুড়াইয়া ফেলেন। ইসলামের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এ যে কতো বড় একটা খিদমত, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই মহত কার্যকেও কুচক্রীরা নিজেদের কাজে লাগাইল। তাহারা হযরত ওসমানের এইরূপ কুরআন জ্বালাইয়া দেওয়াকে একটা ভীষণ ধর্মদ্রোহিতার কাজ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল।

কুফায় প্রথম বিদ্রোহ দেখা দিল। কুফার শাসনকর্তা সা'দ আসিলেন মদিনায় খলীফার সঙ্গে পরামর্শ করিতে। কিন্তু তিনি যখন কুফায় ফিরিয়া গেলেন, তখন বিদ্রোহীরা তাহাকে বাধা দিল এবং তাহার সঙ্গের একজন ভৃত্যকে হত্যা করিয়া ফেলিল। সা'দ বাধ্য হইয়া মদিনায় ফিরিয়া গেলেন। সরলমতি খলিফা তখন বিদ্রোহীদের প্রতি কোনোরূপ শাস্তির ব্যবস্থা না করিয়া বরং তাহাদের ইচ্ছানুসারে সা'দকে বরখাস্ত করিয়া তদস্থলে আবু মুসা আশারীকে কুফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন।

www.pathagar.com

চারিদিকে বিদ্রোহের আভাস পাইয়া খলিফা প্রাদেশিক গভর্নরদের এক পরামর্শসভায় আহ্বান করিলেন। সকলেই বলিলেন কুচক্রীদের যাহারা নেতা, তাহাদিগকে শাস্তি দিলেই সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। কিন্তু খলিফা মুসলিম-নিধনে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। মুয়াবিয়া বিপদের সংকেত দিয়া খলিফাকে দামেস্কে যাইতে অনুরোধ করিলেন। অথবা একদল দেহরক্ষী রাখিবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কোনো প্রস্তাবেই খলিফা রাজী হইলেন না। যে-মাটিতে তাঁহার প্রিয় রসুল ঘুমাইতেছেন, মদিনার সেই পাক-মাটি ছাড়িয়া নিজের জীবনের মমতায় তিনি যাইবেন অন্যত্র, এ ধারণা তাঁহার নিকট একেবারেই বিষদৃশ ঠেকিল। পক্ষান্তরে নিজের নিরাপত্তার জন্য সাধারণ রাজকোষ হইতে অর্থ লইয়া যে তিনি একদল সৈন্য মোতায়েন রাখিবেন, এ কার্যকেও তিনি নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিলেন। তিনি আরও দেখিলেন, এ কাজ করিতে গেলেও সেই মুসলিম-নিধনকেই সমর্থন করিতে হয়– যাহা তিনি আদৌ কামনা করেন না। কাজেই আদর্শবাদী মহানুভব খলিফা এসব পরামর্শের একটিও গ্রহণ করিলেন না। নগর-রক্ষকদিগকেও নিষেধ করিয়া দিলেন কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিতে।

হজের সময় মদিনায় অবারিত দ্বার। মিসর, কুফা এবং বসরা হইতে বিদ্রোহীরা দলে দলে মদিনায় প্রবেশ করিল। তাহারা ভাবিয়াছিলঃ হযরত আলিকে খলিফা পদের প্রলোভন দিলে তিনি তাদের পক্ষ সমর্থন করিবেন। যখন তাহারা গোপনে হযরত আলির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ প্রস্তাব পেশ করিল, তখন মহামতি আলি অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং বলিলেন, খলিফাকে রক্ষার জন্য তিনিই সর্বপ্রথম তাঁহার তরবারি নিষ্কোষিত করিবেন। আলির নিকট হইতে বিমুখ হইয়া ষড়যন্ত্রীরা তাল্‌হা এবং জুবায়েরের নিকট গেল এবং তাঁহাদিগকে গভর্নরের পদ দিবার প্রলোভন দেখাইল। বলা বাহুল্য, এই দুই আদর্শ সাহাবাও বিদ্রোহীদের এই প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। এইরূপে নিরাশ হইয়া অবশেষে তাহারা একজনকে বশে আনিতে পারিল। ইনি হযরত আবুবকরের পুত্র মুহাম্মদ। কতিপয় কারণে মুহাম্মদ খলিফার উপরে অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই সুযোগে তিনি তাঁহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার প্রয়াস পাইলেন। মিসরের শাসনকর্তা হইবার জন্য গোপনে তিনি ষড়যন্ত্রকারীদিগকে স্বীকৃতি দিলেন।

বিদ্রোহীরা অন্য কোনো সমর্থনকারী না পাইয়া খলিফার নিকট নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ ও দুঃখ প্রকাশ করিল এবং বলিল ঃ মিসরের শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্‌কে সরাইয়া তদস্থলে মুহাম্মদ-বিন-আবু বকরকে নিযুক্ত করিলেই তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া যাইবে। খলিফা তাহাতেই রাজী হইলেন। মুহাম্মদকে তিনি মিসরের শাসনকর্তার পদে নিয়োগপত্র দিলেন। মুহাম্মদ সেই নিয়োগপত্র লইয়া বিদ্রোহীদের সঙ্গেই মিসর যাত্রা করিলেন। মিসর, কুফা এবং বসরার আন্দোলনকারীরা একই সঙ্গে মদিনা ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

মদিনাবাসীরা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। কিন্তু কয়েকদিন পরেই দেখা গেল কুচক্রীরা পুনরায় মদিনায় আসিয়া হাজির হইয়াছে। এবার তাহারা একটা ক্রীতদাসকে ধরিয়া আনিয়াছে। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় বলিলঃ এই ক্রীতদাস হযরত ওসমানের, উটও

www.pathagar.com

হযরত ওসমানের; মিসরের শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্‌র নিকট একখানি গুপ্তপত্র লইয়া যাইতেছিল। আমরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছি। এই সেই পত্র। এই বলিয়া তাহারা সেই পত্র সবাইকে দেখাইল। পত্রখানি হযরত ওসমানের তরফ হইতে মিসরের শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্‌র বরাবর লেখা। পত্র লেখা আছে ঃ "মুহাম্মদকে তোমার স্থলে গভর্নর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলাম বটে, কিন্তু এ আদেশ সত্য নহে। মুহাম্মদ ও তাহার দলবল তোমার নিকট পৌঁছিলেই তুমি তাহাদিগকে সাবাড় করিয়া দিবে।" তীক্ষ্ণবুদ্ধি হযরত আলি এই চক্রান্ত বুঝিতে পারিলেন। হযরত ওসমানের মতো সত্যবাদী মহান খলিফা এমন জঘন্য কৌশল অবলম্বন করিবেন, ইহা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিলেন না। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন ঃ মদিনা হইতে তিনটি বিভিন্ন পথ–মিসর, কুফা এবং বসরায় গিয়াছে। শুরু হইতেই তিন দলকে এই তিন পথে যাইবার কথা। যে স্থানে পত্রখানি ধরা পড়িয়াছে বলিয়া বিদ্রোহীরা বলিতেছে, মদিনা হইতে তাহা অনকে দূরবর্তী। যদি একমাত্র মিসরের কাফেলাই সেই পত্র লইয়া ফিরিয়া আসিত, তাহা হইলেও বিশ্বাস করা যাইত; কিন্তু একই সঙ্গে কুফা এবং বসরার কাফেলা কি করিয়া একত্র হইয়া ফিরিয়া আসিল? মিসরের দল যদি কুফা-বসরার দলকে এই পত্রের কথা বলিয়া ফিরাইয়া আনিতেই চাহিত, তবে মদিনা হইয়া দুই পথে তাহাদিগকে দ্রুত অগ্রসর হইতে হইত। আর তাহা করিতে গেলেও ততক্ষণ বসরা ও কুফার লোকেরা স্ব-স্ব গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া যাইত। হযরত আলি তাই বুঝিলেন, এই ষড়যন্ত্র পূর্বনির্ধারিত। তবুও তিনি বিদ্রোহীদলের নেতৃবৃন্দকে লইয়া হযরত ওসমানের নিকট আসিলেন এবং পত্রখানি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন সেই পত্র তাঁর লেখা কি-না। হযরত ওসমান পত্রখানি ভালো করিয়া দেখিয়া বলিলেন ঃ "পত্রের সীল-মোহর আমার বলিয়া মনে হইতেছে বটে, কিন্তু এ পত্র আমি লিখি নাই বা এ সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না। এ জাল-পত্র।" বিদ্রোহীরা অনেক বাদানুবাদ করিল। অনেকে বলিল ঃ "আপনি না লিখিলেও নিশ্চয়ই আপনার মন্ত্রী মারোয়ান এ পত্র লিখিয়াছেন। মারোয়ানকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করুন।" কিন্তু এই সমর্পণের অর্থ কী খলিফা তাহা ভালোভাবেই বুঝিলেন। ইহার অর্থঃ মারোয়ানকে আযরাইলের হাতে তুলিয়া দেওয়া। দলিল নাই, প্রমাণ নাই, কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কেমন করিয়া মহাপ্রাণ হযরত ওসমান একজন মুসলামানের হত্যার কারণ হইবেন? তাঁহার বিশ্বাস বিদ্রোহীরা নিজেরাই এই পত্র জাল করিয়া আনিয়াছে। প্রত্যেক মুসলমানের জান ও মাল রক্ষা করা খলিফার কর্তব্য। তাছাড়া যে সময় বিদ্রোহীরা এই দাবী করিতেছিল, তখন মারোয়ান খলিফার গৃহেই অবস্থান করিতেছিলেন। কাজেই, তিনি তখন খলিফার অতিথি। অতিথিকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করা আরবীয় আতিথ্য ধর্মেরও সম্পূর্ণ বিপরীত। হযরত ওসমান তাই মারোয়ানকে বিদ্রোহীদের হস্তে সমর্পণ করিতে অস্বীকার করিলেন। বিদ্রোহীরা তখন ভীষণ উত্তেজিত হইয়া বেয়াদবিপূর্ণ ভাষায় বলিতে লাগিল "পত্র যেই লিখুক, খলিফা পদের যোগ্য আপনি নন। এখনই এই আসন পরিত্যাগ করুন।" খলীফা বলিলেন ঃ "আল্লাহ্‌র নিয়োজিত এই দায়িত্বপূর্ণ পবিত্র পদ বিনা করণে কিছুতেই আমি ছাড়িব না–আমার ভুল দেখাও, আমি সংশোধন করিতে রাজী আছি।" বিদ্রোহীরা খলিফাকে শাসাইতে শাসাইতে চলিয়া গেল।

www.pathagar.com

বিদ্রোহীরা মদিনার উপকণ্ঠে আড্ডা গাড়িয়া বসিল। খলিফা তবুও তাহাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন না।

শুক্রবার আসিল। জুমা'র নামাজের জন্য দলে দলে লোক সমাবেশ হইতে লাগিল। খলিফা খোতবা দিতে উঠিলেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা বাধা দিল। জাল-পত্রের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলেই তাহাদের বিপদ। তাহারা মসজিদের মধ্যেই শোরগোল করিয়া খলিফাকে কিছু বলিতে দিল না। একজন খলিফার লাঠিটা লইয়া ভাঙিয়া ফেলিল, তারপরই প্রস্তর নিক্ষেপ শুরু হইয়া গেল। বৃদ্ধ খলিফা আহত হইয়া পড়িলেন। সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে গৃহে পৌঁছাইয়া দিলেন।

বিদ্রোহীরা তখন খলিফার গৃহ পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল। বাহিরের সহিত তাঁহার কোনোই যোগসূত্র রহিল না। এমন ভাবেই তাহারা আট-ঘাট বন্ধ করিয়া দিল যে, বাহির হইতে পানিটুকু পর্যন্ত লইবারও উপায় রহিল না। হযরত আলি আসিয়া বিদ্রোহীদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিলেনঃ মহামান্য খলিফার প্রতি তোমাদের এই আচরণ যারপরনাই ঘৃণ্য। কিন্তু তাহাতে কোনোই ফল হইল না। পানির অভাবে খলিফা ও তাঁহার পরিবারবর্গ দারুণ কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া রাসূলুল্লাহ্‌র অন্যতম পত্নী উম্মে হাবিবা নিজে একটি খচ্চরের পিঠে পানি লইয়া আসিলেন; কিন্তু দুর্বৃত্তরা তাঁহাকেও লাঞ্ছিত করিয়া ফিরাইয়া দিল।

আশ্চর্যের বিষয়, এই সংকট মুহূর্তেও খলিফা কোনোরূপ বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন না; মুসলিম-রক্তে পবিত্র মদিনা নগরী রঞ্জিত হইবে আর সে রক্তপাত তাহার নিজের নিরাপত্তা ও স্বার্থের জন্য সংঘটিত হইবে, ইহা কিছুতেই তিনি বরদাশ্‌ত করিতে পারিলেন না। নগর-রক্ষী সেনাদলকে তাই তিনি অস্ত্র প্রয়োগ করিতে নিষেধ করিলেন না। মদিনবাসীরাও খলিফার বিনা অনুমতিতে হঠাৎ কিছুই করিতে পারিতেছিলেন না। হযরত আলি, তালহা, জুবায়ের প্রভৃতি সাহাবারাও একই মন্ত্রে দীক্ষিত। যে-আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বয়ং খলিফা অস্ত্র ধারণ করিতেছেন না, তাঁহারাও সেই একই আদর্শের অভিসারী। পাক-মদিনায় কোনোরূপ রক্তপাত যাহাতে না হয় তাঁহারাও তাহাই চাহিতেছিলেন। কাজেই সকলেই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিয়া যাইতেছিলেন মাত্র। তবে খলিফার নিরাপত্তার জন্য তাঁহারা যথারীতি ব্যবস্থা করিতে ভুলেন নাই। হযরত আলি তাঁহার দুই পুত্র হাসান-হোসেনকে পাঠাইয়া দিলেন খলিফার গৃহ পাহারার জন্য। খলিফার রক্ষার্থে প্রয়োজন হইলে তাঁহারা জীবন দিবেন, ইহাই ছিল তাঁহাদের প্রতি নির্দেশ।

দেখিতে দেখিতে জিলহজ মাস আসিয়া পড়িল। মদিনাবাসীদের অধিকাংশই হজের জন্য মক্কা যাত্রা করিলেন। ইবনে আব্বাস খলিফার দ্বাররক্ষক স্বরূপ মোতায়েন ছিলেন। খলিফা তাঁহাকেও হজে যাইতে আদেশ দিলেন। মদিনার হাজীদিগের উপর তাঁহাকেই তিনি নেতা নিযুক্ত করিলেন। মক্কায় সমবেত হাজীদিগের নিকট বিদ্রোহীদের আচরণ ব্যাখ্যা করার কথাও তিনি বলিয়া দিলেন। বিদ্রোহীরাও হজের পূর্বেই মদিনা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, অনর্থক কোনো রক্তপাত করিবে না, ইহাই তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

বিবি আয়েশাও হজে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় তিনি আপন ভ্রাতা মুহাম্মদ বিন্-আবুবকরকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন; কিন্তু মুহাম্মদ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তাহার মন তখন বিকৃত। তিনিও যে বিদ্রোহীদের অন্যতম নেতা।

www.pathagar.com

বিদ্রোহীরা বুঝিল ইহাই উপযুক্ত সময়। মদিনা নগরী প্রায় শূণ্য। আর কয়েকদিন পরেই হজ করিয়া সকলে ফিরিয়া আসিবে। কাজেই আর দেরী করা চলে না। বিদ্রোহীরা তাই একদিন খলিফার গৃহে জোর করিয়া ঢুকিবার চেষ্টা করিল। দ্বার রক্ষকেরা সংখ্যায় অতি অল্পই ছিল; বিদ্রোহীরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। খানিকটা সংঘর্ষের পর দ্বার-রক্ষীরা গৃহের অভ্যন্তরে আসিয়া ফটক বন্ধ করিয়া দিল। খুব হৈ-চৈ শুরু হইল। ইত্যবসরে মুহাম্মদ বিন্ আবুবকর তাঁহার দুইজন সঙ্গী লইয়া অলক্ষ্যে গৃহের পশ্চাৎদিক হইতে অন্য বাড়ির ছাদের সাহায্যে দেওয়াল টপকাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। খলিফা তখন গৃহের অভ্যন্তরে স্ত্রী-পুত্র-পরিবেষ্টিত অবস্থায় কুরআন পাঠ করিতেছিলেন। একটা স্নিগ্ধ বেহেশতী জ্যোতিতে তাঁহার শুভ্রশশ্রুমণ্ডিত পবিত্র মুখকমল ঝল্মল্ করিতেছিল। বাহিরের এই উন্মত্ত কোলাহল—এই শয়তানি ষড়যন্ত্রের বিভীষিকা তাঁহাকে একটুও বিচলিত করিতে পারিল না; একটা নীরব প্রশান্তিতে মহান খলিফার অন্তর আজ ভরপুর। আল্লাহ্‌র উপর সে কী পরম নির্ভর! অন্যায় যে তিনি করেন নাই, তিনি যে তাঁহার বিবেক অনুযায়ী আপন কর্তব্য পালন করিয়াছেন, এই পরম সান্ত্বনায় আজ তিনি নির্বিকার।

আত্মরক্ষার জন্য আজ তাঁহার কোনো চেষ্টার প্রয়োজন নাই। তাঁহার জীবনমরণের ভার তিনি আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ করিয়া দিয়াছেন। ইচ্ছা হয় তিনি বাঁচাইবেন, ইচ্ছা হয় মারিবেন। বিদ্রোহীদের লক্ষ্যস্থল তিনি নিজে; ব্যক্তিগত কারণে লোকেরা যদি তাঁহাকে না-ই পছন্দ করে, তবে সেইজন্য রাষ্ট্রের হেফাজতে নিয়োজিত সৈন্য বা রক্ষীদলকে অথবা মদিনাবাসীদিগকে তিনি কেন আহ্বান করিবেন? এরূপ কার্য করিতে তিনি লজ্জাবোধ করিলেন। অকৃত্রিম মুসলিম-প্রীতি, ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ আজ তাঁহাকে স্তব্ধ করিয়া দিল। বলিষ্ঠ মনোবল লইয়া বীরের মতো তিনি আসন্ন ভয়ঙ্করের সম্মুখীন হইলেন।

ঘরে ঢুকিয়াই মুহাম্মদ-বিন-আবুবকর হযরত ওসমানের দাড়ি ধরিয়া সজোরে হেঁচ্‌কা টান দিলেন। এই অমার্জনীয় ধৃষ্টতা দেখিয়া মহান খলিফা ধীর শান্ত স্বরে কহিলেন ঃ "বাবা মুহাম্মদ, যদি তোমার পিতা আজ জীবিত থাকিতেন আর তোমার এই আচরণ দেখিতে পাইতেন তবে তিনি নিশ্চয়ই লজ্জিত হইতেন। তুমি আজ আমার দাড়ির অমর্যাদা করিতেছ, কিন্তু তিনি এই দাড়িকে শ্রদ্ধা করিতেন।" মুহাম্মদ সে কথা শুনিয়া লজ্জায় সরিয়া আসিলেন। তখন অপর দুই পাষণ্ড খলিফাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করিল। পার্শ্বেই খলিফার বিবি দাঁড়াইয়াছিলেন; তিনি সেই আঘাত আপন হাত দিয়া ঠেকাইতে গেলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাতের কয়েকটি আঙুল কাটিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে হযরত ওসমানও ধরাশায়ী হইলেন। তাঁহার হস্তস্থিত কুরআনখানি লণ্ডভণ্ড হইয়া ছিটকাইয়া পড়িল। খলিফার পবিত্র রক্তে কুরআনের পৃষ্ঠা রঞ্জিত হইয়া গেল। খলিফা তখনও দু-হাত বাড়াইয়া সেই রক্ত-রঞ্জিত ছিন্ন কুরআনের পৃষ্ঠাগুলি সযত্নে নিজের বুকে ধরিয়া তুলিয়া লইলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরেই খলিফা শাহাদাত প্রাপ্ত হইলেন।

খলিফার স্ত্রী ও অন্যান্য পরিজনবর্গ তখন ভীতস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। নিম্নে ফটকের পার্শ্বে সমবেত উন্মত্ত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন ঃ "আল্লাহ্‌র কসম,

www.pathagar.com

খলিফা নিহত হইয়াছেন।" সে কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি সকলে উপরে উঠিয়া আসিয়া দেখিল খলিফা নিহত অবস্থায় পড়িয়া আছেন। হযরত আলি, জুবায়ের ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে যে খলিফা নিহত হইবেন, তাহা তাঁহারা ভাবিতেই পারেন নাই।

ইত্যবসরে ঘাতকেরা কোন্ ফাঁকে পালাইয়া গিয়াছে, তাহা কেহ বুঝিতেও পারে নাই।

এমনই শোচনীয় বেশে হযরত ওসমান দুনিয়া হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

হযরত ওসমানের চরিত্র

উপরে আমরা হযরত ওসমানের শৈশব হইতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জীবনের ঘটনাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম–উদ্দেশ্যঃ এই পটভূমিকায় তাঁহার চরিত্র-বিচার সহজ হইবে। পাঠক, একবার মনের চোখ দিয়া খলিফার জীবন-আলেখ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। দেখিবেন, এই চিত্রের কোথাও কোনো মলিনতা নাই–এর আগাগোড়া আলোয় ঝল্মল্। শৈশবে তিনি বিনয়ী, সত্যবাদী, যৌবনে তিনি মিতাচারী, সচ্চরিত্র, সর্বপ্রকার বিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে মুক্ত। জীবনে তিনি কখনো মদ পান করেন নাই বা অপর কোনো নারীকে স্পর্শ করেন নাই; দাম্পত্য জীবন তাঁহার অতি পবিত্র–পরিবারে তিনি আদর্শ স্বামী, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ পিতা। কর্মজীবনে তিনি অক্লান্ত কর্মী; ঈমানে অটল, বিপদে নির্ভীক, আল্লাহ্ ও রসুলের প্রতি তাঁহার প্রখর অনুরাগ। সমগ্র জীবন–সমগ্র সম্পদ তাঁহার ইসলামের সেবায় উৎসর্গীকৃত। ভোগে তৃষ্ণা নাই, বিষয়-আসয়ে বাসনা নাই। মানব-কল্যাণে তিনি আত্মনিবেদিত। এমনই অবস্থায় জীবনের ৭০টি বৎসর অতিবাহিত করিয়া আসিয়া তিনি খলিফার দায়িত্বপূর্ণ গুরুভার গ্রহণ করিলেন। এই পদে তিনি ১২ বৎসর কাটাইয়াছিলেন। প্রথম ছয় বৎসর তাঁহার অযোগ্যতা বা স্বজন-প্রীতি সম্বন্ধে কোনো কথাই ওঠে নাই; এমন কি হযরত ওমর অপেক্ষাও তিনি জনপ্রিয় ছিলেন বলিয়া জানা যায়। জীবনের শেষ ছয়টি বৎসরই অভিযোগ শোনা গেল যে তিনি স্বজন-প্রিয়, অকমর্ণ্য ও দুর্বল, খলিফা পদের অযোগ্য। এই স্বজন-প্রীতি এবং অকর্মণ্যতা সম্বন্ধেই আমরা এখন আলোচনা করিব।

হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তিনি অতিমাত্রায় স্বজন-প্রিয় ছিলেন, অর্থাৎ কিনা বড় বড় রাজপদে তিনি অন্য সকলকে সরাইয়া আনিয়া নিজের আত্মীয়-স্বজনকে সেই সব পদে বসাইয়াছিলেন। সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া, আবদুল্লাহ্-বিন-আমের, মিসরের শাসনকর্তা, বসরার শাসনকর্তা এবং তাঁর মন্ত্রী আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ মারোয়ান–ইহারা সকলেই তাঁহার আত্মীয় ছিলেন।

কথাগুলি মিথ্যা নয়। এখন দেখা যাউক, এই নিয়োগগুলি প্রকৃত পক্ষে স্বজন-প্রীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল কিনা এবং হইলেও এগুলি সমর্থনযোগ্য কিনা।

সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়াকে হযরত ওসমান নিয়োগ করেন নাই; ওমরের সময়েই তিনি এই পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ওসমান তাঁহাকে নিজ পদে বহাল রাখিয়া দিয়াছিলেন মাত্র। কাজেই এই নিয়োগ সম্বন্ধে হযরত ওসমানের উপর দোষ আরোপ করা মোটেই সমীচীন নয়।

www.pathagar.com

বসরার শাসনকর্তা ছিলেন আবু মূসা আশারী। হযরত ওমর তাহাকে নিয়োগ করেন। হযরত ওসমানের খলিফা পদ-লাভের সঙ্গে সঙ্গেই বসরার লোকেরা আশারীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনিল। তদন্ত করিবার পর ওসমান আশারীকে সরাইয়া আনিলেন এবং তদস্থলে বসরাবসীদের মতানুসারেই অন্য এক ব্যক্তিকে তাহাদের গভর্নর নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ইনিও বেশীদিন ঐ পদে থাকিতে পারেন নাই। তাহার বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ আসিতে লাগিল। তখন ওসমান তাহাকে বরখাস্ত করিয়া আবদুল্লাহ্-বিন-আমেরকে তদস্থলে নিযুক্ত করিলেন। এই আমের ওসমানের আত্মীয় ছিলেন বটে।

কুফার শাসনকর্তা ছিলেন পারস্য-বিজয়ী সা'দ। হযরত ওমর তাহাকে নিয়োগ করিয়া যান। কিন্তু সামান্য একটি অপরাধে হযরত ওমর তাহাকে বরখাস্ত করেন এবং মুগীরাকে তদ্স্থলে নিযুক্ত করেন। মৃত্যু-সময়ে হযরত ওমর এই কথা বলিয়া যান যে, সা'দকে যেন পুনরায় কুফার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করা হয়। হযরত ওসমান খলিফা পদ লাভ করিয়াই হযরত ওমরের পরিত্যক্ত বাসনা পূর্ণ করেন। তিনি মুগীরাকে ফিরাইয়া আনেন এবং সা'দকে পুনরায় গভর্নররূপে কুফায় পাঠাইয়া দেন। কিন্তু সা'দ এবারেও বেশীদিন এই পদে থাকিতে পারিলেন না। ইবনে মাসুদ ছিলেন কুফার খাজাঞ্চি। তাহার নিকট হইতে সা'দ কিছু ঋণ গ্রহণ করেন। সরকারী তহবিল হইতেই মাসুদ এই টাকা সা'দকে দেন। কিন্ত যথাসময়ে সা'দ এই টাকা পরিশোধ না করায় মাসুদের সহিত তহার মনোমালিন্য ঘটে। সরকারী তহবিলের টাকা তিনিই বা কতোদিন এরূপ ভাবে ফেলিয়া রাখিতে পারেন। বাধ্য হইয়া তখন তিনি এই ব্যাপার খলিফার গোচরীভূত করেন। হযরত ওসমান তদন্ত করিয়া দেখেন, সা'দ-ই দোষী। তখন বাধ্য হইয়া তিনি পুনরায় সা'দকে বরখাস্ত করেন এবং তদস্থলে অলিদকে নিয়োগ করিয়া পাঠান। অলিদ অবশ্য হযরত ওসমানের দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন।

মিসরের শাসনকর্তা ছিলেন আমর-বিন্-আ'স্। হযরত ওমর তাহাকে বরখাস্ত করিয়া আবদুল্লাহ্-বিন-সা'দকে নিযুক্ত করিয়া যান। ইহাও তিনি বিনা কারণে করেন নাই। আমর-বিন-আ'সের অধীনে আবদুল্লাহ্-বিন-সা'দ ছিলেন রাজস্ব-সচিব। এ নিয়োগও হযরত ওমর করিয়া যান। উভয়ের মধ্যে শাসন-সংক্রান্ত বিষয় লইয়া মতভেদ ঘটে। ঘটনাটি পরে ওসমানের নিকট প্রেরণ করা হয়। খলিফা তদন্ত করিয়া আমর-বিন-আ'সকেই দোষী সাব্যস্ত করেন। একজনের হাতে রাজস্ব আর একজনের হাতে সেনাবিভাগ; কাজেই উভয়ের ভিতরে যদি মিল না থাকে, তবে শাসনকার্য চলিতেই পারে না। ওসমান তাই বাধ্য হইয়াই আস'কে সরাইয়া আনিয়া আবদুল্লাহ্-বিন-সা'দকেই মিসরের শাসনকর্তা নিয়োগ করিলেন। আমর-বিন-আ'সের বিরুদ্ধে হযরত ওমরও পূর্বেই বিরূপ হইয়াছিলেন। সুতরাং এ অপসারণের মূলেও হযরত ওমরের নীতিই অনুসৃত হইয়াছিল।

চারিটি প্রদেশের শাসনকর্তা এই ভাবেই নিযুক্ত হইয়াছিল। অন্যায় করিয়া বিনা কারণে হযরত ওসমান কাহাকেও পদচ্যুত বা নিযুক্ত করেন নাই। ঘটনার স্বাভাবিক গতিতেই এই নিয়োগ ও বদলীগুলি সংঘটিত হইয়াছিল।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। যাহাকেই তিনি নিয়োগ করিয়াছেন, জনসাধারণের আস্থা হারাইলে তিনি আর তাহাকে সেই পদে রাখেন নাই। স্বজনদিগের

www.pathagar.com

প্রতিও তিনি একই ব্যবহার করিয়াছেন। মাবিয়ার বিরুদ্ধে কেহ কোনো অভিযোগ আনে নাই; কাজেই তিনি তাহাকে নিজ পদে বহাল রাখিয়াছিলেন। কিন্তু, অলিদের বিরুদ্ধে যেই অভিযোগ আসিয়াছে, অমনি ওসমান তাহাকে বরখাস্ত করিয়াছেন, এমন কি শরিয়তের বিধান অনুসারে তাহাকে প্রকাশ্যে বেত্রদণ্ডও দান করিয়াছেন। খলিফা যদি এইখানে কোনো তারতম্য করিতেন, তবে স্বজন-প্রীতির অভিযোগ টিকিত বটে। স্বজন-প্রীতির অভিযোগের ভয়ে উপযুক্ত আত্মীয়-স্বজনকে কোনো পদ না দিলেও তো আর এক অন্যায় হইত। কাজেই এখানে দৃঢ় মনোবল ও কর্তব্য-বোধ থাকা দরকার। হযরত ওসমানের সেই দৃঢ়তা ছিল। উপযুক্ত হইলে স্বজনদিগকে নিয়োগ করিবার সৎসাহসও যেমন ছিল, অপরাধ করিলে সেই স্বজনদিগকে বরখাস্ত বা শাস্তি দিবার মনোবলও তাঁহার ঠিক সেইরূপই ছিল। পক্ষান্তরে ক্ষমা-গুণেরও তাঁহার অভাব ছিল না। কুফার শাসনকর্তা অলিদকে যখন তিনি বরখাস্ত করিলেন, তখন তিনি বসরার পদচ্যুত গভর্নর আবু মূসা আশারীকে পুনরায় কুফার শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইলেন। আবার মিসেরর শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যখন লোকেরা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিল, তখন তাহাকেও তিনি ছাড়েন নাই, লোকমতের স্বপক্ষেই তিনি মুহাম্মদ-বিদ-আবুবকরকে তদস্থলে মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই মুহাম্মদ কিরূপ যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন তাহা পাঠক পূর্বেই দেখিয়া আসিয়াছেন। হযরত ওসমানের ঘাতকদের মধ্যে ইনিই ছিলেন প্রধান। এরূপ লোক কি কখনও কোনো প্রদেশের শাসনকর্তা হইবার যোগ্য? অথচ এরূপ লোককেও জনসাধারণ সুপারিশ করে এবং ইহাদিগকে লইয়া খলিফার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালায়। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ যে কতো মিথ্যা, মুহাম্মদ বিন-আবুবকর তাহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

এইবার দেখা যাউক, হযরত ওসমান যে সব আত্মীয়-স্বজনকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহাদের যোগ্যতা ছিল কিনা। বলা বাহুল্য, এদিক দিয়াও হযরত ওসমানের দূরদর্শিতা ও বিচার-বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। সিরিয়া মিসর, বসরা এবং কুফা—এই চারিটি প্রদেশেই ছিল খেলাফতের শক্তি-কেন্দ্র। এই চারিটি কেন্দ্রে বিচক্ষণ শাসনকর্তার নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। হযরত ওসমান উপযুক্ত লোকই এই সব পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নিজেদের কার্যাবলীর দ্বারাই ইহাদের নিয়োগ সমর্থিত হইয়া যাইতেছে। রোমক ও পারশ্য শক্তি তখনও সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয় নাই; দিকে দিকে শত্রুদের বিদ্রোহ ও অভিযান চলিতেছে; এই দুঃসময়ে মাবিয়া, আবদুল্লাহ্-বিন-সা'দ অথবা আবদুল্লাহ্-বিন-আমেরের মতো বিচক্ষণ লোক না থাকিলে নবগঠিত ইসলামী সাম্রাজ্যের ভাগ্যে যে কী ঘটিত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

প্রথমেই ধরুন মুয়াবিয়ার কথা। রোমকগণ ৮০,০০০ সৈন্য লইয়া সিরিয়া আক্রমণের উদ্দেশ্যে এশিয়া মাইনরের পথে অগ্রসর হইল। মুয়াবিয়া সংবাদ পাইয়াই প্রস্তুত হইলেন। খলিফাও মদিনা হইতে একদল সৈন্য মুয়াবিয়ার সাহায্যে পাঠাইয়া দিলেন। মুয়াবিয়া রোমদিগকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিলেন। শুধু তাই নয়, তাহার সৈন্য বাহিনী আর্মেনিয়ার ভিতর দিয়া তিফলিস্ পর্যন্ত দখল করিয়া লইল। জল-পথেও যাহাতে শত্রুদিগকে বাধা দেওয়া যায়, তাহার চিন্তাও মুয়াবিয়া করিয়াছিলেন। খলিফার অনুমতি

www.pathagar.com

লইয়া তিনি একটি নৌ-বহর প্রস্তুত করিলেন এবং সাইপ্রাস দ্বীপ দখল করিয়া লইলেন। ইহাই মুসলিমদিগের প্রথম নৌ-যুদ্ধ। মুসলিম নৌ-শক্তি গঠনের ইতিহাসে মুয়াবিয়ার নাম তাই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। হযরত ওমরের সময়ই জলপথে তিনি সাইপ্রাস দ্বীপ দখল করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু হযরত ওমর নৌ-যুদ্ধ করিতে সাহস পান নাই। হযরত ওসমান এই নূতন দুঃসাহসিক কার্যে উৎসাহ দিয়াছেন। ইহার পর রোমানেরা যখন আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করিতে চায়, তখনও মুয়াবিয়ার নৌ-বহর আবদুল্লাহ্‌র নৌ-বহরের সহিত মিলিত হইয়া রোমকদিগকে বাধা দেয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যুদ্ধেও মুসমানেরাই বিজয়ী হয়। এই নব-গঠিত নৌ-বহর ক্রীট, মাল্টা প্রভৃতি দেশ বিজয়ের পর কনস্টান্টিনোপোলের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়।

মুয়াবিয়ার ন্যায় আবদুল্লাহ্‌র সামরিক তৎপরতাও ছিল প্রচুর। রোমক সেনাপতি গ্রেগরীর অধীনে রোমানেরা ১,২০,০০০ সৈন্য লইয়া মিসরের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু আবদুল্লাহ্‌র সেনাদল তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করিল। গ্রেগরী নিহত হইলেন। ইহার ৫ বৎসর পর রোমানেরা জলপথে আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করিবার জন্য ৫০০ রণ-তরীর এক বিরাট বহর লইয়া অগ্রসর হইল। আবদুল্লাহ্‌ পূর্ব হইতেই ছোটখাট একটি নৌ-বহর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মুয়াবিয়ার নৌ-বহর আসিয়াও আবদুল্লাহ্‌র নৌ-বহরের সহিত যোগ দিল। উভয়ের মিলিত শক্তি রোমকদিগকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করিল। এইরূপে মুয়াবিয়া এবং আবুল্লাহ্‌র সমবেত চেষ্টায় আফ্রিকা মহাদেশের দিকে দিকে ইসলামের লাল ঝাণ্ডা উড়িতে লাগিল। মুয়াবিয়ার শাসনক্ষমতা পূর্বে মাত্র দামেশ্‌কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এখন তিনি সমগ্র সিরিয়ার শাসনকর্তা রূপে পরিগণিত হইলেন। এই রাজ্য বিস্তারের জন্য ঐতিহাসিকগণ তাহাকে 'আরবের সীজার' বলিয়া অভিহিত করেন।

বসরার শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্‌ বিন আমেরও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। আমেরের কর্মভার গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই পারশ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। পলাতক সম্রাট ইয়াজদ্‌জর্দের সাঙ্গোপাঙ্গোরা সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। আবদুল্লাহ্‌-বিন আমের দক্ষতার সহিত সে বিদ্রোহ্‌ দমন করেন। খলিফা ওসমান মদিনা হইতে একদল সেনা পাঠাইয়া আমেরকে সাহায্য করেন। আমের শুধু পারশ্য পূনর্দখলই করেন না, বিদ্রোহীদিগের অনুসরণ করিতে করিতে একদিকে বল্‌খ্‌ এবং তুর্কীস্তান, অপরদিকে হিরাত, কাবুল ও গজনী পর্যন্ত দখল করিয়া লন। খোরাসানের অধিকাংশ (নিশাপুর, তুস, মার্ভ প্রভৃতি) এই সময়েই মুসলিম শাসনাধীনে আসে। পরবৎসর মুসলিম শক্তি আজারবাইজান পর্যন্ত অগ্রসর হয়।

কুফার শাসনকর্তা অলিদ যদিও মদ্যপানের অভিযোগে বরখাস্ত হন, তবুও রাজ্যশাসনে তিনি অক্ষম ছিলেন না। মারওয়ানও তৎকালে একজন বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। কাজেই তাহাদের কাহারও নিয়োগই অযৌক্তিক হয় নাই। এই সব যোগ্য ব্যক্তিদের কল্যাণে হযরত ওসমানের সময় মুসলিম সাম্রাজ্য বহুগুণে বিস্তৃত হইয়া যায় এবং পূর্বাপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হয়। বস্তুত হযরত ওসমানের সময়েই প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সাম্রাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর পুনর্গঠিত হয়। চারিপাশে রোমক, পারশিক ও তুর্কীদিগের বিদ্রোহ ও আক্রমণ হইতে মুসলিম সামাজ্য শুধু সংরক্ষিতই হয় নাই,

www.pathagar.com

সংগঠিতও হইয়াছে। এই গৌরব সম্পূর্ণরূপে হযরত ওসমানের প্রাপ্য। তিনি যদি সিরিয়া, মিসর ও পারশ্যে উপযুক্ত গবর্নর নিযুক্ত করিতে না পারিতেন, তবে মুসলিম রাষ্ট্র ধ্বংস হইয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। কাজেই মুয়াবিয়া, আবদুল্লাহ্ প্রভৃতি স্বজনদিগকে নিয়োগ করিবার জন্য হযরত ওসমানকে নিন্দা না করিয়া বরং উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করিতে হয়। ইহাদেরই কল্যাণে মুসলিম সাম্রাজ্য রক্ষা পাইয়াছে। এই সব যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ না করিলেই কি ভালো হইত? নিয়োজিত ব্যক্তিদিগের এইরূপ অসাধারণ যোগ্যতার প্রমাণ পাওয়ার পর হযরত ওসমানকে স্বজন-প্রিয় বলা কোনো চিন্তাশীল ঐতিহাসিকের পক্ষেই আর শোভা পায় না। অপদার্থ অ-স্বজন লোকদিগকে নিয়োগ করিলে হযরত ওসমান স্বজন-প্রীতির অভিযোগ হইতে মুক্ত থাকিতেন বটে, কিন্তু মুসলিম সাম্রাজ্য রসাতলে যাইত। যে স্বজন-প্রীতি স্বদেশ বা স্বজাতি-প্রীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, সে স্বজন-প্রীতি দোষের নয়।

তাহা হইলে একথা এখন পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, হযরত ওসমানের উপর যে সব অভিযোগ আনা হয়, তাহার মূলে কোনো সত্য নাই। তাঁহার সমস্ত কর্ম অকৃত্রিম দেশ ও স্বজাতি-প্রেম হইতে উৎসারিত হইয়াছে। যে প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি মুসলিম জাহানের খেলাফতের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি পরিপূর্ণ ভাবেই পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হাতে মুসলিম সাম্রাজ্য দুর্বল তো হয়ই নাই; বরং পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে সবল ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। কাজেই স্বজন-প্রীতি বা অক্ষমতার অভিযোগ নিতান্তই হাস্যকর।

ষড়যন্ত্রকারীদের মিথ্যা অভিযোগের উপযুক্ত উত্তর খলিফা নিজেই দিয়া গিয়াছেন। যখন হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা নানারূপ অভিযোগ আনিল, তখন তিনি একদিন মাদিনার মসজিদে সমবেত জনতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন ঃ

"যখন আমার উপর খেলাফতের গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়, তখন আমি আরবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি ছিলাম। আমার অগণিত উট ও বকরী ছিল। আর আজ আমার একটি উটও নাই, একটি বকরীও নাই–শুধু দুইটি ছাড়া, যাহা আমি কোরবানীর জন্য রাখিয়া দিয়াছি। বলুন, ইহা সত্য কিনা? (জনতা উত্তর দিল ঃ হ্যাঁ, ইহা সত্য) আমার প্রতি এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, আমি আমার আত্মীয় ইবনে আবু সারাহ্‌কে যুদ্ধ-লব্ধ সমুদয় দ্রব্যাদি দান করিয়াছি। এই অভিযোগ অমূলক। যুদ্ধ দ্রব্যাদির একটা অংশ মাত্রই তাহাকে দান করা হইয়াছে। ইহার পরিমাণই এক লক্ষ টাকা।[৩] এইরূপ দান নূতনও নহে। হযরত আবুবকর এবং হযরত ওমরও এইরূপ ভাবে দান করিতেন। তাহা সত্ত্বেও লোকেরা যখন আপত্তি তুলিল, তখন তাহাও আমি তাহার নিকট হইতে ফিরাইয়া লইয়াছি। আপনারা আরও অভিযোগ করিয়াছেন যে, আমি আমার আত্মীয়-স্বজনদিগের প্রতি অত্যাধিক অনুরাগী এবং তাহাদিগকে আমি অর্থ-সাহায্য করি। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য

৩. হডরত ওসমান ত্রিপলি অভিযানের সময় সেনাপতি ইবনে আবু সারাহ্‌কে বলেন যে, তুমি যদি ত্রিপলি জয় করিতে পারো, যুদ্ধ লব্ধ দ্রব্যাদির এক-পঞ্চমাংশ তোমাকে দান করিব। সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারেই হিসাব করিয়া তাঁহাকে এই অর্থ দান করা হয়।

www.pathagar.com

এই যে, আমি তাহাদিগকে ভালোবাসিলেও অপরকে ঘৃণা করি না বা অপরের অধিকার তাহাতে ক্ষুণ্ন হয় না। আত্মীয় হইলেও আমি তাহাদের উপর যথারীতি কর্তব্য চাপাইয়া দেই। তাহাদিগকে আমি যাহা দান করি, আমার নিজ সম্পত্তি হইতেই দান করি। বায়তুল-মাল-তহবিল হইতে আমি এক কপর্দকও গ্রহণ করি না। এ মাল আমার বা আমার আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে যায়েজ নয়। আপনারা জানেন, রাসূলুল্লাহ্, হযরত আবুবকর এবং হযরত ওমরের সময়েও আমি নিজের আয় হইতে বহু অর্থ দান করিয়াছি। আমার যৌবনকালে যখন আমার অর্থের প্রয়োজন ছিল বেশী, প্রয়োজন ছিল বেশী, তখনই আমি এই সব দান করিয়াছি, এখন যখন আমি আমার বংশের নির্দিষ্ট আয়ু-সীমায় পৌছিয়াছি, আমার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে এবং আমি আমার ধন-সম্পত্তি যাহা আছে তাহা আমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে দান করিয়া দিতেছি, তখনই অবিবেচক লোকেরা আমার বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি ও অন্যান্য দোষ আরোপ করিতেছে। আল্লাহ্‌র কসম, আমি কোনো দেশের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করি নাই। দেশবাসীর নিকট হইতে যাহাই আদায় করিয়াছি, সম্মতই দেশবাসীর কল্যাণে ব্যয় করিয়াছি। সমুদয় রাজস্বের এক-পঞ্চমাংশই বায়তুল-মাল তহবিলে আসে। ইহার মধ্য হইতে আমি নিজের জন্য এক কপর্দকও গ্রহণ করি না। এমন কি যাহা আমি খাই, তাহাও আমার নিজের উপার্জিত অর্থ হইতে খাই।[৪]

এই প্রকাশ্য ঘোষণা হইতেই হযরত ওসমানের চরিত্র-মাধুর্য প্রকাশ পাইতেছে। বায়তুলমালের অগাধ ধন-রাশির প্রতি তিনি ভুলিয়াও দিকপাত করেন নাই। এমন কি আইনানুসারে প্রাপ্য নিজের ভাতাও যিনি গ্রহণ করেন নাই, দীনহীন বেশে যিনি জীবন যাপন করিতেন, সেই নিঃস্বার্থ মানব-প্রেমিক খলিফাকেও বলা হয় কিনা তিনি ছিলেন, "অহঙ্কারী, অর্থলোলুপ এবং জাকজমকপ্রিয়!!" ('Vain, fond of money and splendour, -Von Kremer.)

আর একটি ঘটনাতেও হযরত ওসমানের চরিত্র-মাধুর্যের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। হযরত আবুবকর মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। খলিফা পদে কাহাকে মনোনীত করিয়া যাইবেন, সে সম্বন্ধে সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তিনি হযরত ওসমানকে নিজ কক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হযরত ওসমান আসিলে হযরত আবুবকর বলিলেনঃ আমি খলিফা মনোনয়ন করিয়া যাইব, তুমি লিখিয়া লও। হযরত ওসমান লিখিতে বসিলেন। দুই-একটি কথা বলিবার পরই হযরত আবুবকর অচেতন হইয়া পড়িলেন। খলিফা ইন্তেকাল করিতেছেন ভাবিয়া হযরত ওসমান তাড়াতাড়ি লিখিয়া ফেলিলেন ঃ "আমি হযরত ওমরকে খলিফা মনোনীত করিয়া গেলাম।" ইহার কিছুক্ষণ পরেই হযরত আবুবকরের আবার জ্ঞানসঞ্চার হইল। তিনি ওসমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কি লিখিয়াছো? ওসমান পড়িলেন ঃ "আমি খলিফা পদে হযরত ওমরকে মনোনীত করিয়া গেলাম।" শুনিয়া হযরত আবুবকর খুশি হইলেন এবং বলিলেন ঃ "আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন।" অতঃপর এই ঘোষণাই বাহিরে

৪. Omar the Great, by Shibli Nomani, P. 94
উদ্ধৃতাংশ তিনি তাবারী হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

www.pathagar.com

অপেক্ষমান জনতাকে শুনাইয়া দেওয়া হইল। জনতা একবাক্যে তাহা সমর্থন করিল।[৫]

এই নিভৃত নীরব মুহূর্তটিতে হযরত ওসমানের চরিত্রের যে উদার মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সত্যই অনবদ্য।

অপদার্থ এবং দুর্বলই বা তিনি কেমন করিয়া ছিলেন? যাঁহার সময়ে রাজ্যের আয়তন বহুগুণে বাড়িয়া গেল, বহু নূতন দেশ বিজিত হইল, রাজস্ব বৃদ্ধি পাইল, বহু জনকল্যাণ ও দেশোন্নতি যাঁহার দ্বারা সাধিত হইল–পাক-কুরআনকে যিনি চিরদিনের মতো নির্ভুল থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া গেলেন, মুসলিম নৌ-বহরের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, তিনি হইলেন "অপদার্থ"। দুর্বল ও অক্ষম তো দূরের কথা, অশীতিবর্ষ বয়স্ক হযরত ওসমানের শাসনই ছিল সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ, সার্থক ও সুন্দর। অত বড় গণতান্ত্রিক শাসনকর্তা আর দেখা যায় না। কমিউনিজম আজ পর্যন্ত যে পর্যায়ে পৌছিতে পারে নাই, হযরত ওসমান চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বে সেই পর্যায়ে পৌছিয়া গিয়াছিলেন। বিকৃত কমিউনিজম নয়, খাঁটি ইসলামী কমিউনিজমের তিনি ছিলেন এক মূর্তিমান আদর্শ। পুঁজিবাদ ও সমূহবাদের কি করিয়া সমন্বয় হইতে পারে, তিনি তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। সঞ্চয় ও বিতরণ তিনি এক সঙ্গে করিয়াছেন। দুর্বৃত্তেরা হযরত ওসমানকে হত্যা করিয়া বায়তুল-মাল ধনাগার লুণ্ঠন করিতে গিয়া নিরাশ হইয়া দেখিল বায়তুল-মাল-ফাণ্ডের প্রায় সমুদয় অর্থ প্রজাদের কল্যাণে ব্যয় করা হইয়া গিয়াছে। নিজে খলিফা হইয়াও হযরত ওসমান নিজেকে স্টেটের একজন সাধারণ নাগরিক ছাড়া অন্য কিছু মনে করিতেন না। গভর্নরদের বিরুদ্ধে জনসাধারণ যে কোনো ছোট-খাট ব্যাপারেও খলিফার নিকট নালিশ করিতে পারিত। জনপ্রিয়তা হারাইলে কাহারও রক্ষা ছিল না। খলিফা নিজের রুটি নিজেই উপার্জন করিতেন। "No work, no bread" সোভিয়েট রাশিয়ার এই গাল-ভরা বুলি শুধু কিতাবেই আছে, গোহালে নাই। হযরত ওসমান সেই নিজের রুটি নিজেই কামাই করিয়া খাইতেন। লেনিন কি তাহা করিতেন? স্ট্যালিন কি তাহা করিয়াছেন? হযরত ওসমান জনসাধারণকে যে নাগরিক অধিকার দিয়াছিলেন, সোভিয়েট রাশিয়ায় কি তাহা মিলে? "State must wither away" স্টেট উড়িয়া যাইবে–এই নীতি সোভিয়েট রাশিয়ার চিরদিন আকাশ-কুসুমই হইয়া থাকিবে; কিন্তু হযরত ওসমান কার্যতঃ এই সব আদর্শের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। এমন কি যে আমীর আলী বলিয়াছেন যে, হযরত ওসমানের খলিফা নির্বাচন ইসলামের ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছিল, সেই আমীর আলীও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন ঃ

"The incursions of the Turks in Trasoxiana led to the conquest of Balkh. Similarly were Hirat, Kabul and Ghazni conquered. The risings in south Persia led to the subjugation of Kerman and Sistan. In the settlement of the new acquisitions, the policy of Omar was followed. No sooner were these countries conquered than effective measures were set on foot for the development of their material resoureces. Water-

৫.Early Caliphate , Mahammad Ali-P. 235

www.pathagar.com

courses were dug, roads made, fruit trees planted and security given to trade by the establishment of regular police organisation. In Africa, Tripoli and Barca, and in the mediterranean Cyprus, were conquered. A large fleet sent by the Romans to re-conquer Egypt was destroyed off Alexandria." History of the Saracens : p. 47

কি করিয়া তবে তিনি 'দুর্বল' বা 'অক্ষম' হইলেন?

হযরত ওসমানের রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে মৌলানা মুহাম্মদ আলী বলিয়াছেন ঃ

"যে কোনো গভর্নর বা উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীর বিরুদ্ধে জনসাধারণ খলিফার নিকট নালিশ করিতে পারিত। সমস্ত বিভাগই হযরত ওমরের আদর্শে শাসিত হইত। রাজস্ব বিভাগের অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছিল। একমাত্র মিসরের রাজস্বের পরিমাণই ২০ লক্ষ হইতে ৪০ লক্ষ মুদ্রায় পরিণত হইয়াছিল। আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাতা দান এবং সাহায্যের পরিমাণও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বহু নূতন ইমারত, নূতন রাস্তাঘাট, সেতু, মসজিদ, সরাইখানা ইত্যাদি নির্মিত হইয়াছিল। মদিনা নগরীকে বন্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটি বিরাট বাঁধ নির্মিত হইয়াছিল। মদিনার মসজিদ বৃহদাকারে নির্মিত হইয়াছিল।"

(Early Caliphate : P. 258)

হযরত ওসমানের ইহাই হইল সত্য পরিচয়। রাসূলুল্লাহ বলিয়া গিয়াছেন ঃ হযরত ওসমানকে একমাত্র হযরত ইব্রাহিম বা স্বয়ং তাঁহার সহিতই তুলনা করা চলে। সত্যিই কি তাহা নহে! জীবনের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত মহানবীর আদর্শকেই তিনি অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। এ জীবনের প্রারম্ভ যেমন সুন্দর, অবসানও তেমনি সুন্দর। এ যেন এক মহাকাব্যের বেদনা-সুন্দর অবসান। হালকা কোনো সুর নাই, গভীর সুরের খেলা। এক নিমেষে ইহাকে বুঝা যায় না, যুগ যুগ ধরিয়া ভাবিতে হয়। মনে হয় হযরত ওসমানের মৃত্যু তাঁহার জীবনের চেয়েও মধুর। হযরত ওমর, হযরত ওসমান এবং হযরত আলী তিনজনই আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন, কিন্তু হযরত ওসমানের মৃত্যু-বরণ ছিল অপর দুইজন অপেক্ষা অধিকতর গৌরবের। হযরত ওমর বা হযরত আলি অতর্কিতে নিহত হইয়াছেন, কিন্তু হযরত ওসমান জানিয়া শুনিয়া স্বজ্ঞানে আততায়ীদিগের হস্তে শহীদ হইয়াছেন। ইচ্ছা করিলে তিনি বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে পারিতেন, কিন্তু পবিত্র মদিনার মাটিতে তিনি রক্তপাত ঘটাইবেন না এবং কোনো মুসলমানকে তিনি বধ করিবেন না–ইহাই ছিল তাঁহার দৃঢ়পণ। দেশ-রক্ষা এবং দেশ-জয়ের জন্য যিনি অসংখ্য সৈন্য পাঠাইয়াছেন এবং যুবকের মতো মনোবল দেখাইয়াছেন, আত্মরক্ষার জন্য সেই খলিফাই একটি সৈন্যও মোতায়েন করিলেন না! মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও তিনি জীবন রক্ষায় উদাসীন। মুয়াবিয়া বিপদ বুঝিতে পারিয়া নিজের কাছে খলিফাকে লইয়া যাইতে চাহিলেন, তাহাও তিনি অস্বীকার করিলেন। একদল সৈন্য পাঠাইতে চাহিলেন, তাহাতেও তিনি রাজী হইলেন না। সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন ঃ আল্লাহ্ আমার রক্ষক, আর কাহারও সাহায্য আমি চাই না। সমস্ত ধন-সম্পদ, সমস্ত সৈন্যবল, সমস্ত আত্মীয়-স্বজন, সমস্ত বন্ধু-বান্ধব দুয়ারের

www.pathagar.com

বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল, খলিফা আপন ঘরে আততায়ীর হস্তে নীরবে আত্মদান করিলেন। শুধু পাক-কুরআন রহিল সেই মৃত্যুর সাক্ষী। প্রাণান্তে জ্যোতি-দীপ্ত মুখে কুরআন বুকে লইয়া খলিফা চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

বিদ্রোহের কারণ

একথা তাহা হইলে এখন নিশ্চয়ই বলা যায় যে, স্বজন-প্রীতি এবং অক্ষমতার কারণেই যে হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা নহে। খলিফার হত্যার জন্য খলিফা দায়ী নহেন—দায়ী স্বয়ং বিদ্রোহীরা, দায়ী সেই জামানার অসংযত মানব-প্রকৃতি ও অশান্ত পরিবেশ। ষড়যন্ত্রকারীদের সম্মুখে কোনো ন্যায়-নীতি বা আদর্শ ছিল না! দুর্ধর্ষ আরবদিগের উৎকট দলীয় মনোবৃত্তিই এই বিদ্রোহের কারণ। অসভ্য বন্য-প্রকৃতি হইতে মানুষের মন সবে মাত্র আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল, ঠিক এই সময়ে গণতান্ত্রিক খলিফাদের অভ্যুদয়। কাজেই লোকে তাঁহাদের উচ্চ আদর্শ এবং সাম্যবাদের মর্যাদা দিতে পারে নাই। যে দেশে শুধু কথায় কথায় মারামারি, রক্তারক্তি; কবিলাতে কবিলাতে যেখানে অনবরত যুদ্ধ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা, গোত্রগত বিবাদ-বিসম্বাদের যেখানে অন্ত ছিল না, নৈতিক চরিত্র যাহাদের তখনও গঠিত হয় নাই, তাহাদের মধ্যে হযরত ওমর বা হযরত ওসমানের সময়েও তাহাই হইয়াছিল। যাহাই তিনি করিতে গিয়াছেন, একদল লোক তাহাই অন্যায় ভাবিয়াছে। ভালো কাজ করিলেই যে সর্বসাধারণের চিত্ত জয় করা যায়, তাহাও তো নহে। ভালো কাজ করিতে গেলেও অনেকের শত্রু হইতে হয়। হযরত ওসমান জুয়াখেলা তুলিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেও একদল লোক তাঁহাকে দেখিতে পারিত না। ভুল কুরআন জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন; তাহাতেও একদল লোকের তিনি বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। আবুজার গিফারীকে নির্বাসন দিয়াছিলেন, তাহাও অনেকের ভালো লাগে নাই। রাজকর্মচারীদের নিয়োগের বেলাও ঠিক এইরূপই হইয়াছিল। নিযুক্ত কর্মচারীরা উপযুক্ত হইলেও একদল লোক সব সময়েই খলিফাকে সমালোচনা করিয়াছে। সবাইকে কি কেহ কখনো সন্তুষ্ট করিতে পারে? কাজেই খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখিয়া বা তাঁহার হত্যা দেখিয়া তাঁহার বিচার করিলে চলিবে না। ফল দেখিয়া কারণ অনুমান করা সঙ্গত হইবে না। সেরূপ করিলে হযরত ওমর ও হযরত আলিও মুক্তি পাইবেন না। হযরত ওমর তো আর 'স্বজন প্রিয়' ছিলেন না। অতবড় আদর্শ গণদরদী খলিফাও কেন নিহত হইলেন? তারপর যে আলির জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা হযরত ওসমানকে হত্যা করিল, সেই আলিও কিছু দিনের মধ্যেই গুপ্তঘাতকের হস্তে কেন নিহত হইলেন? কোন্ নীতি বা আদর্শের প্রেরণায় পরপর তিনজন খলিফা নিহত হইলেন, তাহা কেহ বলিয়া দিতে পারে কি? উচ্ছৃঙ্খল মনোবিকৃতির ফলেই এই সব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল।

স্বজন-প্রীতির অভিযোগ যদি হযরত ওসমানকেই দেওয়া হয়, তবে হযরত আলিও সেই দোষে দুষ্ট। হযরত আলিও তো নিজের আত্মীয়-স্বজনকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে তো স্বয়ং রাসূলুল্লাহও এ দোষ হইতে মুক্তি পান না! মৃত্যুকালে তিনি আপন শ্বশুর হযরত আবুবকরকে কেন খলিফা নিয়োগের ইঙ্গিত দিয়া গেলেন? হযরত আবুবকর,

www.pathagar.com

হযরত ওসমান ও হযরত আলি প্রত্যেকেই তো রাসূলুল্লাহর আত্মীয়! ইঁহাদের মধ্যেই বা কেন খোলাফায়ে রাশেদীন সীমাবদ্ধ রহিল? এও তো এক মস্ত বড় স্বজন প্রীতি!

বস্তুতঃ হযরত ওসমানের সত্যিকার ইতিহাস এখনো লিখিত হয় নাই। উমাইয়া ও আব্বসীয়দের দ্বেষ-হিংসার ফলে এই যুগের ইতিহাস বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। আব্বাসীয়দের হস্তে যখন শাসন-শক্তি আসিল, তখন তাহারা উমাইয়া বংশের ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়া দিল। ইহাই হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে অভিযোগের মূল কথা।

William Muir তাঁহার "Annals of the Early Caliphate গ্রন্থে বলিয়াছেন ঃ-

"Most traditions attribute the writing and sealing of the order to Marwan, the Caliph's unpopular cousin who, throughout the narration receives constant abuse as the author of Osman's troubles; but all this is manifestly tinged by Abbaside and anti-Umayid prejudices.-"

অর্থাৎ ঃ অধিকাংশ বিবরণেই প্রকাশ যে, জাল চিঠিখানির লেখা এবং সীল-মোহর করা-মারোয়ানের কাজ। সমস্ত বিবরণীতে তাই তাহাকে গালাগালি দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে হযরত ওসমানের সমস্ত বিপদের মূলে ছিল এই মারোয়ান। কিন্তু এই সব কথা উমাইয়াদের প্রতি আব্বাসীয়দের বিদ্বেষের রঙেই অনুরঞ্জিত।

তিনি আরও এক স্থানে বলিয়াছেন ঃ-

"According to some authorities, Osman presented the royal share of they looty as a free gift to Marwan, his prime minister, and they add that this was one of the grounds of Osman's impeachment. But it reads like a party calumny.

Ibid : P. 300

অর্থাৎ ঃ "কেহ্ কেহ্ বলেন, ওসমান যুদ্ধ-লব্ধ মালের রাজকীয় অংশ তাঁহার মন্ত্রী মারোয়ানকে উপহার স্বরূপ দান করেন এবং বলেন এই কারণেই হযরত ওসমানকে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ইহা দলীয় নিন্দা-গালাগালি বলিয়াই মনে হয়।"

হযরত ওসমানের প্রকৃত ইতিহাস তাই অসত্যের আবর্জনায় চাপা পড়িয়া আছে। এই মহান খলিফার ইতিহাস এখন পুনর্লিখিত হওয়া উচিত।

নওবাহার-১৯৫১

www.pathagar.com

ইসলাম ও সঙ্গীত

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ,-

ইসলামে সঙ্গীত যে বিল্‌কুল্ হারাম–এতকাল এই কথাই শুনে আসছি। অনেক স্থলে হাতে-কলমেও এর পরিচয় পেয়েছি। আপনাদের এখানে গান গাইলে আমি সমাদার লাভ করি বটে, কিন্তু তাই বলে মনে করবেন না যে, সর্বত্রই একরকম। অনেক স্থলে গান গেয়ে আমাকে বেশ অপ্রস্তুতও হতে হয়েছে। তাই ঠেকে শিখে আত্মরক্ষার জন্য একটু প্রস্তুত হয়েছি। কোন্ অস্ত্র দিয়ে নিজেকে রক্ষা করবো, তাই আজ আপনাদেরকে খুলে বল্‌ছি।

শাস্ত্রের দোহাই দিয়েই যখন সঙ্গীতকে নিষিদ্ধ বলা হয়, তখন সেই শাস্ত্র সম্বন্ধেই প্রথমে আলোচনা করা যাক্।

কোরআন ও হাদিস (অবশ্য সহী হাদিস) আমাদের মাথার মনি। তাদের বিধি-নিষেধকে উল্লংঘন করবার ঔদ্ধত্য আমার নাই। কোরআন ও হাদিসে বাস্তবিকই যদি থাকে যে, সঙ্গীত একেবারেই হারাম, তবে তা হারামই। এ সম্বন্ধে আর কোনো দ্বিরুক্তি নাই। কিন্তু আমরা পরিষ্কার করে জান্‌তে চাই–কোরআন-হাদিসে সেরূপ নিষেধাজ্ঞা আছে কিনা। যাঁরা সঙ্গীতকে হারাম বলে ফাতোয়া দেন, এ প্রমাণ-ভার তাঁদের উপর। পরিষ্কার করে জানতে হারাম বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। তাহ্‌লেই সব গণ্ডগোল চুকে গেল। হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবকালে লাম্পট্য, মদ্যপান প্রভৃতি দুর্নীতির সঙ্গে সঙ্গীতও তো জড়িয়ে ছিল। সুতরাং সঙ্গীত সর্ব অবস্থায় নিষিদ্ধ হলে, সে সম্বন্ধে কোরআন শরীফে কোনও আয়াত থাকা খুবই স্বাভাবিক–যেমন নাকি অন্যান্য দুর্নীতি সম্বন্ধে আছে। আমরা চাই সেই আয়াত ও সেই হাদিস।

কোরআন-হাদিস সম্বন্ধে আমার যে সামান্য জ্ঞান আছে, তাতে তো মনে হয়–কোরআন-হাদিসে ওরূপ কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই। কোরআন শরীফে তো নাই-ই, তবে কোনো আয়াত বিশেষকে আনুমানিক ও দূরাগত একটি অর্থ দিয়ে বিপক্ষ পক্ষ তাঁদের উদ্দেশ্য হাসিল করে থাকেন। হাদিস থেকেও তাঁরা ২/১ টি হাদিস উদ্ধৃত করেন বটে, কিন্তু তাও ততো সুস্পষ্ট নয়। সঙ্গীতের বিপক্ষে তাঁরা যেরূপ ২/১টি হাদিস দেখিয়ে থাকেন, আমরাও স্বপক্ষে সেরূপ দু'একটি হাদিস দেখাতে পারি। দৃষ্টান্তস্বরূপ দু'টি হাদিসের উল্লেখ এখানে করছিঃ

এক হাবশী বালিকা একদিন বিবি আয়েশার গৃহে গান গাচ্ছিল হযরত রসুলে করিম বিবি আয়েশার সঙ্গে সেই গান শুনছিলেন। এমন সময় হযরত ওমর এসে গৃহ-প্রবেশের এজাজত চেয়ে দ্বারে দাঁড়িয়ে রইলেন। হযরত ওমর ছিলেন 'বাগরেশে' পুরুষ। তাঁর নামে সকলের প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হতো। হাবশী বালিকা ওমরের কথা শুনেই পালিয়ে গেল। ইত্যবসরে হযরত ওমর গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি দেখলেন হযরত রসুল ও বিবি আয়েশা হযরত ওমরকে লক্ষ্য করে মৃদু মৃদু হাসছেন। তা দেখে হযরত ওমর

www.pathagar.com

তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন হযরত রসুল বললেন–একটা হাবশী বালিকা গান করছিল, আমরা শুনছিলাম। কিন্তু তোমার আসার কথা শুনেই সে পালিয়েছে। তা শুনে হযরত ওমর বললেন–"রাসূলুল্লাহ্, আপনি যা শুনতে পারছেন, আমি তা পারবো না? কই? মেয়েটি কোথায়? ডাকুন তাকে, সে গান করুক।" তখন মেয়েটিকে আবার ডাকা হলো এবং তিনজনে বসে তার গান শুনলেন।

আর একবার একটি আনসার জাতীয়া মেয়ের বিয়ে হচ্ছিল। হযরত রসুল সেখানে উপস্থিত হয়ে সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন– "বিবাহে তোমরা কোনো আমোদ করছো না? বাজাও, দফ্ বাজাও; আনসারগণ দফ্ বাজানো খুব ভালোবাসে।

এ রকম আরও দু-একটা হাদিসের কথা উল্লেখ করা যায়।

এর থেকেই পরিষ্কার বুঝা যায়–সঙ্গীতে–অন্ততঃ বিশুদ্ধ সঙ্গীতে হযরত মুহম্মদের কোনোই আপত্তি ছিল না।

সঙ্গীত যে হযরত মুহম্মদের পূর্ববর্তী পয়গম্বরদিগের সময়েও প্রচলিত ছিল, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত দাউদ তাঁর সুমধুর কণ্ঠ-সঙ্গীতের জন্য (লেহানে দাউদী) চির-প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। হযরত মূসা যখন বনি-ইসরাইলদেরকে সঙ্গে নিয়ে নীল-নদ পার হয়ে যান, তখন বনি-ইসরাইল রমণীরা ওপারের তীরে উঠে আনন্দে অধীর হয়ে দফ্ বাজিয়ে গান করতে থাকে। হযরতের সময়েও আরবে সঙ্গীতের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। তাঁর মৃত্যুর পরও সঙ্গীতের উৎস কখনো নিরুদ্ধ হয়ে যায়নি। খলিফা হযরত ওমর নিজে সঙ্গীত রচনা করতেন। তিনিই সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ 'ইবনে সুরঈদের' উৎসাহদাতা ছিলেন। খলিফা হযরত আলি ও হযরত মুয়াবিয়া উভয়েই সঙ্গীতের আলোচনা করতেন। খলিফা অলিদ একজন প্রসিদ্ধ বীণা-বাদক ছিলেন। খলিফা আবু আব্বাস এবং মনসুর সঙ্গীত ও অন্যান্য ললিত-কলার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য চির প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। খলিফা হারুন-আর্-রশিদের নাম না বললেও চলতে পারে। বস্তুতঃ খলিফাদের সময়ে বাগ্দাদ, পারশ্য, কর্ডোভা ও গ্রাণাডাতে সঙ্গীতের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। ইতিহাস তার সাক্ষী।

অন্যদের কথা দূরে থাক, যাঁরা খলিফাতুল্ মু'মেনিন্, তাঁদের সম্বন্ধেই এই কথা!

তারপর ভারতবর্ষ। সুদীর্ঘ মুসলিম শাসনে ভারতীয় সঙ্গীত মুসলমানদিগের হাতে নবজীবন লাভ করেছে। যদি বলি যে ভারতীয় সঙ্গীতের অর্থ মুসলিম-সঙ্গীত, তাতেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতীয় সঙ্গীতের ৪টি বড় বিভাগ আছে ঃ– (১) ধ্রুপদ, (২) খেয়াল, (৩) ঠুংরি, (৪) টপ্পা। আপনারা শুনে হয়তো স্তম্ভিত হবেন যে, একমাত্র ধ্রুপদ ছাড়া অন্য ৩টি বিভাগই মুসলামনদের সৃষ্টি। মুসলমানেরাই ভারতীয় সঙ্গীতের মুক্তিসাধন করেছে। আর্য-ঋষিরা সঙ্গীতকে ধ্রুপদের কারাকক্ষে বন্ধ করে তাকে দম আটকে মেরে ফেলবার কায়দা করেছিলেন, এমন সময় মুসলমান এসে সেই কারার দুয়ার ভেঙে সঙ্গীতকে বাইরে নিয়ে এসে আল্কিমিয়ার যাদুস্পর্শ তার অসাড় অঙ্গে বুলিয়ে দিলো! অমনি খেয়াল-রূপিণী এক বিচিত্র মূর্তির আবির্ভাব হলো। সম্ভবতঃ এটা ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা। সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজির সভাকবি ও সভাগায়ক আমির খসরুই খেয়াল গানের স্রষ্টা। খেয়াল গানের উৎকর্ষ যখন চরমে পৌঁছায়, তখন পাঞ্জাবের শোরি মিয়া টপ্পা গানের সৃষ্টি করেন।

www.pathagar.com

মুসলমান আমলে আমির খসরু, তানসেন, ধোধি খাঁ, সূরষ খাঁ, চাঁদ খাঁ, শোভন খাঁ, শোটি, হম্‌দম্‌, মৌলাদাদ, ইলিয়াস, গোলাম নবী, সনদ,কদর, খুশাল খাঁ, নবাব ওয়াজেদ আলি প্রভৃতি অসংখ্য ক্ষণজন্মা সঙ্গীত-স্রষ্টা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় মুসলমানের এই অধঃপতনের যুগেও আর কিছুতে না হোক-অন্ততঃ সঙ্গীতে মুসলমান সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। আল্লাবন্দে খাঁ, নাসিরুদ্দীন খাঁ, আব্দুল করিম খাঁ, হাফিজ আলি খাঁ, আলাউদ্দীন খাঁ (বাঙালী) প্রভৃতি অসংখ্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুর-শিল্পী এখনো সগৌরবে ভারতে বিদ্যমান।

শুধু গায়ক হিসাবে নয়–রাগ-রাগিণী হিসাবেও সঙ্গীতে মুসলমানের দান অপরিসীম। বহু রাগ-রাগিণী মুসলমান সুর-শিল্পীরা সৃষ্টি করে গেছেন। আড়ানো, মিয়াঁ সারঙ্গ, মিয়াঁ মল্লার, মিয়াঁকি জয়জয়ন্তী, হোসেনী কানাড়া, দরবারী কানাড়া, দরবারী তোড়ী, বাহাদুরী তোড়ী, জৌনপুরী তোড়ী, বাহার ইত্যাদি বহু নূতন রাগ-রাগিণী মুসলমানদের হাতে জন্ম লাভ করেছে।

সুতরাং স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন–সঙ্গীতকে এক শ্রেণীর মৌলবী সাহেবরা নিষিদ্ধ বলে ফতোয়া দিলেও ইসলাম কিন্তু সঙ্গীতের সঙ্গে চিরবিজড়িত। মুসলমানের কোরআন-হাদিস এবং সুদীর্ঘ ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতিহাসই তার প্রমাণ। আশ্চর্যের বিষয়–খোদা যেখানে নীরব, রসুল যেখানে নীরব, খলিফাতুল মুমেনিনরা যেখানে প্রশ্রয়দাতা, সেখানে আজ তেরো শ' বছর পরে এতদ্দেশীয় এক শ্রেণীর মৌলবীরা পঞ্চমুখ হয়ে ফতোয়া দিচ্ছেন যে– গান বিলকুল হারাম। যেন সঙ্গীতের এই সমস্যা স্বয়ং আল্লা, রসুল বা খলীফাদের জানা ছিল না। যেন মুসলমান আমলের শরিয়ত-পন্থী বড় বড় বাদশা, কাজী, মুফতী প্রভৃতি কারও মনেই এ সমস্যার উদয় হয়নি, অথবা তাঁরা যেন কেউ-ই এ সমস্যা সমাধান করবার যোগ্যতা রাখতেন না।

উক্ত মৌলবী সাহেবরা সঙ্গীত সম্বন্ধে যে আপত্তি উত্থাপন করেন, তা এক হাস্যকর ব্যাপার। কেউ আমাকে বলেছিলেন–আপনার যে গলা কাঁপিয়ে রাগ–রাগিণী বার করেন, তার জন্যই সঙ্গীত হারাম হয়ে যায়। নতুবা কোরআন শরীফের মতো সুর করে কোনো কিছু পড়লে কিছুই দোষ হয় না। এ কথার কোনোই মূল্য নাই। রাগ-রাগিণী, আর যাকে বলে 'খোশ এল্‌হান'–এরা উভয়ই একই মার পেটের সন্তান,–গলা জড়াজড়ি করে আছে। ওদের মধ্যে কোনো সীমারেখা নাই। তাছাড়া রাগ-রাগিণীই বলুন আর 'এল্‌হানই' বলুন– কোনো ধ্বনিই সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি–এই সুর সপ্তকের বাইরে নয়। শুধু Permutation ও Combination–এর যা তফাৎ! রাগ-রাগিণীও যেমন হারমোনিয়ামে বাজিয়ে দেওয়া যায়, কোরআন পাঠও তেমনি হারমোনিয়ামে বাজানো যায়। মানব কণ্ঠের যে-সুর বাঁধা আছে, তার বাইরে কোনো কথা নাই। আর এক মৌলবী সাহেব আমাকে বলেছিলেন–

"আপনারা যে তাল দিয়ে গান করেন, সেই তালই হচ্ছে হারাম।" ঐ কথাও মূল্যহীন। তাল তো অন্য কিছু নয়, শুধু সময়ের সমতা রক্ষা করা মাত্র।

গান যদি যায়েজ হয়, তবে তাল হারাম হবে কেন? তাল তো মানুষের বহু কার্যের মধ্যেই বিদ্যমান। প্রতিদিন যে দরুদ শরীফ পাঠ করা হয়, তার মধ্যেও তো তাল রাখে।

www.pathagar.com

বিশ্ব-প্রকৃতিই তো ছন্দ-তালে পরিপূর্ণ। ঋতুচক্রের আবর্তনের নৃত্যে কোনো দিন তো তাল কাটে না। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত–সবাই তো তালে তালে নেচে যায়। গাছে গাছে ফুল ফোটে, ফল ধরে–সবই তালে তালে। আগে-পিছে হয়ে তারা কেউ আসে না। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র তালে তালেই আসে, তালে তালেই চলে যায়। আমাদের এই দেহের মধ্যেও তো তালের লীলা-খেলা চলেছে। ধমণীতে যে রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, তার মধ্যে চমৎকার তাল রয়েছে। কি সুন্দর তালে তালেই না নাড়ি আমাদের স্পন্দিত হচ্ছে। কি সুন্দর ছন্দ-তালেই না ফুসফুস নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছে। বস্তুতঃ এই তাল রক্ষা করে চলাই হচ্ছে স্বভাবধর্ম। তাল যখন কেটে যায়, তখনই বিপদ ঘটে। নাড়ীর গতি অসম হয়। তখনই বুঝতে হবে–একটা কিছু বিমার হয়েছে। বস্তুতঃ তাল কেটে গেলে সৃষ্টির সব কিছু বেসুরো ঠেক্‌তো, সৃষ্টি অচল হতো।

এইবার সাধারণভাবে একটু আলোচনা করা যাক্। সঙ্গীত মানুষের এত প্রিয় কেন? হাজার হাজার মৌলবীর লক্ষ লক্ষ ফতোয়াও মানুষকে সঙ্গীত থেকে বিরত রাখতে পারে না কেন? তার কারণ–সঙ্গীতের সঙ্গে মানব-মনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। এই নিখিল সৃষ্টির মূলে আমি শুধু দুটি উপাদানই লক্ষ্য করি– সে হচ্ছে সুর আর রূপ। সুর আর রূপের ভিতরেই সৃষ্টি ডুবে আছে। আকাশে তাকাও, পাতালে তাকাও–সর্বত্র রূপের লীলাখেলা। পথে-প্রান্তরে অন্তরে-বাহিরে যে দিকে যখনই কান দাও, সর্বত্র সুরের লীলা-তরঙ্গ। বিশ্ব-বীণার তারে তারে নিশি-দিন সুর ধ্বনিত হচ্ছে। সেই Music of spheres যাদের কান আছে, তারাই শুনতে পায়।

এই যে সুর আর রূপের কথা বলছি, তার উপাদান সৃষ্টির মধ্যে যেমন লুকিয়ে আছে, মানুষের মনের মধ্যেও তেমনি লুকিয়ে আছে। খোদাতালা মানুষকে সুর আর রূপ দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। সুর আর রূপে তাই মানব-হৃদয় এমন করে সাড়া দেয়। কাজেই ফতোয়া যদি দিতে হয়, তবে সে ফতোয়া মানুষের উপর নয়–খোদাতালার উপর দিতে হবে। খোদাতালাকে বলতে হবে–হে খোদা, তুমি মানুষকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করো, সে ভালো, কিন্তু দোহাই তোমার,–সেই মাটির ভিতর তোমার সুরের সুধা আর রূপের রং মিশিয়ে দিও না! এ না হলে এই দুনিয়ায় ফতোয়া দিয়ে মানুষকে আমরা কাবু করতে পারি না!

মানব-মনে সুর আর রূপের উপাদান যে আছে, তা একটা প্রবাদ বাক্যেও পরিষ্কার বুঝা যায়। আদমের দেহাভ্যন্তরে (কল্‌বের মধ্যে) যখন খোদাতালা রুহ (আত্মা) প্রবিষ্ট করান, তখন রুহ্ সেখানে থাকতে চাইলো না,–ছট্‌ফট্ করে বেরিয়ে এলো। তখন খোদাতালা ফেরেশ্‌তাদিগকে বললেন–সেই কল্‌বের কুঠরিতে আলো দিতে। অপূর্ব রূপচ্ছটায় কল্‌ব্ আলোকিত হয়ে গেল। তখন রুহ্‌কে পুনঃপ্রবিষ্ট করানো হলো। এবারও রুহ্ থাকতে চাইলো না। তখন খোদাতালার হুকুম হলো–কল্‌বের চারিদিকে সুমধুর বাদ্যধ্বনি করো। এইবার রুহ্ শান্ত হয়ে আদমের দেহে রয়ে গেল।

এই উপাখ্যানের মূলে গভীর সত্য নিহিত আছে। বাস্তবিকই সুর আর নূর ছাড়া সৃষ্টি অচল হতো। এই যে বিশ্ব-প্রকৃতি নিতি-নবভাবে এমন রূপ-সুষমায় প্রকাশ পাচ্ছে, এই যে ফুল ফুটছে, চাঁদ হাসছে–দিকে দিকে, লোকে-লোকে এই যে সুমধুর সঙ্গীত-ধ্বনি

www.pathagar.com

উত্থিত হচ্ছে, এ একবারে নিরর্থক নয়। বিরাট বিশ্বের সমবেত আত্মাকে (রুহ্) মশ্‌গুল করে রাখবার জন্যই খোদাতালার এই বিপুল আয়োজন; বিশ্বের বিরহী আত্মা (রুহ্) এই পরের ঘরে থাকতে চায় না, বিচ্ছেদ-বেদনায় বেরিয়ে যেতে চায়, তাই খোদাতালা তাঁর রূপ ও তাঁর সুর দিয়ে তাকে শান্ত করলেন। সুর আর রূপের মধ্যে আমাদের আত্মা তার পরমাত্মীয়ের পুলক-পরশ অনুভব করে বলেই যা কিছু সান্ত্বনা। বিরহী আত্মা তার প্রিয়তমের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কতো দূরে এসে পড়েছে; এ যে অ-জানা অ-চেনা দেশ; এখানে সে নিতান্ত নিঃসঙ্গ, তাই সে তার প্রিয়তমের খোঁজে ব্যাকুল। প্রিয়তমের দেখা সে পায় না, শুধু পায় একটু আভাস-একটু চরণধ্বনি শুধু দেখে তার রূপের ছটা, শুধু শোনে তার নুপুর-গুঞ্জন! এই রূপের ছটা আর গুঞ্জন-গীতিই তাকে যেন পথের সন্ধান বলে দেয়, যেন বলে-"এই পথ দিয়ে উঠে এসো, আমার সন্ধান পাবে।" যে মানুষের অন্তর এই দু'টি পথের ইঙ্গিতকেই অস্বীকার করে, তার আবার কিসের বিরহ, কিসের কান্না, কিসের ব্যাকুলতা, প্রিয়তমের সন্ধান পাবার তার কোনো ভরসা নাই। Shakespeare এই রকম লোক সম্বন্ধেই বলেছেন-তারা 'fit for treason and murder.'খোদাতালার এই সঙ্গীত-জলসা আর এই রূপের মেলা তাদের কাছেই শুধু ব্যর্থ।

মানুষের জীবনে ললিত-কলার প্রয়োজন আছে। যে জাতীয় উন্নতির দোহাই দিয়ে সঙ্গীত ও অন্যান্য কলা-বিদ্যাকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়, সেই জাতীয় উন্নতির জন্যও এর অপরিহার্য দরকার। সৌন্দর্য-পিপাসা মানুষের মনকে সুন্দর করে, অসুন্দরকে ঘৃণা করতে শিখায়। যার মনে সৌন্দর্য্যবোধ জন্মেছে, সে ভিতরে বাহিরে কোনো দিক দিয়েই অসুন্দরের সঙ্গে মিতালি করতে পারে না; তাজমহলের সৌন্দর্য্য যদি আমায় পাগল করে তোলে, তবে কুঁড়ে ঘরে নোংরা জীবন যাপন করতে আমর সাধ যায় না। একটা অভাবের তীব্র অনুভূতি সারা চিত্তকে চঞ্চল করে তোলে। আজ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রতি কার্যে আমরা অসুন্দরকে নিয়ে ঘর করছি। আমাদের যা আছে তাতেই আমরা সন্তুষ্ট হতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। সৌন্দর্যবোধের অভাবই এর মূল কারণ। অসুন্দরকে জয় করি আমরা সুন্দর হবো-এই আগ্রহ আজ আমাদের নেই। আমাদের জীবনে সৌন্দর্য ও সুর নেই-উচ্ছৃঙ্খল, এলোমেলো জীবন আমরা যাপন করছি। তার মধ্যে কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলা বা তাল নেই। কাজেই সুর আর রূপের আমাদের এত দরকার। আজ যদি আমরা ললিত-কলার অনুরাগী হই, তবে আমরা ধর্মে-কর্মে, ভিতরে-বাহিরে সব দিক দিয়েই সুন্দর হতে পারবো।

অবশ্য একটা কথা আছে। মৌলবী সাহেবরা সঙ্গীতকে যে দু'চোখ পেতে দেখতে পারেন না, তার যে একবারেই কোনো কারণ নেই, তাও মনে করবেন না। সঙ্গীত বলেই যে সঙ্গীত হারাম তাও যেমন নয়, আবার সঙ্গীত বলেই যে সঙ্গীত হালাল, তাও তেমনি নয়। প্রত্যেক জিনিসেরই ভালো-মন্দ আছে। দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে সব জিনিসেরই বিচার করতে হয়। সঙ্গীত একটা তলোয়ার বিশেষ। যার হাতে যখন থাকে তার ইঙ্গিতেই চলে। ভালো লোকের হাতে থাকলো ভালো ফল হয়, মন্দ লোকের হাতে থাকলে মন্দ

www.pathagar.com

ফল হয়। সঙ্গীত এক দিকে যেমন মানবাত্মাকে শাস্ত্রের সকল সীমারেখা অতিক্রম করে অনন্ত ভাবরাজ্যে নিয়ে যেতে পারে, তেমনি আবার তাকে ধ্বংসের মুখেও ফেলে দিতে পারে। অবশ্য এ সঙ্গীতের দোষ নয়, এ সেই ব্যবহারকারীর দোষ। এমন যে হালাল জিনিস ভাত, তাও বিকৃত করে খেলে হারাম হয়ে যায়। কাজেই সর্বত্র আমাদের বিচার-বুদ্ধির দরকার। যে সঙ্গীত আমাদেরকে সুন্দর করতে পারে, আত্মাকে উন্নীত করতে পারে, সেই সঙ্গীতই আমরা চাই। পবিত্র অন্তর দিয়ে সঙ্গীতের সাধনা করতে হবে, তা হলেই সঙ্গীত ইসলামের বাহন হবে। ইসলাম অশরীরী ভাবেই ধর্ম, জড়ত্বকে সে স্বীকার করে না। মানবাত্মার সূক্ষ্ম অনুভূতিকে সে সারা প্রাণ দিয়া উপলব্ধি করে। কাজেই এই অশরীরী ভাবকে মনের মধ্যে মূর্ত করে তুলতে সঙ্গীতই হবে বড় একটা সহায়, কেননা অনন্তকে সান্তের মধ্যে রূপ দেওয়াই হচ্ছে সঙ্গীতের চরম সার্থকতা। অবশ্য এ উদ্দেশ্য সফল করে তুলতে হলে, আমাদের আদর্শ অনুযায়ী নূতন নূতন সঙ্গীত রচনা করতে হবে–যা সহজ ভাবেই আমরা প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে পারি। "এমন দিন কি হবে মা তারা"–এ রকম গান গাইলে আপনারা মৌলবীদের সঙ্গে ঝগড়া করে এঁটে উঠবেন না।

আমার মনে হয়, সঙ্গীতে যে মুসলমান চিরদিনই শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে আসছে, তার প্রধান কারণই হচ্ছে, সে মুসলমান। ইসলামই সঙ্গীতের উপযুক্ত ক্ষেত্র। সঙ্গীতের যে সাধনা, ইসলাম তার থেকে দূরে নয়। মুসলমানের মনে কোনো স্থূলত্ব বা জড়ত্ববোধ নাই, নিরাকারের ধেয়ানী সে, অনন্তের রাজ্যে সে যাওয়া আসা করে, তাই একান্ত ও তন্ময় হয়ে সে গান করতে পারে, তাই তার সুরের মুকুরে অসীমের ছায়া পড়ে, তাই তার কণ্ঠ-সঙ্গীত এত প্রাণবন্ত, এত জীবন্ত হয়ে ওঠে। কোনো পীর সাহেবের মুখে যদি কখনো গান শুনতে পেতাম, তবে তার চেয়ে সুন্দর জিনিস বোধ হয় আর কিছু হতো না।

পরিশেষে বলতে চাই–সঙ্গীত সম্বন্ধে মৌলবী সাহেবদের সঙ্গে আমাদের একটা আপোষ হওয়া নিতান্ত দরকার। সঙ্গীতের খারাপ দিক (Sark side) সম্বন্ধে আমাদিগকে যেমন হুঁশিয়ার হতে হবে, মৌলবী সাহেবদেরকে তেমনি সঙ্গীতকে জীবনের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে। খোদাতালার এই যে সুন্দর আকাশ, পৃথিবী, এই যে রূপের আলো, এই যে বিচিত্র সুরের খেলা,----তাঁর অস্তিত্বের এই যে পুলক-পরশ এ যেন তাঁদের জীবনে ব্যর্থ হয়ে ফিরে না যায়।[৬]

মাসিক মোহাম্মদী –১৯৩০

৬.*কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজের সাহিত্য সভায় লেখক কর্তৃক পঠিত।

www.pathagar.com

ইসলাম ও উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত

আমার পূর্বলিখিত 'ইসলাম ও সঙ্গীত' নামক একটি প্রবন্ধে আমি দেখাতে চেয়েছিলাম যে ইসলামই সঙ্গীতের প্রকৃষ্ট প্রকাশ-ভূমি। সীমার মধ্যে অসীমকে মূর্ত করে তোলাই হচ্ছে সঙ্গীতের চরম সার্থকতা। যে সঙ্গীতে অনন্তের এক একটা ইঙ্গিতে ফুটে ওঠে, যে সঙ্গীতে অনির্বচনীয়কে উপলব্ধি করা যায়, তাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত। কিন্তু সবার কণ্ঠেই এই সঙ্গীত ধরা পড়ে না। এ অতি সূক্ষ্ম অশরীরী জিনিস, জোর করে একে ধরে আনা যায় না। অসীমের ধেয়ানী না হলে অসীমকে পাওয়া যায় না। মুসলমান নিরাকারের উপাসনা করে ; স্থূলকে অতিক্রম করে সূক্ষ্ম ভাব-রাজ্যে সে যাওয়া- আসা করে; তার মনের দিক-চক্রবাল অপরের চেয়ে অধিকতর ব্যাপক; তাই তার কণ্ঠে সঙ্গীতের যে আবেদন ধরা পড়ে, অপরের কাছে তা প্রায়ই পড়ে না। হারমোনিয়াম-কাঁধে-বাঁধা রাস্তার একজন সাধারণ পশ্চিমা মুসলমান গায়ক থেকে আরম্ভ করে ভারতের শ্রেষ্ঠ খেয়ালী ফৈয়াজ খাঁ, আবদুল করিম খাঁ, নাসির খাঁ, আল্লাদিয়া খাঁ, রজব আলী খাঁ, বন্দে হোসেন খাঁ, ঠুংরি সম্রাট জমিরুদ্দীন খাঁ অথবা জগদ্বিখ্যাত সেতারী প্রফেসার এনায়েত খাঁ–সকলেই একথা প্রমাণ করে। সঙ্গীতের ইতিহাস আলোচনা করলেও দেখা যায়–যুগে যুগে মুসলমানেরাই সঙ্গীতে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে আসছে। মুসলমানের বর্তমান রাজনৈতিক অধঃপতনের যুগেও এদিক দিয়ে তারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আর কিছুতে না হোক–সঙ্গীতে এখনও মুসলমানেরাই 'ওস্তাদ'।

সঙ্গীতের বিভিন্ন শাখায় মুসলমানদিগের দানও যে কতো বড়, তাও আমি পূর্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি।

কিন্তু তবুও এ কেমন কথা যে ইসলামে সঙ্গীত নিষিদ্ধ! একদিকে দেখি নিষেধের ফতোয়া, অপর দিকে দেখি–মুসলমানেরাই সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ সাধক এবং শ্রেষ্ঠ-সুরস্রষ্টা! এ অসামঞ্জস্যের ব্যাখ্যা কি? কোন্‌টি সত্য? ইসলামে সঙ্গীত নিষিদ্ধ, এইটেই সত্য, না ইসলামই সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ প্রকাশক্ষেত্র এইটেই সত্য?

আমার মতে এই দুই মতই সত্য।

All great truths are self-contradictory. ছোট ছোট সত্যের ভিতরে অসামঞ্জস্য বড় বেশী থাকেনা; কিন্তু মূলীভূত বড় বড় সত্যগুলি পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়। এখানেও তাই হয়েছে। ইসলামে সঙ্গীত নিষিদ্ধও বটে, আবার ইসলাম সঙ্গীতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ-ভূমিও বটে। একই জিনিসকে দুটি বিভিন্ন দৃষ্টি-কেন্দ্র থেকে দেখা হয়েছে বলেই এই আপাত বিরোধ জেগে উঠেছে।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কেমন করে তৈরী হয়, তার উপাদান কি, তা বোধ হয় সকলেই আপনারা জানেন। এলাপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক উভয় ঔষধের উপাদান একই; তবে এলাপ্যাথিক স্থূল আর হোমিওপ্যাথিক সূক্ষ্ম। স্থূল ঔষধকে পানি বা এল্‌কোহলের সঙ্গে মিশিয়ে সূক্ষ্মাংশে বিভাগ করতে করতে যখন আর মূল ঔষধের কোনো অস্তিত্বই অনুভব করা যায় না, তখনই তা হয় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ। যে ঔষধ স্থূলকে এড়িয়ে যতো উর্ধ্বে

www.pathagar.com

উঠে যায়, ততোই তার শক্তি বেড়ে যায়। লক্ষতম শক্তির ঔষধ দশম শক্তির ঐষধের চেয়ে বহুগুণে শক্তিশালী। লক্ষতম শক্তির কোনো ঔষধের মধ্যে মূল ঔষধের নাম-গন্ধও খুঁজে পাওয়া যাবে না, অথচ তার মধ্যে মূল ঔষধের শক্তি ও ক্রিয়া শতগুণ বেড়ে গিয়েছে। বস্তু যেখানে স্থূল, সেখানে সে জড়, আর যেখানে সে সূক্ষ্ম, সেখানে সে বিদ্যুৎ; সেখানে তার শক্তি অসীম। প্রত্যেক জিনিসেরই এইরূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ আছে।

সঙ্গীতের ঠিক এমনি দুটো রূপ আছে। একটি স্থূল সঙ্গীত আর একটি সূক্ষ্ম সঙ্গীত। বিশ্বের যাবতীয় কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতের অন্তরালে আর এক অপ্রকাশিত সঙ্গীত-জগৎ আছে, সে সঙ্গীতের ধ্বনি সহজে আমাদের কানে ধরা পড়ে না, তার জন্য স্বতন্ত্র কানের দরকার। এই অমর্ত সঙ্গীত সাধারণতঃ কানে যেমন শুনাও যায় না, কণ্ঠে তেমনি গাওয়াও যায় না। যাঁরা সঙ্গীতজ্ঞ, তাঁরা জানেন 'উদারা' 'মুদারা' 'তারা'—এই তিন স্বরগ্রামে মানুষের কণ্ঠ বাঁধা। এর নিচেকার বা উপরকার স্বরগুলি মানুষের আয়ত্তের মধ্যে নেই। এই তিন সুর-সপ্তকের অতীতে যে সুর আছে, মানুষের কণ্ঠ তার নাগাল ধরতে পারে না। কিন্তু মানুষের কণ্ঠে ধরা পড়ে না বলেই যে তারা নেই, তা তো নয়! কোথায় সেই সুর? কারা গায়, কারা শোনে সে সঙ্গীত? এ কথা, চিন্তা একেবারেই আমাদের লক্ষ্যের বাইরে পড়ে আছে।

সকলেই জানেন, গায়কদের কণ্ঠের উচ্চতা বা Pitch সকলের সমান নয়। যে গায়কের কণ্ঠ যে-সীমা পর্যন্ত স্বভাবতঃ ওঠে, তার অতীতের সুরগুলি সে কণ্ঠে গাইতে পারে না বটে, বাণী সেখানে রুদ্ধ হয়ে যায় বটে, কিন্তু তা হলেও মন তার সেই সুরগুলি নীরবেই গেয়ে যায় এবং নীরবেই শোনে! যার কণ্ঠ স্থূলকে যতো এড়িয়ে চলতে পারে, তার কণ্ঠ ততো মধুর। নারী-কণ্ঠের গান এই জন্যই আমাদের এত ভালো লাগে। পুরুষের কণ্ঠ অপেক্ষা নারী-কণ্ঠের উচ্চতা বা Pitch-ও খুব বেশী। তা ছাড়া তাদের কণ্ঠে সুর অপেক্ষা সুরের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতই ফোটে বেশী করে। এই জন্যই তা আমাদের এত ভালো লাগে। নারী-কণ্ঠের গান যদি এত সুন্দর হতে পারে, তবে নারী-কণ্ঠেরও অতীতে যে সূক্ষ্মতর সুর আছে, সেই নাগাল-না-পাওয়া সুর আরও কতো মধুর!

সেই সুরের রূপ নাই। সেই অশরীরী সুরের লীলা-তরঙ্গে আমাদের আকাশ-বাতাস ভরপুর। বর্তমান সময়ে Wireless বা Radio আবিষ্কারের পর এ কথা আর অস্বীকার করার উপায় নাই। কোন্ সুদূর হতে ভেসে আসে না-শোনা গানের সুর, ধরা পড়ে তা বেতার-যন্ত্রে! যার যন্ত্র আছে সেই সে সঙ্গীত শুনতে পারে; যার নাই, সে তা শুনবে কেমন করে! সে হয়তো এ কথা বিশ্বাসই করবে না।

সঙ্গীতের এই যে সূক্ষ্ম রূপ, এটা উচ্চক্রম হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মতোই। স্থূল বাদ-সঙ্গীত যেন এলোপ্যাথিক ঔষধ, তার মাত্রাও স্থূল, ক্রিয়াও স্থূল। আর এই উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত যেন শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ; তাকে চোখে দেখা যায় না, অথচ সে আছে এবং তার ক্রিয়াও আছে।

বলা বাহুল্য ইসলাম এই উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতেরই পক্ষপাতী। কণ্ঠ যেখানে নীরব—বাণী যেখানে স্তব্ধ, সেখান থেকে তার যাত্রা। ইসলামে যে সঙ্গীত নাই, এ কথা একেবারেই মিথ্যা। হোমিওপ্যাথিকের যে ভক্ত, সে যেমন এলোপ্যাথিকের স্থূল ঔষধ অথবা উগ্রগন্ধ কোনো দ্রব্যই গ্রহণ করে না; ইসলামের এই অরূপ-সঙ্গীতের ভক্তেরাও তেমনি স্থূল সঙ্গীতকে এড়িয়ে চলতে চায়।

www.pathagar.com

এই উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত শুনতে হলে হৃদয়ের বেতার-যন্ত্র দিয়ে শুনতে হয়। এ সঙ্গীত শুনতে হলে প্রশান্ত নীরবতার দরকার। ঢাক-ঢোলের বাদ্যের মধ্যে অথবা বাহিরের কলরোলের মধ্যে সে সঙ্গীতের সুর ধরা পড়ে না।

ঢাক-ঢোলের বাদ্যেও সঙ্গীত আছে, আবার মসজিদে নামাজের মধ্যেও সঙ্গীত আছে। কিন্তু তফাৎ এই যে, একটি এলোপ্যাথিক, আর একটি হোমিওপ্যাথিক। উভয় ঔষধই মূলতঃ এক হলেও লোকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ধারে পর্যন্তও এলোপ্যাথিক ঔষধ রাখে না, খাওয়া তো দূরের কথা। এই কারণেই বোধ হয় মুসলমানেরা মসজিদের সামনে বাদ্যকে এত ভয়ের চোখে দেখে।

মুসলমানেরা যে কারণে পৌত্তলিকতার বিরোধী, সেই কারণে স্থূল সঙ্গীতেরও বিরোধী। স্থূল সঙ্গীত যেন সঙ্গীতের আকার-মূর্তি; মুসলমানেরা সে সঙ্গীতের পূজারী নয়; সে সঙ্গীত তাদের জীবনে খাপও খায় না। তাই যাঁরা সাধক, ওলি-আল্লাহ্ বা দরবেশ, তাঁরা এই শ্রেণীর সঙ্গীতকে বর্জন করে অনির্বচনীয় নীরব সঙ্গীতের মধ্যে ডুবে যান। এইখান থেকে দৃষ্টিপাত করলেই ইসলামের নিকট সঙ্গীত নিষিদ্ধ বলে মনে হয়। ইসলামে সঙ্গীত আছে, কিন্তু সঙ্গীতের পৌত্তলিকতা নাই।

বর্তমানে সঙ্গীত-চর্চার দিকে বাঙ্গালী মুসলামানদের ঝোঁক অত্যন্ত বেশী দেখা যাচ্ছে। স্থূল সঙ্গীতের দিকে তারা ঝুঁকে না পড়ে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা এখন দরকার। আকাশ-বাণীর তারে তারে নিশিদিন যে সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে–সমস্ত সুর যেখানে এক মহা ঐক্যতানে লয় হয়ে যাচ্ছে–হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে বেতার-যন্ত্র বসিয়ে সেই উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত–সেই 'Music of the spheres' শুনতে হবে। নতুবা বাইরের এই স্থূল সঙ্গীত তাকে নীচের দিকেই টেনে নামাবে।

মোয়াজ্জিন

ভাদ্র, ১৩৪৩, ১৯৩৬

www.pathagar.com

মুসলিম জাহানের শাসনতন্ত্র

পাকিস্তানের নূতন শাসনতন্ত্র ঘোষণা করা হইয়াছে। দেশবাসী এর গঠন-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ওয়াকিফ্হাল।

এই নূতন পরিবর্তনের মূলে দাঁড়িয়ে মুসলিম জাহানের কোন্ রাষ্ট্রে কিরূপ শাসন-পদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে, তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপভোগ্য হতে পারে। সব দেশের পূর্ণ পরিচয় এক প্রবন্ধে দেওয়া অসম্ভব। নিম্নে আমি তাই তুরস্ক, মিসর, আফগানিস্তান, ইরান এবং ইরাকের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কিছুটা আভাস দিচ্ছি।

তুরস্কঃ তুরস্ক একটি রিপাবলিক। বহু বিচিত্র এর রাজনৈতিক ইতিহাস। তুর্কীজাতি সাম্রাজ্য জয় করেছে, স্থাপন করেছে, শাসন করেছে, আবার তেমনি হারিয়েছে। তবু এরা মরেনি, টিকেই আছে। অদ্ভুত এদের প্রাণশক্তি ও মনোবল।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত তুরস্কে রাজতন্ত্র (Monarchy) প্রচলিত ছিল। সুলতান আবদুল মজিদ যখন তুরস্কের খলিফা, তখন তাঁর হাতেই সর্বপ্রথম (১৮৫৬) কিছুটা নিয়মতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। অতঃপর ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের চাপে পড়ে সুলতান আবদুল হামিদ (১৮৭৬) একটাconstitution ঘোষণা করেন। তাতে স্থানীয় খৃষ্টানরা স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। কিন্তু ১৮৭৮ সালে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ পুনরায় রাজতন্ত্রের প্রবর্তন করেন। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নব্য তুর্কীদলের আবির্ভাব হয় এবং ১৯০৫ সালের পূর্বের (১৮৭৬ সালের) শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। তবে তাতে কতিপয় ধারার পরিবর্তন ও সংযোজন সাধিত হয়েছিল। ১৯০৮ সালে সুলতান আবদুল হামিদ সিংহাসনচ্যুত হন। সেই সঙ্গে খেলাফতেরও অবসান ঘটে।

তারপরই আসে প্রথম মহাসমর, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে। তুরস্ক জার্মানীর সঙ্গে যোগ দিয়ে ত্রি-শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু জার্মানীর পরাজয়ের সাথে তারও পরাজয় ঘটে। এতে নব্য তুর্কীদলের প্রভাব তিরোহিত হয়। তুর্কীবীর কামাল-পাশার অধীনে নূতন জাগরণ দেখা দেয়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তুরস্ককে রিপাবলিক ঘোষণা করা হয়। মুস্তফা কামাল পাশা প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তখন থেকে তুরস্ক ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র (secular state) রূপে পরিগণিত হয়।

তুরস্কের রাষ্ট্রভাষা তুর্কী। এর সার্বভৌমিকতা (sovereignty) জাতির হাতে ন্যস্ত (sovereignty belongs to the nation)। The Grand National Assembly-ই হচ্ছে তুরস্কের সর্বময় কর্তা। এই এসেমব্লি সমগ্র তুর্কী জাতির প্রতিনিধিত্ব করে। প্রতি চার বছর অন্তর এই এসেমব্লির নির্বাচন হয়।

তুরস্কে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ব্যাখ্যা হচ্ছে-"Liberty consists any action which is not deterimental to others" অর্থাৎ যে-কোনো ব্যক্তি স্বাধীনভাবে যে-কোনো কাজ করতে পারে—যদি তা অপরের ক্ষতির কারণ না হয়।

তুরস্কে ধর্ম-স্বাধীনতা আছে, তবে অপর ধর্মের প্রতি তা যেন আক্রমণাত্মক না হয়।

তুরস্কে প্রাইমারী শিক্ষা ছেলে-মেয়েদের জন্যে বাধ্যতামূলক এবং পাবলিক স্কুলসমূহে তা অবৈতনিক।

www.pathagar.com

মিসর ঃ মিসর পূর্বে তুর্কীর অধীনে ছিল। খেদিব তখন দেশ শাসন করতেন। বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণের ফলে ১৮৭৯ সালে মিসর গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের সম্মিলিত শাসনাধীনে আসে। ১৮৮২ সালে জাতীয় নেতা আরাবী পাশা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বৃটেন মিসরকে আশ্রিত রাজ্য (protectorate) বলে ঘোষণা করে। অতঃপর জগলুল পাশার নেতৃত্বে মিসরে গণ-আন্দোলন শুরু হয়। ফলে ১৯২২ সালে বৃটিশ সরকার মিসরকে স্বাধীনতা দান করেন। ১লা মার্চ, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বাদশা ফুয়াদ মিসরের স্বাধীন নরপতিরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। একমাস পরেই মিসরের বর্তমান শাসনতন্ত্র বিঘোষিত হয়।

রাজাই ছিলেন এতদিন মিসরের প্রধান কর্মকর্তা। কিন্তু মিসর আর এখন রাজতন্ত্র নয়। জেনারেল জামাল আব্দুল নাসের রাজন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে মিসরে স্থাপন করেছেন ডিক্টেটরশীপ।

আফগানিস্তান ঃ আফগানিস্তান রাজতন্ত্র। ইংরাজীতে যাকে বলে "benevolent despotism"–এখানে তাই। আমীরই সর্বেসর্বা। রাশিয়া এবং ভারতের মধ্যবর্তী বলে একে নিয়ে চিরদিনই ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ অনেক খেলা খেলতে চেয়েছে এবং এখনও সে খেলার অবসান ঘটেনি। আফগানিস্তানকে বৃটিশ আপন কুক্ষিগত করে রাখবার বহু চেষ্টা-ষড়যন্ত্র করেছে। কিন্তু আফগান জাতিও শক্ত চীজ। সহজে কারো হাতে সে ধরা দেয়নি। অনেক ভাগ্যবিড়ম্বনার পর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্তান বৃটেন ও অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির চক্রান্ত থেকে মুক্ত হয়, এবং ১৯২১ সালে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯২৩ সালে বিচক্ষণ-প্রগতিশীল বাদশাহ আমানুল্লা আফগানিস্তানের জন্যে একটি নূতন শাসনতন্ত্র কায়েম করেন।

এরপর আফগানিস্তানে দ্রুত রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে। ইতিহাস পাঠক তা জানেন।

আফগানিস্তানকে বলা যায় ধর্মমিশ্রিত স্বেচ্ছাতন্ত্র (Government is autocracy diluted with theoeracy)। বাদশাকে হানাফী জামাতভুক্ত হতেই হবে। দেশের শাসনভার গ্রহণের পূর্বে তাঁকে পার্লিয়ামেন্টের সম্মুখে শপথপত্রে এই বলে স্বাক্ষর করতে হয় এবং ঘোষণা করতে হয় যে, তিনি শরিয়ৎ মোতাবেক দেশ শাসন করবেন এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করবেন।

কেবলমাত্র আফগানিস্তানের মুসলিম প্রজারাই মন্ত্রী হবার অধিকরী। আফগান পার্লিয়ামেন্টে দুটি স্থায়ী পরিষদ (Houses) আছেঃ উচ্চ এবং নিম্ন। তৃতীয় একটি পরিষদও আছে–তার নাম জির্গা (Jirga)। প্রত্যেক চার বৎসরে জির্গার এক একটি অধিবেশন হয়। এই জির্গায় সমস্ত উপজাতিদের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন। বাদশাহ নিজে সভাপতিত্ব করেন।

ইরান ঃ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইরানে অবিমিশ্র রাজতন্ত্রই বিদ্যমান ছিল। শাহিনশাহ্-ই ছিলেন ইরানের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। কিন্তু ধীরে ধীরে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটে এবং সুখের বিষয়, তা রক্তহীন বিপ্লবের মধ্য দিয়েই ঘটে।

www.pathagar.com

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ইরানে রিপাবলিক শাসন আসন্ন হয়ে আসে। কিন্তু নানা কারণে উলেমা সম্প্রদায়ের সঙ্গে রেজা শাহের মতবিরোধ ঘটে; ফলে রিপাবলিক শাসন তো প্রতিষ্ঠিত হয়ই না, উল্টা রেজা শাহেব কাছ থেকে উলেমারা এই ঘোষণাই আদায় করে নেন যে, রিপাবলিক শাসন শিয়া মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯২৫ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে ইরানের জাতীয় পরিষদ (Iranian National Assembly) রেজা শাহ্‌কে পুরুষানুক্রমিকভাবে রাজা বলে ঘোষণা করে। রেজা শাহ্‌ পাহ্‌লবী ছিলেন সত্যই ইরানের ত্রাণকর্তা। কিন্তু ১৯৪১ সালে আবার বিপর্যয় দেখা দেয়। বহু ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে ১৯৪৩ সালে আমেরিকা, বৃটেন এবং সোভিয়েত রাশিয়া বিখ্যাত Tehran Declartion-এ ইরানের স্বাধীনতা স্বীকার করে।

১৯০৬-৭ সালে ইরানী শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। গণতন্ত্র এবং ধর্মতন্ত্রের এ এক সংমিশ্রণ।

ইরানে সর্বপ্রকার প্রকাশনাই (Publications) স্বাধীন। যদি কোনো মুদ্রিত পুস্তকে বা অন্য কোনো কিছুতে আপত্তিকর কিছু প্রকাশিত হয়, তখন প্রেস আইন অনুসারে লেখক অথবা প্রকাশককে তার জন্য দায়ী করা হয়। লেখক যদি দেশবাসী ও সুপরিচিত হন, তখন শুধু তাঁকেই অভিযুক্ত করা হয়–প্রকাশককে নয়। লেখককে না পাওয়া গেলে তখন প্রকাশককে দায়ী করা হয়।

ইরাক ঃ ইরাক (মেসোপোটেমিয়া) পূর্বে তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। কিন্তু বৃটিশদের চক্রান্তে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষভাগে (১৯১৭) ইরাক তুরস্ক থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যায়। General Mande-এর অধীনে একদল বৃটিশ সৈন্য ইরাক দখল করে এবং ইরাককে আশ্রিত রাজ্য বলে ঘোষণা করে। কিন্তু ইরাকে স্বাধীনতার আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে Sir Percy (মেসোপোটেমিয়ার তৎকালীন বৃটিশ হাই কমিশনার) সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে আরব মন্ত্রীদের দ্বারা গঠিত একটি কাউন্সিল প্রবর্তিত করেন। এরপর মক্কার রাজা হুসেনের পুত্র ফয়সলকে ইরাকের আমীর পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বলা বাহুল্য, এই হুসেন তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার সময় বৃটিশ পক্ষ অবলম্বলন করেছিলেন। ১৯২১ সালে Sir Percy আমীর ফয়সলকে ইরাকের রাজা বলে ঘোষণা করেন। তারপর ঘটনার স্বাভাবিক গতিতে ইরাক বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়। ১৯৩১ সালে ইরাকে ম্যাণ্ডেটরী (Mandatory) শাসনের অবসান ঘটে এবং তার ফলে ইরাক স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রে (Sovereign stste) পরিণত হয়।

ইরাক তাই রাজতন্ত্র।[১] এর সার্বভৌমিকতা (Sovereignty) ইরাকবাসীর হাতে (The sovereixgty of the constitutional kingdom of Iraq resides

---

১. ইরাক এখন আর রাজতন্ত্র নয়। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে জেনারেল করিম কাসেম ক্ষমতা দখল করেন। ইরাক প্রজাতন্ত্রের রূপ নেয়। প্রকৃতপক্ষে সেখানে ডিক্টেটরী শাসনই প্রবর্তিত হয়েছিল। ১৯৬৩ সালে অপর একটি অভ্যুত্থানের দ্বারা ফিল্ড মার্শাল আব্দুস মালাম আরিফ ক্ষমতা দখল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা আবদুর রহমান আরিফ ইরাক প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। [লেখাটি ১৯৬২ সালে রচিত, ফলে বর্তমানে এসব ছেলের খোল-নলচে প্রায় সম্পূর্ণরূপে পাল্টে গেছে। –সম্পাদক]

www.pathagar.com

in the people)। দেশবাসী এই ক্ষমতা আমানত (Trust) স্বরূপ তাদের রাজার হাতে অর্পণ করেছেন।

ইরাকের শাসতন্ত্রে নাগরিক অধিকার অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। সর্বপ্রকার নাগরিকই সমঅধিকার ভোগ করতে পারে।

বাক-স্বাধীনতাও ইরাক-শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। যে কেউ যখন খুশী অবাধে যার-তার সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে। তবে আইনের খেলাফ কিছু হলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা আছে।

ইরাকের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। অন্যান্য ধর্মমতাবলম্বীরাও স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মচর্চা করতে পারে।

রাজা দেশ শাসন করেন, আবার সৈন্যদের প্রধান সেনাপতিও তিনি। শাসনকার্য পরিচালনার জন্যে তাঁর একটি মন্ত্রীসভা (Council of ministers) আছে। প্রয়োজন হলে রাজা সামরিক আইনও জারি করতে পারেন।

মুসলিম রাষ্ট্রগুলির শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে এই হলো মোটামুটি পরিচয়। বলাবাহুল্য, এ পরিচয় অতি আধুনিক (uptodate) নয়। মধ্যপ্রাচ্যে রাজনীতি ও শাসনতন্ত্রের এত দ্রুত পরিবর্তন হয় যে, কোনো বিষয় স্থির নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন।

["Selected Constitutions of the world" থেকে সংগৃহীত।]

পাক জমহুরিয়াত

মার্চ, ১৯৬২

নয়া শাসনতন্ত্রের ইসলামী রূপ

নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানে এক নূতন সম্ভাবনার যুগ সূচিত হবে।

আমি রাজনীতির ছাত্র নই। কাজেই রাষ্ট্রদর্শনের আলোকে এর দোষগুণ বিচার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সে চেষ্টা আমি করবো না। রাজনীতি থেকে দূরে দাঁড়িয়ে একজন সাধারণ মুসলিম নাগরিক হিসেবে এই নূতন রাষ্ট্রবিধান আমার মনে কী প্রতিক্রিয়া জাগিয়েছে, তাই আমি বলবো।

এই শাসনতন্ত্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য ও আকর্ষণ হচ্ছে এর ইসলামী রূপ। যদিও শাসন-বিধানের কোথাও পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে উল্লেখ করা হয়নি, শুধু বলা হয়েছে "Republic of Pakistan",তবু এই শাসনতন্ত্রের মধ্য দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের রূপই ফুটে বেরিয়েছে। ইসলামের চমৎকারিত্ব তো সেইখানেই। নাম না বললেও আপন মহিমায় সে পরিচিত হয়।

তবু ইসলামী রাষ্ট্রের যে আদর্শ আমাদের মনে জেগে আছে, তার সঙ্গে পাকিস্তানকে একবার মিলিয়ে দেখতে চাই। কিন্তু তা করতে হলে ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা পূর্ব-ধারণার প্রয়োজন। নিম্নে এর বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি দেওয়া হলো ঃ

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ

(১) সার্বভৌমিকতা একমাত্র আল্লাহ্‌র (Sovereignty belongs to Allah alone) এ নীতি মানতে হবে;

(২) শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌র প্রদত্ত আমানত (Sacred turst) বলে গ্রহণ করতে হবে;

(৩) আল্লাহ্‌ ও রসুলের নির্দেশ অনুযায়ী (অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ্‌ মোতাবেক) আইন প্রণয়ন করতে হবে;

(৪) কুরআন-হাদিসের বিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করা চলবে না;

(৫) জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব নাগরিককে সমান অধিকার দিতে হবে;

(৬) সব নাগরিককে ধর্ম-স্বাধীনতা, কর্ম-স্বাধীনতা ও বাক-স্বাধীনতা দিতে হবে;

(৭) কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করা চলবে না;

(৮) নারী জাতির ন্যায্য অধিকার দিতে হবে;

(৯) সামাজিক সাম্য ও ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠা করতে হবে;

(১০) মুসলমানদের জন্য ইসলামী জীবন ও ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে হবে;

(১১) আইনের চোখে সবাই সমান—এই নীতি মানতে হবে;

(১২) প্রত্যেক অসমর্থ নাগরিকের মৌলিক অভাব (basic needs) পূরণ করতে হবে;

(১৩) রাষ্ট্রকে জনকল্যাণ প্রয়াসী (Welfare stste) করে গড়ে তুলতে হবে;

(১৪) আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও মিলন প্রতিষ্ঠা করতে হবে;

(১৫) নূতন কোনো সমস্যার উদয় হলে ইজমা, কিয়াস, ইসতিহাদ ইত্যাদি দ্বারা তার সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে।

–(দেখুনঃ মওদূদীর Islamic Law and Constitution)

এইগুলিই হলো ইসলামী রাষ্ট্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

ইসলামী রাষ্ট্রের আলোকে পাকিস্তান

এই আলোকে পাকিস্তানের নয়া শাসনতন্ত্রকে একবার পরীক্ষা করা যাক–

শাসনতন্ত্রের সর্বপ্রথম প্রস্তাবনাতেই আল্লাহ্‌র সার্বভৌমিকতা এবং তাঁর আমানতের কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

Whereas sovereignty over the entire universe is Almighty Allah alone, and the authority exercisable by the people is a sacred trust;

www.pathagar.com

"And---Pakistan should be a democratic state based on Islamic principles of social justice".

তারপর বলা হয়েছে ঃ

"কোনো আইনই ইসলামের মূলনীতিসমূহের বিরোধী হবে না।"

(No law should be repugnant to Islam)

"সমস্ত নাগরিককে আইনের চোখে সমান জ্ঞান করা হবে এবং সবাইকে সমানভাবে আইনের আশ্রয় (protection) দেওয়া হবে,

"কোন নাগরিকের বাক-স্বাধীনতাকে (বিনা কারণে) ক্ষুণ্ন করা হবে না;

"(বিনা কারণে) পরস্পরের মেলামেশার অধিকার হরণ করা হবে না;

"কর্মে, গতিবিধিতে এবং ধর্মাচরণে প্রত্যেকের স্বাধীনতা থাকবে;

"অমুসলমান ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের অধিকার অক্ষুণ্ন থাকবে এবং তাদের উন্নয়নের জন্যে বিশেষ সুযোগ ও সাহায্য দেওয়া হবে;

"মুসমানদের জীবনযাত্রা পদ্ধতি ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে যাতে ইসলামানুসারী হয় সে ব্যবস্থা করা হবে;

"কুরআন ও ইসলামিয়াত শিক্ষা মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হবে;

"অসমর্থ নাগরিকদের মৌলিক অভাব (যথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা) পূরণ করা হবে;

"সুদ (রিবা), মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য নিষিদ্ধ বস্তু সমাজ থেকে দূরীকরণের ব্যবস্থা করা হবে;

"মুসলিম জাহানের সংহতি এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও মিলন সুদৃঢ় করা হবে;

"প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক ও অবৈতনিক হবে;

"জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে জনকল্যাণের জন্য সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বণ করা হবে।"

এইরূপ ছোটখাটো আরও অনেক ব্যবস্থা রয়েছে-যা থেকে সত্যই মনে হবে কি ইসলামের দিক থেকে, কি মানবতার দিক থেকে-এই শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য হয়েছে। ইসলামী আদর্শ সম্পূর্ণ বজায় রেখে, অথচ বর্তমান যুগের সমস্ত চাহিদা মিটিয়ে এমন একটা অভিনব শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা সহজ কথা নয়।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

শাসনতন্ত্রে Presidential form of Government গ্রহণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রের একজন প্রেসিডেন্ট থাকবেন, তিনি অবশ্য মুসলমান হবেন। তিনি রাষ্ট্রপ্রধানও হবেন (Head of the state) আবার সৈন্য বাহিনীরও তিনি প্রধান সেনাপতি হবেন। এই ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ ইসলামানুমোদিত হয়েছে বলে আমি মনে করি। খোলাফায়ে রাশেদীনও এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। হযরত ওমর 'আমীরুল মুমেনীন'ও ছিলেন,

www.pathagar.com

সিপাহসালারও (Commander-in-chief) ছিলেন। রাষ্ট্রপ্রধানের এই দ্বৈত-রূপ তাই আমাদের কাছে নূতন নয়; ইসলামের মূলনীতির সঙ্গে এ ব্যবস্থা অন্তর্বিজড়িত। দুইকে নিয়েই ইসলামের কারবার। দুই বিপরীতের মধ্যে সে আনে সমন্বয়। দীন ও দুনিয়া, ইহকাল ও পরকাল, জড় ও চৈতন্য; ধর্ম ও কর্ম, কুরআন ও তলোয়ার, স্রষ্টা ও সৃষ্টি ইসলামে একসাথে বাঁধা। দুই প্রান্তের মাঝখান দিয়ে পাতা আছে তার সিরাতুল মুস্তাকিম; কাজেই যাঁরা একই ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সেনাপতিরূপে দেখতে নারাজ তাঁদের ইসলামী রাষ্ট্র দাবী করবার কোনো অধিকার আছে বলে আমি মনে করি না।

ইসলামী গণতন্ত্র

ইসলাম গণতন্ত্রের প্রয়াসী সন্দেহ নেই, কিন্তু পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের অন্ধ অনুকরণ সে সমর্থন করে না। গণভোট তার কাম্য নয়। প্রতিটি মানুষের কাছে ভোট নেবার প্রথা ইউরোপ আমাদের শিখিয়েছে। তাদের সেটা দরকার, কিন্তু আমাদের নয়। সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Secular State); সেখানকার রাষ্ট্রদর্শনও স্বতন্ত্র। সার্বভৌমিক ক্ষমতা নিয়েও তাদের সঙ্গে আমাদের দারুণ প্রভেদ। তারা বলে দেশের চরম শাসনক্ষমতা হচ্ছে দেশবাসীর (Sovereignty belongs to the people)। কাজেই কোনো জননেতাকে নির্বাচিত হতে হলে তাদের প্রতিটি দেশবাসীর মত বা ভোট গ্রহণ করতেই হয়। তাই তারা গণ-ভোটের প্রবর্তন করেছে। কিন্তু ইসলামের মূলণীতি তো তা নয়। ইসলামের সার্বভৌমিকতা একমাত্র আল্লাহ্‌র। ভোটে জিতে গেলেই যে সে যোগ্য নেতা বা যোগ্য শাসক হলো তা নয়; আল্লাহ্‌র রাজ্য আল্লাহ্‌র আইন কানুন দ্বারা সে পরিচালনা করছে কিনা, তাই দেখে হবে তার বিচার। ইসলাম তাই বিশেষ কোনো তন্ত্র বা ইজমের অন্ধ উপাসক নয়। গণভোটের চেয়ে তার কাছে যোগ্যতার মূল্য বেশী। ইসলামে তাই যোগ্য ব্যক্তির মনোনয়নের স্থান আছে। মনোনয়ন যদি জনসাধারণ দ্বারা সমর্থিত হয়, তবে তাও এক হিসাবে নির্বাচন বলে গণ্য হবে। এই নীতিই রাসূলুল্লাহ্‌র অভিপ্রেত ছিল। মৃত্যুকালে তিনি হযরত আবুবকরকে খলিফা মনোনীত করবার ইঙ্গিত রেখে গিয়েছিলেন। হযরত আবুবকরও হযরত ওমরকে মনোনীত করে গিয়েছিলেন। সেই ওমরই ছিলেন সমগ্র ইসলাম জাহানের আদর্শ খলিফা। হযরত ওমর কাকেও মনোনয়ন দিয়ে যাননি। তিনি মজলিস-ই-শো'রার হাতে পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন। তদনুসারে হযরত ওসমান তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। দুঃখের সঙ্গেই বলতে হয় নির্বাচন প্রথা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইসলামের ঘর ভাঙার পর্বও শুরু হলো। এই ছিদ্রপথ দিয়েই ইসলামে রাজতন্ত্র (monarchy) অনুপ্রবেশ করে এবং হযরত আলির সময়েই ইসলামের স্বর্ণযুগের অবসান ঘটে।

বস্তুতঃ গণতন্ত্র হলেই যে কল্যাণ হলো, এমন কোনো কথা নেই। বর্তমান গণতন্ত্র মেজরিটির শাসন নয়, নানা দলে বিভক্ত জনগণের একটির শাসন মাত্র। ইকবাল তাই বর্তমান গণতন্ত্রের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না। তিনি বলেছেনঃ এই গণতন্ত্রে মানুষের মাথা শুধু গণনাই করা হয়, ওজন করা হয় না। আরও বলেছেন; দু'শ গাধার মগজ একত্র

www.pathagar.com

করলেও একটা মানুষের মগজ (চিন্তা) তৈরি করা যায় না (আজ মগ্‌জে দোসদ্‌ খর ফিক্‌রে ইনসানী না মীআয়েদ্‌)। কাজেই গণতন্ত্রের প্রতি অহেতুক মোহ যেন আমাদের না থাকে। নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রই (Controlled democracy) আমাদের কাম্য। নূতন শাসনতন্ত্রে সেই বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান।

নয়া শাসনতন্ত্রের ইসলামী রূপ

অনেকে বলতে পারেন, কাজে ইসলামী হলে তবেই তো একটা রাষ্ট্র ইসলামী হবে। পাকিস্তানে বহু অনৈসলামিক বিধি-ব্যবস্থা ও ক্রিয়াকলাপ এখনও বিদ্যমান। কি করে তবে একে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যায়।

এ এক বিকৃত ধারণা। কাজ বা ফল দেখেই যদি কোনো বস্তুর নামকরণ হয়, তবে রাষ্ট্র ও সমাজ তো দূরের কথা, ক'জন মুসলমান ধোপে টিকবে-কার্যকলাপ দেখে কি প্রত্যেক মুসলমানের নামকরণ করা হয়েছে? মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেই একটা শিশুও মুসলমান বলেই গণ্য হয়। বড় হলেই সে নামাজ, রোজা ও শরিয়তের অন্যান্য হুকুম-আহ্‌কাম পালন করবে কিনা, তা না দেখেই আদমশুমারীর খাতায় তার নাম লিখে দেওয়া হয় যে সে মুসলমান। কার্যতও দেখা যায়, বহু মুসলামানই নামাজ রোজা করে না অথচ মুসলমানদের তালিকা থেকে তাদের নাম কেউ কেটে দেয় না–এমন কি মোল্লা-মৌলবীরাও না। এটা কিছু অন্যায় নয়, বরং এইটাই স্বাভাবিক। প্রকৃতির রাজ্যে এই নীতিই অনুসৃত হয়। পণ্ডিতেরা যদিও বলেন, "A tree is known by its fruit", তবু ফল ধরার আগেই কিন্তু গাছের পরিচয় হয়ে যায়। আমের চারার কলম দেখেই বলে দেওয়া যায় সেটা আমের গাছ। সেই রকম কলার পেয়া কলা না দেখিয়েই আমাদের কাছ থেকে কলাগাছের স্বীকৃতি আদায় করে নেয়।

এরূপ কেন হয়?

এর কারণ এই যে, প্রকৃতি, পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা আমাদের জ্ঞানকে সহজ করে দেয়। অনেক কিছুই বুঝবার আগেই আমরা বুঝি। আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি অত চুলচেরা হিসাব পছন্দ করেনা। কোনো ব্যতিক্রম বা ত্রুটি থাকলে সে তা উপেক্ষা করে যায়। এই হলো প্রকৃতির নিয়ম।

ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজ জীবনে এবং প্রকৃতিতে যখন এই নীতি ক্রিয়া করছে, তখন ইসলামী রাষ্ট্রের বেলায় তা কেন চলবে না? ব্যক্তি যদি ইসলামী হয়, সমাজ যদি ইসলামী হয়, তবে তাদের দ্বারা রচিত রাষ্ট্রও ইসলামী হতে বাধ্য; কেননা ইসলামী রাষ্ট্রের উপর যে যে বিধান প্রযোজ্য, ব্যক্তি এবং সমাজের উপরেও ঠিক সেই সেই বিধানই প্রযোজ্য। কাজেই প্রথম দুটো স্তর ইসলামী বলে সার্টিফিকেট পেলে উচ্চতর স্তরটি আপনা আপনি ইসলামী খেতাব পাবার অধিকারী হয়: কেননা রাষ্ট্র হচ্ছে সমাজেরই উচ্চতম স্তর– The highest organisation of society is the state"- Dr. khalifa A. Hakim!

www.pathagar.com

সুদ, মাদক দ্রব্য ও অন্যান্য নিষিদ্ধ বস্তুর দূরীকরণ সম্বন্ধে বলা যায় এই সব সমস্যার সমাধান কোনোদিন রাতারাতি সম্ভব হয় না। ধীরে ধীরে এর মূলোৎপাটন করতে হয়। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ঠিক এই পন্থাই অবলম্বন করেছিলেন। আন্তর্জাতিক জটিলতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বিধর্মীদিগের প্রভাব ও প্রয়োজন ইত্যাদি অনেক সমস্যা এর সঙ্গে জড়িত আছে। কাজেই এই ধরনের সংস্কার কিছুটা ক্রমিক ও সময় সাপেক্ষ। মাওলানা মওদূদীর মতো কঠোর শাসনতান্ত্রিকও একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি বলেন ঃ "It is inevitable that the required reform should be gradual and the changes in the laws should be effected in such a manner as to balance favourably the change in the moral educational, social, cultural and political life of the nation."

-(Islamic Law and constitution).

অনেকের ধারণা ইসলামী রাষ্ট্রের মানে হচ্ছে এমন একটা রাষ্ট্র যা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং যেখানে ঘটেছে শরীয়তের পূর্ণ রূপায়ণ। কিন্তু এ ধারণা ভুল। ইসলামী রাষ্ট্র কোনেদিন আকাশ থেকে মাটিতে পড়বে না-একে গড়ে নিতে হবে। ফলের আশায় আমরা যেমন গাছ লাগাই এবং অনেক দিন পরে তার ফল খাই—এও তাই। পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র বললে বুঝতে হবে—আমাদের ধ্যানের পাকিস্তানকে লাভ করবার একটি প্রক্রিয়া (process) মাত্র আমরা লাভ করেছি। Cantwel Smith চমৎকার ভাবেই বলেছেন ঃ "To achieve an islamic state was to attain not a form, but a process."ইসলামী শাসনতন্ত্রকেও এই আলোকেই দেখতে হবে। খুঁটিনাটি দোষত্রুটি বিচারের সময় এ নয়-মূল নীতি ও কাঠামো ঠিক রেখে আমদের অগ্রসর হতে হবে। ডক্টর খলীফা আবদুল হাকিমও এই কথা বলেন ঃ"The Islamic State shall follow a prescribed model in broad outlines; it is a system, but is an open ant not a close system." -(Islamic Ideology)

ইসলামী রাষ্ট্র ঠিক ধর্মরাষ্ট্র (Theocracy) নয় ; আধুনিক ও প্রগতিশীল হতে এর কোথাও বাধা নেই। ইজমা, কিয়াস ও ইসতিহাদ দ্বারা একে অনায়াসে যুগোপযোগী করে নেওয়া যায়। বর্তমানে শাসনতন্ত্রেও এ বিধান প্রয়োগ করা হয়েছে।

"Electoral college" দ্বারা নির্বাচন সম্পন্ন করার বিধান ও ইসলামের অনুসারী হয়েছে। গণভোট একে তো আমাদের আদর্শের বিরোধী, তার উপর এ প্রথা অনাবশ্যকভাবে ব্যয়বহুল। এক একটা ইলেকশনে সরকারের কমপক্ষে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় হয়। এই অহেতুক অপব্যয়ের কোনো মানে হয় না। এ অর্থ অন্য কোন মহৎ কাজে অনায়াসে ব্যয় করা যেতে পারে। প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কাজ করবার তাকিদ তো কুরআনেরই নির্দেশ। আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন শরীফে বলেছেন ঃ "আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রসুলা ঃ ওয়া উলিল আম্‌রে মিন কুম।"

অর্থাৎ-আল্লাকে মানো, রসুলকে মানো এবং কওমের নেতাদিগকে মানো।

কাজেই যে কোনো দিক্ দিয়ে বিচার করলেই দেখা যাবে আইয়ুব প্রবর্তিত এই নয়া শাসনতন্ত্র ইসলামের মূলনীতি ও আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে; কার্যগতভাবে না

www.pathagar.com

পেলেও আদর্শগতভাবে আমরা ইসলামী রাষ্ট্র লাভ করেছি। আর আমরা যখন ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য সামনে রেখেই পা বাড়িয়েছি, তখন এই অবস্থাতেও আমরা পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র বলতে পারি। Cantwell Smith-এর আরেকটি মন্তব্যও এখানে উদ্ধারযোগ্য ঃ

"A state is Islamic in actuality if it aims at becming Islamic ideally.

—(Isamic in Modern History)

অর্থাৎ–ধ্যানে ধারণার ইসলামী হলেই একটা রাষ্ট্রকেও কার্যতঃ ইসলামী রাষ্ট্র বলা যায়।

আদর্শ রাষ্ট্র (Ideal state) স্থাপনের জন্য প্লেটোর সময় থেকে আজ পর্যন্ত চিন্তা ও চেষ্টার বিরাম নেই। হাজার হাজার বছর ধরে এর সন্ধানে মানুষ ঘুরে মরেছে।

Socialism, Marxism, Fascism, League of Nations, UNO ইত্যাদি কতো মতবাদ, কতো সংস্থাই না স্থাপিত হয়েছে; কিন্তু আদর্শ রাষ্ট্র কেউ আনতে পারেনি। তার একটা বড় কারণ হচ্ছে এই যে, শাসনকার্যের মূলমন্ত্র মানুষ ভুলে গেছে। আদান-প্রদানের মনোভাবই হবে সব শাসনের ভিত্তিমূল। শাসিতের উপর শাসকের শাসন দণ্ড চালাবার দিন চলে গেছে। এখন হবে সমানের উপর সমানের শাসন ("Rule of the equals over the equlas")—অর্থাৎ শাসক এবং শাসিত উভয়কে দেশের কাজে হাত মিলাতে হবে। কুরআন শরীফে এইরূপ শাসনেরই ইঙ্গিত আছে। আল্লাহ্ বার বার তাঁর 'ওয়াদার' (covenant) কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন ঃ "তোমরা তোমাদের ওয়াদা পালন করো, আমিও করবো।" এর থেকেই Roussear তাঁর "Social contract"-এর থিওরী গ্রহণ করেছিলেন। আইয়ূব-প্রবর্তিত নয়া শাসনতন্ত্রে এই আদান-প্রদানের ভঙ্গী বিদ্যমান। কাজেই এ শাসন কুরআনের নির্দেশিত পথ ধরেই চলেছে বলে আমি মনে করি।

এক নূতন যুগের প্রবেশ দুয়ারে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। ইসলামের সোনালী যুগের স্বপ্ন আবার আমাদের চোখে ঘনিয়েছে। আবার তার নূতন জয়যাত্রা শুরু হবে এবং সেই অভিযানে পাকিস্তান প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

নয়া শাসনকতন্ত্রকে তাই জানাই আমার আন্তরিক মুবারকবাদ।

আজাদ

মার্চ, ১৯৬২

www.pathagar.com

জিন্নাহ্ হইতে কায়েদ-ই-আযম

শিশুর পিতা যেমন শিশুর অন্তরেই ঘুমাইয়া থাকে, মিঃ জিন্নাহ্র ভিতরে তেমনি ঘুমাইয়া ছিলেন আমাদের মহান নেতা–কায়েদ-ই-আযম। যে নির্ভীকতা, তেজস্বীতা, স্পষ্টবাদিতা, সততা ও সৎসাহস কায়েদ-ই-আযমের চরিত্রে আমরা লক্ষ্য করি সেসব গুণ মিঃ জিন্নাহ্র মধ্যেই রূপলাভ করিতেছিল। বস্তুতঃ মিঃ জিন্নাহ্ কায়েদ-ই-আযমেরই পূর্ব অধ্যায়। এই অধ্যায় পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে–ভবিষ্যতের কায়েদ-ই-আযম কিভাবে ধীরে ধীরে মিঃ জিন্নাহ্র মধ্যে সঞ্চারিত হইতেছিলেন।

কায়েদ-ই-আযম তো একদিনে হয় না। কতো দীর্ঘ দিনের তপস্যায় লালা পুলের অন্তর-মূর্তি বিকশিত হয়। কায়েদ-ই-আযমে পৌঁছিতে মিঃ জিন্নাহ্কেও সেইরূপ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল।

মার্বেল খেলার গলিতে কায়েদ-ই-আযমকে সর্ব প্রথম আমরা লক্ষ্য করি। ছেলেরা ধূলায় মার্বেল খেলিতেছে। বালক জিন্নাহ্ বলিলেন– বন্ধুরা- শোনো। মার্বেল খেলা ভালো নয়। এ অতি নোংরা খেলা। হাত-পা, মুখে-চোখে ধূলা-বালি লাগে। আর বসে বসে বুড়োদের মতো খেলতে হয়। তার চেয়ে এসো আমরা ক্রিকেট খেলি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বীরের মতো খেলবো। গায়ে-হাতে ধূলা লাগবে না। পরিচ্ছন্ন সেই খেলা। মার্বেল খেলার চেয়ে ক্রিকেট খেলা শতগুণে ভালো। তাই নয় কি? কথাগুলির মধ্যে সেদিন আমরা কিশোর কায়েদের কথাই শুনিতে পাই নাই কি?

তরুণ ব্যারিষ্টার মিঃ জিন্নাহ্। বোম্বে হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করিতেই তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অতবড় হাইকোর্টে একমাত্র সার্থক মুসলিম ব্যারিষ্টার–তাও বয়সে নবীন। কিন্তু তবু তাঁর কী বলিষ্ঠ মনোবল! বিচারপতির সামনে তিনি যখন সওয়াল-জবাব করেন, তখন তাঁর ব্যক্তিত্বে ফুটিয়া উঠিত এক অপূর্ব দৃঢ়তা ও আত্মমর্যাদাবোধ। একবার এক জজ সাহেব জিন্নাহ্র কথা শুনিতে না পাইয়া বলিয়া ফেলিলেন–মিঃ জিন্নাহ্, আপনার কথা আমরা শুনিতে পাইতেছি না, একটু জোরে বলুন (We can't hear you, Mr. Jinnah, speak up) ইহাতে মিঃ জিন্নাহ্ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, আমি ব্যারিষ্টার, অভিনেতা নই। জজ সাহেব একটু দমিয়া গেলেন। কিন্তু জিন্নাহ্র কণ্ঠস্বর কিছুমাত্র উন্নীত হইল না দেখিয়া পুনরায় তিনি বলিতে বাধ্য হইলেন ঃ Mr. Jinnah, I must ask you speak louder. মিঃ জিন্নাহ্ এবার উত্তর দিলেন ঃ মিঃ লর্ড, যদি আপনি আপনার সম্মুখের স্তূপীকৃত পুস্তকগুলি সরাইয়া দেন, তবেই আপনি আমার কথা শুনিতে পাইবেন।

জজ সাহেব নিরুত্তর।

একবার একটি মামলার নথিপত্র লইয়া এক মক্কেল আসিলেন জিন্নাহ্র নিকটে। উদ্দেশ্য তিনি তাঁহাকে সেই মামলায় ব্যারিষ্টার নিয়োগ করিবেন। মক্কেল জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আপনার ফি কতো?

www.pathagar.com

মিঃ জিন্নাহ্ বলিলেন ঃ দৈনিক পাঁচশত টাকা।

মক্কেলের আশঙ্কা হইল তাঁহার মামলাটি দীর্ঘদিন স্থায়ী হইবে, কাজেই দৈনিক হিসাবে ফি দিতে গেলে তাঁহার অনেক টাকা লাগিবে। তিনি তাই বলিলেন, আমার কাছে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা আছে। দয়া করিয়া এই টাকাটাই আপনার গোটা ফি বাবদ গ্রহণ করিবেন কি?

মিঃ জিন্নাহ্ পাঁচ হাজার টাকা রাখিয়া দিলেন বটে, কিন্তু ওরূপ চুক্তিতে রাজী হইলেন না। বলিলেন, দৈনিক হিসাবেই আমি ফি গ্রহণ করিব। মাত্র তিনদিন শুনানীর পরই মিঃ জিন্নাহ্ সেই মামলায় জয়লাভ করিলেন। তিনি তখন উক্ত পাঁচ হাজার টাকা হইতে তিন দিনের ফি বাবদ দেড় হাজার টাকা কাটিয়া রাখিয়া বাকী সাড়ে তিন হাজার টাকা মক্কেলকে ফেরৎ দিলেন। মক্কেল বিস্মিত হইয়া গেলেন।

একবার এক মক্কেল মিঃ জিন্নাহ্র কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাঁহার ধার্যকৃত ফির উপরেও একটা মোটা টাকা পুরস্কারস্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন। জিন্নাহ্ সে টাকা গ্রহণ করেন নাই। একটা চিঠি লিখিয়া তিনি টাকাটা ফেরৎ পাঠাইলেন। চিঠিতে এইরূপ লেখা ছিল ঃ আপনি আমাকে দিয়াছেন সর্বমোট-----টাকা, তন্মধ্যে আমার ফি বাবদ পাওনা----টাকা। বাদবাকী------টাকা ফেরত পাঠাইলাম।

মিঃ জিন্নাহ্র বিবাহ ব্যাপারের মধ্যেও একই দৃঢ়তা, চরিত্রবল ও সৎসাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। বোম্বের বিখ্যাত পার্শী নেতা স্যার দীনশা পেটিটের পরমা সুন্দরী কন্যা রতনবাঈকে তিনি বিবাহ করেন। এই বিবাহে কন্যার পিতার আদৌ সম্মতি ছিল না। তিনি যখন শুনিলেন রতনবাঈ গোপনে গোপনে জিন্নাহ্র সহিত বাগ্‌দত্তা (betrothed) হইয়া আছেন তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। রতনবাঈয়ের বয়স তখন মাত্র ১৭ বৎসর। তিনি তাই আইনের আশ্রয় লইয়া কন্যার এই বিবাহ বন্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। কারণ আইন অনুসারে ১৮ বৎসর বয়স না হইলে স্বমতে বিবাহ করা যায় না। মিঃ জিন্নাহ্ ও রতনবাঈয়ের উপর তাই কোর্ট হইতে ইনজাংশন জারী হইল। ইনজাংশন জারী হওয়ার পর মিঃ জিন্নাহ্ রতনবাঈকে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে উপদেশ দিলেন এবং নিজেও সে অনুসারে চলিলেন। নির্দিষ্ট দিন আসিলে দেখা গেল, স্যার দিনশা পেটিটের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। যে আইনের তিনি আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহারই বলে উভয়ে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। সুতরাং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল তারিখের Statesman পত্রিকায় স্যার দীনশা এই মর্মে ঘোষণা দিতে বাধ্য হইলেন ঃ

"Miss Rattanbai only daughter of Sir Dinshaw Petit, yesterday underwent conversion to Islam and is today to be married to the Hon. Mr. M. A. Jinnah."

বলা বাহুল্য এই ব্যাপারেও মিঃ জিন্নাহ্র চরিত্র-মাধুর্য ও মনোবল উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। তাঁর প্রেমও মর্যাদাপূর্ণ। কোথাও কোনো বাড়াবাড়ি নাই। অশোভনতা নাই–সংযম ও শালীনতা দ্বারা সে প্রেম নিয়ন্ত্রিত। অতবড় পার্শী সম্প্রদায়ের নেতা স্যার দীনশা পেটিটকেই তরুণ জিন্নাহ্র নিকট নতি-স্বীকার করিতে হইয়াছে। জাতীয় মর্যাদাকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন না করিয়া সম্ভ্রমের সঙ্গেই তিনি রতনবাঈকে লাভ করিয়াছিলেন। রতনবাঈও

www.pathagar.com

জিন্নাহ্‌র মধ্যে এমন কিছু গৌরবজনক সম্পদ দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, শত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও তিনি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। সাবালিগা না হওয়া পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন। এরূপ অবস্থায় সচরাচর মেয়েদের মতি পরিবর্তন ঘটাইবার নানা প্রকার চেষ্টা করা হইয়া থাকে। অনেক সময় তাহাতে ফলও হয়। কিন্তু রতনবাঈয়ের উপর সব চেষ্টা, সব কৌশল ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গেল। পরম বিশ্বস্ততার সহিত তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন।

ব্যাপারটি ভাবিবার মতো। একে তো ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, তাহাতে যে-সে পিতা নন, ভারতের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা স্যার দীনশা পেটিট---অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক, রতনবাঈ তাঁহার একমাত্র সন্তান। সেই কন্যাকে পিতা যখন আইন দ্বারা মিঃ জিন্নাহ্‌র সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার পথে বাধা দান করিলেন, তখন এ বিবাহের সম্ভাবনা শুধুমাত্র একটা ক্ষীণ আশার সূত্রে দুলিতে লাগিল। জিন্নাহ্‌ ইচ্ছা করিলে হয়তো অন্য উপায়ে রতনবাঈকে লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু সেপথে তিনি যান নাই। রতনবাঈয়ের আন্তরিকতার উপর নির্ভর করিয়া তিনি তাঁহাকে স্বাধীনতা দিলেন এবং নিজে নিজের শপথে অটল থাকিয়া প্রহর গুণিতে লাগিলেন। প্রেম অন্ধ বলিয়া শোনা যায়। কিন্তু জিন্নাহ্‌র প্রেম ছিল প্রজ্ঞার আলোকে সমুজ্জ্বল।

বিবাহের কিছুদিন পরেই যে কাণ্ডটি ঘটে, তাহা আরও অপরূপ। জিন্নাহ্‌র নির্ভীকতার সে এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সেই সময় বোম্বের গভর্ণর ছিলেন লর্ড উইলিংডন। জিন্নাহ্‌র সহিত গভর্নরের যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। গভর্নর ও গভর্নর-পত্নী নব দম্পতিকে তাই এক প্রীতিভোজে নিজ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন। তখন ছিল শীতকাল। সুসজ্জিত ডাইনিং হলে বহু নিমন্ত্রিত গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছে। এমন সময় মিঃ জিন্নাহ্‌ সস্ত্রীক সেই হলে প্রবেশ করিলেন। গভর্নর গভর্নর-পত্নী আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। নির্দিষ্ট আসনে গিয়া উভয়ে উপবেশন করিলেন। রতনবাঈ সেদিন একটা খাটো ঝুলের গাউন পরিয়া গিয়াছিলেন। গভর্নর-পত্নী তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি ভাবিলেন খাটো পোষাকের দরুন মিসেস্‌ জিন্নাহ্‌ শরীরের নীচের অংশে শীত অনুভব করিতেছেন। তাড়াতাড়ি তিনি একজন এডিকংকে ডাকিয়া একটা শাল আনাইয়া তাঁহাকে দিলেন। ইহাতে মিঃ জিন্নাহ্‌র অনুভূতি আহত হইল। তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন ঃ মিসেস্‌ জিন্নাহ্‌ যদি শীত বোধ করেন, তবে তিনি নিজেই বলিবেন এবং নিজেই শীতবস্ত্র চাহিয়া লইবেন। এই বলিয়াই মিসেস্‌ জিন্নাহ্‌কে লইয়া হল হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সেই যে গেলেন, তারপর আর কোনোদিন তিনি গর্ভ্নরের বাড়ীতে যান নাই।

মনে হয় না কি, এই সব ঘটনার মধ্যে ভবিষ্যতের নির্ভীক ও স্পষ্টবাক কায়েদ-ই-আযমই উপস্থিত ছিলেন'।

মাহে-নও

ডিসেম্বর, ১৯৬৩

www.pathagar.com

নয়া জিন্দেগীর আহ্বান

পাকিস্তানের নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় সূচিত হবে।

বৃটিশ আমল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত পাশ্চাত্য শাসনতন্ত্র দ্বারাই আমাদের দেশ শাসিত হয়ে এসেছে। পাশ্চাত্য প্যাটানেইর পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রই ছিল এতদিন আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ। শুধু পাক-ভারত উপমহাদেশেই নয়, বর্তমান জগতের প্রায় সর্বত্রই এই শাসন প্রথারই প্রচলন দেখা যায়। সেই গণভোট, সেই আইন-পরিষদ, সেই পার্লামেন্ট, সেই মেম্বর, সেই মন্ত্রী–সমস্তই ইউরোপীয় প্যাটার্নের। এমন কি মুসলিম জাহানের সর্বত্রই এই আদর্শে শাসনতন্ত্র রচিত হচ্ছে। আযাদী লাভের পরও পাক-ভারতে বৃটিশ নীতিতেই দেশ শাসিত হচ্ছে। এমন কি ভারতে আজ পর্যন্ত পালিয়ামেন্টারী প্রথাই চালু রয়েছে। কোনো মৌলিক পরিবর্তন সেখানে আসেনি।

সারা জগত যখন পাশ্চাত্য-শাসনতন্ত্রের মোহে মুগ্ধ হয়ে তার অন্ধ-অনুকরণ করছে, তখন একমাত্র পাকিস্তান থেকেই সর্বপ্রথম এর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ এলো। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে যখন বিপ্লবী সরকার পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করলেন, তখন থেকেই আমরা এক নতুন পথে চলছি। এ পথ আগের সেই চলা পথ নয়; এর লক্ষ্য–আদর্শ নূতন, ধ্যান-ধারণা নূতন–যাত্রীরাও নূতন, রাহ্‌গীরও নূতন। প্রেসিডেন্ট ফিল্ড-মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ূব খান এই নূতন পথের দিশারী।

সমগ্র জগত একদিকে–পাকিস্তান একদিকে। স্বাবলম্বনের এমন দুর্জয় প্রতিজ্ঞা খুব কম দেখা যায়। বাইরের জগতে কতো দ্বন্দ্ব, কতো প্রলোভন; কতো ভয়ভীতি; কতো আকর্ষণ; সব তুচ্ছ করে আপন ঐতিহ্যে ফিরে আসবার এই শপথ নিশ্চয়ই আমাদের নূতন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। এত বড় সুঃসাহস একমাত্র ইসলামের সেই সোনালী যুগেই দেখেছি। মুষ্টিমেয় আরব-বীর যে মনোবলে বিহর্বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল, যে গভীর আত্ম-প্রত্যয়ে নূতন পথে জয়যাত্রা করেছিল, দীর্ঘদিন পরে আবার তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। এই নূতন বিপ্লব কতখানি সার্থক হয়েছে, কোথায় এর দোষত্রুটি আছে—আমি আজ তার বিচার করবো না। দোষত্রুটি তো থাকতেই পারে। আর প্রত্যেক নবগঠিত শাসনতন্ত্রে তা থাকেই। এতবড় যে British constitution, তাও একদিনে গড়ে ওঠেনি। হাজার বছরের ঘাত-প্রতিঘাতে এই "unwritten constitution" গড়ে উঠেছে। কাজেই সে বিচার আজ নয়। আজ শুধু শুক্‌রিয়া—আজ শুধু মুবারকবাদ, যেহেতু বিদেশী শাসনতন্ত্র থেকে আজ আমরা প্রকৃত মুক্তি লাভ করেছি। পাকিস্তানে পাশ্চাত্য প্যাটার্নের Parliamentary Democracy-র আজ অবসান ঘোষিত হচ্ছে আর তার যায়গায় কায়েম হচ্ছে আমাদের নিজস্ব গণতন্ত্র—পাক্ জম্‌হুরিয়াত। এটা আমাদের এক বিরাট মনের আযাদী। এর মধ্যে আছে আমাদের মুক্তির আনন্দ আর সৃষ্টির উল্লাস। ইকবাল ঠিকই বলেছেন ঃ "The slave imitates, the freeman creates." কাজেই, এই নূতন পাক-গণতন্ত্র নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব নূতন শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে পরিচয় দিতে গিয়ে কয়েকটি মূল্যবান কথা বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

"It is sometimes said that no matter how good a system, it won't work unless there are men to work it. This is partially true; but what is wholly true is this : That it is far more difficut to change a bad system than to change bad men. So, don't let us have a weak system because of the fear that we may not find suitable men to run it."

-"অর্থাৎ, সময় সময় বলা হয় যে, একটা নিয়মতন্ত্র যতই ভালো হোক না কেন, উপযুক্ত লোক না পেলে তা কিছুতেই কার্যকরী হয় না। একথা আংশিকভাবে সত্য, কিন্তু পুরোপুরি সত্য হচ্ছে এইঃ মন্দ লোককে পরিবর্তন করা যতো কঠিন, মন্দ পদ্ধতি পরিবর্তন করা তার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন। অতএব উপযুক্ত লোক পাওয়া যাবে না-এই আশঙ্কায় একটা দুর্বল নিয়মতন্ত্র যেন আমরা প্রবর্তন না করি। এ হবে একটা নিরাশার যুক্তি এবং এর কাছে আমাদের কিছুতেই আত্মসর্পণ করা উচিত নয়।"

অতি সত্য কথা। ভালো লোক না পেলে যতো ভালো শাসনতন্ত্রই হোক না কেন, কার্যকরী হয় না। কিন্তু তাই বলে শাসনতন্ত্রকে তো আর দুর্বল করে গড়া যায় না। শাসনতন্ত্র যাতে আদর্শ হয়, সেই দিকে আগে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। তারপর ভালো লোক খুঁজতে হবে,-তৈরি করে নিতে হবে।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের আর একটি কথাও অত্যন্ত মূল্যবান। জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন ঃ

"It would be the height of stupidity if they reinforce the system that had failed. They should adopt a system which could give their country satbility. The parliamentary system could work only in countries where political parties were stable and by commanding an overwhelming majority, could give their country a stanle government."

-"অর্থাৎ, যে পদ্ধতি ব্যর্থ হচ্ছে, তা পুনঃপ্রবর্তন করা তাদের পক্ষে হবে চরম মূর্খতা। এমন একটা পদ্ধতি তাদের গ্রহণ করা উচিত যা তাদের দেশকে স্থায়িত্ব দান করবে। পার্লামেণ্টারী পদ্ধতি কেবল সেই সব দেশেই চলতে পারে যে-সব দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর স্থায়িত্ব আছে এবং বিপুল সংখ্যাগরিষ্টতার দরুন তারা দেশে স্থায়ী সরকার গঠন করতে পারে।"

এ কথা সত্যই আজ আমাদের ভেবে দেখবার সময় এসেছে যে, আমরা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের উপযোগী কি-না। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র ঐসব দেশেই সার্থক হতে পারে— যেখানে স্থায়ী রাজনৈতিক দল আছে এবং প্রচুর সংখ্যাধিক্য (majority) দ্বারা যেখানে দলগত স্থিতিশীলতা রক্ষা করা যায়। কিন্তু আমাদের দেশ তো তা নয়। এখানে ব্যাঙের ছাতার মতো নূতন নূতন দল গজায়; দল নিয়ে শুধু দলাদলি, মারামারি, রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে। সুষ্ঠু রাজনৈতিক কোনো মতবাদ বা রাষ্ট্রদর্শন এখানে গড়ে ওঠেনি; ব্যক্তিগত এবং দলগত স্বার্থের জন্যই এখানে দল গঠন করা হয়। এ অবস্থায় পাশ্চাত্য শাসনতন্ত্রকে হুবহু এখানে নকল করতে গেলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। দেশের নাড়ির সঙ্গে যোগ রেখে, আলো-বাতাসের সঙ্গে খাপ খাইয়ে, জাতীয় ঐতিহ্যের দাবী মিটিয়ে এখানকার শাসনতন্ত্র রচনা করতে হবে। কাজেই, আদর্শের দিক দিয়ে এবং যৌক্তিকতার দিক দিয়ে

www.pathagar.com

পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র যে মূলতঃ অন্য দেশের শাসনতন্ত্র অপেক্ষা খানিকটা স্বতন্ত্র হবেই– এ কথা স্বতঃসিদ্ধ। আরও একটি বিশেষ কথা এইঃ দল যেখানে বেশী, গণতন্ত্র সেখানে অচল। গণতন্ত্রের গোড়ার কথা হলো সংখ্যাধিক্যের শাসন (rule of the majority)। কিন্তু যে দেশ বহু দলে বিভক্ত, সে দেশের ভোটাভুটিতে মেজররিটিই বা কারা, আর মাইনরিটিই বা কারা বুঝা কঠিন। সে প্রশ্ন অবান্তরও বটে। ধরুন, একটি কেন্দ্রে ১০,০০০ ভোটার; সেখানে ১০টি রাজনৈতিক দল থেকে ১০জন প্রার্থী। ভোট ভাগাভাগি হয়ে একজন প্রার্থী মাত্র ১,৫০০ (কিংবা তার কিছু বেশী-কম) ভোট পেয়েই ইলেক্‌শনে জয়লাভ করতে পারে। কিন্তু গোটা ভোটদাতাদের তুলনায় ১,৫০০ তো সামান্য একটা মাইনরিটি মাত্র। অথচ দলের আধিক্য বশতঃ তারাই সেখানে মেজরিটি! এর নাম কি গণতন্ত্র?

মাথা-গুনতির এই গণতন্ত্র ইসলাম সমর্থনও করে না। এ গণতন্ত্র শুধু secular state-এর জন্যই উপযোগী। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে প্রতিটি মানুষকে ভোটাধিকার দেওয়া হয়, তার কারণ আছে। সেখানকার রাষ্ট্রদর্শনের মূল নীতিই হলো ঃ "sovereignty belongs to the people." অর্থাৎ সার্বভৌমিক ক্ষমতা গণ-মানুষের হাতে। সেইজন্য কোনো মেম্বর বা প্রেসিডেন্টকে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে চূড়ান্ত সমর্থন চাইতে হয় গণ-মানুষের কাছে। কিন্তু ইসলামের রাষ্ট্রনীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইসলামের সার্বভৌমিকতা মানুষের হাতে নয়—আল্লাহ্‌র হাতে। ইসলাম বলে ঃ "Sovereignty belongs to Allah." কাজেই পাকিস্তানকে আমরা ইসলামী স্টেটও করতে চাইব, আবার secular state-এরও আইন-কানুন মেনে চলবো–এ কোনো যুক্তি নয়।

ইসলামী রাষ্ট্র এখন গঠনের মুখে। এর জন্য কোনো বিধিবদ্ধ আইন-কানুন নেই। একে এখন সুষ্ঠভাবে আমাদের গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু এ কাজ সহজ নয়। কোনো দেশের কোনো শাসনতন্ত্রই একদিনে নিখুঁত-হয়নি। Ideal state বা আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন আজকার নয়, প্লেটো-এরিস্টটলের সময় থেকেই এই ধ্যান মানুষের মনে জেগে আছে। এরপর মধ্যযুগে Locke, Hume, Hobbs, Roussseau, Voltaire প্রভৃতি বহু রাজনৈতিক দার্শনিক এ ভিষয়ে বহু আলোকপাত করেছেন। অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীতে কার্লমার্ক্সের হাতে রাষ্ট্রদর্শনের এক নবরূপায়ণ ঘটেছে। কিন্তু এখানেও এর শেষ হয়নি। বর্তমান যুগেও Harold Laski, Bertrand Russel, Bernard Shaw সমুখ অসংখ্য লেখক রাজনৈতিক দর্শনের উপর বহু গ্রন্থ লিখেছেন। সর্বশেষ প্রচেষ্টা United Nations Organisation (UNO)-তে এসে পৌছেছে। আদর্শ-সুন্দর কোনো রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা এখানেও যে সার্থক হয়ে ওঠেনি, একথা সকলেই জানেন।

অবস্থা যখন এই, তখন নবগঠিত পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র যে নিখুঁত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, সে আশা করা যায় না। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাথে সাথে এরও উন্নতি ও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী! দেশবাসীর এখন উচিত এই নূতন প্রচেষ্টাকে সর্বপ্রকারে সার্থক করে গড়ে তুলতে সাহায্য করা। চিন্তাশীল উলেমা, রাজনীতিক, কবি-সাহিত্যিক, কর্মী, ছাত্র—প্রত্যেকেরই সাহায্যের প্রয়োজন আছে। তাঁরা এগিয়ে আসুন এবং সুন্দর, সুখী ও স্থিতিশীল পাকিস্তান গড়ে তুলবার গৌরবময় ভূমিকায় অংশগ্রহণ করুন।

মাহেনও

মার্চ, ১৯৬২

www.pathagar.com

আমরা কেন স্বতন্ত্র নির্বাচন চাই

স্বতন্ত্র নির্বাচনের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি-প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। পাকিস্তানের বর্তমান শাসন-ব্যবস্থায় যুক্ত-নির্বাচন প্রবর্তিত হইলে মুসলমানদের কী কী ক্ষতি হইতে পারে এবং কেমন করিয়া কোন্ পথ দিয়া সেই ক্ষতি আসিতে পারে দূরদর্শী রাজনৈতিক চিন্তাবিদেরা তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। আমি সেই দিক দিয়া আজ কোনো কথা বলিব না। আমাদের জাতীয় লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও আদর্শের দিক দিয়াই আজ এ বিষয়ের উপর কিছুটা আলোকপাত করিব।

একথা সকলেই জানেনঃ টু-নেশন থিওরীর উপরেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই নীতির প্রবর্তক কায়েদ-ই-আযম কিন্তু কায়েদ-ই-আযম নিজে এ-নীতি উদ্ভাবন করেন নাই। চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই এ নীতি জগতে বিঘোষিত হইয়াছে। দ্বিজাতিত্বের ভিত্তির উপরেই ইসলামিক সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। উহা আল্লারই বিধান। কুরআন উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে ঃ "ইন্নামাল মুমিনুনা ইখ্ওয়াতুন" (মুসলমানেরা এক জাতি)-এই কথা বলিলে স্বাভাবিক ভাবেই দুই জাতির কথা আসিয়া পড়ে। মুসলমানেরা যদি এক জাতি হয়, তবে অবশিষ্ট যাবতীয় অ-মুসলমানেরাও আরেক জাতি হইয়া দাঁড়ায়। ইহার উপরেও রাসূলুল্লাহ্ বলিয়াছেনঃ "আল্-কুফ্রো মিল্লাতাঁও ওায়হেদা" (অবিশ্বাসীরা এক জাতি)। তাহা হইলে কুরআন ও হাদিস উভয়ের দ্বারাই দ্বি-জাতিতত্ব স্বীকৃত ও প্রতিপন্ন হইতেছে।

ইহাই হইল দ্বি-জাতিতত্ত্বের গোড়ার কথা। যাহারা মনে করেন কায়েদ-ই-আযম গোঁড়ামী করিয়া সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বশে ভারতের হিন্দু-মুসলমানকে দুই স্বতন্ত্র জাতিতে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহারা ভ্রান্ত। টু-নেশন-থিওরী কায়েদ-ই-আযমের মনগড়া রাজনৈতিক মতবাদ নয়, ইসলামের গভীর সত্যের এ বাস্তব উপলব্ধি।

এখন, কথা হইতেছে, মুসলমানদিগকে আল্লাহ্ স্বতন্ত্র জাতি রূপে কেন ঘোষণা করিলেন। ইহারও কারণ আছে। কোনো সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি বা জাতি-বিদ্বেষের কথা এর মধ্যে নাই। বৃহত্তর মানব-কল্যাণের জন্যই মুসলমানদিগকে পৃথক বা স্বতন্ত্র জাতি রূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

তওরাত, যবুর এবং বাইবেল যাহারা পড়িয়াছেন, তাহারা একটা কথার সহিত নিশ্চয়ই পরিচিত হইয়াছেন। সে কথাটি হইতেছে ঃ "covenant" অর্থাৎ চুক্তি বা একরারনামা। কুরআন শরীফেও বহু স্থানে এ কথার উল্লেখ আছে। আল্লাহ্ ইহুদী ও খৃষ্টান জাতির সঙ্গে বারে বারে চুক্তি-সম্পাদন করিয়াছেন। চুক্তিতে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, ইহুদীরা ও খৃষ্টানেরা যদি আল্লাহ্‌কে প্রভু বলিয়া মানে এবং তাঁহার বিধান অনুযায়ী চলে, তবে আল্লাহ্ও তাহাদের উপর নানা অনুগ্রহ বর্ষণ করিবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বারে বারে ওয়াদা করিয়াও ইহুদী ও খৃষ্টানেরা সে ওয়াদা রক্ষা করে নাই। (দেখুন ঃ সুরা মারদার ১২-১৪ আয়াত্) আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল, তাঁর হুকুমাত (হুকুমাতে ইলাহিয়া) জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। পাদ্রীদের মুখেও এই "Kingdom of God" বা "Kingdom of Heaven" এর কথা শোনা যায়। কিন্তু আল্লাহ্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ইহুদী বা নাসারাদের হাতে

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র রাজ্য দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বা হইবার আশা নাই। আল্লাহ্‌র শর্ত এমন কিছু কঠিনও নয়। আল্লাহ্‌র একত্ব ও প্রভুত্ব স্বীকার এবং মানুষকে সমঅধিকার দান—এই সহজ স্বীকৃতির উপরেই 'স্বর্গ-রাজ্য' কায়েম হইতে পারিত। কিন্তু বনি-ইসরাঈল গোষ্ঠী দুইটি শর্তের একটিও পালন করে নাই। আল্লাহ্‌কে তাহারা অস্বীকার করিয়াছে, আল্লাহ্‌র নবীদিগকে হত্যা করিয়াছে, আল্লাহ্‌র বাণীকে বিকৃত করিয়াছে, পক্ষান্তরে মানুষের উপরেও তাহারা অকথ্য জুলুম করিয়াছে এবং পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও পার্থক্যের দেওয়াল তুলিয়া দিয়াছে। খোদাদ্রোহিতা এবং মানব-বিদ্বেষ তাহাদের রক্তে মিশিয়া আছে। এই মনোভাব লইয়া কেহই কোনোদিন জগতে কোনো আদর্শ-ভিত্তিক রাষ্ট্র বা সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারে না। মুনাফেকী ও শঠতা কোনোদিন জয়যুক্ত হয় না। বলা বাহুল্য, ইহুদী ও খৃষ্টান-জগতের কোনো রাষ্ট্র বা সমাজ-ব্যবস্থাই তাই কোনো কালেই সফল হয় নাই। মানবজাতির কোনো কল্যাণই তাহারা সাধন করিতে পারে নাই। প্রাচীন গ্রীসে সক্রেটিস ও প্লেটো "Ideal state" বা আদর্শ-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন ; সেই হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যযুগে রুশো, ভল্টিয়ার, লক্‌, হিউম প্রমুখের সমাজ-তন্ত্রবাদ, পরবর্তী কালের ফ্যাসিবাদ ও সমূহবাদ (কমিউনিজম) এবং অতি আধুনিক যুগের লীগ-অব-নেশনস ও ইউ-এন-ও প্রতিষ্ঠান—সবকিছুর ইতিহাসই ব্যর্থতা ও ধোকাবাজির ইতিহাস। জগতে আজ পর্যন্ত ইহারা 'স্বর্গ-রাজ্য' স্থাপন করিতে পারে নাই, পারিবেও না।

বনি-ইসরাইল শাখা ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু বাকী আছে বনি-ইসমাইল শাখা। হযরত ইব্রাহিম এবং ইসমাইলের সঙ্গেও আল্লাহ্‌ চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং সে চুক্তি এখনও বলবত আছে। আল্লাহ্‌র হুকুমাত প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্‌র-খলিফা (Vicegerent) দুনিয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছে, সে হুকুমাতের বিধিবদ্ধ আইন-কানুন (আল-কুরআন) জারি হইয়াছে, সে স্বর্গরাজ্যের রাজধানীও (মক্কা) সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানবতা তাই ব্যাকুল আগ্রহে এই স্বর্গরাজ্যের প্রতি চাহিদা আছে। এই শাসনতন্ত্রেই বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত মানুষ তার হারানো অধিকার ফিরিয়া পাইবে। নূতন নূতন মতবাদে মানুষের মন এখন বিরক্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, ইসলামী রাষ্ট্রের কাছে তাই তাহারা শান্তির আশা করিতেছে।

পাকিস্তান এই ধ্যান-ধারণা ও আশা-আকাঙ্খারই প্রতীক। আজ তাই পাকিস্তানকে "ইসলামিক রিপাবলিক" বলিতে আমাদের কোনো লজ্জা নাই, সংকোচ নাই। জগত জোড়া নিরাশার মধ্যে কপালে লেবেল্‌ আঁটিয়াই পাকিস্তান আজ ইসলামী রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'মোহামেডান স্পোটিং'-এর মতো 'তাজমহলের' মতো আপন শ্রেষ্ঠত্ব ও চমৎকারিত্ব দিয়াই প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় সে আজ বহির্বিশ্বের শ্রদ্ধা কুড়াইবে।

মুসলমান তাই স্বতন্ত্র একটি জাতি। এই স্বাতন্ত্র্যের অর্থ সংকীর্ণতা নয়, এটা তার বৈশিষ্ট্যের পরিচয়। অপর সকলের দ্বারা যাহা সম্ভব হয় নাই, মুসলমানের দ্বারা তাহা সম্ভব হইবে—এই জন্যই সকলের মধ্য হইতে তাহাকে পৃথক করিয়া আনা হইয়াছে। মুসলমানকে এই স্বতন্ত্র রূপ কেন দেওয়া হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ কুরআন-শরীফে কি বলিতেছেন দেখুন ঃ

www.pathagar.com

"ওয়া ফাযা-লিকা জা-আল্না-কুম উম্মাতাঁও ওয়াসাতা"--------

অর্থাৎ ঃ আমি তোমাদিগকে মহান জাতিরূপে গড়িয়া তুলিয়াছি, যাহাতে তোমরা আমার বাণী অপর সকলের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারো"... (২ ঃ ১৪৩)

অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

"কুনতুম্ খায়রা-উম্মাতিন্ উখরিজাত লিন্নাসে তা'মুরুনা বিল্ মা'রুফে"....

অর্থাৎ ঃ মানব কল্যাণের দিক্ দিয়া তোমাদিগকেই আমি শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছি; যাহা ভালো তাহাই তোমরা সকলকে করিতে নির্দেশ দিবে, যাহা মন্দ তাহা করিতে নিষেধ করিবে এবং আল্লাহ্তে বিশ্বাস রাখিবে।....(৩ ঃ ১০১)

মুসলমানেরা যে কেন স্বতন্ত্র জাতি, এইখানে তাহার সন্ধান মিলিবে। একটা বিশেষ দায়িত্ব-পালনের জন্যই তাহাদিগকে স্বতন্ত্র হইতে হইয়াছে। বলাবাহুল্য, এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই তাহাদের তাহজিব-তমদ্দুনও স্বতন্ত্র হইয়াছে। কাজেই কায়েদ-ই-আযম যে বলিয়া গিয়াছেন ঃ "আমরা স্বতন্ত্র একটি জাতি এবং আমাদের কাল্চারও স্বতন্ত্র"– এ কথা অতি সত্য।

আজ জগত ভৌগলিক স্বাদেশিকতার আদর্শে অভিশপ্ত হইয়া আছে। যে যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সে শুধু সেখানকার কথাই ভাবিতেছে। দেশ-প্রাচীরের বাইরে যেসব মানুষ আছে, তাহাদিগকে সে আর ভাই বলিয়া কাছে ডাকিতে পারিতেছে না। ভৌগলিক সংলগ্নতা (Geographical contignity) না থাকিলে এক-ধর্মাবলম্বীদিগকেও একই জাতি বা স্টেট বলিয়া স্বীকার করা সম্ভব হইতেছে না। ইউরোপীয় রাষ্ট্র-দর্শন তাই মানব-জাতিকে শতধা খণ্ডিত করিয়া ফেলিয়াছে। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের সংঘাতে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস আজ মুখরিত। একমাত্র ইসলামই আজ প্রচলিত রাষ্ট্র-দর্শন ও সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নূতন আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছে। দেড়হাজার মাইল দূরবর্তী দুইটি দেশ লইয়াও যে একটি রাষ্ট্র বা জাতি গঠিত হইতে পারে, পূর্ব ও পশ্চিমকে যে এক নিশানের তলে মিলানো যাইতে পারে–ইসলামই তাহা জগতকে দেখাইয়াছে। এক নূতন রাষ্ট্র-দর্শনের পরীক্ষা বা experiment চলিয়াছে পাকিস্তানে। এ আদর্শ সফল ও কার্যকরী হইলে ইহা বহির্বিশ্বের দিকে দিকে বিস্তৃত হইয়া যাইবে। কালে কালে এই পাকিস্তানের আদর্শেই একটা বিশ্ব-গভর্নমেন্ট (Global Goverment) স্থাপিত হইবে এবং প্রত্যেক জাতির ন্যায্য অধিকারই সেখানে স্বীকৃত হইবে। এক-পৃথিবীর (One world)-এর স্বপ্ন আজ আমাদের চোখে ঘনাইয়া আসিয়াছে। সেই স্বপ্নকে বাস্তব রূপদান করাই হইবে পাকিস্তানের অনাগত দিনের প্রধান ভূমিকা; কারণ তাহার সামনে আছে এক পৃথিবী ও এক মানব জাতির আদর্শ ঃ

"কানান্নাসা উম্মাতাঁও ওয়াহেদা"–

অর্থাৎ ঃ সমগ্র মানবমণ্ডলী এক জাতি।

এই নূতন চিন্তা ও নূতন আদর্শের সূত্র ধরিয়া বহু সংঘর্ষের পর আমরা পাকিস্তানক লাভ করিয়াছি। নিতান্ত দুঃখের বিষয় কায়েদ-ই-আযমের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরই

www.pathagar.com

আমাদের মধ্যে একদল লোক সেই পুরাতন পদ্ধতি ও আদর্শের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছে। সুদূর ভবিষ্যতের চিন্তা না করিয়া, নিজেদের গুরু দায়িত্বের কথা না ভাবিয়া, বৃহত্তর মানবকল্যাণের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অন্ধ আবেগে অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তাহারা যুক্ত-নির্বাচন চাহিতেছে। যুক্ত-নির্বাচন-নীতি গ্রহণ করিলে যে পাকিস্তানের মূল-নীতিরই বিরোধিতা করা হয়, পাকিস্তানের মূলনীতি অস্বীকার করিলে যে পাকিস্তানকে টিকাইয়া রাখিবার আর কোনো যৌক্তিকতা থাকে না এবং পাকিস্তান গেলে যে সেই সঙ্গে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের প্রদত্ত বিধানকেও মিটাইয়া দেওয়া হয়, একথা বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন রাখে না। ইহা দ্বারা শুধু যে পাকিস্তানই ধ্বংস হইবে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-মানুষের এক চরম দুর্দিনও ঘনাইয়া আসিবে।

পাকিস্তান আজ ইসলামী রাষ্ট্র। এর লক্ষ্য ও আদর্শের রূপদানের জন্য তাই চাই আমরা একদল যোগ্য মুসলমান। বিরুদ্ধ ধ্যান-ধারণা ও ভিন্ন আদর্শের পূজারীদের সহযোগিতায় এ-রাষ্ট্র চালাইতে গেলে গণমানুষের মুক্তির পথ অনির্দিষ্ট কালের জন্য রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (secular state) ভারতে যুক্ত-নির্বাচন প্রথার ফলাফল আমরা লক্ষ্য করিতেছি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সেখানে লাগিয়াই আছে, মুসলিমদিগের শুদ্ধিকরণ সেখানে অবাধে চলিতেছে, বহুভাবে মুসলমানেরা সেখানে নির্যাতিত হইতেছে। ঠিক তাহারই পাশে ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নির্বিঘ্নে তাহাদের ধর্ম-কর্ম পালন করিতেছেন। এই শান্তি ও নিরাপত্তাই হইবে আমাদের লক্ষ্য। যুক্ত-নির্বাচন দ্বারা যদি অশান্তির আগুন জ্বলে, তবে সে যুক্ত-নির্বাচন দিয়া আমরা কি করিব?

আজ এই কঠিন জাতীয় দুর্দিনে দলনির্বিশেষে সমস্ত মুসলমানকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইঃ তাঁহারা এই ব্যাপারে একমত হউন। মানুষকে তাহার ন্যায্য অধিকার দিবার জন্য পাকিস্তান এক নূতন রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন করিয়া জগতকে চ্যালেঞ্জ দিয়াছে। ইহা কোনো সাম্প্রদায়িক অভিযান নয়; মানবতার মুক্তির অভিযান। কে আছো যুবক, কে আছো তরুণ, কে আছো আদর্শবাদী, কে আছো স্বাপ্নিক কায়েদ-ই-আযমের মতো স্বতন্ত্র হইবার দুর্জয় সৎসাহস ও গভীর আত্ম-প্রত্যয় লইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াও। নূতন পৃথিবী তোমাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

শান্তিনগর, ঢাকা

১৯৫০

www.pathagar.com

মার্কস্-ইজ্‌ম্ কি বাঁচিয়া আছে?

কোনো একজন সুরসিক লেখক বলিয়াছেন ঃ "All isms have become wasms" (অর্থাৎ সমস্ত ইজ্‌ম্‌ই এখন বাসি হইয়া গিয়াছে) মার্কস্-ইজ্‌ম্ সম্বন্ধেও কি তাই?

কমিউনিজমের বুনিয়াদ হইল মার্কস্-ইজ্‌ম্। কমিউনিজমের যুক্তি, দর্শন ও অঙ্গীকার সমস্তই মার্কসের। কমিউনিজ্‌ম্ কেন আসিবে, কেমন করিয়া পুঁজিবাদের পতন হইবে, কমিউনিজ্‌ম্ প্রবর্তিত হইলে মানুষের কি কি সুখ-সুবিধা ঘটিবে, ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে মার্কস্ বহু যুক্তি-প্রমাণ ও ভবিষ্যৎবাণী রাখিয়া গিয়াছেন। সেই সব প্রমাণ ও অঙ্গীকারে বিশ্বাস করিয়াই রাশিয়ার বলশেভিকরা নিজ দেশে কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা করে। আজ ত্রিশ বৎসরেরও ঊর্ধ্বকাল হইতে রাশিয়ায় কমিউনিজ্‌ম্ চলিতেছে। মার্কসের সমস্ত থিওরী সেখানে পরিলক্ষিত হইয়াছে। কাজেই আমরা এখন দেখিতে চাই ঃ মার্কসের মতবাদ ধোপে টিকিয়া গিয়াছে কি না; অন্য কথায় মার্কস্‌বাদ এখনও বাঁচিয়া আছে কি না।

(১) মার্কস্ চাহিয়াছিলেন ঈশ্বরহীন ধর্মহীন ও শ্রেণীহীন সমাজ। ধর্মকে তিনি আফিম (opium of the people) বলিয়া নির্বাসন দিয়াছিলেন। কিন্তু মার্কসের এই আশা সফল হয় নাই। ধর্মভাব মানুষের মনের সহজাত একটি বৃত্তি। সেই স্বভাবধর্মের বিরুদ্ধতা করিয়া মানুষ বেশীদিন টিকিয়া থাকিতে পারে না; একটা প্রতিক্রিয়া আপনা আপনিই দেখা দেয়। সোভিয়েট রাশিয়াতেও তাহাই ঘটিয়াছে। নির্বাসিত ধর্ম দিনে দিনে আবার ফিরিয়া আসিতেছে ; গীর্জাতে আবার লোকেরা যাওয়া-আসা করিতেছে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলির তো কথাই নাই। সোভিয়েট রাশিয়া হইতে সহস্র মুসলমান এখনো প্রতি বৎসর মক্কা-শরীফে হজ করিতে যায়। সোভিয়েট রাশিয়া এই জন্যই ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদের নীতির পরিবর্তন করিয়াছে; এখন সে অনেকটা ধর্মের স্বাধীনতা দিয়াছে। ধর্ম এখন সেখানে একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার।

অপর দিক দিয়াও মার্কসের এই অধর্মের অভিযান সফল হয় নাই। এক ধর্মকে তাড়াইতে গিয়া আর এক ধর্মের ভূত আসিয়া কমিউনিস্টদের ঘাড়ে চাপিয়াছে। কমিউনিস্টদের নিকট এখন মার্কস্‌ই হইতেছেন ঈশ্বর এবং মার্কস্‌বাদ বা কমিউনিজ্‌ম্‌ই হইয়াছে তাহাদের ধর্ম। মার্কসের 'ক্যাপিটাল'কে (Das Kapital) কমিউনিস্টরা একটা প্রেরণাপূর্ণ, অবতীর্ণ ও অব্যর্থ গ্রন্থ ("revealed, inspired and infallible") বলিয়া মনে করে এবং এই জন্যই 'ক্যাপিটাল'কে 'শ্রমিকদিগের বাইবেল' বলা হয়। খৃষ্ট ধর্মের অন্যান্য ক্রিয়া-কলাপ ও অনুষ্ঠানের সহিতও এই নূতন ধর্মের অবিকল মিল আছে। খৃষ্টধর্মে অবিশ্বাসীদিগকে যেমন পুড়াইয়া মারিবার ব্যবস্থা (Inquisition) ছিল, কমিউনিজ্‌মে অবিশ্বাসীদিগকেও তেমনি ভাবে হত্যা করা হইয়াছে। Iljin নামক জনৈক লেখকের "The world on the Brink of the Abyss" গ্রন্থ হইতে জানা যায় ঃ কমিউনিজ্‌ম্‌কে স্বীকার না করার অপরাধে অথবা কমিউনিজ্‌ম্-বিরোধী কোনো কাজে লিপ্ত

www.pathagar.com

থাকিবার কোনোরূপ সত্য বা অমূলক সন্দেহে বলশেভিকরা মোট ১,৮৬০,০০০ লোককে হত্যা করিয়াছে, তন্মধ্যে ২৮ জন বিশপ, ১২০০ জন পাদ্রী, ৬০০০ জন শিক্ষক, ৬৮০০ জন ডাক্তার, ১৯২০০০ জন শ্রমিক এবং ৮১৫,০০০ জন কৃষক (Economics of Islam : P. 80) । খৃষ্টানদের যেমন Rome, কমিউনিস্টদের তেমনই Kremlin. এইরূপে খৃষ্ট ধর্মের যাবতীয় ভূতই এখন কমিউনিস্টদের ঘাড়ে চাপিয়া ধর্মকে তাড়াইবার অপচেষ্টার প্রতিশোধ লইতেছে! স্বভাবের নিকট মার্কস্‌বাদ এইরূপে পরাজিত হইয়াছে।

(২) পুঁজিবাদকে তুলিয়া দিয়া দেশে পূর্ণ সাম্যবাদ স্থাপন করাই ছিল কমিউনিজ্‌মের প্রধান অঙ্গীকার। উহার মূল উদ্দেশ্য ছিলঃ দেশের সমস্ত শিল্পকে জাতীয়করণ (Nationalized) করিয়া দেশবাসীর অর্থ-বৈষম্যকে দূর করা এবং সর্বপ্রকার শ্রেণী-বিভাগ তুলিয়া দিয়া সকলকেই সমঅধিকার দান করা। স্টেট্ (State) অথবা ডিক্টেটরশিপ (Dictatorship) প্রতিষ্ঠাও কমিউনিজমের আসল উদ্দেশ্য ছিল না। সর্ব সাধারণই হইবে দেশের মালিক, ডিক্টেটর নয়, স্টেটও নয়– ইহই ছিল তাহার আদিম পরিকল্পনা। তবে যেহেতু এই চরম সাম্য রাতারাতি আনা যায় না, তাই সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবেই ডিক্টেটর ও স্টেটের প্রয়োজন হইয়াছিল। কথা ছিলঃ লোকেরা যখন সাম্যবাদের আদর্শ পুরাপুরি গ্রহণ করিতে পারিবে তখন এই ডিক্টেটরশিপ এবং স্টেট–দুইই উড়িয়া যাইবে ("The state will wither away"—Lenin) । আবার একথাও ছিল যে, ডিক্টেটর যিনি হইবেন, তিনি জনসাধারণের প্রতিনিধি রূপেই দেশ শাসন করিবেন–স্বাধীন ভাবে বা স্বেচ্ছাচারীরূপে নয়। পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইলে সাম্যনীতিও পরিবর্তিত হইবে। এখন যেমন যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেকের মজুরী বা ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়, তখন আর সেরূপ হইবে না। তখন যাহার যাহা প্রয়োজন হইবে, সে তাহাই পাইবে। (From each according to his capacity to his need" ইহাই হইবে চরম সাম্যের মূলমন্ত্র।

কিন্তু এই ৩০ বৎসরের সাধনার পর আমরা সোভিয়েট রাশিয়ায় কি দেখিতেছি? স্টেট বা ডিক্টেটরশিপ কি ধীরে ধীরে উঠিয়া যাইবার অবস্থায় আসিয়াছে? প্রয়োজন অনুযায়ী সবই পাইব—এমন অবস্থা কি সম্ভব হইয়াছে? কখনোই না। বরং উল্টা ফলই ফলিয়াছে। স্টেট উঠিয়া যাওয়া তো দূরের কথা, ডিক্টেটরই এখন সর্বেসর্বা। ডিক্টেটরের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া তো দূরের কথা, ডিক্টেটরই এখন সর্বময় কর্তা। লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিন সেই যে রাশিয়ার ভাগ্য-বিধাতা হইয়াছেন, আর সেখান হইতে তাঁহার সরিবার কোনো মতলব নাই।

সাম্যবাদের মূলনীতি ছিলঃ Power must not be concentrated in the hands of an individual" (অর্থাৎ ঃ এক হাতে কিছুতেই যেন শক্তি কেন্দ্রীভূত না হয়), কিন্তু স্ট্যালিন সমস্ত শক্তি নিজের হাতে লইয়া এই নীতির মর্যাদা রক্ষা করিতেছেন। ডিক্টেটর পদ হইতে তাঁহাকে হটায়, এমন শক্তিমান পুরুষ আজ সোভিয়েট রাশিয়ায় নাই।[১]

---

১. রাশিয়ায় এখন ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ ঘটেছে। আলেক্সি কোসিগিন বর্তমানে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী; কিন্তু তিনি পার্টিপ্রধান নন।

www.pathagar.com

রাশিয়ায় প্রেরিত আমেরিকার ভূতপূর্ব রাজদূত Joseph E. Davies তাহার Mission to Moscow নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন ঃ

"The Government is a Dictatorship, not of the proletariat, as professed, but over the proletariat. It is completely dominated bu one man."

অর্থাৎ ঃ সোভিয়েট রাশিয়া ডিক্টেটরশিপ প্রচলিত; ডিক্টেটর এখন আর পূর্ব প্রতিশ্রুত শ্রমিক সাধারণের ডিক্টেটর নহেন, এখন তিনি শ্রমিক

সাধারণের উপরে ডিক্টেটর। এটা সম্পূর্ণরূপে একজন লোকের কর্তৃত্বাধীন।

বস্তুত, সোভিয়েট রাশিয়াকে এখন আর সাম্যবাদী বলা চলে না। নামে না হইলেও, কাজে এখন সে পুরাদস্তুর সাম্রাজ্যবাদী বা ফ্যাসিবাদী। সোভিয়েট রাশিয়া এখন প্রকৃতপক্ষে Britsh Commonwealth-এরই অনুরূপ। অথবা ইহাকে সম্পূর্ণ এক নূতন ধরনের রাষ্ট্র আদর্শও বলা যায়। Mr. Masani ঠিকই বলিয়াছেন ঃ

"Actually a third variety of State is not only possible, but is already coming to existence, and one of the countries where you can see it to-day is Russia."—Socialism Re-considered : P. 28.

(৩) কমিউনিস্টদের প্রস্তাবনা ছিলঃ শুধু রাশিয়াতে কমিউনিজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠিত করিয়াই তাহারা সন্তুষ্ট থাকিবে না, অন্যান্য দেশেও তাহারা নিজেদের মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে এবং ইহার জন্য প্রয়োজন হইলে তাহারা বিপ্লব ও রক্তপাতও ঘটাইবে। এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়াই তাহারা মস্কোতে Communist International বা Comintern স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল। ইহা একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন বিশেষ।

এই কমিনটার্ণ ছিল অন্যান্য নন্-কমিউনিস্ট দেশের পক্ষে মস্তবড় এক বিভীষিকা। আশ্চর্যের বিষয়, গত ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে স্ট্যালিন এই Comintern ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। ফলে জোর রিয়া ভিন্ন দেশে কমিউনিজ্‌ম্ চালাইবার সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। Comintern-এর পরিবর্তে এখন Cominform স্থাপিত হইয়াছে। ইহা আত্মগঠনমূলক, আক্রমণমূলক নয়। সাম্রাজ্যবাদী অন্যান্য শক্তির সহিত মৈত্রী স্থাপন না করিলে সোভিয়েট রাশিয়ার চলে না; তাই বাধ্য হইয়া সে তাহার মূলনীতি পরিত্যগ করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের সহিত এইখানে কমিউনিজমের আপোষ হইয়াছে।

(৪) মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (historical materialism)-ও বাস্তবশূন্য নিছক কল্পনা। মার্কস্ বলেনঃ জগতের ইতিহাস শ্রেণী সংঘর্ষেরই ইতিহাস। ("The history of all hitherto existing societies is the history of class struggles.") আযাদ ও গোলামে, ধনিক ও শ্রমিকে, জালিম ও মজলুমে–যুগে যুগে চলিয়াছে অবিশ্রান্ত সংঘর্ষ (uninterrupted struggle) তারই ফলে দেশে দেশে রচিত হইতেছে ইতিহাস। কিন্তু মার্কসের এই থিওরি জগতের ইতিহাস সমর্থন করে কি? নিশ্চয়ই না। দাস-মুক্তির ইতিহাসের কথাই ভাবুন। মার্কসের থিওরি অনুসারে যুগে

www.pathagar.com

যুগে দাসেরা করিয়াছে মনিবদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং তাহারই ফলে লাভ করিয়াছে তাহারা আযাদী। কিন্তু ঐকথা একেবারে মিথ্যা । দাসেরা যুদ্ধ করিয়া নিজেদের মুক্তি আনে নাই। মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং লিঙ্কন প্রমুখ উদারমনা মহদ্ব্যক্তিদের চেষ্টাতেই দাসমুক্তি আসিয়াছে।

আলেকজাণ্ডার যখন পারস্য আক্রমণ করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে ছিল লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাস। আবার পারস্য সম্রাট দরিয়াসের অধীনেও ছিল অগণিত ক্রীতদাস। কিন্তু যখন উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন আলেকজাণ্ডারের দাসগণ দরিয়াসের দাসদের সঙ্গে মিলিয়া সম্রাটদ্বয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল কি? বরং তার উল্টা! আলেকজাণ্ডারের ক্রীতদাসেরা স্বীয় প্রভুর স্বপক্ষে দাঁড়াইয়া দরিয়াসের ক্রীতদাসদের বিরুদ্ধে লড়াই করিল। দরিয়াসের ক্রীতদাসেরাও সেইরূপ স্বদেশের কল্যাণ কামনায় নিজ প্রভুর স্বপক্ষে দাঁড়াইয়া আলেকজাণ্ডারের ক্রীতদাসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল। কোথায় রহিল তবে শ্রেণী-সংঘর্ষ?

ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যায় ঃ এখানে শ্রেণী সংঘর্ষের কোনো কথাই নাই। শূদ্রেরা কবে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে? Prof. Brji Narain তাই ঠিকই বলিয়াছেন ঃ "If all history is class struggle, India has no history at all" অর্থাৎ ঃ সমস্ত ইতিহাসই যদি শ্রেণী-সংঘর্ষের ইতিহাস হয়, তবে ভারতের কোনো ইতিহাসই নাই।

বিগত দুইটি মহাযুদ্ধের পানে তাকান। কোন্ শ্রেণী-সংঘর্ষের ফলে এই দুইটি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইল? পুঁজিবাদী আমেরিকা সাম্যবাদী সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত যোগ দিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ করিল? তুর্কী কেন জার্মানীর স্বপক্ষে যোগ দিল?

হালাকু খাঁ কেন বাগদাদ ধ্বংস করিল? মুসমানদিগের অধঃপতন কেন হইল, আবার কেনই বা দিকে দিকে ইসলামের লাল মশাল জ্বলিয়া উঠিল? পাকিস্তান কেন আসিল? কোন্ শ্রেণী-সংঘর্ষের ফলে এতগুলি কাণ্ড ঘটিল। মার্কসের থিওরী এই সব ঐতিহাসিক ঘটনার একটিরও কোনো ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

(৫) "Workers of the world, unite" (জগতের শ্রমিকদল এক হও)-ইহাই ছিল মার্কসের বাণী। এ বাণীও সফল হয় নাই। ইংলণ্ডের শ্রমিকদল জার্মানী, রাশিয়া এবং আমেরিকার শ্রমিকদলের সহিত মিলিত হইয়া সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের জন্য কোথাও যুদ্ধ করিয়াছে কি? না। যুদ্ধ বাধিলেই দেখা যায়, প্রত্যেক দেশের শ্রমিকদল তাহাদের নিজেদের দেশের রক্ষাকল্পে অপর দেশের শ্রমিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ইংলণ্ডের বা আমেরিকার শ্রমিকদল জানে, ইংলণ্ড বা আমেরিকা ধ্বংস হইলে তাহাদের রুজি-রোজগার ও সুখ-সুবিধা মারা যাইবে।

(৬) মার্ক্স্ গোড়াতে অনেকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেনঃ

"Abolish slavery and you will have wiped America off the map of nations." অর্থাৎ ঃ দাসপ্রথা তুলিয়া দিলে ম্যাপে আমেরিকার অস্তিত্বই থাকিবে না। আমেরিকায় দাস-প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কই, আমেরিকা তো নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই! বরং সে এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র।

www.pathagar.com

(৭) মার্কসের অর্থনৈতিক থিওরিও ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি চাহিয়াছিলেন মুদ্রাহীন অর্থনীতি (moneyless economy)। অর্থাৎ আজকাল যে অর্থ দ্বারাই সমস্ত জিনিসের লেন-দেন চলে, মার্কস্ এ প্রথা তুলিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কুলি, মজুর, উকিল, ব্যারিস্টার যোগ্যতা অনুসারে কাজ করিয়া যাইবে, তার বিনিময়ে তাহারা বেতন পাইবে না, পাইবে তাহাদের যাবতীয় অভাবের জিনিসপত্র। কৃষক জমি চাষ করিয়া ফসল ফলাইয়া স্টেটকে দিল, স্টেট তাহার ভাত-কাপড় সরবরাহ করিল। আদিম যুগে যেরূপ পরস্পরের মধ্যে দ্রব্য-বিনিময় হইত, মার্কসের মনেও ছিল সেই পরিকল্পনা। মুদ্রা প্রথা তিনি এই জন্য তুলিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন যে, উহা পুঁজিবাদেরই বাহন এবং সাম্যবাদের ঘোর পরিপন্থী। কিন্তু মার্কসের এ আশা সফল হয় নাই। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে লেনিন মুদ্রা-বিনিময় প্রথা তুলিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু উহাতে নানা প্রকার অসুবিধা ঘটায় বাধ্য হইয়া তিনি আবার মুদ্রা-প্রথারই প্রচলন করেন। বিতাড়িত রুবল (ruble) আবার ফিরিয়া আসিয়া নিজের স্থান দখল করিয়াছে। পুঁজিবাদের প্রধান বাহন মুদ্রাশক্তির নিকট কমিউনিজ্‌ম্ এইখানে হারিয়া গিয়াছে।

(৮) দেশের কর্মশক্তি বাড়াইবার জন্য মার্কস্ যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাও কার্যকরী হয় নাই। কার্যে দক্ষতা ও আন্তরিকতা দেখাইলে কর্মচারীর পদোন্নতি হয় ও বেতন বাড়ে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু মার্কস্ এরূপ তারতম্য পছন্দ করেন নাই। বেতনের হারের সমতাই ছিল তাঁহার কাম্য। যাহাকে যেখানে যে কাজে লাগান যাইবে, সে সেই কাজই দক্ষতার সহিত করিবে; ব্যক্তিগত পদোন্নতি বা স্বার্থের কথা না ভাবিয়া তাহারা ভাবিবে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা, সমষ্টিগত কল্যাণের কথা– ইহাই ছিল মার্কসের নির্দেশ। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় এ ব্যবস্থা বিফল হইয়াছে। ভালো কাজ করিলে পদোন্নতি হইবে বা বেতন বাড়িবে অথবা যে যতো উৎপন্ন করিবে সে ততোই বেশী অর্থ পাইবো—এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস এবং প্রেরণা না থাকিলে কোনো কাজই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। সমষ্টিগত কল্যাণ-বোধ কর্মীকে যতোটা না কর্মে উদ্বুদ্ধ করে, তার চেয়ে বেশী করে ব্যক্তিগত কল্যাণ-বোধ। এই সত্য সোভিয়েট রাশিয়া হাতে কলমে ঠেকিয়া উপলব্ধি করিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় এখন আর বেতনের হারের সমতার কোনো কথা নাই। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে লেনিন ঘোষণা করিয়াছিলেন ঃ The salaries of the highest official should not exceed the average salary of a good worker. অর্থাৎঃ রাজ্যের সর্বোচ্চ কর্মচারীর বেতন একজন ভালো শ্রমিকের বেতন অপেক্ষা বেশী হইবে না। তিনি এই নির্দেশও দিয়াছিলেন যে, কোনো উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর বেতন ৫০০ রুবলের বেশী হইবে না। কিন্তু স্ট্যালিনের হাতে আসিয়া এই নির্দেশ এখন কোথায় গিয়া নামিয়াছে, রাশিয়ার বর্তমান বেতন ও আয়ের হার লক্ষ্য করিলেই পাঠক তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেনঃ

www.pathagar.com

কর্মীর পরিচয়	বেতনের নিম্নতম এবং উচ্চতম হার
(১) সাধারণ শ্রমিক ------------------	৮০-৪০০ রুবল্
(২) ক্ষুদ্র কর্মচারী --------------------	৮০-৩০৯ রুবল্
(৩) উচ্চপদস্থ কর্মচারী ------------- (বিচারক, বিশেষজ্ঞ, প্রফেসর, হাকিম ইত্যাদি)	১৫০০-১০,০০০ রুবল্
কর্মীর পরিচয়	বেতনের নিম্নতম এবং উচ্চতম হার
(৪) সাধারণ শ্রমিকদের পেনসন---------- (অন্য কোনো সুবিধা নাই)	৫৫-৫৮০ রুবল্
(৫) উচ্চ কর্মচারীদের অথবা------------ তাহাদের বিধবা ও সন্তান-	২৫-১০০০ রুবল্

(ইহার সহিত বাসগৃহ, ছেলেদের মেয়েদের স্কলারশিপ ইত্যাদি সুবিধা আছে)

কমরেড ইভন (Comrade Yvon) নামক একজন ফরাসী কমিউনিস্ট বলেনঃ বর্তমানে রাশিয়ার আয়ের হার ২৫ রুবল্ হইতে ৩০,০০০ রুবল্ (অর্থাৎ ঃ ৫ টাকা হইতে ৬০০০ টাকা)। একজন ইঞ্জিনিয়ার বা বিশেষজ্ঞ একজন শ্রমিক অপেক্ষা গড়ে প্রায় ১০০০ গুণ বেশী বেতন পায়। শ্রমিকদের মধ্যেও যাহারা কর্মদক্ষ (stakhnovist), তাহারা সাধারণ শ্রমিক অপেক্ষা ৫/৬ গুণ বেশী বেতন পায়। G. P. U. গুপ্ত-পুলিশের বেতন ও সুখ-সুবিধা অন্যান্য সকলের অপেক্ষা বেশী।

এই হারের সহিত ইংলণ্ড ও আমেরিকার বেতনের হার তুলনা করিলে দেখা যাইবে ঃ ইংলণ্ড ও আমেরিকা পুঁজিবাদী হইয়াও যে-হারে বেতন দেয়, সোভিয়েট রাশিয়া কমিউনিস্ট সাজিয়াও তদপেক্ষা নিকৃষ্ট হারে বেতন দেয়। আমরা দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি ঃ

ফ্যাক্টরীর নাম	বেতনের হার
Chili Copper Company------	1:41
Curtis Publishing Co.------	1:51
Consolidated Oli Co.------	1:82

অতএব দেখা যাইতেছে সোভিয়েট৭ রাশিয়ার শ্রমিকেরা যে ইংলণ্ড ও আমেরিকার শ্রমিকদের অপেক্ষা সুখে আছে, তাহা নয়। বরং শ্রমিকদের অবস্থা অন্যান্য দেশের তুলনায় আরো শোচনীয়। Prof. Brij Narain তাঁহার "Marxism is dead" নামক বিখ্যাত পুস্তকে অকাট্যরূপে প্রমাণ করিয়া দেখাইতেছেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ার শ্রমিকদের বেতনের হার এমন কি বোম্বাই এবং লাহোরের মিল-মজুরদের বেতনের হার অপেক্ষাও কম। তাহা হইলে পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, সোভিয়েট রাশিয়ার বেতনের সমতা রক্ষা করা তো দূরের কথা, বেতনের তারতম্য সেখানে অন্যান্য দেশ হইতে আরো বেশী।

www.pathagar.com

সোভিয়েট রাশিয়ার রেল, স্টীমার এবং সিনেমাতে অন্যান্য দেশের মতই ১ম শ্রেণী, ২য় শ্রেণী, ৩য় শ্রেণী–এইরূপ শ্রেণী-বিভাগ রহিয়াছে।

অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সোভিয়েট রাশিয়ায় কোনো শ্রেণীহীন সমাজ গঠিত হয় নাই–হইবেও না। কাজেই বলা যায়, মার্কসের একটি প্রধান নীতি এবং অঙ্গীকার এইখানে একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে।

(৯) পুজিবাদ এবং সেই সঙ্গে শোষণ (exploitation)-এর সমস্ত পথ বন্ধ করিয়া দেওয়াই ছিল কমিনিউজমের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু সে আশাও সফল হয় নাই। সোভিয়েট রাশিয়াতে বহু স্টেট ব্যাঙ্ক রহিয়াছে। সেখানে ব্যক্তিগত ভাবেই লোকেরা টাকা জমা রাখে। লোকগুলিকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য ব্যাঙ্কগুলি উচ্চ হারে সুদ দেয়। সোভিয়েট রাশিয়ায় এখন যারা যতো খুশী রোজগার করিতে পারে ; কিন্তু স্টেট বণ্ড (State Bond) ক্রয় করা ছাড়া অন্য উপায়ে তাহারা সে টাকা খাটাইতে পারে না। স্টেট ব্যাঙ্কগুলির সুদও খুব বেশী ঃ শতকরা ৮। সেভিংস ব্যাঙ্কের প্রচলনও সেখানে যথেষ্ট আছে।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট রাশিয়ায় মোট ৪৩,০০০০০ সেভিংস ব্যাঙ্ক ছিল। সেভিংস ব্যাঙ্কও খুব উচ্চ হারে সুদ দেয় ঃ শতকরা ৮ হইতে ১০। তাহা হইলে পুঁজিবাদে আর কমিউনিজমে বিশেষ তফাৎ রহিল কোথায়? এইভাবে বিনা পরিশ্রমে আয় বৃদ্ধি করাও তো exploitation! এই জন্যই একজন লেখক সোভিয়েট রাশিয়ার এই বিপ্লবকে "Revolution without, no change within" অর্থাৎ ঃ বাহিরে বিপ্লব, ভিতরে কিছুই না–এই বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। Islam and Socialism—By Mirza Md. Hossain P. 124.)

এই ধরনের বহু দৃষ্টান্তই দেওয়া যাইতে পারে। আশা করি, পাঠক ইহা হইতেই বুঝিতে পারিতেছেন ঃ মার্ক স্‌বাদ আর এখন 'Ism' নাই, 'Wasm'-এ-ই পরিণত হইয়াছে।

নওবাহার

ভাদ্র ঃ ১৩৫৬–১৯৪৯

www.pathagar.com

আমার চোখে মাইকেল

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে মাইকেল মধুসূদন দত্তের এক বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তিনি মহাকবি। তাঁর 'মেঘনাদবধ'ই বাংলা সাহিত্যে একমাত্র সার্থক মহাকাব্য। এর উপর আবার তিনিই বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্তক; সনেট, নাটক ও প্রহসনেরও তিনি প্রথম রচয়িতা। এতগুলি প্রাথমিকতা বা বৈশিষ্ট্যের যে কোনো একটি থাকলেই তো সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি একটা স্থায়ী আসন দাবী করতে পারতেন। মাইকেলের সবগুলিই আছে। মাইকেলের স্থান তাই বাংলা-সাহিত্যে একক ও অনন্য। কিন্তু আজ আমি সে সব কথা কিছুই বলবো না। অন্য দু-একটা কথা বলবো।

মাইকেল ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দুঘরের ছেলে। অথচ কোন্ অজানার-ডাক শুনে মাত্র ১৯ বছর বয়সেই এই তরুণ যুবক স্বধর্ম, স্বজাতি ও স্বদেশ ত্যাগ করে চলে গেলেন বিদেশে। প্রথমে মাদ্রাজে, তারপর বিলেতে। একি শুধু যুগের আবেগ? অথবা অন্য কোনো বিলাস? না। কঠোর সাধনায় তাঁর এই প্রবাস-জীবন কেটেছে। ১০/১২টি ভাষা তিনি শিখেছেন। ফার্সী, বাংলা, সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু, ইংরাজী, ল্যাটিন, গ্রীক— ইত্যাদি ভাষায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে তিনি যখন দেশে ফিরলেন, তখনই তিনি বাংলা ভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। মাত্র ৩-৪ বছরের সাধনাতেই তিনি নব নব অবদানে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তুললেন। কাজেই মাইকেল যে একজন ক্ষণজন্মা প্রতিভা ছিলেন, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

তিনি শুধু কবিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন দিকপাল। যুগে যুগে এমন পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন হয়। ধর্মজগতে নবীদের যে কাজ, সাহিত্য-জগতে কবিদেরও সেই কাজ। মনে হয় তাঁরা আসেন না—প্রেরিত হন। মাইকেলকে আমার সেইরূপ একজন সংস্কারধর্মী কবি বলে মনে হয়। আপনারা জানেন বাংলা সাহিত্যে তখন বিদ্যাসাগরের যুগ। উইলিয়াম কেরী প্রমুখ খৃষ্টান পাদ্রীগণ ও কলিকাতার রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি প্রমুখ পণ্ডিতগণ এক সাথে মিলে বাংলা ভাষার খাত পরিবর্তন করে ফেলেছেন। তখনই সর্বপ্রথম পণ্ডিতদের হাতে পড়ে সংস্কৃতের তুহিনস্পর্শে বাংলা ভাষা তার স্বাভাবিক প্রাণশক্তি ও সচ্ছন্দ গতি হারিয়েছে। আরবী-ফার্সী সমস্ত শব্দ বাংলা ভাষা থেকে বর্জিত হলো আর তাদের জায়গায় আমদানি করা হলো কঠিন কঠিন সংস্কৃত শব্দ। প্রকাশভঙ্গীও হলো আড়ষ্ট। পয়ারের একঘেয়ে ছন্দ (jingling monotony) প্রগতিশীল ভাবধারার অভাব এবং অন্ধ সংস্কার-প্রীতি বাংলা ভাষার প্রগতির পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ালো। বাংলা ভাষার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে পণ্ডিতেরা তাকে আবার সেই পৌরাণিক যুগে নিয়ে গেলেন। সীতার বনবাস, শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা, কাদম্বরী ইত্যাদি পৌরাণিক ধ্যান-ধারণা বাংলা ভাষাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললো। আগের সেই দেবমাহাত্ম্য ও অলৌকিকতার দিন যেন ফিরে এলো। মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের হাতে এসে বাংলা সাহিত্যে যে উদার মানবিকতার সুর ধ্বনিত হয়েছিল, তা যেন আবার মিলিয়ে যেতে

www.pathagar.com

চাইলো। বন্দিনী সীতার মতোই অবরুদ্ধ বাংলা ভাষা মুক্তির জন্য তার দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানালো।

কেউ কোনো সাড়া দিল না। অবশেষে যশোরের এক তরুণ যুবক এগিয়ে এলেন ভাষা-জননীর এই আহ্বানে। স্বদেশ ছাড়লেন, স্বজাতি ছাড়লেন, স্বধর্ম ছাড়লেন। তিনি গেলেন ইউরোপে– সেখানে বসে দীর্ঘ সাধনার পর নানা উপাদান নিয়ে ফিরে এলেন বাংলা দেশে। তারপর এক এক করে কেটে দিলেন ভাষা-জননীর পায়ের যতো শৃঙ্খল। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে করে দিলেন তার সংযোগ। এমনি করে আনলেন তিনি বাংলা ভাষার মুক্তি। মাইকেল তাই সর্বপ্রথম সার্থক বিপ্লবী কবি। তিনি না এলে বাংলা ভাষা কোন্‌পথে কোন্‌খাতে প্রবাহিত হতো বলা কঠিন। আমার মতে মাইকেলের সবচেয়ে বড় দান বা বড় কৃতিত্ব এইখানে। মাইকেলের পথ ধরেই তো বাংলা ভাষা আজ এতদূর অগ্রসর হতে পেরেছে। হিন্দী, মারাঠি বা অপর কোনো আঞ্চলিক ভাষা এই গৌরব লাভ করতে পারেনি।

এর একমাত্র কারণঃ মাইকেলের সংস্কারমুক্ত প্রচারধর্মী মন ও উদার মানবতাবোধ। আর্য-আবেষ্টনে শৃঙ্খলিত হতে না হতেই বাংলা ভাষা মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিল এবং সে সংগ্রামের একমাত্র মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন মাইকেল।

মেঘনাদবধ কাব্যের আগাগোড়া রয়েছে এই বন্ধন-মুক্তির সুর, শাশ্বত মানবতার সুর। অযোধ্যার রাম, লক্ষণ, সীতা প্রমুখ আর্য, আর লঙ্কার রাবণ, মেঘনাদ, প্রমুখ অনার্য। কিন্তু উৎকট জাতিবিদ্বেষের ফলে অনার্যেরা আর্যদের চোখে অসভ্য, রাক্ষস, বর্বর, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি ছাড়া অন্য কিছু নয়। মানবতার প্রতি এই অবমাননা মাইকেল বরদাশ্‌ত্‌ করতে পারেন নি। তিনি তাঁর কাব্যে রাম-লক্ষণকে বরং খাটো করে রাবণ ও মেঘনাদকে বড় করে দেখিয়েছেন। এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি ও সৎসাহসের জন্য মাইকেল যথার্থই ধন্যবাদের পাত্র। এই দৃষ্টি, এই মূল্যবোধ সে যুগে খুবই বিরল ছিল না কি? এই গণজাগরণের দিনে মেঘনাবধ কাব্যের আবেদন তাই এখনও অব্যাহত আছে। আর্ত-নিপীড়িত মানুষ মেঘনাদবধ কাব্য থেকে যথেষ্ট প্রেরণা পাবে।

মেঘনাদবধের আর একটা বৈশিষ্ট্য—জীবনের সংগ্রামশীল চেতনা। সমগ্র কাব্য জুড়ে এই কথাই যেন ঘোষণা করা হচ্ছে– এ জীবন সংগ্রামশীল। জীবনের অর্থই তো সংগ্রাম। ইক্‌বাল একেই বলেছেন tension মানুষের জীবন হচ্ছে তরঙ্গের মতো; চললে আছে, না চলবেলনেই। এই গতির সুর মেঘনাদবধ কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মাইকেলকে আমি আর এক দিক দিয়ে মূল্য দিই। বিশেষ লক্ষ্য করলে দেখা যাবেঃ বাংলা ভাষা বিকাশের একটা বিশেষ ধারা বা পথ আছে। আর্যস্পর্শ ও পরিবেশ সে সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চলে। প্রাচীন বাংলার দ্রাবিড়দের হাতে তার জন্ম, তারপর সে লালিত হয় বৌদ্ধদেব হাতে–সেখান থেকে সে আশ্রয় নেয় বাংলার সুলতানদের শাহী দরবারে। ৪-৫ শ' বছর পর বৃটিশ আমলে এলে ষড়যন্ত্রের ফলে সে সংস্কৃতের কবলে পতিত হয়, কিন্তু খৃষ্টধর্মী মাইকেল এসে তার উদ্ধার সাধন করেন। তারপর ব্রাহ্মধর্মী রবীন্দ্রনাথ তাকে অপরূপ শ্রী দান করেন। ইসলামধর্মী নজরুল তাকে নূতন মহিমা দান

www.pathagar.com

করেন। সর্বশেষে দেশ-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে যেই সে পাকিস্তানে এসেছে, অমনি সে লাভ করেছে অন্যতর রাষ্ট্রভাষার পদগৌরব। আশ্চর্য লাগে, অন্যত্র তার এ সম্মানলাভ আজ পর্যন্ত ঘটেনি। এ কথার দ্বারা আমি বলতে চাই, পাকিস্তানে বাংলা ভাষার নূতন সম্ভাবনা আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মাইকেলকে যখন দেখি, তখন তাঁকে দেখি আর এক বিশিষ্ট মূর্তিতে। কবিদের জাত-বিচার নেই; গণ্ডী-সংকীর্ণতার তাঁরা উর্ধ্বে। তবু মাইকেল যে পাকিস্তানের মহাকবি–এ গৌরব প্রকাশে আনন্দ পাই–ভরসা পাই–প্রেরণা পাই।

মহাকাব্যের বিচারে মেঘনাদবধ কাব্যের দোষগুণ বিচার সমালোচকেরা করবেন। মানুষের কোনো সৃষ্টিই ত্রুটিমুক্ত, নয়। মেঘনাদবধ কাব্যেরও তাই ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। Milton-এর Paradise Lost-এরও ত্রুটি আছে। কেউ কেউ বলেন ঃ Miltion is more criticized than read". এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও কাব্য সমালোচক T. S. Eliot বলেছেন ঃ Miltion writes English like a dead language" তাই তিনি একটু ব্যঙ্গচ্ছলে বলেছেন ঃ 'কেউ যদি মিলটনের প্যারাডাইজ লষ্ট পড়তে চায় তা যেন দু'বার করে পড়ে; প্রথমবার শুধু শব্দাড়ম্বর উপভোগ করবার জন্যে, দ্বিতীয়বার তার অন্তর্নিহিত ভাববস্তুর উপলব্ধির জন্যে।' এ ধরনের উক্তি অবশ্য বিতর্কমূলক। মাইকেল সম্বন্ধেও হয়তো অনেকে এই ধরনের কথা বলবেন। আমি সে বিতর্কের মধ্যে যাবো না। আমি তাঁর শুধু গুণই গ্রহণ করবো, কারণ, "a critic must always be on the poets side"

আজ আমার তরুণ ভাইদেরকে ডাক দিই মাইকেলের দিকে দৃষ্টি ফিরাতে। মাইকেলের আদর্শকে যথাসম্ভব আমাদের গ্রহণ করতে হবে। তাঁর মতো সবাইকে ধর্মান্তর গ্রহণ করতে হবে– সে কথা বলছি না। তাঁর মধ্যে অন্যান্য যে সব মহৎ গুণ ছিল, তার থেকে নিশ্চয়ই আমরা আলো নিতে পারি। তাঁর মতো ছাত্র কই? তার মতো মুক্তমনা তরুণ কই? সেই অটল দৃঢ় বিশ্বাস, সেই নির্ভীক মনোবল, সেই সত্যানুসন্ধিৎসা, সেই সাধনা কই? কোথায় আমাদের মধ্যে সেই নবসৃষ্টির কৌতুহল সেই উদ্যম? সেই দুঃসাহস? শুধু নয়, আমাদের জীবন-ধারা আজ পয়ারের শ্লথ গতিতে একটানা ভাবে ভাষা বয়ে চলেছে। কোন্ তরুণ আজ এই একঘেয়েমি ভেঙে দিয়ে আনবে আমাদের জীবনে মুক্তচ্ছন্দের উচ্ছল গতিবেগ? সেই তরুণ এসো, মাইকেলকে আজ শ্রদ্ধা জানাও।

পরিশেষে আমি দুটো প্রস্তাব করতে চাই। প্রথমটা হচ্ছে যে, "মাইকেল পুরস্কার" নাম দিয়ে বাংলা একাডেমী থেকে একটা বাৎসরিক সাহিত্য পুরস্কার ঘোষণা করা হোক।

দ্বিতীয়টা হচ্ছে ঃ মাইকেলের সমস্ত গ্রন্থাবলী বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশ করা হোক।

ঢাকা, ১৯৫৬

www.pathagar.com

লেখকদের ভূমিকা

লেখক বন্ধুগণ,

আস্‌সালামু আলাইকুম। পাকিস্তান লেখক-সংঘের এই দ্বিতীয়-বার্ষিক অধিবেশনে আপনারা আমাকে সভাপতিত্ব করার সম্মান দেওয়ায় সত্যি আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। এতে আমার প্রতি আপনাদের মনের প্রীতি ও ভালোবাসাই প্রকাশ পাচ্ছে। এজন্য জানাই আপনাদেরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

বন্ধুগণ! পাকিস্তানের ইতিহাসে পাকিস্তান রাইটার্স গিল্‌ডের জন্ম এক বিস্ময়কর ঘটনা। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বস্‌রা নগরে এমনি একটা লেখক-সংঘের সৃষ্টি হয়েছিল। তার নাম ছিল ইখ্‌ওয়ানুস্‌-সাফা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা গভীর অনুশীলন করেছিলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৫০ খানা মৌলিক গ্রন্থ লিখেছিলেন। ঐ সব গ্রন্থ পরে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মুসলিম জ্ঞান-বর্ণনার এ এক সুন্দর নিদর্শন।

পাকিস্তান লেখক-সংঘের ভূমিকাও অনুরূপ হবে বলে আমি মনে করি। এই সংঘকে তামদ্দুনিক পাকিস্তান রচনার ভার নিতে হবে। তামদ্দুনিক পাকিস্তানের দৃঢ় বুনিয়াদর উপরেই ভৌগলিক পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা নির্ভর করে। কাজেই, এই সংঘকে খানিকটা আদর্শবাদী না হয়ে উপায় নেই। অবশ্য শিল্পে ও সাহিত্যে বাহিরের কোনো নিয়ন্ত্রণ অবাঞ্ছনীয়। সৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্তঃ অর্ডার দিয়ে ভালো জামা-কাপড় তৈরী করা যায়, কিন্তু ফুল ফুটানো যায় না। মানি, এ কথা সত্য। তাহলেও কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতি লেখকদের আনুগত্য একেবারে অস্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্র বা সমাজ একটি জীবন্ত দেহ বিশেষ। শিল্প, সাহিত্য, তমদ্দুন—এসব হলো তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এদের প্রত্যেকে স্বাধীন ভাবে ক্রিয়া করলেও পরস্পরের মধ্যে একটা চমৎকার সঙ্গতি আছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে লেখকগণের সম্পর্কও সেইরূপ অন্তর্বিজড়িত। শিল্পী-সাহিত্যিকদেরকে তাই খানিকটা নৈতিক বন্ধন মেনে চলতেই হয়। এ বন্ধন এত ব্যাপক যে প্রতিভার স্ফুরণ তাতে ব্যাহত হয় না। বন্ধনের মধ্যেও সৃষ্টি সম্ভব। খেলার মাঠে বাউণ্ডারী লাইন থাকে, রেফারী থাকে, আইন-কানুন থাকে। সে সব বন্ধন মেনে নিয়েই খেলোয়াড়রা মাঠে নামে। তারি মধ্যে থেকেই এক একটা হানিফের সৃষ্টি হয়। একটা বিশেষ পরিবেশ ও ভাবধারার মধ্যেই জন্মেছিলেন আল্লামা ইকবাল এবং এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী কায়েদ-ই-আযম। ম্যাডোনার মাতৃমূর্তি এবং মোনালিসার স্নিগ্ধ হাসিতে খৃষ্টানী ভঙ্গি থাকলেও তারা এখন বিশ্বের সম্পদ। সেইরূপ তাজমহলও। রূপ, রস ও ভাবের রাজ্যে ব্যক্তি নৈর্ব্যক্তিক হয়, বিশেষ নির্বিশেষ হয়। শিল্পে ও সাহিত্যে পাকিস্তানবাদ গ্রহণে আমাদের মনে তাই যেন কোনোরূপ হীনমন্যতা না থাকে। আপন পরিচয়েই আমরা বিশ্বসভায় আসন নিতে চাই।

www.pathagar.com

আমাদের সমস্যা

আজ আমাদের সামনে অনেক কঠিন সমস্যা এসে দেখা দিয়েছে। সে সব সমস্যার সঙ্গে পাকিস্তানেরও যেমন সম্পর্ক রয়েছে, বিশ্ব-জগতেওরও তেমনি। সে সব সমস্যার প্রতি লেখকদের দৃষ্টি দেওয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্যাগুলিকে মোটামুটি দুই বাগে ভাগ করা যায় ঃ

১। বিশ্ব-সমস্যা, ২। গৃহ-সমস্যা।

বিশ্ব-সমস্যা

জগৎ জুড়ে আজ মহা অশান্তি দেখা দিয়েছে। কামান-গোলা ও এটম-বোমার যুদ্ধ তো আছেই, তলে তলে আর এক রক্তবিহীন স্নায়ু-যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। সে হচ্ছে আদর্শ বা আইডিওলজীর যুদ্ধ। মানুষ শুধু খাবার জন্য বাঁচে না, বাঁচার জন্য খায়। যুগে যুগে মানুষ এক বৃহত্তর ও উন্নরতর জীবনের সন্ধান করে ফিরছে। প্রত্যেকেই সেই না-পাওয়া সুন্দরকে চায় এবং কেমন করে কোন্ পথে তাকে পাওয়া যাবে চিন্তা করে। কিন্তু সেই শ্রেয় ও প্রেয়ের ধারণা সব মানুষের এক নয়। পথও তাদের অভিন্ন নয়। মানব-সমাজ যেন দলে দলে বিভক্ত হয়ে সেই অজানার সন্ধানে অভিযান করছে। প্রত্যেক দল কপালে লেবেল এঁটে মার্চ করে চলেছে। Capitalism, Socialism, Communism, Fascism, Nazism, Marxism, Materialism, Nationalism—কতো দল, কতো মত, কতো পথ! প্রত্যেকেই বলছে ঃ আমার মত ও আমার পথই অভ্রান্ত। এই দ্বন্দ্ব থেকেই শুরু হয়েছে দলাদলি, রেষারেষি ও হানাহানি। প্রত্যেক দলই চাইছে অপর দলকে পরাভূত করে তার নিজের মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। এই যে, জগৎজোড়া অশান্তি, তার মূল কারণ এইখানে। এই মত ও পথের দ্বন্দ্বে, লক্ষ্য ও আদর্শের সংঘর্ষে মানবতার চরম দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে। আজ যদি ভ্রান্ত দল জয়যুক্ত হয়, অথবা দলীয় সংঘর্ষের ফলে সত্য সুন্দর ও কল্যাণের পথ অবরুদ্ধ হয়ে যায়, তবে মানব সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। বিপন্ন মানবতা তাই আজ দিকে দিকে তার সঙ্কেতবাণী পাঠিয়েছে। অনাগত এক মুক্তি ফৌজের আশাপথ চেয়ে সে প্রহর গুণছে।

মানবতার এই আহ্বানে পাকিস্তানের লেখক-গোষ্ঠীকে সাড়া দিতে হবে।

আমাদের পথ স্বতন্ত্র

এই গুরু দায়িত্বে উদ্বুদ্ধ হলে আমাদের এক স্বতন্ত্র পথ ধরে চলতে হবে। গড্ডালিকা-স্রোতে ভেসে গেলে চলবে না। আদর্শের সংগ্রামে আমাদেরও নামতে হবে। আমরাও স্বতন্ত্র এক দল হবো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের দল হবে দল-ভাঙা দল—দল-মিলানো দল—বা শান্তি -সেবার দল। কায়েদ-ই-আযম এই অর্থেই বলেছিলেন ঃ We are separate nation & we have got a separate culture. এই স্বাতন্ত্র্যে

www.pathagar.com

সঙ্কীর্ণতা নেই, সাম্প্রদায়িকতা নেই, আছে এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত। জগতে যখনই কোনো সত্য বা কল্যাণের আবির্ভাব হয় তখনই এ স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন দেখা দেয়। শ্রেষ্ঠ হতে হলেই স্বতন্ত্র না হয়ে উপায় নেই, আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে এই অর্থেই 'খায়রা উম্মাতিন্' বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ জগতের মধ্যে তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি। যা ভালো তাই করতে তোমরা সকলকে নির্দেশ দেবে, যা মন্দ তা করতে নিষেধ, করবে। এই স্বাতন্ত্র্যই হবে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি।

অতএব বিশ্ব-মানুষের কল্যাণ-চিন্তা আমাদের করতেই হবে। শুধু "Art for Art's sake" এই নীতি মেনে সাহিত্য-চর্চা করলে আমাদের চলবে না। আমাদের নীতি হবে "Art for man's sake." আজকালের সর্বক্ষেত্রে আমাদের অনুপ্রবেশ করতে হবে। উচ্চতর দৃষ্টিকোণ ও মূল্যমান দিয়ে যাচাই করে প্রচলিত মতবাদ ও থিওরীসমূহের সংস্কার আনতে হবে, প্রয়োজন হলে নূতন থিওরী দিতে হবে। শুধু কাব্য, উপন্যাস ও ছোট গল্পই সাহিত্য নয়। রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এইসব মননধর্মী সাহিত্যে আমাদের দৈন্য প্রচুর।

Plato-র Republic, Rousseau-র 'Social Contract', Karl-Marx-এর 'Das Kapital', Adam Smith-এর 'Wealth of Nations' ইত্যাদি ধরনের গ্রন্থ আমাদের মধ্যে নেই বললেই চলে। Newton, Darwin, Freud, Einstein প্রভৃতির কথা না হয় বাদই দিলাম।

সুখের বিষয়, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইউব খান জগতের রাষ্ট্র দর্শনে এনেছেন এক বিস্ময়কর বিপ্লব। বিপ্লব আনতে হলে আগে আসে চিন্তায়, তারপরে রাষ্ট্রে। Locke, Hume, Rousseau-র লেখাতেই এলো French Revolution, Karl-Marx-এর দর্শন আনলো Communism. কিন্তু এক্ষেত্রে উল্টা হয়েছে। আগেই এলো আমাদের রাষ্ট্রবিপ্লব। এতে আমাদের কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় আমরা অন্ধভাবে পাশ্চাত্যর শাসনতন্ত্রের অনুসরণ করছিলাম। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মায়ায় আমরা সম্মোহিত হয়ে ছিলাম। আর কোনো বিকল্প শাসনতন্ত্র যে থাকতে পারে, তা কোনোদিন আমরা ভাবিওনি, চেষ্টাও করিনি। সেই পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের প্রতি সর্বপ্রথম চ্যালেঞ্জ গেল পাকিস্তানের-অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল আইউবের কাছ থেকে। শুধু মুখের চ্যালেঞ্জ নয়, বিকল্প একটা বাস্তব শাসনতন্ত্রও তিনি দাঁড় করালেন সমগ্র জগতের সামনে। মাত্র দুই বৎসরেই পাক জমহুরিয়াৎ (Basic Democracy) একটি কঠিন বাস্তব সত্য।

প্রেসিডেন্ট আইউবের এই নূতন রাষ্ট্র বিধানের বৈশিষ্ট্য হলো ইসলামী শাসন-নীতির সঙ্গে এর চমৎকার মিল আছে। এ শাসনে শাসক ও শাসিতের মধ্যে একটা চুক্তি বা আদান-প্রদানের ভাব আছে। একমাত্র Rousseau-র 'Social Contract'-এর থিওরীর সঙ্গেই এর কিছুটা তুলনা হতে পারে। Rousseau বলেছিলেনঃ সমাজ বা রাষ্ট্রের শাসন নীতি হবে সমানের উপর সমানের শাসন (rule of the equals over

www.pathagar.com

the equals) অন্য কথায় শাসক ও শাসিত পরস্পর হাত মিলিয়েই দেশ শাসন করবে। বলা বাহুল্য Basic Democracy-তে এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান কিন্তু প্রেসিডেন্ট আইউব রুশোর কাছ থেকে এই আইডিয়া নেন নি, তিনি নিয়েছেন উভয়ের মূল উৎস কুরআন থেকে। রুশোও তাঁর 'Social Contract'-এর আইডিয়া কুরআন থেকে পেয়েছিলেন। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ বহুস্থানে ওয়াদা বা Covenant-এর কথা বলেছেন। পয়গম্বরদিগের মধ্যবর্তিতায় তিনি ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তি স্থাপন করেছিলেন। সে সব চুক্তির ভাবার্থ এই যে, মানুষ আল্লাহ্‌কে এক এবং অদ্বিতীয় বলে মানবে, উৎপীড়িত ও দুস্থ মানুষকে সেবা ও সাহায্য করবে, জাকাত দেবে, দুর্বলের উপর অত্যাচার করবে না ইত্যাদি। তিনি আরও বলেছিলেন, মানুষ যদি তাদের ওয়াদা পালন করে, তবে আল্লাহ্ও তাঁর ওয়াদা পালন করবেন, অর্থাৎ ইহকালে ও পরকালে তাদেরকে ধন, মান, রাজ্য ও সুখসম্পদ দেবেন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে বনি ইসরাইল ও খৃষ্টানেরা সে চুক্তি ভঙ্গ করেছে। আল্লাহ্‌কে মানেনি, নবীদিগকে হত্যা করেছে, মানুষের উপর জুলুম করেছে, অবিচার করেছে। ফলে আল্লাহ্ও তার উপযুক্ত প্রতিদান দিয়েছেন।

বাকী আছে বনি ইসমাইল। এদের সঙ্গেও আল্লাহ্ চুক্তি করেছেন। এদের কাছে তিনি তাঁর খলিফা পাঠিয়েছেন, আইন-গ্রন্থ কুরআন পাঠিয়েছেন, রাজ্য দিয়েছেন, রাজধানী দিয়েছেন, সৈন্যসামন্ত ও সাজ-সরঞ্জাম সব দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি দুনিয়ায় এসে আল্লাহ্‌র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এবং কিভাবে সে রাজ্য শাসন রতে হবে, দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। সেই শাসনের একটা আদর্শ রূপ আমরা আমরা পেয়েছিলাম খোলাফায়ে রাশেদিনদের সময়ে—বিশেষ করে হযরত ওমরের শাসন পদ্ধতিতে। বলা বাহুল্য, হযরত ওমরের শাসন পদ্ধতির সঙ্গে প্রেসিডেন্ট আইউবের শাসন পদ্ধতির বহুলাংশে মিল আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়ঃ হযরত ওমর রাষ্ট্র ও ধর্মকে (State and Church) পৃথক করেননি। বহু দূরবর্তী প্রদেশ তাঁর রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সর্বোপরি তিনি ছিলেন আমিরুল মুমেনিন ও সিপাহ্‌শালার দুই-ই। পাকিস্তানেও সে সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

কাজেই আমার মনে হয়, আমরা যদি আন্তরিকভাবে সর্বাত্মক চেষ্টা করি, তবে এই নূতন রাষ্ট্র-দর্শন জগতে এক নূতন যুগ সৃষ্টি করতে পারে। ইতোমধ্যেই তার শুভ লক্ষণ দিকে দিকে দেখা দিয়েছে। আজ সমগ্র মুসলিম জাহানে ঐক্য ও মিলনের সুর ধ্বনিত হচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মিসর, আরব রিপাবলিক, মরক্কো, আল্‌জিরিয়া সর্বত্র নবজীবনের স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে। মুসলিম জাহানের এই রূপান্তরে পাক প্রেসিডেন্ট আইউব প্রধান নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। শুধু মুসলিম জাহান নয়, বর্হিবিশ্বও তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। জাপান, বার্মা, নেপাল, জার্মানী, যুগোশ্লাভিয়া, সোভিয়েট রাশিয়া সকলেই আজ তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত। আশ্চর্য নয়, আইউবের হাতেই হয়তো সফল হবে সেই বহু যুগের প্রতিষ্ঠিত স্বর্গরাজ্যের বাস্তব রূপায়ণ আর কুরআনের সেই উজ্জ্বল আশার বাণীঃ সমগ্র মানবমণ্ডলী এক জাতি—কানান্নাসো উম্মাতাঁও ওয়াহেদা ঃ

www.pathagar.com

এইখানে পাকিস্তান লেখক-সংঘের দৃষ্টি আমি আবার আকর্ষণ, করি। অতি প্রাচীন কাল থেকে একটা আদর্শ রাষ্ট্র (Ideal State) গঠনের চেষ্টা মানব সমাজে চলে আসছে। Socrates থেকে আরম্ভ করে Bertrand Russel পর্যন্ত বহু চিন্তাবিদ রাষ্ট্র-দর্শন নিয়ে বহু গ্রন্থ লিখেছেন। League of Nations এ-চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে। UNO-ও হয়তো একই পথে যাবে। এদের ব্যর্থ হবার একটা গুঢ় কারণ হলো এই যে, এদের মনের গভীরে রয়েছে সেই চুক্তিভঙ্গের প্রভাব এবং প্রবণতা। যারা নিজেরাই চুক্তি ভঙ্গ করেছে, তারা আবার কি করে অপরের সঙ্গে চুক্তি রাখবে। তাই তাদের সব চেষ্টা বারে বারে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। আমার মনে, হয়, এইবার আমাদের সুযোগ এসেছে। জগতকে দিতে হবে এইবার আমাদের নূতন দর্শন, নূতন চিন্তা, নূতন আদর্শ। দর্শন আসে দুই পথে। রাষ্ট্র বিপ্লবের আগেও আসতে পারে। পরেও পারে। স্বাপ্নিক বীর আগেই এনেছেন রাষ্ট্র বিপ্লব। সে বিপ্লব যদি আমাদের ঐতিহ্য ও আদর্শের অনুরূপ হয় তবে লেখকদের উচিত এর পশ্চাদ্‌ভূমিতে যে দর্শন ও যে আইডিওলজী আছে, তাকে পরিস্ফুট করে জগতের সামনে তুলে ধরা। তরবারি ও লেখনী একসাথে মিললেই তবে আমাদের এই নূতন অভিযান জয়যুক্ত হবে।

গৃহ-সমস্যা

এইবার ঘরের কথা কিছু বলবো।

পাকিস্তান রাইটার্স গিলডের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সামনে সম্ভাবনার এক নূতন দুয়ার খুলে গেছে। আমাদের মনের দিক্‌চক্রবাল সম্প্রসারিত হয়েছে। এতদিন পূর্ব-পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আমাদের সাহিত্যিক ও তামদ্দুনিক সংযোগ গভীর ছিল না। পরস্পরের মিলনের জন্য কোনো সমভূমিও আমরা খুঁজে পাইনি। হাজার মাইল ভৌগোলিক ব্যবধানকে মিটিয়ে দেবার জন্য কোনো চেষ্টাও আমাদের ছিল না। অথচ তারি মধ্য দিয়ে কি কৌশলে আমরা একটা মিলনভূমি আবিষ্কার করলাম। যে স্বাপ্নিক এতবড় অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললেন, তিনি বাইরে কবি হন আর না হন–ভিতরে তিনি মস্তবড় এক রোম্যান্টিক কবি। আজ সিন্ধী, পাঞ্জাবী, বেলুচ, বাঙালী এক সাথে এসে মিশেছে। শুধু তাই নয়, এই অল্প সময়ের মধ্যেই পাঞ্জাবী মেয়েকে বাঙালী ছেলে বিয়ে করেছে, বাঙ্গালী মেয়েকে সিন্ধী ছেলে বিয়ে করেছে। সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পশ্‌তু, বাংলা ভাষার ভিতরেও এমনি inter-marriage হবে।

পাকিস্তানের লেখকবৃন্দের নিকট তাই এক নূতন দিন এলো। পূর্ব-পাকিস্তানের যে সব বাঙালী লেখক পশ্চিম পাকিস্তানে আছেন তাঁরা এখন কাব্য, উপন্যাস, গল্প লেখবার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন থেকে নূতন নূতন উপকরণ সংগ্রহ করুন। পশ্চিম পাকিস্তানের লেখকেরাও পূর্ব পাকিস্তানের দিকে ফিরে তাকান। উভয়কে উভয়ের কাছে পরিচিত করার ভার লেখকদেরই নিতে হবে। অনুবাদের মধ্য দিয়েও এই মন-জানাজানির কাজ করতে হবে। হালী, ইকবাল ও অন্যান্য লেখকদের কিছু

www.pathagar.com

কিছু অনুবাদ আমরা বাংলায় করেছি। গিলডের মধ্যবর্তিতায় আরও করা হবে। বাংলা থেকেও কিছু কিছু উর্দুতে তরজমা হয়েছে। সম্প্রতি জনাব জমীল্ উদ্দিন আলী বাংলার মেয়েদের উপর যে কয়েকটি দোঁহা লিখেছেন, কাব্যের দিক্ দিয়ে তা অনবদ্য হয়েছে। আশাকরি, এ পথে তিনি আরও অগ্রসর হবেন।

পাকিস্তান রাইটার্স গিলডের আবির্ভাবে সত্যি লেখকদের মধ্যে এক নব প্রাণ-চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। লেখকদের আত্মচেতনা বেড়েছে এবং মর্যাদা ও মান উন্নীত হয়েছে। আদমজী প্রাইজ প্রবর্তনা গিলডের এক অতুলনীয় কীর্তি। এই মহান দানশীলতার জন্য আদমজী কর্তৃপক্ষকে লেখক সংঘের পক্ষ থেকে জানাই আমার আন্তরিক শুক্‌রিয়া ও মুবারকবাদ।

পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা একাডেমী ও ঢাকা রেডিও-ও প্রতিভাদীপ্ত লেখকদেরকে অনেকগুলি পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করছেন। সেজন্য তারাও ধন্যবাদার্হ।

কিন্তু পুরস্কারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলিই যে সেই সেই বিষয়ের শ্রেষ্ঠ পুস্তক, সে কথা সত্য নাও হতে পারে। পাকিস্তানের বাইরে এই সব পুস্তক কি প্রতিক্রিয়া আনে, সেদিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি রাখতে হবে। নইলে এইসব পুরস্কারের উদ্দেশ্য পণ্ড হতে পারে এবং জগতের চোখে পাকিস্তানের মূল্যমান অবনমিত হতে পারে।

পূর্ব-পাকিস্তানে সাহিত্য-প্রগতির পথে কিছু কিছু বাধার সৃষ্টি হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানে পশ্চিম বাংলার বই এখনো প্রচুর পরিমাণে আমদানি করা হয়। সেই সব পুস্তক গরম কেকের মতো বিক্রী হয়। সবাই কোলকাতার বই কিনবার জন্য পাগল। অবশ্য স্বীকার করতেই হবে, কোলকাতার বই পূর্ব পাকিস্তানের প্রকাশিত বই-এর তুলনায় বহুলাংশে উন্নত। মার্জিত রুচি পাঠক যদি সেই সব বই পড়তে ভালোবাসে, তাহলে খুব দোষ দেওয়া যায় না। বরং আমাদের লেখকদের অক্ষমতাই তাতে প্রকাশ পায়। কিন্তু অন্যদিকও তো ভেবে দেখতে হবে। একে তো বৈদেশিক মুদ্রার প্রশ্ন, তার উপর আমাদের লেখকের ভবিষ্যতের প্রশ্ন। পশ্চিম বাংলার পুস্তক অবাধে আমদানি হলে আমাদের লেখকরা কিছুতেই নিজ পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। আমি যতোদূর জানি, পশ্চিম পাকিস্তানে এই বিপদ নেই। সেখানকার লেখকেরা বই লিখেই স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে। আমরা পশ্চিমবঙ্গের এত বই কিনি, কিন্তু আমাদের একখানা বইও সেখানে কেউ আমদানি করে না। কাজেই আমার মনে হয় অন্যান্য শিল্পের ন্যায় পুস্তকের উপরেও একটা Tarrif বসানো উচিত। শুধু Standard বই এবং Text বই আনলেই আপাততঃ চলবে।

দুইটি বৈদেশিক প্রকাশক প্রতিষ্ঠানও আমাদের সাহিত্যে একটা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তারা প্রচুর পারিশ্রমিক দিয়ে বহু ভালো ভালো বিদেশী বই-এর বাংলা অনুবাদ ছেপে পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বত্র বিক্রি করছে। এর ভালো দিকও আছে, মন্দ দিকও আছে। পাঠকের রুচি ও পঠনস্পৃহা বেড়েছে। মন ও চিন্তার ব্যাপ্তিও ঘটেছে। কিন্তু অধিকাংশ সৃষ্টি-ধর্মী লেখকের প্রতিভাকেই এরা কিনে নিয়েছে। ফলে আমাদের সাহিত্যে কোনো মৌলিক সৃষ্টি বা মননশীল সাহিত্য উৎপন্ন হতে পারছে না।

www.pathagar.com

পূর্ব-পাকিস্তানে কর্ণফুলী পেপার মিল থাকা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু প্রায়ই ভালো কাগজ পাই না। আমাদের বাজারে আর্ট পেপার, কভার পেপার, অত্যন্ত দুর্মূল্য। এনিটক বা আই ভরী ফিনিস কাগজ নাই বললেই চলে। ভালো কালি, ভালো টাইপেরও অভাব। বিদেশী পুস্তকের সঙ্গে মুকাবিলা করতে হলে কর্তৃপক্ষকে এই সব অসুবিধা দূর করতেই হবে। ভালো বই এখানে প্রস্তুত হলে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা আমরা বাঁচাতে পারবো।

বন্ধুগণ,

আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে। আমরা আজ এক নূতন যুগের প্রবেশ দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছি। এ যুগ নভোভ্রমণের যুগ। স্থান ও কালের ধারণা আমাদের পাল্টে যাচ্ছে। নূতন মূল্যমান দিয়ে এখন আমাদের জীবন ও জগতকে দেখতে হবে এক পৃথিবীর স্বপ্ন ক্রমেই আমাদের চোখে বাস্তব হয়ে আসছে। এই নূতন পৃথিবীর রূপায়ণে পাকিস্তানের লেখকবৃন্দ যেন এক গৌরবময় ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন– এই আমার কামনা।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ!

পাকিস্তান লেখক-সংঘ জিন্দাবাদ!

(করাচীতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।)

অভিভাষণ

সমবেত ভদ্রমহিলাবৃন্দ, ভদ্রমহোদয়গণ আর আমার তরুণ ভাইবোনেরা–

তসলীম ও মুবারকবাদ! আমার ৫৫তম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে আজ আপনারা আমাকে যে বিপুল অভিনন্দন ও মানপত্র দান করলেন, তা আমি কৃতজ্ঞ অন্তরে গ্রহণ করছি। যাদের হাত দিয়ে এলো এই মণিহার আমার গলায় তাদের স্নেহস্পর্শ ও গভীর অনুরাগ চিরদিনই আমি মনে রাখবো। এই মালার স্মৃতি ও সৌরভ হবে আমার চলার পথের পাথেয়, এ থেকে পাবো আমি নব নব উৎসাহ ও কর্ম-প্রেরণা।

কিন্তু এ-হার কেমন করে আজ গলায় পরি! পরতে যে শরম লাগে! যাঁর করুণায় এ-মালার ফুল রচিত হলো, মালি এসে জুটলো, এত আয়োজন, এত সমারোহের যিনি উৎস-মূল, সেই পরম করুণাময় রাহ্‌মানুর রাহিম আল্লাহ্‌ যে আড়ালে দাঁড়িয়ে এই উৎসব লক্ষ্য করছেন! সর্বশুভদাতা তিনি, সকল প্রশংসার একমাত্র অধিকারী তিনি! এ মালা তাই তাঁরই প্রাপ্য। এ মালা তাঁকেই আজ অর্পণ করছি।

বন্ধুগণ,

জীবনে আরও অনেক স্থান থেকে অভিনন্দন লাভ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে; কিন্তু যশোরের এই অভিনন্দন ও সম্বর্ধনার মধ্যে আছে একটা অনন্যসুলভ বৈশিষ্ট্য! এটা আমার প্রথম জন্ম-বার্ষিকী। দীর্ঘ ৫৫টা সৌর-বৎসরে আজ আমার কাব্য-জীবনেব একটি

www.pathagar.com

বৎসর পূর্ণ হলো! ৫৫ বৎসরের শিশুকবি আমি! মিথ্যাই বা কি! কবিরা তো মহাকালের কাছে শিশুই। বিশ্বস্রষ্টা অনন্ত নিখিলে যে রূপ ও রোমাঞ্চ সৃষ্টি করছেন, তার খবর বাইরের জগৎ কতোটুকু জানে? কবি-শিশুরা সেই পরম পিতার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অস্পষ্ট ভাষায় আকারে-ইঙ্গিতে যা-কিছু একটু আভাস দিয়ে যায়।

আর একটা বৈশিষ্ট্যও আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার জন্ম-বার্ষিকী আমার আপন ঘরেই উদ্‌যাপিত হচ্ছে। যশোর আমার মাতৃভূমি; যশোরেই আজ এই উৎসবের আয়োজন। মা-বোন ও ভাইদের আশীর্বাদ ও প্রীতি-স্নেহের ছায়াতলেই আপনারা আমাকে অভিনন্দিত করছেন। এ উৎসব অন্যখানে হলে নিশ্চয়ই এত সুন্দর, স্বাভাবিক ও সুশোভন হতো না। ঘরের মায়া কাটিয়ে এতদিন আমি ছিলাম দূরে দূরে, দেশের ভাইবোনদের সঙ্গে ছিল না আমার তেমন কোনো নিবিড় যোগাযোগ। কিন্তু হলে কি হয়! রক্তের সম্বন্ধ, অন্তরের টান যাবে কোথায়! যশোরের এই মাটি, এই আকাশ-আলো, এই হাওয়া ও পানি, এই নারিকেল -সুপারী-খেজুর গাছের স্নিগ্ধ রূপশ্রী–সবার সাথেই আমার আছে নিবিড় যোগ। সে কি কখনো মিথ্যা হতে পারে! শুনতে পেয়েছি আজ আমি তাদের সবারি আবাহন, পেয়েছি আজ তাদের নিমন্ত্রণ। আকাশের আলোকোজ্জ্বল দীপ্তিতে, বাতাসের নৃত্যচপল গতি-ভঙ্গিতে, ফুলের স্নিগ্ধ হাসিতে, পাখির কল-সঙ্গীতে, তৃণ-শস্যের শ্যাম-কান্তিতে অনুভব করছি আমি এক নিগূঢ় আত্মীয়তার স্বাক্ষর। সবাই আজ আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আমার গুরুজনেরা, এসেছেন জননী-ভগিনীরা, এসেছে আমার তরুণ ভাই-বোনেরা। কেউ দিচ্ছেন আশীর্বাদ, কেউ দিচ্ছেন অন্তরের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। মান-অভিমানের পালাও আছে ছোট্ট ছোট্ট নাতি-নাতিনীরা কথা কচ্ছে না! বলছে ঃ "যাও দাদু, তোমার সঙ্গে আড়ি! তুমি কেন আমাদের ভুলে ছিলে?"

এমনি এক সুন্দর পরিবেশের মধ্যে আপনারা দিচ্ছেন আমাকে অভিনন্দন! এই শুভক্ষণে আমি শুধু এইটুকুই বল্‌তে পারি ঃ যশোর যেমন আমাকে ভালোবাসে, আমিও তেমনি যশোরকে ভালোবাসি। কাছেই থাকি আর দূরেই থাকি–যশোরকে আমি ভুলিনি। যশোরের কল্যাণ চিন্তা চিরদিনই আমার মনে জেগে আছে, মনের দিকচক্রবাল হয়তো আজ সম্প্রসারিত হয়েছে, অন্তরে জেগেছে আজ বৃহত্তর স্বদেশপ্রেম ও বিশ্ববোধ; তা হলেও সবার মাঝারে আজ জেগে আছে আমার জন্মভূমির মুখচ্ছবি। ঢাকায় থাকলেও যশোরের স্মৃতি আমার ঢাকা পড়েনি; সেখানে বসেও রচনা করেছি এক নূতন যশোর। আপনারা হয়তো জানেন, সেখানকার 'যশোর সমিতির' সঙ্গে আমি ঘনিষ্টভাবে জড়িত।

যশোর আমার সত্যই গৌরবের বস্তু। যশোর করে রসের ডিলারী। ইতিহাস থেকে জানা যায়ঃ অতি প্রাচীন কাল থেকেই যশোরে অত্যুৎকৃষ্ট চিনি প্রস্তুত হয়। কোটচাঁদপুরে ছিল চিনির কারখানা। সেখানকার চিনি শুধু ,দেশবাসীর রস-পিপাসাই মিটায়নি–লক্ষ লক্ষ টাকার চিনি বিদেশেও রপ্তানি হয়েছে। ইউরোপে যশোরের চিনির খ্যাতি ছিল প্রচুর।

এ গেল বাহিরের পরিচয়। অন্তরলোকেও যশোর এই রসমূর্তিতেই প্রকাশ পাচ্ছে। সেখানেও চলেছে এই রসের কারবার। এই যে লম্বা লম্বা খেজুর গাছ দেখছেন, ওরা যুগ যুগ ধরে মিছেই মাটির উপর দাঁড়িয়ে নেই। যে রসের ফল্গুধারা বয়ে চলেছে এই মাটির

www.pathagar.com

পৃথিবীর বুকের তলে, তার সাথে আছে এই খেজুর গাছগুলোর সংযোগ। এগুলো রসের পাইপ বা চোঙা। কোন্ আদিকাল থেকে আল্লাহ্ এখানে এই চোঙাগুলি বসিয়ে রেখেছেন, কে জানে। বিজ্ঞানীরা বসায় তেলের পাইপ, আল্লাহ্ বসিয়েছেন এই রসের পাইপ! এম্নি পাইপ বসানো আছে আর একটি জায়গায়–আরবের মরুভূমিতে। সে খেজুর গাছ দিয়েছে জগতকে অমৃত। যশোরের খেজুর গাছও কম যায়নি; সেও দিয়েছে 'মধুর'রস–'গৌড়জন' যা নিরবধি পান করে তৃপ্ত হচ্ছে। যশোরের মাটিতে মাইকেল মধুসূদনের জন্ম তাই অনিবার্য হয়েছিল। 'অমৃত বাজার' 'আনন্দ বাজার' এমন নামকরণ যশোরেই সম্ভব। এই মাটিতেই জন্মেছেন বাগ্মী মুনশী মেহেরুল্লাহ্, জন্মেছেন গরীব শাহ্ ফকীর–জন্মেছেন রসকবি পাগ্লা কানাই। প্রেমিক শিশির কুমার, শিল্পী উদয় শঙ্কর–এই মাটিরই সন্তান। সেই দেশে আমার জন্ম! আমি কি গৌরববোধ করবো না!

আমার জীবনস্মৃতি

আমার জন্মপল্লী হলো ঝিনাইদা মহকুমার শৈলকুপা থানার অন্তর্গত মনোহরপুর গ্রামে। আমার ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটের বর্ণনানুসারে দেখা যায়ঃ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আমার জন্ম। কিন্তু আমার বেশ ,মনে আছে শৈলকুপা হাইস্কুলে ভর্তি হবার সময় আমার আব্বা আমার বয়স প্রায় বছর দুই কমিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই আমার প্রকৃত জন্ম হয়েছিল সম্ভবতঃ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে। তবে এটা ঠিক যে, যেদিন আমার জন্ম হয়, সেদিন বাংলা তারিখ ছিল ৭ই পৌষ, রবিবার। আশ্চর্যের বিষয়, আমার প্রথম জন্ম-বার্ষিকীতে আজ দেখছি ৭ই পৌষ ঠিক রবিবারেই পড়েছে। এ এক অদ্ভুত যোগাযোগ!

বলা বাহুল্য, এই সব কারণেই এই উৎস আমার কাছে এনেছে এক সুন্দর সার্থকতার আনন্দ আর এরই জন্যে এর উদ্যোক্তাদের প্রতি স্বতঃউৎসারিত হয়ে আস্ছে আমার অন্তরের অফুরন্ত ধন্যবাদ।

আমার বেশ মনে পড়ে, আমার কাব্য-জীবনের প্রথম উন্মেষ হয় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে। আমি তখন শৈলকুপা হাইস্কুলে ৫ম শ্রেণীর ছাত্র। নীচের ক্লাস থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত আমি শৈলকুপা স্কুলেই পড়েছিলাম। ৫ম শ্রেণীতে উঠবার পরই কেমন যেন একটা কাব্যিক ভাব আমার মধ্যে এলো। এটার কারণও ছিল। আমার পিতা মরহুম মৌলবী গোলাম রাব্বানী সাহেব ছিলেন তখনকার দিনে আমাদের অঞ্চলের একজন বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত ও কবি। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, কাসাসুল আম্বিয়া প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ ছিল তাঁর অনেক। অবসর সময়ে প্রায়ই তিনি সুর করে করে সে সব পড়তেন। তার থেকেই আমার মনে লেগেছিল কাব্যের রং। লেগেছিল সুর ও ছন্দের দোলা। তিনি তখন সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখেও লোকদের শোনাতেন। বহুজনের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র তিনি কবিতাতে লিখতেন। আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর। তিনি যতোদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন কোনো-না-কোনো একটা সংবাদপত্র তিনি নিতেনই। আমি যখন খুব ছোট, তখন থেকেই তিনি নিতেন 'হিতবাদী' ও 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রকাণ্ড বিছানার চাদরের মতো বড়ো

www.pathagar.com

বড়ো কাগজের কথা আজও আমার মনে আছে। সেই সব কাগজ কোনো কোনো সময় তিনি আমাকে পড়তে বলতেন। পরে যখন 'মোসলেম-হিতৈষী' ও 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' বাহির হয়, তখন তিনি সে সব কাগজেরও গ্রাহক হয়েছিলেন।

এই সাহিত্যিক আবহাওয়া আমাদের পরিবারে ছিল কতকটা বংশানুক্রমিক। আমার পিতামহ মরহুম কাজী গোলাম সরোয়ারও ছিলেন একজন নামকরা কবি। বিজুলিয়ার নীল-কুঠির বিদ্রোহের সময় ইংরাজ সাহেবদের বিরুদ্ধে তিনি এক প্রকাণ্ড কবিতা লিখে দেশবাসীকে বিদ্রোহী করে তুলেছিলেন। কাজেই কিছুটা উত্তরাধিকার সূত্রেই আমি পেয়েছি আমার কাব্য-প্রেরণা।

আর একটি ঘটনাও আমার কাব্য-জীবনের উন্মেষের পক্ষে সাহায্য করেছিল। "মানময়ী গার্লস্ স্কুলের" যশস্বী লেখক স্বর্গীয় রবি মৈত্রের নাম আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। আমার জন্মপল্লী মনোহরপুরের সংলগ্ন ফাজিলপুর গ্রামে ছিল তাঁর নিবাস। তিনিও ছিলেন শৈলকুপা স্কুলের ছাত্র। আমি যখন ৫ম শ্রেণীতে, তিনি তখন ৮ম শ্রেণীতে। সেবারকার পুরস্কার বিতরণী সভায় তিনি "পঞ্চ নদীর তীরে, বেণী পাকাইয়া শিরে" এই কবিতাটি অপূর্ব ভঙ্গীতে আবৃত্তি করেন। তা শুনে আমার মনেও জেগেছিল কবি হওয়ার সাধ।

আমার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'সাপ্তাহিক মোহম্মদী'-তে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে। আমি তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র। সে সময় তরুণ তুর্কীবীর আনোয়ার পাশা বুলগেরিয়ার কবল থেকে 'আদ্রিয়ানোপল' উদ্ধার করেন। সেই খুশিতে আমি কবিতা লিখি 'আদ্রিয়ানোপল উদ্ধারে'—এই আমার প্রথম ছাপা কবিতা! কবিতাটির নূতন ছন্দ, প্রকাশভঙ্গির আধুনিকতা ও সাবলীল গতি-ভঙ্গির জন্য তৎকালীন সাহিত্যিক মহলে বেশ একটা সাড়া পড়ে যায়। সেই থেকেই আমি দু'একটি করে কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠাতে থাকি।

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করি আমি ১৯১৪ সনে। দৌলতপুর থেকে আই-এ পাশ করে কলিকাতায় রিপন কলেজে পড়তে যাই বি-এ। সেখান থেকেই ১৯১৮ সালে বি-এ পাশ করি। যশোরের অন্যতম প্রতিভাবান সাহিত্যিক "পথের পাঁচালী"র যশস্বী লেখক স্বর্গীয় বিভূতি ভূষণ বন্দোপাধ্যায় ছিলেন রিপন কলেজে আমার সহপাঠি।

আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ "রক্তরাগ" ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়। এর পাণ্ডুলিপি নিয়ে যাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে। তিনি তা পড়ে দেখে এই আশীর্বাণী আমাকে দেন ঃ

> "তব নব-প্রভাতের রক্তরাগখানি
> মধ্যাহ্নে জাগায় যেন জ্যোতির্ময়ী বাণী।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আরও কয়েকবার সাক্ষাৎ হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তখন আমি হেয়ার স্কুলের শিক্ষক। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে আসতেন শান্তিনিকেতন থেকে। ঠাকুর বাড়ির কয়েকটি ছেলেও পড়তো হেয়ার স্কুলে। ঠাকুর বাড়িতে তখন প্রতি বৎসরই হতো শারোদোৎসব ও বর্ষামঙ্গল। এসব উৎসবে আমি প্রায়ই যোগ দিয়েছি। সুরশিল্পী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও ছিল আমার পরিচয়। আমার একটি গানের সুর তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ছন্দের যাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথের

www.pathagar.com

সঙ্গে আমার কোনোদিন পরিচয় ঘটেনি। পরিচিত হবার আগেই তিনি চলে গেলেন পরপারে। তাঁর প্রতি আমার গোপন শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে আমার কবিতা 'সত্যেন্দ্র স্মৃতিতে।

এই সময় কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে আকস্মিকভাবে আমার পরিচয় ঘটে। ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটে তখন ছিল 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিস। সেখানে প্রায়ই যেতাম। হঠাৎ একদিন শুনি নজরুল ইসলাম এসেছেন। এক মুহূর্তেই পরিচয় ঘটে গেল। তরুণ কবির প্রাণের প্রাচুর্য ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আমাকে মুগ্ধ করলো। তখন রবীন্দ্র সঙ্গীতের যুগ। দেখলাম নজরুল খুব ভালো গানও গাইতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান "আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি"– নজরুলের মুখেই প্রথম আমি শুনি। চমৎকার লাগলো। তাঁর কাছ থেকেই এই গানটি শিখেছিলাম। আর একটি জিনিস তাঁর কাছ থেকে শিখেছিলাম সেটি হচ্ছে স্বরলিপি থেকে হারমোনিয়ামে গান তোলা। নজরুল রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন।

এর কিছুদিন পরই তিনি লিখলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী'। কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় নলিনী সরকারের 'বিজলি' পত্রিকায়। আমার বেশ মনে পড়ে, কলিকাতার রাস্তায় হকাররা সেদিন বলে বেড়াচ্ছিল ঃ "হাবিলদার বিগড় গ্যায়া! হাবিলদার বিগড় গ্যায়া।"

এই কবিতা থেকেই সৃষ্টি হলো নজরুলের সাথে আমার একটা আদর্শগত বিভেদ। কবিতার অপূর্ব ছন্দ, শব্দ-সম্পদ, বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গী আমাকে মুগ্ধ করলো, কিন্তু ওর অন্তর্নিহিত ভাবধারার সঙ্গে কেন যেন আমার মন সায় দিল না। দর্শন ও তত্ত্বকথার দিক্ দিয়ে আমি ছিলাম সুফী কবি জালাল উদ্দীন রুমি, হাফিজ, রবীন্দ্রনাথ ও ইকবালের ভাবশিষ্য। মওলানা রুমী যে বলেছেন ঃ "বাঁশী কি বলছে শোনো, ঝাড় থেকে কে তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে এলো, এই কথাই তার বুক থেকে ধ্বনিত হচ্ছে," অথবা রবীন্দনাথ যে বলেছেন ঃ "হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে ভুবনে রাজে হে"–এই সুরেই আমার মনের বীণা ছিল বাঁধা। কাজেই খোদার আসন আরশ ভেদ করে উঠবার মতো বিদ্রোহ আমি সহ্য করতে পারলাম না। আমি লিখলাম ঠিক এর বিপরীত একটা কবিতা–'নিয়ন্ত্রিত'। নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পর মুসলিম সমাজের অনেকেই চঞ্চল হয়ে ওঠেন; অনেক সাময়িক পত্রিকা ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে গালাগালি দেয়। নজরুল তখন জেলে। জেলে বসেই তিনি সেই সব কবিতা ও মন্তব্য পাঠ করেন। আমার 'নিয়ন্ত্রিত' কবিতা পড়ে তিনি তাঁর কোনো কোনো বন্ধুর কাছে এই মন্তব্য করেছিলেন ঃ "আর সব্বাই দিয়েছে গালাগালি, গোলাম মোস্তফা দিয়েছে উত্তর।"

নজরুলের সঙ্গে ছিল আমার আদর্শগত যা একটু পার্থক্য; কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ছিল অতি মধুর। সর্বত্রই আমাদের দেখাশোনা ও মেলামেশা হয়েছে। আদর্শগত পার্থক্য ও স্বকীয়তা বজায় রেখেও কেমন করে দুই কবি-বন্ধু মিলতে পারে, আমরা তার সুন্দর নজীর। দুঃখের বিষয় এই মনোভাব আজকের কবি-সাহিত্যিকদিগের মধ্যে অত্যন্ত বিরল।

www.pathagar.com

আমার লক্ষ্য ও আদর্শ

যে-যুগে আমার জন্ম, সে যুগ বাংলার মুসলমানদের অবসাদের যুগ। সে-যুগে আমাদের সাহিত্যের না ছিল কোনো স্বাতন্ত্র্য, না ছিল কোনো স্বকীয়তা। প্রত্যেক জাতির মননশক্তি, ঐতিহ্য, ধ্যান-ধারণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হয় তার মাতৃভাষার মধ্যে। জাতির অন্তরমূর্তি ছায়া ফেলে তার সাহিত্যের মনো-মুকুরে। সাহিত্য তাই জাতির মনের প্রতিধ্বনি। সাহিত্যের ভিতর দিয়েই গোটা জাতির সাচ্চা চেহারা দেখা যায়। সেই হিসাবে বাংলার মুসলমানদের কোনো সাহিত্যই তখন রচিত হয়নি। আমি তাই ছোটবেলা থেকেই চেয়েছিলাম মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য রচনা করতে। রবীন্দ্রনাথ বা সত্যেন্দ্রনাথের অনুরাগী হলেও আমার মনে জেগেছিল আমাদের নিজস্ব সাহিত্য-সৃষ্টির একটা দুর্জয় আকাঙ্খা। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির তাকিদে নয়—সহজভাবেই আমি বাংলা সাহিত্যে চেয়েছিলাম ইসলামী কৃষ্টির রূপায়ণ। মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ–এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন হিন্দু জাতির মর্মবাণীর উদগাতা। তাঁরা যে পথ দেখিয়ে গেছেন, আমিও করতে চেয়েছিলাম সেই পথের অনুসরণ। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব সভ্যতাকেই বিশ্বের দরবারে বড় করে দেখিয়ে গিয়েছেন। আমারও মনে জাগ্‌লো এই স্বপ্নসাধ। বাংলা ভাষা বাঙালির ভাষা। সেই বাঙালির অর্ধেকের বেশি হলো মুসলমান; কাজেই বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের জীবনের প্রকাশ যদি না থাকে তবে সে সাহিত্য কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামী রূপায়ণ তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই অনিবার্য হয়েছিল এবং এখনও আছে। বাংলা ভাষা যখন বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা, তখন তার একটা নিজস্ব ছাপ এতে থাকবেই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির দিক দিয়েও এর প্রয়োজন রয়েছে। মুসলিমের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে যে সৌন্দর্য্য ও চমৎকারিত্ব আছে, তাকে যদি বাংলা ভাষার রূপ দেওয়া যায়, তবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যই হবে পরিপুষ্ট—এই ছিল আমার ধারণা। সে যুগে আমাদেরই মধ্যে একদল ছিলেন—যারা মনে করতেন, ইসলামী কোনো কিছু ঢুকলেই কাব্য মারা যাবে। আমি ছিলাম তাদের ঘোর বিরোধী। আমি বুঝেছিলাম, প্রত্যেক কাল্‌চারেরই নিজস্ব সৌন্দর্য্য ও চমৎকারিত্ব আছে। এটাও বুঝেছিলাম ঃ কোনো সত্যিকার কবি-সাহিত্যিকই নিজের পরিচিত পরিবেশ, প্রকাশ-ভঙ্গি ও বিষয়বস্তু ছেড়ে কাব্য-চর্চা করতে পারে না। সত্য, সুন্দর এবং মঙ্গলকে কেন্দ্র করেই যখন সমস্ত কাব্য ও শিল্প গড়ে ওঠে, তখন কাব্যের আঙ্গিক বা উপকরণ বিভিন্ন হলেও তার আবেদন সমানই থাকে। কাজেই কোনো মুসলিম কবি যদি আরবী-ফার্সী শব্দ বা ভাবধারা ব্যবহার করে, তবে তাতে কোনোই অন্যায় হয় না, বরং সেইটেই হয় স্বাভাবিক। হাফিজ, খৈয়াম, মিলটন, সেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল –প্রত্যেকেই আপন আপন আদর্শে ও আঙ্গিকে কাব্য-রচনা করেছেন। বাংলার মুসলিম কবিকেও ঠিক তাই করতে হবে।

মুসলমানদের অনেকেই বাংলার সাহিত্যে হিন্দু-ভাবধারার প্রাধান্য দেখে দুঃখিত হন এবং এর জন্য হিন্দু লেখকদিগের প্রতি দোষারোপ করেন। আমি কিন্তু সেই দলের নই। আপন জাতির ঐতিহ্য ধ্যানধারণা ও আদর্শকে মাতৃভাষায় রূপ দিয়ে তারা নিশ্চয়ই কোনো

www.pathagar.com

অপরাধ করেনি। বরং ঠিক কাজই করেছে। প্রত্যেক জাতির কবি সাহিত্যিকদের স্বভাব-ধর্মই তো হলো তার জাতির প্রতিনিধিত্ব করা। হিন্দুরা তা করেছে, মুসলমদানেরা তা করেনি। কাজেই দোষ হলো মুসলমানদের। এই দৈন্য আমি ঘুচাতে চাই। হিন্দু-সংস্কৃতিকে ঘৃণা করিনা-আঘাতও করিনা, আমি চাই শুধু আমার সংস্কৃতিকে গড়ে তুলতে।

একটা বাধা

কিন্তু এ কাজে খানিকটা বাধা আছে। হিন্দু-মুসলমান কৃষ্টির লক্ষ্য ও আদর্শে অনেকখানি যেমন মিল আছে, দুঃখের বিষয় তেমনি অনেকখানি বৈষম্য আছে,-সে হলো আদর্শগত বৈষম্য। সাহিত্য সাধনায় তাই উভয় জাতির মধ্যে অনেক স্থানে সংঘাতের সম্ভাবনা আছে। হিন্দুর আছে বহু দেববাদ, মুসলমানের আছে তৌহিদ। হিন্দু ধর্মের আছে মূর্তি পূজা, ইসলাম তার ঘোর বিরোধী। হিন্দু মানে পুনর্জন্মবাদ আর অবতারবাদ। মুসলমান তা আদৌ মানে না। এই ধরনের দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া যায়। এই সব কারণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আজ দুই নূতন পথে প্রবাহিত হচ্ছে। একে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। পাকিস্তানের জন্মের মূলেও রয়েছে এই সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বকে মেনেই আমাদের একটা আপোষ করতে হবে। আজ জগতে এসেছে আত্মচেতনা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের যুগ। প্রত্যেকেই চাচ্ছে তার স্বীকৃতি। ঘি, চিনি ও সাদা সরু চাউলের পাশে আজ ডালডা, গুড় ও মোটা লাল চাউল আপন অধিকারে বাজারে আত্ম-প্রকাশ করেছে। ট্রেনে আজ ফার্স্ট ক্লাশেও কুলি-মজুরের প্রবেশ রোধ করা যাচ্ছে না। দিন ও রাত্রির মতো সাদা বাজারের সঙ্গে কালোবাজার ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। আজ তাই আপোষ ছাড়া গতি নেই। সাহিত্য ও শিল্পের নীতিও হবে এই। মিশ্রণ নয়, মিলনই হবে এ যুগের বৈশিষ্ট্য। আজ আমরা এক-পৃথিবীর নাগরিক, খণ্ডকে স্বীকার করেই আমাদের হতে হবে অখণ্ড জগতের অধিবাসী।

আমার মতে, হিন্দু তার নিজস্ব কালচার গড়বে, মুসলমানও তার নিজস্ব কালচার গড়বে, এই হলো সোজা কথা। যে বাংলা ভাষা নিয়ে এত দ্বন্দ্ব, সেই বাংলা ভাষাতেই আছে এর সমাধান। দ্বন্দ্বকে দ্বন্দ্ব-সমাসে পরিণত করলেই তো সব লেঠা চুকে যায়। কেউ কারো পেটে হজম না হয়েও দিব্যি মিলেমিশে থাকতে পারে।

নূতন ভবিষ্যৎ

একথা অস্বীকার করলে চলবে না যে, পাকিস্তান শুধু একটা ভৌগলিক পরিবর্তনই আনে নাই, একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লবকেও সে টেনে এনেছে। আমাদের আকাশে দেখা দিয়েছে নব নব সম্ভাবনার ইঙ্গিত। এক নূতন ভবিষ্যতের সম্মুখে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। এতদিনকার অনেক কিছু আজ ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। আমাদের মূল্য-জ্ঞানও (sense of value) অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে। কাল যাকে চেয়েছিলাম, আজ আর তার প্রয়োজন নেই। এই ভাঙাগড়া শুধু যে পাকিস্তানেই শুরু হয়েছে, তা নয়-ভারতেও। পাকিস্তানেই শুধু ইসলামী রাষ্ট্র-রচনার জল্পনা-কল্পনা চলছে না, ভারতেও চলছে রাম-

www.pathagar.com

রাজত্বের পরিকল্পনা। রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য নিয়ে এখানেও যেমন সমস্যা জেগেছে, ওখানেও তেমনি জেগেছে; এখানেও উর্দু ঢুকেছে, এখানেও হিন্দি ঢুকেছে; এখানেও প্রধানমন্ত্রীকে করা হয়েছে 'উজিরে আজম' ওখানে 'অধিমন্ত্রী'; এখানকার 'কেরাণী' ওখানে হয়েছে 'করনিক'! ওখানকার 'মাঙ্গলিক নিয়ামক' বা 'জনসংভরণ (আসাদন)' 'মহাপ্রেষাধিকারিক' 'উত্তর শিক্ষণ কৃত্যক' 'সম্প্রসারপর্ষৎ' ইত্যাদি যে কি জিনিস তা অনেক শিক্ষিত হিন্দুই বলতে পারবেন না। এমনি ধরনের পরিভাষা পশ্চিমবঙ্গে গঠিত হয়েছে।

দৃষ্টিকোণের এই পরিবর্তনের জন্যই বাংলার হিন্দু আজ হিন্দী ভাষাকে সহজেই মেনে নিতে পেরেছে। সে আজ বুঝছে, তাকে বাঁচতে হলে বাঙালিত্বের গণ্ডী কেটে আশ্রয় নিতে হবে বৃহত্তর হিন্দুত্বের গণ্ডিতে। উভয় রাষ্ট্রেই জেগেছে আজ নব-সৃষ্টির চঞ্চলতা। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের হিন্দুদের নিরাশ হলে চলবে না। নূতন পরিবেশের সঙ্গে তাদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এমন বিপ্লব তো বহুবার তাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে এসেছে। ধরুন সঙ্গীতের কথা। ধ্রুপদই ছিল ভারতীয় সঙ্গীতের আদিম রূপ। একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সে ছিল প্রাচীর-বেষ্টিত। মুসলমানেরা এসে ভাঙলো সেই অচলায়তন; আনলো নূতন আলো, নূতন সুর। হিন্দু সুরশিল্পীরা হয়তো তখন ভেবেছিলেন, সুরলোকে কি দৌরাত্মই না ঘটে গেল। কিন্তু অকল্যাণের বেশে এলো পরম সুন্দর। ধ্রুপদকে ভেঙে মুসলমানেরা আনলো খেয়াল, আনলো ঠুংরী-টপ্পার অপরূপ বৈচিত্র্য। আজ ভারতীয় সঙ্গীতের চারিটি শাখা ঃ ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী। বলা বাহুল্য, এই চারিটির ভিতর তিনটিই হলো মুসলমানের দান। আশ্চর্যের বিষয়, আজ হিন্দুরা সেই খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী পরম শ্রদ্ধা ও আনন্দের সঙ্গে গাইছেন এবং তারাই করছেন এর আদর ও লালন। পাকিস্তানকে আজ যারা অশুভ বলে মনে করছেন, অনাগত দিনে তারাই হয়তো দেখবেন এর কল্যাণময়ী রূপ।

পাকিস্তানের হিন্দু ভাইদের তাই অনুরোধ করি ঃ অবস্থার সঙ্গে তারা খাপ খাইয়ে চলুন এবং কিছু ত্যাগও করুন, দানও করুন। তাদের উন্নত বিদ্যা-বুদ্ধি ও শক্তি-সামর্থ তামদ্দুনিক পাকিস্তান রচনায় অনেকখানি সাহায্য করবে এবং তাতে তারাও সার্থকতা খুঁজে পাবেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তারা আগেই তাদের এই এগিয়ে-চলার মনোভাব দেখিয়েছেন। বাংলা ভাষায় আরবী-ফার্সী শব্দ ও ছন্দের আমদানি নজরুল প্রথম করেননি, করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁর 'কুহু কেকা' 'বেণু ও বীণা' 'তীর্থ-সলিল' 'তীর্থ-বেণু' এবং অন্যান্য কাব্য-গ্রন্থ পড়লেই আপনারা তা বুঝতে পারবেন। তারপর নজরুল ইসলাম যখন আরও সুষ্ঠুভাবে এই নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন, তখনও হিন্দু সমাজ তা অম্লান বদনে মেনে নিয়েছে। মোহিতলাল মজুমদার, নরেন্দ্র দেব প্রমুখ কবিরা এই টেক্‌নিকে বহু কবিতা লিখে যশস্বী হয়েছেন।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষার সংস্কার

কিছুদিন যাবত পূর্ব-বাংলায় ভাষা-সংস্কারের চেষ্টা চলছে। সরকার একটা ভাষা-কমিটি বসিয়েছেন। কমিটি সে ভাষার নমুনা যা আমাদের দেখিয়েছেন,; তাতে যারপরনাই নিরাশ হয়েছি। ভাষা হলো প্রাণের জিনিস; জীবনের সঙ্গে রয়েছে ওর নিবিড় যোগ। প্রাকৃতিক নিয়মে গড়ে উঠেছে ও বহুযুগের আলোছায়ার মধ্য দিয়ে। ওকে এখন নির্মমভাবে ছাঁটাই করতে গেলে চলবে কেন? বাহুল্যকে বর্জন করতে হবে–মনের এই ভঙ্গি অনেক স্থানেই স্বভাব-বিরুদ্ধ ও অবৈজ্ঞানিক। বিশ্ব-প্রকৃতিতে রয়েছে বাহুল্যের বিকাশ। বাহুল্য আছে বলেই আছে বৈচিত্র্য, আছে চমৎকারিত্ব; বাহুল্য আছে বলেই সৃষ্টি শাখায় শাখায় পল্লবিত হতে পারে। ৯২টা elements কেন? বহু রকমের ফল-ফুল কেন? এক রকম ফুল, এক রকম ফল থাকলেই তো চলতো। মিষ্টি? শুধু সন্দেশ রেখে দাও, তাড়াও রসোগোল্লা, জিলেপি ও প্রাণহরাকে। এমনি করে যেটুকু দরকার তাই রেখে ছাঁটাই করতে গেলে আল্লার সৃষ্টি ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়বে।

তারপর একার-কে বাদিক থেকে নিয়ে অক্ষরের ডান দিকে বেঁকিয়ে বসানোও অবৈজ্ঞানিক। বাংলা লেখার গতি হচ্ছে বা-দিক থেকে ডান দিকে। একারকে ডাইনে উল্টা মুখো বসিয়ে দিলে এই গতিতে বাধা পড়ে। একসঙ্গে ছেলের দল লাইন বেধে দৌড়াচ্ছে; হঠাৎ একটা ছেলে আর একজনের সামনে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো; অমনি তাদের তাল কেটে গেল; হুড়মুড় করে সবগুলো পড়ে গেল! একারকে ঘুরিয়ে দেওয়ায় এই কাণ্ড হচ্ছে।

প্রস্তাবিত সংস্কারে স্থান এবং কালের পরিমাণও অনেকখানি বেড়ে যায়। 'স্ত্রী' শব্দটি লিখতে গেলে লিখতে হবে, 'ছ্‌ত্‌রী' রূপে। আগে ছিল স্ত্র +ী, এখন হলো ঃ ছ+ +্ + ত +্ + র +ী। দুবারের যায়গায় সাতবার আমাকে সকল তুলতে হবে। এ কোন্ শ্রেণীর সংস্কার?

সংস্কারকেরা কঠিন বাংলাকে সহজ করতে চান। কিন্তু কোন্ কঠিনকে সহজ করা হলো তা না জানলে ওদের সহজকে সহজে চেনাই যায় না। ধরুন আপনার 'স্ত্রী'। একে পাকিস্তানী বেশে দাঁড় করালে 'ছ্‌ত্‌রী' হলো। এখন আপনার 'স্ত্রী'-র চেহারা যদি ভালোরূপ মনে না থাকে, তা হলে 'ছ্‌ত্‌রী'র ভিতরে তিনি যে লুকিয়ে আছেন, তা আপনি বুঝতেই পারবেন না। তাহলে আগের সেই প্রাচীনা থেকেই গেলেন, মাঝখান থেকে এলেন আর একজন নবীনা! কী লাভ হলো? অনর্থক খরচ বাড়লো!

এখানেও আমার মত ঃ প্রয়োজনের তাকিদে কিছুটা সংস্কার করা যেতে পারে, কিন্তু জোর করে কিছু করতে গেলে তা টিক্‌বে না।

মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের প্রতি

পাকিস্তানের তরুণ মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের দায়িত্ব আজ অসীম। নূতন জাতি-গঠনের মুখে এসে তাঁরা দাঁড়িয়েছেন। তামদ্দুনিক পাকিস্তান রচনার কাজে তাঁদের প্রতিভা নিয়োজিত হবে, এই সকলে আশা করে। প্রত্যেক জাতিই বাঁচে তার তাহ্‌জিব ও

www.pathagar.com

তামদ্দুনের মধ্যে। মুসলিম জাতিকে বাঁচতে হলে তার কালচারকে পুনর্গঠিত করতেই হবে। ইসলাম এক নূতন ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে; পাকিস্তান হবে তার প্রধান পটভূমি। সে শুনাবে বিশ্বমানুষের মুক্তির বাণী। তরুণ শিল্পীদের তাই একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা নিয়ে নামতে হবে। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, তরুণদের অনেকেই আজ এ সম্বন্ধে সচেতন নন। তরল হালকা সাহিত্য রচনাতেই তাঁরা ব্যস্ত। সাগর পারের উৎক্ষিপ্ত যৌন-সাহিত্যে আজ আমাদের রাস্তাঘাট প্লাবিত, অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ ভাবধারায় আজ আমাদের সাহিত্য পরিপূর্ণ। ভাবতে গেলে নিরাশ হতে হয়। দীর্ঘ ৩০ বৎসরের ভিতরে বাংলার মুসলিম কবি-সাহিত্যিকেরা খুব কম মৌলিক দানই জাতিকে উপহার দিয়েছেন। মনন সাহিত্যে তো দূরের কথা, গল্প-উপন্যাস, নাটক ও কাব্যেও তাঁদের দান আশানুরূপ নয়। আজ পর্যন্ত কুরআন শরীফের একটা নির্ভরযোগ্য অনুবাদও বাংলা ভাষায় নেই। এইসব অভাব মিটাতে হলে সাধনা করতে হবে। তরুণদের অনেকের মধ্যেই প্রতিভার দীপ্তি দেখা যায়, কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হতে না হতেই সে দীপ্তি ম্লান হয়ে আসে। জানি না কবে আমাদের এ দৈন্য ঘুচবে।

নিতান্ত দুঃখের বিষয়, আমাদের আলেম সমাজও এসব বিষয়ে তেমন কোনোই উৎসাহ দেখাচ্ছেন না। ইসলামী সাহিত্য তো তাঁরাই রচনা করবেন। আশা করি তাঁরা এ বিষয়ে অবহিত হবেন।

বন্ধুগণ! আপনাদের অনেক সময় নিয়েছি, আর নয়। যশোর পূর্বেও দেখিয়েছে নূতন আলো, নূতন আশা; পাকিস্তানেও সে হবে নকীব–সে হবে অগ্রপথিক। পাকিস্তানের ভৌগলিক সংস্থানই যশোরকে দিয়েছে গুরুত্ব। রাজনীতিতে সে পাকিস্তানের সীমান্তপ্রদেশ। সংগ্রামের দিনেও প্রাণ দিয়ে সে তার প্রিয়, ওতানকে রক্ষা করবে, কালচারাল ফ্রান্টিয়ারও সে সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করবে। চিন্তার নেতৃত্ব করাই হবে যশোরের নূতন ঐতিহাসিক ভূমিকা। "What Jessore thinks today the rest of Pakistan thinks tomorrow." এই গৌরবের সে যেন হয় অধিকারী–এই আমার দিলের আরজু। পুনরায় জানাই আপনাদেরকে আমার আন্তরিক শুকরিয়া ও মুবারকবাদ।

৫৫তম জন্মবার্ষিকী–২৩শে ডিসেম্বর ঃ ১৯৫১

www.pathagar.com

আমাদের শিক্ষার ভবিষ্যৎ

ভ্রাতৃগণ,

আমাকে আহ্বান করা হয়েছে আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে দু'চার কথা বলতে। এই সুযোগ ও সম্মান দেবার জন্যে কন্‌ফারেন্সের কর্তৃপক্ষকে জানাই আমার হাজারো শুকরিয়া ও মুবারকবাদ।

১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্ট সত্যই আমাদের জাতীয় জীবনে একটি চিরস্মরণীয় দিন। এই দিনে আমরা লাভ করেছি পাকিস্তান। একটা নূতন রাষ্ট্রের ভিত্তিপাত করা হয়েছে সেদিন। আমাদের চোখে নেমেছে এক নূতন আশার স্বপ্ন; এক নূতন জগতের দুয়ার গিয়েছে খুলে। আমাদের আসমানে ধ্বনিত হচ্ছে আজ নব নব সম্ভাবনার ইঙ্গিত।

এটা স্বীকার করতেই হবে যে, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক এবং আদর্শগত পরিবর্তনের জন্যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্য-জ্ঞানেরও (sense of value) খানিকটা পরিবর্তন ঘটেছে।

নূতন পরিবেশে এবং নূতন পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাই সব জিনিষকে যাচাই করে নিচ্ছি। আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতিকেও আমরা আজ পাকিস্তানের আলোকে দেখে নিতে চাই।

রাষ্ট্র গঠনে শিক্ষার স্থান

রাষ্ট্র গঠনে শিক্ষার স্থান অতি উচ্চে। স্কুল হচ্ছে রাষ্ট্রের আরশি বিশেষ। স্কুলের আরশিতে রাষ্ট্রের মুখ দেখা যায়। একটা রাষ্ট্রের লক্ষ্য কি, আদর্শ কি, প্রকৃতি কি, তা তার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি দেখেই বলে দেওয়া যায়। জাতির অন্তর-মূর্তি প্রতিফলিত হয় তার শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে। রাষ্ট্র যে নূতন শাসনতন্ত্র ও রাজনৈতিক দর্শনের অনুসরণ করে, তার শিক্ষাপদ্ধতিকেও সেই আদর্শ মেনে নিতে হয়। রাষ্ট্র চলবে এক পথে, তার শিক্ষার ধারা চলবে অন্য পথে—এরূপ হতেই পারে না। রাষ্ট্রের আদর্শের সঙ্গে শিক্ষার আদর্শের তাই মূলতঃ মিল থাকার দরকার। রাষ্ট্রচালকদের দেখতে হবে তার স্কুল-কলেজে কি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তা রাষ্ট্রের আদর্শ মেনে চলছে কিনা। পাকিস্তান গ্রহণ করেছে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র কৃষ্টি-গঠনের আদর্শ; এখন তার স্কুল-কলেজগুলি যদি তা না মানে, তাহলে সেটা হয় দস্তুরমতো রাষ্ট্রবিরোধিতা। কাজেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর রাষ্ট্রের কতকটা নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকে—আর সেটা আমাদের মেনে নিতেই হবে। শিক্ষা বিভাগের প্রধান কর্তব্য হবে এই দিকে দৃষ্টি রাখা। অন্যথায় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা ডিরেক্টর, শিক্ষা-সেক্রেটারী এবং হাজার হাজার স্কুল-ইন্সপেক্টরদের আড়ম্বরের কোনো অর্থ হয় না।

আর এটা খুবই সত্য কথা যে, সীমান্ত রক্ষা করা, খাদ্য সরবরাহ করা, শাসন ও বিচার করা ইত্যাদি কাজের চেয়ে সত্যিকার শিক্ষাদান করা রাষ্ট্রের পক্ষে কোনো অংশে কম মূল্যবান নয়। আমাদের Geographical frontier-ও যেমন রক্ষা করতে হবে, আমাদের Cultural frontier-ও ঠিক তেমনি রক্ষা করতে হবে।

www.pathagar.com

একটা কথা আছে "As the state, so the school"—কথাটা খুবই সত্যি। রাষ্ট্রে যে আদর্শ চাইবে, তা তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিফলিত হবে। আদর্শ নাগরিক-গঠনই হলো তাই আধুনিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। প্রত্যেক স্বাধীন জাতিই এই নীতি মেনে চলছে। তারা যেমন নাগরিক চায়, তেমনটিই তাদের স্কুল-কলেজের কারখানা থেকে তৈরি করে নেয়। ইংরাজ জাতি অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক (constiutional) ও গণতান্ত্রিক জাতি। ব্যক্তি স্বাধীনতাকে (Individual liberty) তারা সর্বাপেক্ষা বেশী মূল্য দেয়; কাজেই তাদের শিক্ষা-পদ্ধতিতেও পাওয়া যায় এই দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্যের ছাপ। আমেরিকা একটি গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট; কাজেই তার শিক্ষা-দর্শন হলো- (Individual efficiency and social sufficiency" অর্থাৎ ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং সামাজিক স্বচ্ছলতা। জার্মানি ছিল "Totalitarian state."স্টেটকেই তারা সর্বেসর্বা বলে মেনেছে; এ-জন্যে তার শিক্ষার মূল প্রেরণা ছিল স্টেটের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ-অর্থাৎ স্টেটই বাপ-মা, এই মনোভাব। বস্তুতঃ প্রত্যেক জাতির স্বকীয়তা ফুটে ওঠে তার শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে।

পাকিস্তানে শিক্ষার আদর্শ কিরূপ হবে

পাকিস্তানের শিক্ষার আদর্শ তাহলে কিরূপ হবে? এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। পাকিস্তান যখন ইসলামী রাষ্ট্র, তখন তার শিক্ষার আদর্শও হবে ইসলামী।

ইসলামী আদর্শ কি?

ইসলামী আদর্শ হলো ঃ লা-শরীক এক আল্লাহকে মানা, রাসূলকে মানা, কুরআন মানা, আদর্শ চরিত্র গঠন করা, মানবতার সেবা করা, পরমত-সহিষ্ণু হওয়া, উদারপন্থী ও বিশ্বপ্রেমিক হওয়া, জড় জগৎ ও আধ্যাত্ম জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে উভয় দিক দিয়েই উন্নতি করা এবং কুরআনের ভাষায় ঃ সকল জাতির ভিতরে "খায়রা উম্মাতিন" (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জাতি) হওয়া। বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। এক কথায় ঃ ইসলামের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ রয়েছে পাকিস্তানের শিক্ষা পদ্ধতিতেও থাকবে সেই বৈশিষ্ট্য ও সেই আদর্শ।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে এক আদর্শকেই অনুসরণ করা হয়েছিল। আজ আমরা যে-কালচারের অধিকারী, সেই সেমিটিক কালচারের বিশ্লেষণ করলে এই বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। আমাদের কালচারে নেই সংকীর্ণতা- নেই গোঁড়ামী। বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। আমাদেরই পিয়ারা রাসূল (সা) বলেছেন ঃ 'জ্ঞান লাভের জন্য সুদূর চীন দেশে যেতে হলেও যাও'। আমরা হেলেনিক কালচারের দর্শন-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও ললিত-কলা থেকে অনেক কিছু নিয়েছি। ভারতীয় কালচার থেকেও কিছু কিছু নিয়েছি-যেখানে যা ভালো দেখেছি-সব নিয়েছি; তারপর তা থেকে সৃষ্টি করেছি নূতন অবদান এবং জগতকে তা উপহার দিয়েছি। Modern Europe আমাদেরই হাতের তৈরী। আমাদের কালচারে আছে Scientific spirit এবং Religious spirit-এর সুষ্ঠু সমন্বয়। ইউরোপ বলেছে ঃ "State must be separated from the

www.pathagar.com

church." আমরা কিন্তু state আর church এক আসনে মিলিয়েছি। ধর্ম রাজনীতি, সমাজনীতি–সব আমাদের ওতপ্রোত ভাবে অন্তর্বিজড়িত।

এই হলো মোটামুটি আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। এখন দেখা যাক— পাকিস্তানের শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদের এই সমাজ-আদর্শকে কতদূর মেনে চলেছে –

আমাদের শিক্ষায় বিজাতীয় আদর্শের প্রভাব প্রথমেই দেখতে পাই ঃ আমাদের শিক্ষায় ধর্মের স্থান নেই বললেই চলে। আমরা ইংরাজের আদর্শকে দু'শ বছর ধরে অনুসরণ করে আসছি। ইংরাজ চলে গেছে, কিন্তু তাদের রেখে যাওয়া আদর্শ এখনও আমরা বর্জন করতে পারিনি। সেই শিক্ষা, সেই সিলেবাস, সেই স্কুল, সেই নিয়ম-কানুন–পাকিস্তানে এখনও অব্যাহত রয়েছে।। ইংরাজ প্রভুরা চলে যাওয়ায় শুধু যেন একটা হাত-বদলই হয়ে গেছে–তার বেশী কিছু নয়।

অবশ্য বলা যেতে পারে ঃ দুই একটা ব্যাপারে ছিটে-ফোঁটা কিছুটা সংস্কারের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত কাজ এখনও কিছুই হয়নি। গত বৎসর শিক্ষা বিভাগ স্কুলপাঠ্য সাহিত্য এবং ইতিহাসে কিছুটা পরিবর্তন এনেছেন। পাকিস্তানক বিরোধী ভাবধারা ও তথ্য সমূহকে সরিয়ে সেখানে চেষ্টা করা হয়েছে আমাদের আদর্শকে কায়েম করবার। ফল কিছুটা হয়েছে, সন্দেহ নেই; কিন্তু সম্পূর্ণ 'Educational System'-এর সংস্কার এ নয়। একে বড়ো জোর বলা যেতে পারে একটা জোড়াতালি দেওয়া ভাব। মাঝখান থেকে দুটো-একটা বিষয়ে একটু-আধটু পরিবর্তন বিশেষ কার্যকরী হয় না। এর পিছনে চাই একটা পরিচ্ছন্ন লক্ষ্যের বা নীতির অনুসরণ। তা যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ সত্যিকার শিক্ষা-সংস্কার আসতে পারে না। শিক্ষা বিভাগ শুধু Primary এবং Secondary স্কুলের সাহিত্য এবং ইতিহাসেই না হয় কিছুটা পরিবর্তন এনেছেন, কিন্তু I.A., B.A. এবং M. A.-র পাঠ্য পুস্তকে পূর্বের আদর্শের ধারা এখনো অক্ষুণ্ণ রয়েছে। Matric, I. A., B. A. এবং M. A-র পাঠ্যপুস্তকে প্রাক-পাকিস্তান যুগের ধারা এখনও প্রায় একটানা ভাবেই চলে আসছে। আমাদের কলেজে এবং ইউনিভারসিটিতে এখনো যেন পাকিস্তান আসেনি। আগের বই, আগের সিলেবাস সবই প্রায় ঠিক আছে। এখানেও সংস্কারের আশু প্রয়োজন রয়েছে।

বলা বাহুল্য, উপরে ইসলামী কালচারের বৈশিষ্ট্যের যে পরিচয় দিয়েছি এই শ্রেণীর কাব্য-সাহিত্য সেই বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। ইসলামের প্রারম্ভ থেকেই মুসলমান মনীষীরা বিভিন্ন কালচারের সংস্পর্শে এলেও সতর্কতার সঙ্গে অনৈসলামিক ভাবধারাকে বর্জন করে চলেছিলেন। Drapper তাঁর "History of Intellectual Development of Europe" গ্রন্থে ঠিকই বলেছেন ঃ

"The Arabs never translated into their tongue the great Greek poets, though they so sedulously collected and translated the Greek philosophers. Their religious sentiments caused them to abominate the lewdness of our classical mythology."

www.pathagar.com

আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের এখানে চলছে তার উল্টো নীতি! এটা ঠিক হিন্দুদের দোষে হচ্ছে না, মুসলিম মনের স্বাভাবিক আকর্ষণ ও আদর্শের বিকৃতি থেকেই এই অভিশাপ আমাদের শিরে নেমেছে।

এখানে স্বভাবতঃই পাকিস্তানের হিন্দু সমাজের কথা আসে। এখানে আমার হিন্দু বন্ধুরা আমাকে হয়তো ভুল বুঝতে পারেন। শিক্ষা, সাহিত্য ও কাব্য থেকে আমি হিন্দুদের তাড়িয়ে দেবার কথা বলছিনা; আমরা যে একটা স্বতন্ত্র জাতি এবং আমাদের যে একটা বিশিষ্ট কালচার আছে এবং তাকে যে আমাদের মাতৃভাষায় রূপ দিতে হবে–এই স্বাভাবিক প্রেরণা থেকেই আমি একথা বলছি।

গত চার বৎসরে শিক্ষা-বিভাগ যে কয়েকটি কাণ্ড করেছেন, তাতেই বুঝা যাচ্ছে তাঁদের সামনে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। ১৯৪৮ সালে তাঁরা Class III ও Class IV থেকেই ইংরাজি তুলে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন; সেই অনুসারে ১৯৪৭ সালের শেষদিকে তাঁরা একটি সার্কুলার জারি করেন; ফলে Class III ও Class IV থেকে ইংরাজি পড়ানো বন্ধ হয়ে যায়। হঠাৎ ১৯৪৯ সালের প্রথম ভাগে আবার সার্কুলার জারি করা হয় যে, যেহেতু কর্তৃপক্ষ তখনো Class V-এর Syllabus তৈরি করতে পারেন নি, সেই হেতু পূর্বের হুকুম তাঁরা নাকচ করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলেছিলেন যে, যে সব ছেলে Class IV বা Class V-এ উঠলো, তারা যেন ছয় মাস করে আগের বইগুলো পড়ে নেয়। ভেবে দেখুন, কতো বড়ো খামখেয়ালির পরিচয় এ। ধরুন Class IV থেকে একটা ছেলে Class V-এ উঠলো। তাকে বলা হলো ঃ 'তুমি Class IV-এর ইংরাজি বইটা ছয় মাসে শেষ করে নাও। বাকী ছয় মাসে Class V-এর বইটা পড়ো।' এটা যদিও সম্ভব হয়, তবু বলতে হবে Class V-এর ইংরাজি জ্ঞান তো পূর্ণ হলো না। Class IV-এ উঠে সে কি আবার Class V-এর এই অসম্পূর্ণ অংশটুকু পূর্ণ করবে? রগড়ের কথাই বটে! এখানে একটা গল্প মনে পড়লো। এক জমিদার এলেন তাঁর বাগানবাড়ি পরিদর্শন করতে। এসেই দেখেন বাগানের একস্থানে একটা মাটির ঢিপি উঁচু হয়ে রয়েছে। জমিদার মালিকে ডেকে বললেন ঃ এই মাটিটা কি তুমি সরিয়ে ফেলতে পারো না? মালি বললো ঃ 'হুজুর, কোথায় রাখবো এই মাটি?' জমিদার রেগে বললেন ঃ 'কেন, একটা গর্ত করে তার মধ্যেই তো এই মাটিগুলি পুরে রাখতে পারো!' মালি মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললো, 'হুজুর, গর্ত খুঁড়লে যে-মাটি বেরুবে, সে-মাটি আবার কোথায় রাখবো?' জমিদার এবার রেগে কাঁই হয়ে বললেন ঃ 'বোকা গাধা কোথাকার, সে- মাটিটা আর একটা গর্ত খুঁড়ে রাখতে পারো না?' মালি বাধ্য হয়ে নিরুত্তর হয়ে রইলো। দ্বিতীয় গর্তের মাটি কোথায় রাখবে, তা জিজ্ঞেস করতে তার আর সাহস হলো না।

আমাদের শিক্ষা-বিভাগের ইংরাজি তুলে দেবার ব্যাপারটাও সেরূপই হলো!

তারপর গত চার বৎসরে শিক্ষা-বিভাগ থেকে দুটো কমিটি গঠন করা হয়েছিলঃ একটি হলো East Bengal Language Standardisation Committtee, আর একটা হলো East Bengal Educational Reconstruction

www.pathagar.com

Committee. ভাষা-সংস্কার কার্যে এক সঙ্গে তারা হাত দিয়েছিলেন। প্রায় দেড় বৎসর পরে উভয় কমিটিই তাদের reports পেশ করেছেন বলে জানা গেছে, কিন্তু সে রিপোর্ট দুটিতে সাপ আছে কি ব্যাঙ আছে, আমরা তার কিছুই জানতে পারিনি এখনো। ভাষা-সংস্কারের যে নমুনা আমরা দেখছি, তা থেকেই বুঝা যায় কমিটি কি রিপোর্ট দিয়েছেন। গভর্নমেন্ট কিন্তু এ সম্বন্ধে একদম নীরব। শিক্ষা-সংস্কার কমিটির সুপারিশ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। অথচ সে কমিটির সুপারিশের তোয়াক্কা না রেখেই শিক্ষা-বিভাগ সম্প্রতি আর একটি সার্কুলার জারি করেছেন যে, প্রাইমারী স্কুলের গোড়া থেকেই আরবী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হবে। জনাব মৌলানা আকরাম খাঁ সাহেব ছিলেন উভয় কমিটিরই প্রেসিডেন্ট, তিনি সরকারের এই অভিনব সিদ্ধান্তের কথা জেনে ২৬-৯-৫১ তারিখের সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়ে গভর্নমেন্টের এই কার্যের তীব্র নিন্দা করেছেন। অবশ্য এর দ্বারা গভর্নমেন্টের নিন্দাই যে সূচিত হচ্ছে, তা ঠিক বলা যায় না। এমনও তো হতে পারে যে, ভাষা-সংস্কার কমিটি এবং শিক্ষা-সংস্কার কমিটি এমন রিপোর্ট দিয়েছেন যা গভর্নমেন্ট গ্রহণ করতে পারেন নি। যেটাই সত্য হোক, শিক্ষা বিভাগের অযোগ্যতা এবং খামখেয়ালিই এর ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। কতো হাজার হাজার টাকাই না এই দুই কমিটিতে ব্যয় হয়েছে।

Text-Book Committee-র গঠন, পরিচালন এবং ক্রিয়া-কলাপও গ্রন্থকার, প্রকাশক ও পুস্তক ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে।

শিক্ষা-বিভাগে কর্মচারী নিয়োগ, বদলী, প্রমোশন ইত্যাদি ব্যাপারেও যথেষ্ট স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ পেয়েছে। এতে সাধারণ ভাবে শিক্ষার ক্ষতি হয়েছে।

শিক্ষার ইস্‌লামী ভাব দিতে হলে শিশুমনেই তা দিতে হবে। শিশুই হলো আমাদের ভবিষ্যৎ জাতির বুনিয়াদ। তাদের শিক্ষাই বা ঠিক পথ ধরে চলছে কই? ইসলামী শিক্ষার গোড়ার কথাই হলো কলেমা। আল্লাহর একত্ব এবং রাসূলের পায়রবী করার স্বীকৃতি গোড়া থেকেই আমাদের চাই। বিস্তৃত ভাবে ধর্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা করা তো দূরে থাকুক এই চারি বৎসরে শিক্ষা-বিভাগ এই সহজ কাজটুকুও করেন নি। বেশী কিছু খরচ না– একটা সার্কুলার জারি করলেই এ কাজটা হয়ে যেত। ধরুন, পরিচালনভার হাতে নিয়েই–শিক্ষা-বিভাগ যদি এমন একটা সার্কুলার জারি করতেন যে, এখন থেকে যে-সব মুসলিম বালক-বালিকা প্রথম ভর্তি হতে আসবে, তাদের কাছে এ প্রশ্নটা অবশ্যই করতে হবে যে, তুমি কলেমা জানো কিনা! যে বলতে পারবে না, তাকে ভর্তি করা হবে না। এই সার্কুলার জারি হয়ে গেলেই–ছেলেমেয়ের মাতাপিতা এবং শিক্ষকগণ সতর্ক হয়ে যেতেন এবং ভালোভাবে কলেমা শিখিয়েই তাদের ভর্তি করবার জন্য পাঠাতেন। এইভাবে গত ৪ বৎসরে অন্ততঃ ২ লক্ষ ছেলেমেয়েকে ইসলামী আদর্শে দীক্ষা দেওয়া যেত। জীবন ভর এ শিক্ষা কাজে লাগতো। একরূপ বিনা পয়সাতেই এতবড় একটা কাজ হতে পারতো– এখনো পারে। গভর্ণমেন্ট সেটা করেন না কেন, বুঝা যায় না।

ধর্ম-শিক্ষাকে এখন একটা স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু রূপেই পাকিস্তানের স্কুলে ঢুকানো দরকার।

www.pathagar.com

আমরা চাই একটা নূতন শিক্ষাতন্ত্র যার সঙ্গে বর্তমান শিল্প-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ মিল নাও থাকতে পারে। ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ আর কতোকাল আমরা করবো, জানি না। বিজাতীয় কালচারের মোহ এখন আমাদেরকে ছাড়তে হবে। অনুকরণপ্রিয়তা দাস জাতির মনোভাব। যারা আজাদ তারা সৃষ্টি করে, যারা গোলাম তারা নকল করে। আল্লামা ইকবাল তাঁর Educational Philosophy-তে এই কথাটার উপরেই বেশী জোর দিয়েছেন। Individuality বা 'খুদীর' বলিষ্ঠ প্রকাশই হবে আমাদের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। গোলাম এবং আযাদের তারতম্য সম্বন্ধে তিনি বলছেন ঃ

> "I will tell you a subtle point
> bright as a pearl
> That you may distinguish between
> the slave and the free.
> The slave is by nature repeatitve
> His experience is bereft of originality,
> The free man is always busily creative."

কাজেই পাকিস্তানকে তার নিজস্ব শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষা-পদ্ধতি সৃষ্টি করতে হবে। কোন্ দেশে কে কি করেছে এই শুধু নকল করলেই চলবে না।

'আসরারে খুদী' এবং অন্যান্য গ্রন্থেও ইকবাল ইউরোপের দর্শন ও চিন্তাধারাকে আঘাত করেছেন। খুদীকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলাই হলো তাঁর প্রধান পয়গাম।

সিলেবাসের চাপ

একথা প্রত্যেক শিক্ষাবিদ স্বীকার করেন যে, সিলেবাসের অস্বাভাবিক গুরুভার আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীদের মন ও মস্তিষ্ককে নিষ্পেষিত করে ফেলেছ। বিষয়বস্তুর বাহুল্য আমাদের কমাতেই হবে। এখানেও আমাদের মূল্যজ্ঞান পরিবর্তিত হওয়া উচিত। ইংরাজেরা যে-মাপকাঠি দিয়ে আমাদের যোগ্যতার বিচার করতো, আমাদেরও যে এখন তাই করতে হবে, তার কোনো মানেই নেই। বড় পণ্ডিত হলেই সার্থক কর্মচারী হয় না। একজন ইংরেজ আই.সি.এস-এর চেয়ে একজন দেশী লোকও ভালো ডিস্ট্রীক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারে। Academic qualification খুব উঁচু থাকলেই মনে করা যাবে না যে কর্মী হিসাবেও সে উঁচু।

আশ্চর্যের বিষয়, আমরা কিন্তু সেই আগের মাপকাঠিকে এখনো আকড়ে পড়ে আছি। শিক্ষার মূল্যমান তাই সংশোধিত হওয়া উচিত। ইংরাজরা যা ভালো মনে করেছে, পাকিস্তানের পরিবর্তিত আবহাওয়ায় আমরাও কেন তাই মেনে চলবো! আমাদের তাই এখন উচিত-প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের সিলেবাসকে রদবদল করা। অবশ্য এ-কথার দ্বারা আমি শিক্ষার মান বা আদর্শকে অবনমিত করতে চাচ্ছি না, বর্তমান অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতেই বলছি।

www.pathagar.com

এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবসর এখানে নেই। শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, ইংরাজিকে তার উচ্চ আসন থেকে এখন সরিয়ে দিতে হবে; বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানী বেশ পরিয়ে ব্যাকরণের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তি দিতে হবে। এখানে শুনে অবাক হবেন, পাকিস্তানের এই মাটিতেই আমাদের জনৈক 'ডক্টর' ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠার একখানি ব্যাকরণ লিখেছেন এবং সেটা পাঠ্যপুস্তক রূপে মনোনীত হয়েছে। তারপর History ও Geography থেকেও অনেক কিছু ছাঁটাই করতে হবে। Mathematics-এর কলেবরও অনেক কমিয়ে দিতে হবে। Arithmetic, Algebra, Geometry— তিনখানা বড় বড় কিতাব আয়ত্ব করতে গিয়ে কতো ছাত্রই না শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ব্যর্থ মন নিয়ে ফিরে গেছে। অত অঙ্ক আর জ্যামিতি করেও কর্মজীবনে কাজে লাগে শুধু টাকা-পয়সার জমা-খরচ। কোথায় থাকে Algebra-র স্থান, কোথায় থাকে Geometry ও Trigunmetry-র জ্ঞান। স্বীকার করি অঙ্ক শাস্ত্রের দ্বারা চিন্তার তীক্ষ্ণতা ও একাগ্রতা জন্মে; কিন্তু এই লাভটুকুর জন্য সময় ও শক্তির যে অপব্যবহার হচ্ছে তার দাম অনেক বেশী।

Elementary science আর একটা উদ্ভট subject. ৬/৭টা বৈজ্ঞানিক বিষয় এক সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয় পড়া তো দূরের কথা, পড়ানোর মাস্টারই খুঁজে পাওয়া যায় না। ৬/৭টা বিজ্ঞানের বিষয় খুব কম শিক্ষকই জানেন। কাজেই এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থা দূর করতে হবে। আমরা স্কুল-কলেজে যে science পড়ি, ব্যবহারিক জীবনে তার কোন মূল্য নেই বললেই চলে। বিজ্ঞানের জ্ঞান আমাদের পুঁথির মধ্যে এবং Laboratory-র মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। দেড়শ' বছর তো science পড়ছি, কিন্তু বাড়িতে এক দোয়াত fountain pen-এর কালিও তৈরি করতে পারিনে, এক বোতল distilled water-ও তৈরি করতে পারিনে, মোটামুটিভাবে কোনো পরীক্ষাও করতে পারিনে। ২। ভাগ হাইড্রোজেন আর ১ ভাগ অক্সিজেন মিলালে যে পানি হয়– তা Laboratory Room-এই প্রমাণ করতে পারি–তার বাইরে নয়। যে শিক্ষার জীবনের কাছে মূল্য নেই তার মূল্য কতটুকু? Applied science-এর তাই আজ প্রয়োজন।

একজন ম্যাট্রিক ছাত্রকে কি কি বিষয় পড়তে হয় এবং সেই বিষয়ের পাঠ্য-পুস্তকগুলির আয়তন কতো, দেখুন ঃ–

1. Our Heritagc	---	96	Pages
2. English prose	---	126	"
3. English poetry	---	66	"
4. The Vicar of Wakefield	---	107	"
5. English Translation	---	240	"
6. Good English	---	484	"
7. Essays, Letters etc.	---	250	"
8. সাহিত্য পরিচিতি (গদ্য)	---	277	"

www.pathagar.com

9. সাহিত্য পরিচিতি (পদ্য)	---	210	Pages
10. গল্পবিথী	---	152	"
11. Rapid Reader ---	---	180	"
12. বাংলা রচনা ও ব্যাকরণ	---	470	"
13. Islamic History---	---	200	"
14. Pak-Bharat Itihas	---	300	"
15. Hygiene ----	---	256	"
16. Public Administration	---	142	"
17. Arithmetic ---	---	716	"
18. Algebra ---	---	700	"
19. Geometry	---	300	"
20. Geograpy ---	---	470	"
		5742.	"

এর উপরে আরো আছে Note books. তাও সব মিলিয়ে অন্ততঃ ১৫০০ পৃষ্ঠা হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ঃ প্রায় ৭০০০ পৃষ্ঠা একজন candidate-কে class IX—X-এ শেষ করতে হয়।

অবশ্য এখানে বলা দরকার ঃ এ সব অবস্থার দরুন আমি ভাষার সংখ্যা কমাতে চাইনে। আমার মতে পাকিস্তানে অন্ততঃ আমাদের চারিটি ভাষা শিখতেই হবে। বাংলা, আরবী, উর্দু ও ইংরাজি। চারিটিই হবে Compulsary—অবশ্য কম-বেশী হোক, ক্ষতি নেই। কিন্তু ভাষার সংখ্যা কমানো যাবে না। আমরা এখন এক-পৃথিবীর (one-world-এর) নাগরিক। কাজেই এখন আমাদের অন্ততঃ ৪টা ভাষা শিখতেই হবে। বাংলাকে বাদ দিতে পারবো না, কারণ সে হলো মাতৃভাষা; আরবী শিখতেই হবে, কারণ সে হলো আমার ধর্মভাষা; উর্দু শিখতেই হবে এ দেশের lingua franca রূপে; আর ইংরাজি শিখতেই হবে একটা আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে। এইভাবে ৪টা ভাষা শিখে রাখলে State-Language যা-ই হোক না কেন, তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

তবে সব ভাষা এক সঙ্গে শিক্ষা করা অসম্ভব। ক্রমে ক্রমে শিক্ষা দিতে হবে।

মেয়েদের শিক্ষা

বর্তমানে মেয়েদের এবং ছেলেদের এক সিলেবাস। এটা কিছুতেই হওয়া উচিত নয়। যে গুরুভার ছেলেরাই সইতে পারে না, তা আমাদের কোমল স্বভাবা মেয়েদের ঘাড়েও চাপিয়ে দেবার মতো নিষ্ঠুরতা আমরা দেখাতে কুণ্ঠিত হচ্ছি না। সমস্ত suject-ই তাদের সমান ভাবে ছেলেদের সাথে পাল্লা দিয়ে পড়তে হবে, এ কেমন কথা!

www.pathagar.com

মেয়েদের উপর পাঠ্য-পুস্তকের অস্বাভাবিক গুরুভার চাপানোর ফলে অন্য দিক দিয়ে তো কুফল ফলছেই। মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে। স্কুল-কলেজের মেয়েদের মধ্যে স্বাস্থ্যবতী মেয়ে খুব কমই দেখা যায়। স্কুলের bus এসে ৮টায় তাদের নিয়ে যায়, আর ৫টায় বাড়িতে রেখে যায়। কি অবস্থা হয় বুঝতেই পারেন।

এর আমূল পরিবর্তন হওয়া নিতান্ত দরকার। অবশ্য এক যায়গায় কিছু পরিবর্তন করলে হবে না; স্কুলে করলে কলেজেও করতে হবে, কলেজে করলে ইউনিভাসিটিতেও করতে হবে।

পরীক্ষা

বর্তমান শিক্ষার অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো পরীক্ষা। পরীক্ষাই হয়েছে আমাদের যোগ্যতার মাপকাঠি। পরীক্ষায় পাশ করলেই সে যোগ্য, ফেল করলেই সে অযোগ্য। এই Essay form-এর Examination-ও ছাত্রদের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠেছে। এ সমস্যা দিনদিনই গুরুতর আকার ধারণ করছে। শতকরা ২০ থেকে ৩০-এর ভিতরে পাশ করছে, বাদবাকী সব ফেল। এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতিরও একটা সুরাহা করতে হবে।

আমাদের দেশে যোগ্য-অযোগ্য বিচার করবার অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই; কাজেই ছেলেদের পরীক্ষা দিতেই হবে। কিন্তু আমাদের জানা উচিত, পরীক্ষাই যোগ্যতা বিচারের একমাত্র মাপকাঠি নয়। পরীক্ষা নিয়ে ইউরোপে বহু পরীক্ষা হয়ে গেছে। কিছুদিন পূর্বে ইউরোপে Hartog Committee Examination-এর দোষগুণ আলোচনা করে একটা Report বের করেছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন "Examination of Examinaton". সেই Rport-এ এ-কথাটি দেখিয়েছেন যে, Examination -এর কোনো নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই। মনের এক এক অবস্থায় Examiner-রা এক এক রূপ মার্ক দেন। এই রিপোর্টে জানা যায় ইউরোপের একটি স্কুলের কোনো এক বিষয়ের ৪৮ খানা ইংরাজীর খাতা ৭ জন বিশিষ্ট Examiners দিয়ে কমিটি স্বতন্ত্র ভাবে পরীক্ষা করান। Chief Examiner কিরূপে ভাবে কাগজগুলো দেখতে হবে, তার নির্দেশও সব পরীক্ষককেই দেন। তারপর ৭ জন Examiners-এর প্রত্যেককে দিয়ে সেই ৪৮ খানা খাতা বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করান। বলা বাহুল্য কারো নম্বরই কেউ জানতে পারেন নি। ৭ জন Examiners-এর পরীক্ষার ফলাফল নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

Examiner	Fail	Pass	Credit	Special	credit
A ..	1 ..	16 ..	27	..	4
B ..	0 ..	2 ..	24	..	12
C ..	7 ..	30 ..	11	..	0
D ..	0 ..	9 ..	36	..	3
E ..	5 ..	16 ..	27		0
F ..	2 ..	7 ..	37		2.
G ..	19 ..	12 ..	17		0

www.pathagar.com

এর ৬ মাস পরে আবার খাতাগুলো পূর্বের Examiner-দের দ্বারাই দ্বিতীয় বারেও পরীক্ষা করানো হলো। দেখা গেল- একই Examiner আগে যাকে পাশ করিয়েছিলেন, এবার তাকে ফেল করিয়েছেন, আগে যাকে ৪০ দিয়েছিলেন, এবার হয়তো তাকে ৬০ দিয়েছেন-এই রকম আর কি!

এ থেকেই আপনারা বুঝতে পারছেন পরীক্ষার ভিতরে রয়েছে মস্ত বড় একটা element of chance. Examiner বদলালেই পরীক্ষার্থীর কপাল বদলে যেতে পারে। সময়, মনের অবস্থা, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি আরো বহু কারণ আছে-যার জন্য marking-এ পার্থক্য ঘটে।

তাহলে এইটেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পরীক্ষকরা যা নির্ধারণ করে দিচ্ছেন, তা সব সময়ে ঠিক নাও হতে পারে।

পরীক্ষা সম্বন্ধে একটা বিষয় আমাদের ভেবে দেখতে হবে। পরীক্ষায় ছাত্রেরা যে এত ফেল করছে, সেটা সম্পূর্ণ ভাবে ছাত্রদেরই দোষ কিনা। প্রত্যেক অভিজ্ঞ ব্যক্তিই স্বীকার করবেন, তা ঠিক নয়। পার্টিশনের পরে অবস্থার অনেক ওলট-পালট ঘটেছে। হিন্দু শিক্ষকরা চলে গেছেন, শিক্ষক অভাবে অনেকে স্কুল উঠে গেছে বা যাবার মতো হয়েছে, কাজেই পড়াশুনা ভালো হয়নি; আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য অনেকে ঠিক সময়ে বই কিনতে পারেনি; অনেককে রেশন আনতে হয়েছে, কেরোসিন তৈল সংগ্রহ করতে হয়েছে, কর্তৃপক্ষও সময় মতো হয়তো বই সরবরাহ করতে পারেননি; পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ছেলেদের মস্তিষ্কও হয়তো পরিপুষ্ট হতে পারেনি, এইরূপ বহু কারণই আছে। বহু সময় এক একটা রাজনৈতিক স্রোত এসেও স্কুলে লেগেডছ, তাতেও বহু ছাত্র বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও হয়তো কঠিন হয়েছে, আবার Examiner-রাও হয়তো কড়া করে খাতা দেখেছেন। এইরূপ বহু কারণেই অত ফেল করেছে। অবশ্য ছেলেরাই এখন পড়াশুনা বড় একটা করতে চায় না। 'টুকার দাবী মানতে হবে" বলে শ্লোগান দেয়- এটাও ঠিক। তবে ছাত্রদের অমনোযোগ ছাড়াও বাইরে যখন আরও কারণ রয়েছে, তখন এই ব্যর্থতার জন্য শুধু ছাত্ররাই কেন Penalised হবে এ প্রশ্ন আমরা করছি।

আনসার ও বয়স্কাউট

Physical Eduction আমাদের শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ। আমার মতে এখন শুধু Physical Exercise করাই উচিত নয়, প্রত্যেক স্কুলে এক একদল Junior Ansare খোলাও উচিত, আর তাদের প্রাথমিক Military Trainnig দেওয়া দরকার। Boy-Scout- দের মতো আনসার দলকে গঠন করতে পারলে তারা স্টেটের অনেক কাজে লাগবে। অবশ্য পাকিস্তানের সঙ্গে সঙ্গেই "ব্রতচারী" আন্দোলন তার আবেদন হারিয়েছে। কাজেই সে সম্বন্ধে কোনো কথা না বললেও চলে। পশ্চিম বঙ্গেও এই আন্দোলনটি এখন স্তিমিতপ্রায় হয়ে এসেছে।

www.pathagar.com

শিক্ষার সামঞ্জস্য

বর্তমানে পাকিস্তানে শিক্ষার দুটো বিশিষ্ট ধারা বয়ে চলেছে দুই স্বতন্ত্র পথে। ইংরাজির ধারা বয়ে চলেছে Primary, Secondary, College এবং Universty-এর খাতে, আর মক্তব থেকে আরম্ভ করে আরবী-ফার্সীর ধারা চলেছে জামাতে উলা ও টাইটেল পরীক্ষার খাতে। এই দুই ধারা সমান্তরাল হওয়া দরকার এবং গোড়ারদিকটায় পরস্পরের মধ্যে মিল থাকার দরকার। মাদ্রাসা-শিক্ষাকে নূতন আলোকে সঞ্জীবিত না করলে এবং ইংরাজি শিক্ষাকে ধর্ম ভাবাপন্ন না করলে কোনো শিক্ষা থেকেই আমাদের আশানুরূপ কল্যাণ হবে না।

শিক্ষকদের কথা

এইবার শিক্ষকদের সম্বন্ধে ২/১টি কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। যে কোনো সভ্য রাষ্ট্রে বা সমাজ-ব্যবস্থায় শিক্ষকদের প্রয়োজন অপরিহার্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের দেশে শিক্ষকদের কোনো মর্যাদাই দেওয়া হয় না। সরকারের নিকটও শিক্ষকরা যোগ্য সম্মান পান না, দেশবাসীর নিকটও না। স্কুল এবং শিক্ষকদের সঙ্গে সঙ্গে স্কুল বিল্ডিংগুলিও বিপদের দিনে মর্যাদা হারায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা যে কোনো বিপ্লবের সময় সর্বপ্রথম মারা পড়ে বেচারা শিক্ষা–The first casulty of war is education. School building-গুলো যেকোনো অজুহাতেই সরকার নিয়ে নিতে পারেন। আযাদ-পাকিস্তানে এই মনোভাব কর্তৃপক্ষকে বর্জন করতে হবে। স্কুলকে পবিত্র বলে মনে করতে হবে, নতুবা আমাদের রক্ষা নেই। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, স্কুলের আসবাব-পত্রের উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে গভর্নমেণ্টকে উদার হস্তে এগিয়ে আসতে হবে। ইউরোপে শিক্ষকদের যে মূল্য আছে, সেই মূল্য এখানে দিতে হবে। শিক্ষককে অবজ্ঞা করলে গোটা জাতিই অবজ্ঞাত হয়ে থাকবে। ইউরোপে Eton, প্রভৃতি স্কুলের মর্যাদা কতো বড়, তা সকলেই আপনারা জানেন The battle of waterlo was at the play-field of Eton—কথাটি খুবই সত্য।

শিক্ষকদেরও আপন কর্তব্য এবং আপন আদর্শ ভুললে চলবে না। যে মানব-সেবার ব্রত তাঁরা গ্রহণ করেছেন, তা পূরিপূর্ণভাবে পালন করতেই হবে। তা ছাড়া আপন অবজ্ঞা চিন্তা ও যোগ্যতা দিয়ে বিশ্বের কাছ থেকে তাঁদের সম্মান আদায় করে নিতে হবে। সম্মান কেউ হাতে তুলে দেয় না, সম্মান অর্জন করতে হয়।

এই সুযোগে পাকিস্তানের হিন্দু শিক্ষকদের প্রতি জানাই আমি আমার অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তাঁরা এক একটি দীপ-শিখাকে আগ্‌লে বসে আছেন। তাদের সৎসাহস ও স্বদেশ-প্রীতি সত্যই অকৃত্রিম। তাঁরা সব্বাই চলে গেলে পাকিস্তানে নিশ্চয়ই একটা চরম দুর্দিন ঘনিয়ে আসতো। যে নূতন দিন এলো, সঙ্গে সঙ্গে আশা করি তাঁরা সত্বরই নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন। সে মনোবল তাঁদের আছে।

www.pathagar.com

হে মশালধারি আলোকের অভিযাত্রী দল, এগিয়ে চলো। তোমাদের পদক্ষেপ দৃঢ় হোক, চরিত্র মহান হোক, জ্ঞানে গুণে তোমরা আদর্শস্থানীয় হও, দেখবে জগত তখন তোমাদের পায়ে আপনি এ সে শ্রদ্ধানতি জানাবে। Bernard Shaw কোনো এক স্থানে শিক্ষকদের সম্বন্ধে টিট্‌কারী দিয়ে বলেছিলেন ঃ

"One who can does, one who can not teaches."

অর্থাৎ যে পারে সে কাজ করে, যে পারেনা সে শিক্ষক হয়।

এ কথা যে মিথ্যা, শিক্ষকরাও যে অনেক কিছু করতে পারেন–তা দেখানোর দিন এলো;–

প্রস্তুত হও।

ঢাকা, ১৯৫২

নজরুল-কাব্যে দার্শনিকতা

নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্যে কোন সুস্পষ্ট দার্শনিকতা প্রচার করেননি। কোনোরূপ গভীর জীবনবোধ বা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি থেকে তাঁর কাব্য উৎসারিত হয়নি। তাঁর অনুভূতি প্রায় বলিষ্ঠ মনে যখন যে ভাবের উদয় হয়েছে, তিনি তাকেই রূপ দিয়েছেন। কোনো নূতন দর্শন বা তত্ত্বকথা শুনাবেন বলে তিনি নিজেও আমাদের কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি। তিনি পরিষ্কারই বলে দিয়েছেন ঃ

"বর্তমানের কবি আমি ভাই,
ভবিষ্যতের নই নবী
কবি ও অ-কবি যাহা বলো মোরে
মুখ বুজে তাই সই সবি।
ভক্তেরা বলে নবযুগ রবি।
যুগের না হই, হুজুগের কবি।
পরোয়া করি না বাঁচিবা-না-বাঁচি
যুগে হুজুগ কেটে গেলে।
মাথার উপর জ্বলিছেন রবি–
রয়েছে সোনার শত ছেলে।"

–(সর্বহারা)

কাজেই কোনোরূপ দার্শনিক অভিনবত্ব তাঁর কাব্যে আশা করা আমাদের অন্যায়। তাঁর কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য অন্যত্র আমাদের খুঁজতে হবে।

তবু যা তিনি লিখে গেছেন, তার মধ্যে জ্ঞাতসারেই হোক অজ্ঞাতসারেই হোক, কিছু না কিছু দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রবন্ধে আমরা সেইটিই দেখবো।

নজরুলের-দার্শনিকতার দুটি বিশিষ্ট রূপ আমাদের চোখে পড়ে (১) ইসলামী দর্শন (২) হিন্দু দর্শন। তিনি যে সব ইসলামী কবিতা বা গজল লিখেছেন, তাতে তাঁর ইসলামী দর্শনের সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে। আল্লাহ, রাসূল দোজখ, বেহেশত, পরকাল সমস্ত তিনি মানেন। এই সব কবিতা ও গানে ইসলামের তৌহিদবাদ ও ধ্যান-ধারণা পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। তার কাব্যের ইসলামী রূপের কিঞ্চিৎ নমুনা দেখুন ঃ

www.pathagar.com

ইসলামী দর্শন

আল্লাহ্ আমার প্রভু, আমার
নাহি নাহি ভয়।
আমার নবী মোহাম্মদ যাঁর
তারীফ জগৎময়।
আমার কিসের শংকা
কোরান আমার ডঙ্কা
ইসলাম আমার ধর্ম,
মুসলিম আমার পরিচয়।।

* *

তোরা দেখে যা আমিনা
মায়ের কোলে।
মধু পূর্ণিমারি সেথা
চাঁদ দোলে।।

* *

বক্ষে আমার কাবার ছবি
চোক্ষে মোহাম্মদ রসুল
শিরপরি মোর খোদার আরশ
গাই তারি গান পথ বেভুল॥

* *

আহমদের এ মিমের পর্দা
উঠিয়ে দেখ মন।
আহাদ সেতায় বিরাজ করেন,
হেরে গুণী জন॥

* *

খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে
বেহুঁশ হয়ে রই পড়ে
ছেড়ে মসজিদ আমার মুর্শিদ
এলো যে এই পথ ধরে॥

সব গানের পূর্ণ উল্লেখ সম্ভব নয়। আরও কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গজলের প্রথম লাইন উদ্ধৃত করছি। এ থেকেই পাঠক বুঝতে পারবেন তাদের অন্তর্নিহিত ভাব ও বিষয়বস্তুর স্বরূপ ঃ

www.pathagar.com

'ও মন, রজমানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ', 'সাহারাতে ফুটলো রে ফুল', 'সৈয়দে মক্কী মদনী আমার নবী মোহাম্মদ', 'তৌহিদের মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম,' 'মদিনায় যাবি কে আয়', 'নামাজ পড়ো রোজা রাখো কল্‌মা পড়ো ভাই',; ,'শহীদী ঈদগাহে দেখ আজ জামায়েত ভারী'– ইত্যাদি গজল ও নাতিয়া সত্য তৌহিদের ব্যঞ্জনায় ভরপুর।

নজরুলের ইসলামী কবিতার মধ্যে মুসলিম জাতির ঐতিহ্য ও আশা-আকাঙ্খার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর আছে। সেখানে তিনি প্রাণের প্রতিষ্ঠা করেছেন। তৌহিদ, রাসূল-প্রীতি, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা প্রভৃতি ইসলামী জীবনদর্শনের বাণীই শুনিয়েছেন।

হিন্দু দর্শন

কিন্তু এই ইসলামী আদর্শ ও জীবন-দর্শন তনি সর্বত্র রক্ষা করেন নাই। তৌহিদের আদর্শ ও ধ্যান-ধারণার পাশাপাশিই হিন্দু-দর্শন ও বেদ-বেদীবাদও তাঁর কাব্যে পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ "নতুন চাঁদে" বেদান্ত দর্শনের সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে। কাব্যের কথা বলছি না; কারণ যে সব হিন্দুয়ানী গান, কীর্তন বা শ্যামা-সঙ্গীত তিনি লিখেছেন, কাব্যের দিক দিয়ে তার অনেকগুলিই রসোত্তীর্ণ হয়েছে। এমন কি, কাজী আবদুল ওদুদের মতে, নজরুলের ইসলামী গজল অপেক্ষা শ্যামা-সংগীত অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ "ইসলামী সঙ্গীতের চাইতে শ্যামা-সঙ্গীত রচনায় নজরুল সার্থকতা অর্জন করেছেন অনেক বেশী।"

–(নজরুল প্রতিভা, ২০২)

বস্তুতঃ কাব্য বিচারে তাঁর "আগমনী", "প্রলয়োল্লাস", "রক্তাম্বরধারিনী মা" ইত্যাদি কবিতা বা অজস্র কীর্তন, শ্যামা-সঙ্গীত বা অন্যান্য গান নিশ্চয়ই সার্থক সৃষ্টি হয়েছে, বলতে হবে। কিন্তু সে বিচার আজ আমরা করছি না। দার্শনিক দৃষ্টি-ভঙ্গিতেই এই সব কবিতা ও গানকে নিরীক্ষণ করছি।

এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে দেখা যায়, নজরুলের এই সব কবিতা গানে প্রতীকবাদ, অবতারবাদ ও অদ্বৈতবাদের ছায়া পড়েছে। প্রকৃতি ও দেব-দেবীর বর্ণনায় অনেক স্থলে প্যাগানিজমও (Paganism) প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর এই ধরনের গানের দু'একটির প্রথম লাইন উদ্ধৃত করছি তা থেকেই পাঠক আমার বক্তব্য বুঝবেন ঃ

'কৃষ্ণপ্রেমের ফুল ফুটেছে, লক্ষী মা তুই ওঠগো এবার, ফিরে গেছে সই এসে নন্দ কুমার,' 'শ্যাম মুখ আর না হেরিব,' 'এসো ঠাকুর মহুয়া বনে,' 'নূতন করে গড়বো ঠাকুর,' 'জয়তু শ্রীরামচন্দ্র,' 'এসো মা ভারত-লক্ষ্মী,' 'এলোরে শ্রীচণ্ডী,' 'আমার কালী বাঞ্ছাকল্পতরু' 'কালো মেয়ের পায়ের তলায়,' 'গিরিধারীলাল কৃষ্ণ গোপাল,' 'মা আমি তোর অন্ধ ছেলে', 'বনদেবী এসো,' 'খেলিছে জলদেবী,' 'কালী কালী মন্ত্র জপি,' 'অন্নপূর্ণা মা এসেছে'–ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এরূপ অসংখ্য কবিতা ও গান নজরুল লিখেছেন যাতে হিন্দুদের রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, উপনিষদ ও বেদান্তের দর্শন বিধৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

শেষের দিকে নজরুল ইসলাম বেদান্ত দর্শনের দিকে অত্যন্ত ঝোঁক দিয়েছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর "নতুন চাঁদ" কবিতাগ্রন্থে বেদান্তদর্শনের প্রভাব খুবই সুস্পষ্ট। দু-একটি নমুনা আমি দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে বেদান্ত দর্শন কী, সে কথা কিছু বলা দরকার।

উপনিষদেরই অপর নাম বেদান্ত। কাজেই বেদান্তক-দর্শন উপনিষদের শিক্ষার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বেদান্ত-দর্শনে "অদ্বৈতবাদ" প্রচার করা হয়েছে। 'একমেবদ্বিতীয়ম্' (এক ছাড়া দুই নাই) এটাই বেদান্ত দর্শনের সারকথা। 'এক ছাড়া দুই নাই'–এ কথাটি শুনতে কিন্তু ইসলামের তৌহিদের মতই শোনায়; যেন মনে হয়, আল্লাহ্‌র একত্বের কথাই বলা হচ্ছে। কিন্তু তা আদৌ নয়। এক ছাড়া দু'য়ের কোনো কল্পনাই এখানে করা হয়নি। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, নদ, নদী, মানুষ, গরু, তৃণলতা সব কিছুই সেই একের প্রকাশ। সবাইকে মিলিয়ে যে অখণ্ড এক, তারই নাম ব্রহ্ম। এই জন্যই বেদান্ত দর্শনে বলা হয় 'জগৎ ব্রহ্মময়'। বৈদান্তিকেরা তাই বিশ্বাস করেন আমিই ব্রহ্ম (অহং ব্রহ্মাস্মি), এই আত্মাই ব্রহ্ম (অয়মাত্মা ব্রহ্ম) অথবা সে-ই আমি (সোহহং)। বেদান্ত মতে তাই সৃষ্টিই স্রষ্টা–অভেদম্ই তার মূলমন্ত্র।

এই বৈদান্তিক ভাবধারা নজরুলের বহু কবিতা ও গানে ছায়া ফেলেছে। একথা কাজী আবদুল ওদুদও স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, "এই অদ্বৈতবাদ বা সোহহং তত্ত্বে নজরুল সুপ্রতিষ্ঠিত হন শ্রী অরবিন্দের কলিকাতার ভক্ত-গোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে।"

–(শাশ্বত বঙ্গ, ৯৪ পৃঃ)

নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলির মধ্যেই ধরা পড়বে নজরুলের বৈদান্তিক মনোভাব ঃ–

"তোমারে কি দিয়া পূজি ভগবান
মন্দিরে তুমি, মুরতিতে তুমি,
পূজার ফুলে তুমি স্তবগীতে তুমি
ভগবান দিয়ে ভগবান পূজা করিতে
তুমি যদি ভাবো অপমান॥"

–(গীতি শতদল)

"তার খেলাঘর তোর এ দেহ
সেত নহে অন্য কেহ
সেযে রে তুই–তবু মোহ
ঘুচলো না তোর–হায় পূজারি!"

–(গুল-বাগিচা)

নজরুল ইসরামের শেষ কাব্যগ্রন্থ "নতুন চাঁদ"। পরিণত বয়সের লেখা। তাঁর দার্শনিক মনের গভীর স্পর্শ এই পুস্তকেই সবচেয়ে বেশী অনুভূত হয়। এই পুস্তকেই নজরুলের বৈদান্তিক মতবাদ অধিকতর সুস্পষ্ট হয়েছে। 'ভগবান' ও 'মানুষে' যে কোনো ভেদ নাই, মানুষ যে ভগবানেরই অংশ, কাজেই সে যে নিজেই ভগবান, পরিদৃশ্যমান জগতের সবকিছুই যে শুধু মায়া, এই তত্ত্ব তাঁর "অভেদম" কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

"কেবলি রূপের আবরণে যিনি
ঢাকিছেন নিজ কায়া
লুকাতে আপন মাধুরী যে জন
কেবলি রচিছে মায়া–
সেই বহুরূপী পরম একাকী
এই সৃষ্টির মাঝে
নিষ্কাম হয়ে কিরূপে সতত
রত অনন্তকাজে।
পরম নিত্য হয়ে অনিত্য
রূপ নিয়ে এই খেলা
বালুকার ঘর গড়িয়ে ভাঙিছে
সন্ধ্যা-সকাল বেলা।
আমরা সকলে খেলি তারি সাথে
তারি সাথে হাসি কাঁদি
তারি ইংগিতে "পরম আমি"রে
শত-বন্ধনে বাঁধি।
মোর "আমি" ভেবে তারে "স্বামী" বলি
দিবাযামী নামি উঠি
কভু দেখি আমি–তুমি যে অভেদ,
কভু প্রভু বলে ছুটি।"

–(অভেদম্)

"জীব-রূপে রই, নিজরূপে কই?
খুঁজিতে সহসা দেখি
সেই নিজ আমি মহাতরু হয়ে
ছড়ায়ে পড়েছি– একি!"

–(ঐ)

"নাই সেথা যথ, তৃষ্ণার লোভ,
নাই বিরোধের ক্লেদ,
নাই সেথা মোর হিংসার ভয়,
নাই সেথা কোনো ভেদ,
নাই অহিংসা-হিংসা সেখানে
কেবল পরম শাম,
রাজনীতি নাই, কোনো ভীতি নাই,
'অভেদম্' তার নাম।"

–(অভেদম্)

www.pathagar.com

তাহলে দেখা যাচ্ছে ইউরোপের মায়াবাদ, পারস্যের সুফিবাদ এবং ভারতের অদ্বৈতবাদ এতকাল যে দর্শন প্রচার করে এসেছে নজরুলও তার অনুসরণ করেছেন। হাফিজ-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সুরের মিল আছে।

একই Pantheism-এর সুর সকলের মধ্যেই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, কাব্য, রস ও ভাবের চমৎকারিত্ব থাকলেও আদর্শ হিসাবে এগুলো পরিতাজ্য হবে, কারণ ইসলামী দর্শন থেকে এ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইসলাম ব্যক্তিকে (খুদীকে) বিসর্জন দিতে বলে না। আল্লাহ্‌র ভিতর চিরনির্বাণ লাভ না করে আল্লাহ্‌কেই নিজের মধ্যে আয়ত্ব করার কথা বলে। এ কথার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহর গুণাবলী আয়ত্ব করে মানুষকে শক্তিশালী হতে হবে।

নজরুলের 'বিদ্রোহী'

নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা এক অদ্ভুত সৃষ্টি। বলিষ্ঠ পৌরষ ব্যঞ্জক ভাবের যতো কবিতা এ যাবত বাংলা ভাষায় লিখিত হয়েছে তন্মধ্যে 'বিদ্রোহী' নিঃসন্দেহে শীর্ষ স্থানীয়। এমন তেজস্বিনী ভাষা, বিপ্লবী ভাবধারা, শব্দ-সম্পদ, উপমা ও আবেদন খুব কম কবিতায় দেখা যায়।

কবিতাটি এ যাবত বহু নিন্দা-প্রশংসা লাভ করেছে। শিল্প সৃষ্টি হিসাবে এর স্থান নিশ্চয়ই অনেক উর্ধ্বে। কোনো সাধারণ কবির হাত দিয়ে এ ধরনের কাব্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। চিন্তা, কল্পনা ও আবেগের উত্তেজিত মুহূর্তেই এমন কবিতা উৎসারিত হয়। কবিতাটি যে আবেগ প্রধান তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। এবং যেহেতু আবেগতাড়িত, সেই কারণেই এর পশ্চাতে কোনো সু-চিন্তিত দর্শন নেই।

ইকবাল জীবনের যে নূতন দর্শন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন তার সঙ্গে 'বিদ্রোহী'র অনেকখানি মিল আছে। হাফিজ, রবীন্দ্রনাথ বা অন্যান্য মরমপন্থি কবিরা যেখানে অলস খোদাপ্রেমে বিভোর হয়ে অতৃপ্ত মিলন কামনায় ব্যাকুল চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, সেখানে একমাত্র নজরুল ইসলামই 'বলদৃপ্ত' কণ্ঠে বলেছেন ঃ

"বলো বীর
বলো উন্নত মম শির।"

এই কবিতায় ইকবালের 'খুদী'-র সুর মাত্রাতিরিক্তরূপে প্রকাশ পেয়েছে। ইকবাল চান নিজেকে বিশ্বসত্তার মধ্যে নিশ্চিহ্ন না করে আত্ম-সত্তাকে স্বতন্ত্ররূপে পরিস্ফুট করে তুলতে। ইকবালের মতে 'আমি আছি' এই কথা যে যতোখানি প্রতিপন্ন করতে পারবে, সে ততোখানি শক্তিমান। এই হিসাবে নজরুলের "বিদ্রোহী" কবিতা বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। নজরুল বলেছেন ঃ

"বলো বীর
বলো উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমারি নত শির ওই

www.pathagar.com

শিখর হিমাদ্রির।
বলো বীর॥
বলো মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা ছাড়ি
ভূলোক-দ্যুলোক-গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন আরশ ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি
বিশ্ব-বধাতার॥"

এর চেয়ে বলিষ্ঠ আত্ম-প্রতিষ্ঠার বাণী আর কি হতে পারে?

কিন্তু একটি কথা। ইকবাল যে খুদীর প্রতিষ্ঠা ও স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছেন, "বিদ্রোহী" ঠিক সেই আদর্শের নয়। ইকবালের "ইনসান্-ই- কামিল্" কোনোরূপ "বিদ্রোহ" নয়। আল্লাকে স্রষ্টা জেনে তাঁর শক্তি ও করুণায় অভিষিক্ত হয়ে সংযম ও সাধনার মধ্য দিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে এগিয়ে যাবে–এই হলো তাঁর কথা। আদর্শ মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ব থাকবে; স্বাতন্ত্র্য থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য, সহযোগিতা ও প্রেমভাবও থাকবে। সম্রাটের রাজ-প্রতিনিধি হতে হলে তাঁর সঙ্গে ঠুকাঠুকি করে তা হওয়া যায় না। দুষ্ট-প্রতিভা বিপজ্জনক। "বিদ্রোহী" কবিতার মূল প্রেরণা তাই ইকবালের দর্শনের অনুযায়ী নয়। এর মূলে রয়েছে জ্ঞানের অহমিকা। প্রেমের কমনীয়তা এতে নেই। প্রেমহীন জ্ঞানের এই পরিণতি। অবশ্য কেউ কেউ বলতে পারেন ঃ অন্যায় ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে আমাদের 'বিদ্রোহী' হতে হবে। কিন্তু সেখানেও বিদ্রোহের কোনো কথা আসে না। শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তো মানুষ হিসাবে অপরিহার্য কর্তব্য। বিদ্রোহের কোনো কথা নয়, তার সঙ্গে করতে হবে আমাদের জেহাদ। বিদ্রোহের কথা উঠলে তো মিতালীর কথা আগেই স্বীকার করা হয়ে যায়। কাজেই বিদ্রোহের কথা অবান্তর। ইসলামে তাই কোনো বিদ্রোহের কথা নেই, আছে দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা। বিদ্রোহ আল্লাহর বিরুদ্ধেও যেমন চলে না শয়তানের বিরুদ্ধেও চলে না। আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তো শাশ্বত ধ্রুবকেই অস্বীকার করা হলো। মানব-জীবনের আশ্রয়ভূমিই তো তাহলে তুচ্ছ হলো। কোন্ ভরসায় আমরা তবে বাঁচবো? পক্ষান্তরে শয়তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা যদি বলি, তবে তার মানে দাঁড়ায় এই যে, এতদিন শয়তানই আমাদের প্রভু ছিল, এখন তার থেকে বিদ্রোহী হয়ে আমরা আল্লাহ্‌র দলে ভিড়ছি অথবা স্বয়ংস্বাধীন হচ্ছি। বলাবাহুল্য, এর কোনোটারা মূলেই কোনো দার্শনিকতা নেই।

নজরুল একস্থানে বলেছেন ঃ

"জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি
পুরুষোত্তম সত্য।"

একথা হয়তো কেউ বলতে পারেন, ইকবাল "absorption of God into oneself" অর্থে যা বলতে চেয়েছেন, হিন্দুয়ানী টেক্‌জনিকে নজরুল এখানে ঠিক তাই বলেছেন। আল্লাহকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করবারই এ চরম ব্যগ্রতা, 'খুদীর-ই এ বলিষ্ঠ আত্মপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু একথা প্রতিপন্ন করা কঠিন; কারণ সমস্ত কবিতাটির মূল প্রেরণা বা inspration হচ্ছে "ভেঙেচুরে সব চুরমার" করার প্রবৃত্তি।

www.pathagar.com

"আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল
আমি দলে যাই যতো বন্ধন
যতো নিয়ম-কানুন-শৃঙ্খল।"
অথবা,–
"আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে
এঁকে দেই পদচিহ্ন।"

এই সব কথার মুকাবেলায় 'বিদ্রোহী'কে আল্লাহ্‌ভক্ত অভিমানী প্রেমিকের বশে দাঁড় করানো কঠিন।

'বিদ্রোহী' ছাড়া নজরুলের বিষের বাঁশীতে 'অভয়-মন্ত্র' ও 'আত্মশক্তি' কবিতা দুটিতেও ইকবালের "আমি আছি" (I amness) মন্ত্রের সুর ধ্বনিত হয়েছে ঃ–

"তুরীয়ানন্দে ঘোষো সে আজ
'আমি আছি'-বাণী বিশ্ব-মাঝ,
পুরুষ রাজ!
সেই স্বরাজ!
জাগ্রত করো নারায়ণ-নর
নিদ্রিত বুকে মর-বাসীর;
আত্ম-ভীত এ অচেতন-চিতে
জাগো 'আমি'-স্বামী
নাঙ্গা-শির॥"

–(আত্মশক্তি)

"ক্ষীণ দুর্বল বলে খণ্ড 'আমি'র
হয় যদি পরাজয়
ওরে অখণ্ড 'আমি' চিরমুক্ত সে,
অবিনাশী অক্ষয়।"

–(অভয়মন্ত্র)

কিন্তু ইকবালেও নজরুল ইসরলমে পার্থক্য ঘটেছে প্রচুর। ইকবালের সংযত আত্মপ্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দৃঢ় সৎসাহস নজরুলের হাতে উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহের বেশে প্রকাশ পেয়েছে।

তবু বলবো দোষ, ত্রুটি ও আদর্শবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে একমাত্র "বিদ্রোহী" কবিতাই ইকবাল দর্শনের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। ইকবালের 'খুদীর' দর্শন এ কবিতায় চমৎকার রূপ পেয়েছে। আমার বিশ্বাস, ইসলামের এই দার্শনিক সত্য নজরুল ইসলামের ইসলামী অন্তরাত্মা থেকে উৎসারিত হয়েছে। কিন্তু বাইরে আসার পথে বেদান্ত-দর্শন ও দেবদেবীবাদের পঙ্কিলতায় তার বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়েছে। মনির ভিতরে ঠিক যেন অবিশুদ্ধ অবস্থায় এ একটা উজ্জ্বল মনি। একে মার্জিত করে আমরা কাজে লাগাতে পারি।

আগস্ট, ১৯৫৮

www.pathagar.com

বাংলা ভাষার নূতন পরিচয়

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। ভাষার দরবারে বাংলা ভাষা সপ্তম স্থান অধিকার করিয়া আছে।

কোনো ভাষার চর্চা করিতে হইলে তাহার ইতিহাসের সহিত অল্প-বিস্তর পরিচয় থাকা প্রয়োজন; নতুবা সেই ভাষার রূপ ও প্রকৃতি, মন ও মেজাজ, গঠন ও আঙ্গিক এবং লক্ষ্য ও প্রবণতা সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ধারণা জন্মে না। আমরা তাই অতি সংক্ষেপে বাংলা ভাষার ইতিহাস এখানেক আলোচনা করিব।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনগ্রাহ্য কোনো ইতিহাস আজ পর্যন্ত রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য রামগতি ন্যায়রত্ন, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ কতিপয় পণ্ডিত ব্যক্তি এযাবত কয়েকখানি ইতিহাস রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থেও অনেক বিভ্রান্তি ও গোঁজামিল আছে। উপাদানের অপ্রতুলতাও এই বিড়ম্বনার অন্যতম কারণ। বর্তমানে নূতন নূতন তথ্য ও উপাদান আবিষ্কৃত হওয়ায় পূর্বের অনেক মতবাদ স্বাভাবিক ভাবে খণ্ডিত বা পরিত্যক্ত হইয়াছে; কাজেই, নূতন গবেষণার আলোকে বাংলা ভাষার একখানি নূতন ইতিহাস লিখিবার প্রয়োজন দেখা দিয়োছে।

উপরিউক্ত লেখকদিগের প্রায় সকলেই এই কথা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, বাংলা ভাষা সংস্কৃতের দুহিতা, কাজেই ইহা আর্য-ভাষা। এই দাবীর ভিত্তি-রচনার উদ্দেশ্যে তাঁহারা বৈদিক যুগ হইতেই বঙ্গদেশের সহিত আর্যদের একটা সম্পর্ক স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ডক্টর সুকুমার সেন বলেন ঃ

"বঙ্গদেশ হইতে দেশবাচক বঙ্গ শব্দের উৎপত্তি। বঙ্গজাতি তথা বঙ্গ শব্দের প্রাচীনতম উল্লেখ রহিয়াছে ঐতরেয় আরণ্যকে।"

[বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস]

অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

"খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব হইতে এদেশে আর্যদিগের বসতি আরম্ভ হয় গঙ্গাপথ ধরিয়া এবং খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্র আর্যভাষার একচ্ছত্রত প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্যদিগের পোষাকী ভাষা অর্থাৎ শিক্ষার, বিদ্যাচর্চার ও সামাজিক অনুষ্ঠানের ভাষা ছিল সংস্কৃত, আটপহুরিয়া অর্থাৎ ঘরোয়া ভাষা ছিল সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত প্রাকৃত। কালক্রমে সংস্কৃত ভাষা বদলাইয়া প্রাকৃত ভাষার রূপ নিল। এই প্রাকৃত ভাষা ভাঙিয়া আবার বিভিন্ন প্রদেশে আঞ্চলিক ভাষায়—যেমন বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী, গুজরাটী, মারাঠি ইত্যাদি—পরিণত হইল। বাংলাদেশে যে আর্যভাষা প্রবর্তিত হইল, তাহা এই পূর্বী প্রাকৃতেরই প্রকারভেদ।"

[বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা]

উপরোক্ত দাবীগুলি কতোদূর সত্য, পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক ঃ

www.pathagar.com

ঐতরেয় আরণ্যক

সুকুমার সেন প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ বলিতে চান যে, যেহেতু ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ শব্দের উল্লেখ আছে এবং ঐতরেয় আরণ্যক বেদের অংশ অতএব বঙ্গদেশ বৈদিক যুগ হইতেই আর্যভূমি।

একেইতো সিদ্ধান্তটি ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তিধারার (syllogism) সম্পূর্ণ বিরোধী তদুপরি ঐতিহাসিক সত্যের সহিতও ইহার কোনো সম্পর্ক নাই।

ঐতরেয় আরণ্যকে 'বঙ্গ' শব্দের উল্লেখ আছে কিনা, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। থাকিলেও সে প্রমাণ এতক্ষণ-ভঙ্গুর যে, তাহার উপর কোনো থিওরী রচনা করা চলে না। কলিকাতা ইউনিভার্সিটির ভূতপূর্ব অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার বলেন যে, ঐতরেয় আরণ্যক বা অন্য কোনো বৈদিক-সাহিত্যে বঙ্গদেশের কোনো উল্লেখ নাই। বঙ্গ শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় অর্থবেদের পরিশিষ্টে, কিন্তু সেখানেও শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি বলেন ঃ

"It is a fact that the Veda-Samhita and the early Vedic literature do not mention the name 'Vanga' either in connection with the names of the Indian tribes or in any enumeration of the countries owned by the Aryans, as well as by the non Aryans, The Rigveda-Samhita did not know even Anga, but the Anga country is mentioned in the Atharvaveda Parisista, In the Atharvaveda Parisista however, the word 'Vanga' occurs with Bagadha (বঙ্গবগধা) as a component of a compound word; but as the scholars do not attach any value to it owing partly to the lateness of the Parisista itself, I advisedly leave the mention out of consideration."

[History of Bengali Literature]

তাহা হইলে পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে যে, ঐতরেয় আরণ্যকে গ্রন্থে বঙ্গদেশের কোনো উল্লেখ নাই; ঐতরেয় আরণ্যক বেদের কোনো অংশও নহে। পর সময়ে রচিত একখানি ভাষ্য মাত্র। বঙ্গ শব্দের উল্লেখ দেখা যায় অথর্ববেদের পরিশিষ্টে; তাহাও 'বঙ্গবগধা' নামক একটি যৌগিক শব্দের অংশ রূপে—আর, যাহার অর্থ কোনো দেশ নয়, এক প্রকার রাক্ষস বিশেষ।

যদি ধরিয়াই লই যে, ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ শব্দের উল্লেখ আছে, তবে দেখা যাক্ আরণ্যক গ্রন্থ কখন কিভাবে কাহার দ্বারা রচিত হইয়াছিল।

www.pathagar.com

ঐতরেয় আরণ্যকের রচনাকাল

বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থখানির রচয়িতা হইতেছেন মহিদাস ঐতরেয় নামক একজন ঋষি-কবি। তিনি রাজা ভোজের সমসাময়িক ছিলেন। রাজা ভোজ মালব-রাজ্যের অন্তর্গত ধারা নগরের রাজা ছিলেন। একাদশ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি রাজত্ব করিতেন। গজনীর সুলতান মাহমুদ যখন সোমনাথ আক্রমণ করেন, তখন রাজা ভোজ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ মুসলিম পরিব্রাজক আল্‌বিরুণী তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে রাজা ভোজের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কাজেই এ অনুমান অনায়াসেই করা যায় যে, ঐতরেয় আরণ্যক একাদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয় নাই।

অথর্ববেদের পরিশিষ্টও অনেক পরে রচিত। কাজেই ইহার উল্লেখ কোনো প্রাচীন ঘটনার প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না।

বাংলা ভাষা কি আর্য ভাষা?

বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত কাজেই উহা আর্যভাষা–এ দাবীও বিচারসহ নয়। সংস্কৃত ভাষাভাষি আর্যদের আসিবার বহু পূর্ব হইতেই এ দেশবাসীদের যে নিজস্ব ভাষা ছিল, একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। প্রাচীনকালে বাংলাদেশের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া ঐতিহাসিক (Marshman 1859) যাহা বলিয়াছেন, তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য।

"অতি প্রাচীনকালে বঙ্গদেশে কি অবস্থা ছিল তাহা নিশ্চয় করা অতি দুষ্কর। বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম কোন্ সময় হইতে চলিল, তাহা জানা যায় না। যে মানুষেরা বঙ্গদেশে প্রথম বাস করিয়াছিল, তাহারা হিন্দু ছিল না। কিন্তু পশ্চিম সীমার পার্বতীয় লোকদের তুল্য এক জাতি ছিল। যে ভাষা এখন চলিত আছে, তাহা কোন্ সময় উৎপন্ন হইল, ইহাও নিশ্চয় করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য। সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী ভিন্ন আরও অন্য অনেক শব্দ বঙ্গভাষায় চলিত আছে। তাহাতে অনুমান হয় যে, বঙ্গদেশবাসী লোকেরা যে ভাষা ব্যবহার করিত, তাহার সহিত সংস্কৃত ভাষার কোনো সম্পর্ক ছিল না।" [বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত]

শুধু তাই নয়। সুপ্রসিদ্ধ বাঙালী ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় আরও কঠিন কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে আর্যভাষা তো দূরের কথা, বাংলাদেশে আদৌ কোনো আর্য আছে কিনা, তাহাই তো সন্দেহের বিষয়। তিনি বলেন ঃ

"যে সময় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অথবা আরণ্যকে আমরা বঙ্গ অথবা পুণ্ড্র জাতির উল্লেখ দেখিতে পাই, সেই সময় অঙ্গে-বঙ্গে অথবা মগধে আর্য জাতির বাস ছিল না।"

অন্যত্র বলিতেছেন ঃ–

"এই প্রাচীন দ্রাবিড় জাতিই বঙ্গ-মগধের আদিম অধিবাসী। নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা আধুনিক বঙ্গবাসিগণের নাসিকা ও মস্তক পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাহারা দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। মগধে ব্রাহ্মণখাদি ও উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিগণকে আর্যজাতীয় অথবা আর্য-সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু

www.pathagar.com

বঙ্গবাসিগণকে জাতিনির্বিশেষে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণের ফল বলা যাইতে পারে। উত্তরাঞ্চলের পশ্চিমাংশ আর্যগণ-কর্তৃক বিজিত হইবার বহুকাল পরেও মগধ স্বাধীন ছিল। সেই সময় তাহাদের কেহ এখানে আসিলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। প্রাচীন সাহিত্যে আর্যগণ-কর্তৃক মগধ ও বঙ্গ অধিকারের কোনো উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং কোন্ সময় আর্যজাতি বঙ্গ মগধ অধিকার করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।"

[বাঙ্গালার ইতিহাস]

বিখ্যাত ভারতীয় ঐতিহাসিক V. C. Pillai সুস্পষ্টভাবে বলিতেছেন যে, আর্যদিগের ভারতাগমনের পূর্বে–(যাহা আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ শতাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল) এদেশ সম্পূর্ণভাবে দ্রাবিড়দের শাসনাধীন ছিল ঃ

"The theme which first set up upon this investigation is the intricate subject known as the Aryo-Dravidian problem. It is needless to mention that the question was first set in motion on the day the Aryan entered India; which event we shall soon see took place in the fifteenth century B. C. India, prior to his entry, was a Dravidian land."

ইহা হইতে স্পষ্টভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, সংস্কৃত হইতে বাংলা ভাষা উৎসারিত হয় নাই। আর্যদের বহুপূর্ব হইতে যখন এদেশে দ্রাবিড়রাই বাস করিত, তখন স্বীকার করিতেই হইবে বাংলা ভাষা তাহাদের হাতেই জন্মলাভ করিয়াছিল–আর্যদের হাতে নয়। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়, আধুনিক বাংলা ভাষাতেও বহু দ্রাবিড় শব্দ মিশিয়া রহিয়াছে। এদেশের বহু প্রাচীন নগর ও গ্রামের নাম, নদ-নদী ও পর্বতের নাম এখনও দ্রাবিড়। যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, পাবনা, ঝিনাইদাহ, দামুকদিয়া, রএড়া, নাগিরাট, গড়াই, তিস্তা, কড়া, গণ্ডা, পণ, কুড়ি, খোকা, খুকি– ইত্যাদি অসংখ্য দ্রাবিড় শব্দ আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় চালু আছে। তবে অনেক শব্দ ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে, কারণ হিন্দু-মুসলমান ইংরাজ ও অন্যান্য জাতিরা কালে কালে ঐ সব শব্দ হয় বর্জন করিয়াছে, নয় বিকৃত বা রূপান্তরিত করিয়া ব্যবহার করিতেছে। যেমন নাগিরাট হইয়াছে নাগের হাট, যসর হইয়াছে যশোহর ইত্যাদি। ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতও ঠিক তাই। তিনি বলেনঃ

"প্রাগৈতিহাসিক কালের বাঙ্গালার অধিবাসীরা কি প্রকারের মানুষ ছিল, তাহা জানা অসম্ভব, তবে এইটুকুই অনুমান হয় যে, যে যুগের ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই বাঙ্গালা দেশে আধুনিক বাঙ্গালির পূর্ব পুরুষেরাই বাস করিয়া আসিতেছে। ভাষাতত্ত্ব হইতে এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙ্গাল দেশে আর্য ভাষা আসিবার পূর্বে এ দেশের লোকেরা অষ্ট্রীক জাতীয় ভাষা এবং কতকটা অষ্ট্রীক ও দ্রাবিড় ভাষার প্রচলন ছিল; অষ্ট্রীক ও দ্রাবিড় ভাষী লোকেরা নিজ নিজ ভাষার কথা দিয়াই এ দেশের নদনদী, পাহাড়-পর্বত ও গ্রামের নামকরণ করিয়াছিল। সেই সকল নামকে ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া উত্তরকালে সংস্কৃত রূপ দেওয়া হইয়াছিল, কোথাও বা সেই সকল নাম বিকৃত হইয়া অর্থহীন নাম রূপে এখনও প্রচলিত আছে। [জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য]

www.pathagar.com

লিপি কাহাদের?

বাংলা ভাষা যে আর্যদের সৃষ্টি নয়, অন্যদিক দিয়াও তাহা প্রমাণিত হয়। ভাষা ও সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন হইতেছে তাহার লিপি। লিপি ছাড়া কোনো ভাষা প্রসারিত বা পল্লবিত হইতে পারে না। কিন্তু আর্যদিগের কোনো লিপি ছিল কি? –না। আর্যেরা কোনো লিপিচর্চা করিত না। ভারতের প্রাচীনতম লিপি ছিল 'ব্রাহ্মী' ও 'খরোষ্ঠী' লিপি। 'অশোক' লিপিও পরে প্রবর্তিত হয়। কিন্তু কোনো লিপিই আর্যদের নিজস্ব নয়– সব লিপিই সেমিটিক। লিপিতত্ত্ববিদ Rawlinson বলেন ঃ

"The Brahmi script, the parent script of India, was borrowed from semitic source probably about the seventh century B. C."

উপরিউক্ত তিনটি লিপিই যে সেমিটিক, তার আর এক বড় প্রমাণ এই যে, উহাদের প্রত্যেকটিই দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত (from right to left)।

এই সব লিপি দ্রাবিড়রাই আমদানি করিয়াছিল। খ্রীষ্টের জন্মের চারি হাজার বৎসর অথবা তাহারও পূর্ব হইতে ভারতীয় দ্রাবিড় জাতিদের সহিত আরবদিগের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। সেই সূত্রেই তাহারা এই সব লিপি ভারতে আনিয়াছিল। বলাবাহুল্য, দ্রাবিড় জাতি ছিল সেমিটিক জাতিদেরই জ্ঞাতি। ব্যাবিলন অঞ্চল হইতে তাহাদের এক শাখা বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়া ভারতে প্রবেশ করে এবং কালে কালে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বাংলাদেশে অধিকার বিস্তার করে। সিন্ধুর ময়েন-জো-দারোতে কিছুকাল পূর্বে (১৯২১) প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে যে লিপি ও সীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাও সেমিটিক, কেননা সে লিপিও দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত।[১]

অতএব কোনো দিক দিয়াই বাংলা ভাষার সৃজনে বা বিকাশে আমরা আর্যদের কোনো দানেরই পরিচয় পাইতেছি না। বাংলা দেশের প্রতি এবং বাংলা ভাষার প্রতি আর্যদের মনোভাবও সুকুমার সেনের অনুমানকে সমর্থন করে না। তিনি তো নিজেই বলিয়াছেন "বাংলাদেশ আর্যেতর জাতির দ্বারা অধ্যুষিত ছিল বলিয়া এদেশে আগমন ও বসতি উত্তর ভারতবাসী আর্যদিগের পক্ষে বহুদিন অবধি নিষিদ্ধ ছিল।" ঠিকই তো, আর্যেরা বাংলাদেশের মাটি ও মানুষকে চিরদিনই অস্পৃশ্য জ্ঞান করিয়া আসিয়াছে। বাংলার অধিবাসীদিগকে তাহারা ম্লেচ্ছ, যবন, রাক্ষস, বর্বর ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি দিয়াছে এবং তাহাদের ভাষাকে 'পক্ষীর ভাষা' বলিয়া উপহাস করিয়াছে। এমন কি যদি কোনো আর্য ভুলক্রমেও বাংলাদেশের মাটি মাড়াইত, তবে বিনা প্রায়শ্চিত্তে আর্যেরা তাহাকে সমাজে গ্রহণ করিত না। নিম্নের শাস্ত্রবাণীই তাহার প্রমাণ ঃ

"অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ॥
তীর্থ যাত্রাং বিনা গচ্ছন পুনঃ সংস্কার মহতি।।"

এই অবস্থায় কি করিয়া আর্যদের হাতে বাংলা ভাষার জন্ম হইতে পারে? যাহারা বাংলাদেশকে ভালোবাসিল না, বাংলাদেশের মানুষকে ভালোবাসিল না, বাংলা ভাষাকে ভালোবাসিল না, বাঙালিদের সহিত মেলামেশা, উঠাবসা বা কোনোরূপ সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন করিল না, যাহাদের লিপিজ্ঞান ছিল না, ছুঁৎমার্গের ভয়ে যাহারা লিপিচর্চাই করিল না, তাহারা কি করিয়া বাংলা ভাষার স্রষ্টা হইতে পারে?

---

১. The Indus Script runs from right to left. : Sir John Marshall

www.pathagar.com

খ্রীষ্টের জন্মের পরে

খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বাবস্থা তো দেখিলাম। এইবার দেখা যাউক খ্রীষ্টের জন্মের পর হইতে দশম-একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত (অর্থাৎ মুসলমানদের বঙ্গবিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত) আর্যেরা কখন কিভাবে বাংলাদেশে আসিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিল এবং বাংলা ভাষাকে কতখানি উৎসাহ দিল।

ডক্টর সুকুমার সেন বলিতেছেন, "পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বেই বাংলাদেশের সর্বত্র আর্যবসতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে আর্যভাষাও সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।" কিন্তু ইতিহাসে সেরূপ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। দশম-একাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত (অর্থাৎ পালবংশের পরাজয় না হওয়া পর্যন্ত) আর্যেরা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। কর্নাট হইতে আগত আর্য-ভক্ত সেনগণ যখন বৌদ্ধ পালদিগকে পরাজিত করিয়া বাংলাদেশ দখল করিল, তখনই আর্যেরা এদেশে আসিবার সুযোগ পাইল। একটা গূঢ় কথা এখানে চাপা পড়িয়া আছে। আর্যেরা যে বাংলাদেশ এবং বাঙালিদিগকে ঘৃণা করিত বলিয়াই এদেশে আসে নাই, ইহা পূর্ণ সত্য নহে। ইহাতে মনে হয় যেন আর্যেরা আসিতে চাহিলেই এদেশবাসী তাহাদিগকে বরণ করিয়া লইত। সেরূপ ধারণা নিতান্তই ভুল। এদেশের দ্রাবিড়-বৌদ্ধ প্রভৃতি অনার্যরাও আর্যদিগকে রীতিমতো শত্রুজ্ঞান করিত। দ্রাবিড়-বৌদ্ধদের কি কোনোরূপ আত্মমর্যাদাবোধ ছিল না? দেশপ্রেম ছিল না? শক্তি-সাহস চিল না? আর্যেরা যখন তাহাদিগকে 'যবন' 'ম্লেচ্ছ' 'রাক্ষস' 'বর্বর' 'দস্যু' ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি দিত, তখন তাহারাই বা আর্যদিগকে পূজা করিবে কেন? তাহারাও প্রাণপণে আর্যদিগকে বাধা দিত। কাজেই আর্য-অনার্য বিরোধ সর্বদা লাগিয়াই ছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এদেশের লোকেরা তাই আর্যদিগকে বাহিরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। ডক্টর দিনেশচন্দ্র সেন এই সত্যের কিছুটা আভাস দিয়াছেন ঃ

"The country (i.e. Bengal) was for centuries in open novolt against Hindu orthodoxy. Buddhist and Jain infiuence was so great that the codes of Manu, while including Bengal within the geographical boundary of Aryyavarta, distinctly prohibited all contact with the land for fear of contamination." [History of Bengali Languge & Literature]

ডক্টর সুকুমার সেন মনে করেন,, পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বেই আর্যেরা বাংলাদেশ দখল করিয়াছিল এবং আর্যভাষায় সারা দেশ ছাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমরা তো দেখিতেছি অন্যরূপ। গুপ্তদের দ্বারা (পঞ্চম শতাব্দী) বাংলাদেশ (সমতট) যে বিজিত হইয়াছিল এমন কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। অন্ততঃ হিন্দুদের সহিত তখনও যে বৌদ্ধদের ভীষণ যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল, একথা চীনা-পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হুয়েন-সাঙ তাঁহাদের ভ্রমণ-বৃতান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ঃ

www.pathagar.com

"The Chinese pilgrims Fa-Hien in the fifth century and Huen Tsang in the seventh century found the Buddhist religion prevailing in Bengal, but already engaged in a fierce struggle with Hinduism, which ended about the ninth or tenth Century in the general establishment of the latter faith. In the eleventh century the senas rose to power in Begal while in the next century, both the Palas and the Senas were submerged beneath the flood of Muslim conquest.

[Encylopaeda Britanica]

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, পালরাজাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই আর্য-হিন্দুরা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশ তাহাদের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেও কি বাংলা ভাষার প্রতি তাহারা কোনোরূপ দরদ দেখাইয়াছে?–মোটেই না। বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন ঃ

"আমরা হিন্দু-কালের কোনো বাঙ্গালা সাহিত্য পাই নাই। হিন্তু সেনরাজগণ সংস্কৃতের উৎসাহদাতা ছিলেন। ব্রাহ্মণেতর ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়াই সম্ভবতঃ তাঁহারা বাংলা ভাষার প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন।"

[বাঙ্গালা ব্যাকরণ]

কোনোরূপ সাহায্য করা তো দূরে থাকুক, বাংলা ভাষার উচ্ছেদ-সাধনের জন্যই তাহারা প্রয়াস পাইয়াছিল। সুপণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ঠিকই বলিয়াছেন ঃ

"বাংলার শেষ হিন্দু রাজা ছিলেন লক্ষণ সেন। তাঁহার সভায় ধোয়ী, উমাপতি ধর প্রভৃতি কবি এবং হলায়ুধ মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু নানা পণ্ডিত ও কবির সমাবেশে তাঁহার রাজধানীতে যে সংস্কৃত ভাষা চর্চার ও পাণ্ডিত্য-প্রকাশের সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়িয়া উঠে, তাহা জয়দেবের গীত-গোবিন্দের মাধ্যমে সমগ্র উত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তার করিলেও বাংলা ভাষা চর্চার কোনো আয়োজন তথায় ছিল না।"

আর একটি মূল্যবান মন্তব্যও তিনি করিয়াছেন ঃ

"১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীবীর ইখ্‌তিয়ার বিন্ মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার লক্ষ্মণ সেনকে লক্ষ্মণাবতী হইতে বিতাড়িত করিয়া বাংলায় সংস্কৃত চর্চার মূলে কুঠারাঘাত হানিয়া বাংলা-চর্চার পথ উন্মুক্ত করেন।" [মুসলিম বাংলা-সাহিত্য]

বস্তুতঃ মুহাম্মদ বিন বখ্‌তিয়ারের হাতে বঙ্গ-বিজয় বাংলা-ভাষার পক্ষে এক মহামুক্তির দিন। মুসলমানদের দ্বারা বঙ্গ-বিজয় না হইলে আর্যদের হাতে যে বাংলাভাষা লোপ পাইত অথবা শুদ্ধিকৃত হইয়া ভিন্নরূপ ধারণ করিত, তাহাতে কোনোই সন্দেহ নাই। সেন রাজাদিগের অল্প-পরিসর সময় রেখার মধ্যেই আর্য ব্রাহ্মণগণ আইন করিয়া বাংলা ভাষার উৎখাত সাধনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহারা এই নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, যদি কোনো

www.pathagar.com

আর্য হিন্দু বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি ধর্মশাস্ত্রসমূহ কোনো মানব-ভাষায় (অর্থাৎ বাংলা ভাষায়) আলোচনা করে, তবে তাহাকে 'রৌবব' নামক নরকদণ্ড ভোগ করিতে হইবে–

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চারিতানি চ।
ভাষায়ং মানবঃ শ্রুত্বা রৌবরং নরকং ব্রজেৎ।।"

ইহাই সংস্কৃতের সহিত বাংলা ভাষার প্রথম সংঘাতের ফল।

বৌদ্ধদের দান

এখানে বাংলা ভাষার সংগঠনে ও প্রচারে বৌদ্ধদের দান, সেবা ও ত্যাগের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, বৌদ্ধরা আর্যদের নিকট পরাজিত হইয়া এবং তাহাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া আরাকান, নেপাল, সিংহল প্রভৃতি দেশে পালাইয়া যায়। আরাকানে গিয়া বৌদ্ধরা বাংলা ভাষার অভূতপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। আরাকান রাজসভায় বৌদ্ধ রাজা ও মন্ত্রীবর্গের উৎসাহ পাইয়া বাংলাদেশ হইতে অনেক মুসলিম কবি সেখানে গিয়া কাব্যচর্চা আরম্ভ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে মহাকবি আলাওল, দৌলত কাজী প্রভৃতি খ্যাতনামা কবি বৌদ্ধদের উৎসাহেই দীর্ঘদিন ধরিয়া বাংলা সাহিত্য চর্চায় নিমগ্ন ছিলেন। আলাওলের 'পদ্মাবতী', 'হপ্তপয়কর' এবং দৌলত কাজীর 'সতী-ময়না' প্রভৃতি কাব্য এই যুগের শ্রেষ্ঠ রচনা। এই সাহায্য ও শহানুভূতির জন্য বাংলা সাহিত্য চিরদিন আরাকানী বৌদ্ধদিগের নিকট ঋণী থাকিবে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার ঘাঁটিয়া ৪৬ টি চর্যাপদ বা বৌদ্ধ দোঁহা আবিষ্কার করিয়া আনেন। তিনি অনুমান করেন সেগুলিই প্রাচীনতম বাংলা ভাষার নিদর্শন। চর্যা গীতিগুলি দশম শতাব্দীতে লুইপার প্রমুখ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত। নিম্নে একটি চর্যার নমুনা দিতেছি ঃ–

"উঁচা উঁচা পাবত, তহিঁ বসই শবরী বালী।
মরঙ্গি গিচ্ছ পরহিণ; গিবত গুঞ্জরী মালী।।
উমত শবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহারী।
তোহেরি নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দারী।"

(উঁচু উঁচু পর্বত–তায় শবরী বালিকা বাস করে। সে ময়ূরপুচ্ছ পরিহিতা, তাহার গলায় গুঞ্জার মালা। হে উন্মত্ত শবর, গোল করিও না। তোমার নিজ গৃহিনী সহজ সুন্দরী নামে পরিচিতা)।

পণ্ডিত হরপ্রাসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত এই দোঁহাগুলির রচয়িতা ও রচনাকাল সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ আছে,[১] কিন্তু একথা না মানিয়া উপায় নাই যে, সেগুলি বৌদ্ধ রচনা–আর্য নহে। কোনো আর্য হিন্দুর এরূপ কোনো রচনা আবিষ্কার করিতে পারিলে বাংলা ভাষার উপর আর্যদের কিছুটা দাবী প্রতিপন্ন হইত বটে। কিন্তু দশম শতাব্দীতে নামিয়া গিয়াও তো সেই বৌদ্ধদিগকেই আমরা দেখিতে পাইতেছি।[২]

*

১। সুকুমার সেন ঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪৬ পৃষ্ঠা।
২। নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান ঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, ৪৬-৫০ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

আর্য-থিওরীর অসারতা

এতক্ষণ আমরা দেখাইলাম যে বাংলা ভাষা আর্য ভাষা নয়। এইবার আরও গভীরে যাইব। গোটা আর্য-থিওরীটাই এবার আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিব। আমরা দেখিব আর্য বলিয়া কোনো জাতি ছিল কি না? থাকিলে কোথায় তাহারা ছিল, কোথা হইতে কোথায় তাহারা গেল, কেমন তাহাদের স্বরূপ আর কেমন তাহাদের প্রকৃতি। এই ভিত্তিমূল যদি অন্তঃসারশূন্য প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ইহার উপর নির্মিত গোটা সৌধটাই তো ভূমিস্মাৎ হইয়া যাইবে।

এতকাল ইতিহাসে আমরা পড়িয়া আসিতেছি যে, অতি প্রাচীন কালে পাক-ভারত উপমহাদেশে অনার্য জাতিরা বাস করিত। তাহারা অত্যন্ত অসভ্য ও বর্বর ছিল। তাহারা ফলমূল আসিল দ্রাবিড় জাতি। তাহারাও অনার্য ও .অসভ্য ছিল। তবে পূর্ববর্তীদের অপক্ষো কিছুটা উন্নত ছিল। সর্বশেষে আসিল এক সুশ্রী গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় ও সুসভ্য জাতি। ইহাদের নাম আর্যজাতি। ইহারা মধ্য-এশিয়ায় বাস করিত। কালে কালে সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে তাহারা দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। মোটামুটি ভাবে দুই ভাগে তাহারা বিভক্ত হয়। এক ভাগ যায় পশ্চিম দিকে, অপর ভাগ আসে পূর্ব দিকে। পূর্বশাখা ইরান হইয়া ভারতে প্রবেশ করে এবং দ্রাবিড় ও অন্যান্য অনার্য জাতিদিগকে পরাজিত করিয়া এই দেশ অধিকার করে। তাহারাই সর্বপ্রথম এদেশে সভ্যতার আলো জ্বালে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্প-সাহিত্যে ও ললিত-কলায় তাহারই এদেশেকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে।

ময়েনজোদারো

কিন্তু এই থিওরী এখন একরূপ অচল। সিন্ধুর ময়েন-জো-দারো, পাঞ্জাবের হরপ্পা ও অন্যান্য স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের পর এখন আর একথা কেহই বলিতে সাহস করে না যে, পাক-ভারতের সভ্যতা আর্যদের দান। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে, আর্যদের অপেক্ষা দ্রাবিড়রাই ছিল অধিকতর উন্নত ও সভ্য। ময়েন-জো-দারোর ধ্বংসাবশেষ হইতে জানা যায় যে, সেখানে সুপরিকল্পিত নগর ছিল, ইষ্টক নির্মিত গৃহ ছিল, রাজপথ ও পয়ঃপ্রণালী ছিল, এমন কি সে-যুগের লোকেরা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের কৌশলও জানিত। বিভিন্ন কারুকার্যখচিত মৃৎপাত্র, নানা ধরনের তৈজসপত্র, বহু সৌখিন আসবাবপত্র ও প্রসাধনদ্রব্য এবং অন্যান্য আরও অনেক নিদর্শনই পাওয়া গিয়াছে–যাহাদের মধ্যে উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছাপ রহিয়াছে। আর একটি বিশেষ বস্তুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে–তাহা হইতেছে ৫০০ সীলমোহর। সীলমোহরগুলির উপরে এক বিশেষ ভাষার অক্ষর অঙ্কিত। সেগুলি দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত এবং প্রাচীন ব্যাবিলন ও মিসর-লিপির সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। অন্য কথায়ঃ লিপিগুলি সেমিটিক।

বলাবাহুল্য, এই সভ্যতা ছিল দ্রাবিড়দের। ইহার সহিত আর্যসভ্যতার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না, কেননা এ সভ্যতা ছিল আর্যদের ভারত আগমনের অন্ততঃ দেড় হাজার বৎসর অগ্রগামী। Sir John Marshall বলেন ঃ

www.pathagar.com

"They (i. e. material remans of Mohen-jo-daro) exhibit the Indus people of the fourth and the fifth millennium B. C. in possession of a highly developed culture in which no vestige of any Indo-Aryan culture is to be found."

কাজেই আর্যরাই যে সর্বপ্রথম প্রাচীন ভারতে সভ্যতার আলো জ্বালিয়াছিল এ কথার মূলে কোনো সত্য নাই। প্রসিদ্ধ ভারতীয় ঐতিহাসিক K. M. Panikkar অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাবেই এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন ঃ

"One thing is certain, and can no longer be contested: civlisation did not come to India with the Aryans. The doctrine of the Aryan origin of Indian civilisation is the result of the theories of the Indo-Germanic scholars who held that anything valuable in this world originated from the Aryans------not only is Indian civilisation pre-Vedic, but also the essntial features of the Hindu religion, as we know it today, were perhaps present in Mohen-jo-daro."

[A survey of Indian History]

তারপর আর্যদের আদি নিবাস যে কোথায় ছিল, আজ পর্যন্ত তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। কেহ বলে মধ্য এশিয়ায়, কেহ বলে ইউরোপে, কেহ বলে ভারতে, কেহবা বলে অন্যরূপ। প্রত্যেক প্রাচীন জাতিরই একটা আদিম উৎপত্তিস্থল এবং তাহার জাতীয় সংস্কৃতির কিছু না কিছু নিদর্শন আছে। মিসরবাসীয়দের পিরামিড, ব্যাবিলোনিয়ানদের শূন্যোদান, চীনাদের মহাপ্রাচীর, বৌদ্ধদের নালন্দা, তক্ষশীলা, দ্রাবিড়দের ময়েন-জো-দারো ইত্যাদি স্মৃতিচিহ্ন এখনও বিদ্যমান। কিন্তু আর্যদের সেরূপ কোনো কীর্তি-চিহ্ন কই? কোথায়ও আছে কি? শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস (এম. এ., বি. এল) তাই আর্যসভ্যতার প্রাচীনতার দাবী মিথ্যা বলিয়া মনে করেন ঃ

"The Indo-Aryans claim that they are the most ancient people in India; but that claim is false. India has no ancient monuments or relice like Egypt, Babylonia or Assyria.

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সত্যসন্ধানী ঐতিহাসিকেরা আর্য-থিওরীকে এখন একটি অলীক কাহিনী (myth) বলিয়া মনে করেন। কেহ বা বলেন, থিওরীটি শুধুমাত্র একটা অনুভূতির উপর দাঁড়াইয়া আছে (based on a solid basis of sentiment)। আবার কেহ বা ইহাকে একটা ঐতিহাসিক প্রলাপ (a historical nonsense) বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।

www.pathagar.com

আর্য-থিওরীর জন্ম

এইবার আর্য-থিওরী সম্বন্ধে শেষ কথা বলিব। আর্য-অনার্যের কথা শুনিলেই আমরা আমাদের চিন্তা ও ধারণাকে সুন্দর অতীতে টানিয়া লইয়া যাই এবং ভাবি যে, আলো ও অন্ধকারের মতো দুই স্বতন্ত্র পরিমণ্ডলে আর্য ও অনার্যেরা বাস করিতেছে এবং সেখান হইতেই মানব-গোষ্ঠীর এই দুই ধারা বহিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই ভুল। আর্য-থিওরীর বয়স এখন মাত্র দেড়শত বৎসর। ইহার পূর্বে কোনো ইতিহাসে 'আর্য' অথবা 'অনার্য' বলিয়া কোনো বিশেষ চিহ্নিত জনগোষ্ঠী অথবা কোনো ভাষা ছিল না। এসব তীক্ষ্ণ শ্রেণী বিভাগ আমরা এখানে বসিয়া করিতেছি মাত্র! কাজেই সমস্ত কল্পনাটাই একটা কৃত্রিম আবরণ দিয়া মোড়া।

থিওরীটির উৎপত্তি কাহিনী নিম্নরূপ ঃ

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের তদানীন্তন চীফ জাস্টিস এবং 'এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'-এর প্রেসিডেন্ট Sir Willam Jones সোসাইটির এক বার্ষিক সভায় একটি মূল্যবান ভাষণ দান করেন। ঐ ভাষণে তিনি ল্যাটিন, গ্রীক, ইংরাজী, ফরাসী, জার্মানি, পহ্‌লবী, সংস্কৃত প্রভৃতি কতিপয় ভাষার অনেকগুলি শব্দ ও ধাতুরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখান যে, ঐ সব ভাষার মূলে ঐক্য রহিয়াছে। তিনি তাই অনুমান করেন, ঐসব ভাষাভাষী জনেরা আদিতে একই স্থানে বাস করিত এবং একই ভাষায় কথা বলিত। কালে কালে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিল। এইরূপেই বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই ইংগিত পাইয়া জার্মান পণ্ডিতদের মনে এক নূতন চিন্তার উদ্রেক হইল। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের (Comparative Philololgy) আলোচনায় তাঁহারা প্রবৃত্ত হইলেন। Max Muller, Bopp, Kalaproth প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে বহু গবেষণা করিলেন। অতঃপর ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে Sir Thomas Young নামক জনৈক মিসরভাষাবিদ পণ্ডিত আলোচ্য ভাষাগুলিকে "Family of Indo-European Languages" বলিয়া অভিহিত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐসব ভাষাভাষী জনগণকে Indo-European Races নামে পরিচয় দেন। ইহার পরই Indo-Aryan এবং Aryan নামের উৎপত্তি হয়।

তাহা হইলে একথা অনায়াসেই বুঝা যায় যে, আর্য-অনার্যের প্রভেদ নিতান্তই আধুনিক যুগের সৃষ্টি। এই জন্যই ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বলেন যে, আর্য, অনার্য বা দ্রাবিড় কোনো নৃতাত্ত্বিক প্রকারভেদ নয়; উহারা ভাষার নাম; অর্থাৎ আর্য ভাষাভাষী যাহারা তাহারাই ছিল আর্য, দ্রাবিড় ভাষাভাষী যাহারা তাহারা ছিল দ্রাবিড়।* কিন্তু এ ব্যাখ্যাও খুব সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয় না। তবে ইহাতে আর্যদের আভিজাত্যের ভঙ্গি নষ্ট হয় বটে।

www.pathagar.com

আর্য-থিওরীর কুফল

আর্য-থিওরীর স্বরূপ দেখান হইল। ইহাতে ভারতীয় আর্যদের ভূমিকা থাকিলেও তাহারা ইহার স্রষ্টা নহে; ইউরোপ হইতে–বিশেষ করিয়া জার্মান জাতির দ্বারা–এই থিওরী উদ্ভাবিত ও প্রচারিত। উৎকট সেমিটিক বিদ্বেষ এবং দুর্বল জাতিদিগকে গ্রাস করিবার গভীর দুরভিসন্ধি এই থিওরীর প্রধান প্রেরণা। ইউরোপে জার্মান জাতিই গোঁড়া আর্য বলিয়া খ্যাত। বিগত দুইটি মহাযুদ্ধ তাহাদের গোঁড়ামির ফলেই সংঘটিত হইয়াছে। পাক-ভারত উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের যে অবনতি ঘটিয়াছে তাহার মূলেও আছে এই আর্য-থিওরীর প্রভাব। বস্তুতঃ এই থিওরী নিতান্তই মানবতা বিরোধী, মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে ও দেশে দেশে বিরোধ ও বৈষম্য সৃষ্টি করিতে এই তিওরী এক অমোঘ অস্ত্র। এই থিওরী মানব-সভ্যতার ইতিহাসকেও বিকৃত কলুষিত করিয়াছে এবং মানব জাতির সূত্র- পরিচয়কে সকলের চোখের আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। কাজেই প্রত্যেক কল্যাণকামী মানুষের উচিত এই থিওরীর অবসান ঘটানো।

* বাঙ্গালীর ইতিহাস

মধ্যযুগ

মুহম্মদ বিন্ বখ্তিয়ারের বঙ্গ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাংলা ভাষার মধ্যযুগের প্রবেশ-দুয়ারে আসিয়া পৌঁছিলাম। এ যুগকে মুসলিমযুগও বলা যাইতে পারে। ১৩৫০-১৭৫০ খ্রী পর্যন্ত দীর্ঘ চারিশত বৎসর ধরিয়া বাংলা সাহিত্য মুসলিমদিগের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের প্রারম্ভে কিছুকাল যাবত সাহিত্য ও সংস্কৃতিকর্ম তেমন উৎকর্য লাভ করিতে পারে নাই, কারণ যুগ-বিপ্লবের পর শান্ত পরিবেশে ফিরাইয়া আনিতে কিছুটা সময় লাগে। বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের আমল হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ হয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মুসলিমদিগের সেবায়, দানে, সাহায্যে ও সহানুভূতিতে বাংলা ভাষা নানা গৌরবে সমৃদ্ধ হইতে থাকে। বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম মুসলিম কবি শাহ্ মুহম্মদ সগীর আযম শাহের রাজত্বকালে 'যুসুফ জুলিখা' নামক কাব্য লিখিয়া যশস্বী হন। মুহাম্মদ সগীরের 'যুসুফ জুলিখা' এবং তৎপূর্ববর্তী বড় চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'ই বাংলা সাহিত্যের দুই প্রথম গ্রন্থ। যুসুফ জুলিখার ভাষা ছিল এইরূপ ঃ–

"কহে শাহ্ মোহাম্মদ যুসুফ জুলিখা পদ
দেশিভাষা–পয়ার রচিত।'
কিতাব কোরাণ মধ্যে দেখিনু বিশেষ
যুসুফ জুলিখা কথা অমিয়া অশেষ।
কহিব কিতাব চাহি সুধারস পুরি।
শুনহ ভকত জন শ্রুতিঘট ভরি॥
দোষ খেম, গুণ ধর রসিক সুজন।
মোহাম্মদ সগীর ভনে প্রেমিক বচন॥

[মুসলিম বাংলা-সাহিত্য]

www.pathagar.com

সুলতান হুসেন শাহ্ এবং তাঁহার বংশধরদিগের আমলই মধ্য-বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। এই উদারমনা সাহিত্য-রসিক গুণগ্রাহী সুলতান সত্যই বাংলা সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। দেশের কবি-সাহিত্যিকদিগকে ডাকিয়া তিনি দরবারে স্থান দেন। আরবী-ফারসী হইতে নানা ধর্মগ্রন্থ, ইতিহাস, গল্প ইত্যাদি অনুবাদ করাইবার কাজে তিনি মুসলিম কবিদিগকে নিয়োগ করেন। সেই সঙ্গে মৌলিক রচনাবলীরও মর্যাদা দেন। শুধু মুসলিম কবি নন, হিন্দু কবিদিগকেও তিনি এবং তাঁহার অনুবর্তিগণ সাদরে আহ্বান করেন। তাঁহাদেরই উৎসাহে রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য হিন্দু গ্রন্থাদি বাংলা ভাষায় অনদিত হয়। হুসেন শাহের আমলে শ্রী চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলা ভাষা জাতিধর্ম-নির্বিশেষে গোটা বাঙালি জাতির প্রতিনিধিত্ব করিবার সুযোগ পায়।

কিন্তু একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। হুসেন শাহের দরবারে যখন বাংলা সাহিত্য চর্চার এমন সমারোহ চলিতেছে, তখনই-বা বাংলা ভাষার প্রতি আর্য-হিন্দুদিগের মনোভাব কিরূপ ছিল? পূর্বের সেই জাতক্রোধ, বিদ্বেষ এবং ঘৃণার ভাব তাহারা তখনও অন্তরে অন্তরে পোষণ করিতেছিল, এই জন্য সুলতানের আবেদনে অগ্রে তাহারা সাড়া দেয় নাই। পরে যখন অন্যান্য কবিরা নিজেদের কাব্য-রচনার জন্য সুলতানের নিকট হইতে প্রচুর ইনাম, খেতাব ও পুরস্কার লাভ করিতে লাগিল, কেবল মাত্র তখনই তাহারা রাজ-দরবারে আসিয়া সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করিল।

"The Brahmins could not resist the infiuence of this high patronage, They were, therefore compelled to favour the language they had hated so much and laterly they themselves came forward to write poems and compile works of translation in Bengali." [History of Bengali Literature]

শুধু তাই নয়। সুলতানদের দেখাদেখি দেশীয় অন্যান্য হিন্দু রাজারাও তখন নিজেদের রাজসভায় বাঙালি কবি-সাহিত্যিকদিগকে সমাদর করিতে লাগিলেন। এইভাবেই বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন হইল এবং উহার সমস্ত গৌরব মুসলমানদের প্রাপ্য ঃ

"Thus the appoinment of Bengali poets to the courts of Hindu Rajas grew to be fashion after the example of the muslim chiefs. [lbid]

এইসব তথ্যের মুকাবেলায় কি করিয়া বলা যায় যে, বাংলা ভাষা আর্য ভাষা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদিগের দান এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহাদের রচিত সাহিত্যে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যও ছিল প্রচুর। ধর্ম, ইতিহাস, জীবনী, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, লৌকিক কেচ্ছা ও কাহিনী এবং অনুবাদই ছিল তাঁহাদের সাহিত্য-কর্মের মূলধারা। কাসাসোল আম্বিয়া, ফতুহুশ্বাম, ফত্হুল মেছের, আলেফ-লায়লা, জঙ্গনামা, শহীদে-কারবালা, লায়লি-মজনু, ইউসুফ-জোলেখা, আমির হামজা, চাহার দরবেশ, ছয়ফুল মুল্ক বদিউজ্জামাল, সোনাভান, গাজী কালু ইত্যাদি অসংখ্য পুঁথি মুসলমান কবিরা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ডক্টর আব্দুল গফুর সিদ্দিকীর মতে মুসলিম পুঁথির সংখ্যা প্রায়

www.pathagar.com

৫০,০০০ হইবে। মুসলিম পুঁথি-সাহিত্যের ভাষা ও রচনা-রীতির কিঞ্চিৎ নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

"মেছের সহর হইতে বাহির হইয়া
মকদ্দস পানে নবি জান নেকালিয়া
সামের সহর বিচে ফলগুন গ্রাম
তথা উতরিল যদি নবি নেককাম।
জিবরিল আসিয়া কহে শোন সমাচার

দেখ হেথা জমিনেতে কেমন বাহার॥" (কাসাসোল আম্বিয়া)

"উজিরের পানে বাদশা আঁখি ঘুমাইল।
দেলেতে হইল গোশ্বা কিছু না কহিল।
উজির কহিল বাদশা আমি সব জানি।
আমিরের বেটা এই উম্বর ইউসানি॥
(আমির হামজা)

"শুন যত বেরাদর কহি কিছু সমাচার
শুন সবে আগামি কালাম।
রুমের সহর বিচে, কুস্তনতুনিয়া দেশে
এস্তাম্বুল বলে যার নাম।
(চাহার দরবেশ)

এই 'চলিত ভাষা' এতই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, অনেক হিন্দু কবিও এই ভাষায় পুঁথি লিখিয়া গিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিই ঃ

"আল্লা আল্লা বল পাক পরোয়ারদিগার।
আখেরে দোজখে ডালি----- যার॥
দোজখ তরিতে বান্দা করহ ফিকির।
জাহিরে বাতুনে লইলাম আল্লার জিকির॥
আল্লার আরশ কোর্সে কিছু মেহেরবানী চাই।
ইমামগণের কেচ্ছা রাধাচরন গাই।
শ্রীযুক্ত সাহেবের কেচ্ছা রাধাচরণ গাত্র।
আল্লা আল্লা বল নবি পাঞ্জাতনের পাত্র॥

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও হিন্দু কবিরা তাঁহাদের কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভারতচন্দ্র ও বিদ্যাপতির নাম করা যায়। নিম্নে দুইটি উদ্ধৃতি দিতেছি ঃ

www.pathagar.com

"মানসিংহ জোড় হাতে অঞ্জলি বাঁধিয়া মাথে
কহে জাহাঁপনা সেলামত।
রামজির কুদরতে মহিম হইল ফতে
কেবল তোমারই কেরামত।
হুকুম শাহানশাহী আর কিছু নাহি চাহি
জের হৈল নিমকহারাম
গোলাম গোলামী কৈল জালিম কয়েদ হৈল
বাহাদুরী সাহেবের নাম।"

(ভারতচন্দ্র রায়)

হৈয়া বান্দার বান্দা নুঙাইয়া শির।
বন্দিব বড় খাঁ গাজী পীর দস্তগীর।
নিয়ৎ হাছির সত্যপীরের কালাম।
কহে বিদ্যাপতি করি হাজার ছালাম॥

(বিদ্যাপতি)

প্রাচীন গদ্য

প্রাচীন বাংলা গদ্যের নিদর্শন খুবই বিরল। শুধু সরকারী দলিল-দস্তাবিজের মধ্যেই যা-কিছু নমুনা পাওয়া যায়। নিম্নে সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাষার নমুনা দেখানো হইতেছে ঃ-

সপ্তদশ শতাব্দী (১৬৬২)

"শ্রী যশোমাধব ঠাকুর কুমড়াল গ্রামে দেবালয়ৎ আছিলা। রাম শর্মা ও গায়রহ্ আপনার ২ ওয়াদা মাফিক সেবা করিতেছিল। রাত্রদিন চৌকি দিতেছিল। শ্রী রাজজীবন মৌলিক সেবার সরবারহ পুরুষানুক্রমে করিতেছেন। -ইত্যাদি।

[শ্রী মনোমোহন ঘোষের 'বাংলা গদ্যের চারযুগ']

অষ্টাদশ শতাব্দী (১৭৮৬)

"শ্রীযুক্ত ওলন্দেজ কোম্পানীতে আড়ঙ্গ বিরভূমের খরিদর দাদনী আমি লইয়া ঢাকা আড়ঙ্গ চালানী করিয়াছি। আপরেল মাহেতে এবং মোকাম মজবুরের গোমস্তা কাপড় খরিদ করিতেছিল এবং কাপড় কথক ২ আমদানি হইয়াছে এবং হইতেছে দাস্ত কথক ২ তৈয়ার হইতেছে এবং মবলগ কাপড় ধোবার হাতে দাস্তর কারণ রহিয়াছে। তাহাতে সংপ্রীতি মেঃ গেল সাহেবের তরফ পেয়াদা আসিয়া খামখা জবরদস্তী ও মারপিঠ করিয়া ঘাট হইতে ধোবা লোককে ধরিয়া লইয়া গেল। -----ইত্যাদি।

www.pathagar.com

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত বাংলা ভাষার এই মিলিত রূপ অব্যাহত ছিল। কিন্তু ইহার পরই বাংলা ভাষার খাত পরিবর্তিত হইল। তখন এদেশে ইংরাজ শাসন প্রবর্তিত হইয়াছে। শাসন কার্যের 'সুবিধার' জন্য ইংরাজেরা ভেদনীতির আশ্রয় লইল। সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাহারা এই নীতি অবলম্বন করিল। এতদিন ফার্সী ভাষা রাজভাষা ছিল, এখন তাহার স্থলে ইংরাজী ভাষাকে তাহারা রাষ্ট্রভাষা রূপে ঘোষণা করিল। বাংলা ভাষাকেও হিন্দুয়ানী রূপ দিয়া মুসলমানদিগের শিক্ষা ও প্রগতির পথে মস্ত বড় বাধার সৃষ্টি করিল। কিরূপ করিয়া এই পটপরিবর্তন ঘটিল, চিন্তাশীল লেখক সজনীকান্ত দাস তাহা নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ-

"১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হালহেড এবং পরবর্তীকালে হেন্‌রি গিটস্ ফরস্টার ও উইলিয়াম কেরী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান ধরিয়া আরবী-ফারসীর অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতি করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই তিন ইংলণ্ডীর যত্ন ও চেষ্টায় অতি অল্পদিনের মধ্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে এই আরবী-পারসী নিসূদন-যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানীর সদর মফস্বল আদালত সমূহে আরবী-ফারসীর পরিবর্তে বাংলা ও ইংরাজীর প্রবর্তনে এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি।" [বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস]

এই কাজে ইংরাজ পাদ্রীদের সহিত যোগ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কর, রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, রামরাম বসু এবং আরও অনেকে। তখন বাংলা ভাষা হইতে আরবী-ফার্সী শব্দ বর্জন করিয়া ভাষাকে সংস্কৃতায়িত করা হইল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ হিন্দু মনীষীরা এই কার্যে অগ্রণী হইলেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা ভাষা রূপান্তরিত হইয়া গেল। এইখান হইতেই বাংলা ভাষার নবযুগ আরম্ভ হইল। ইহাকে "হিন্দু রেনেসাঁর" যুগও বলা যাইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে বাংলা ভাষা নিম্নের রূপ ধারণ করিল ঃ

"কিয়ৎক্ষণ এইরূপ আক্ষেপ করিয়া লক্ষণ উচ্ছ্বসিত শোকাবেগের সম্বরণ পূর্বক সীতার চৈতন্য সম্পাদনে সমর্থ হইলেন। চৈতন্য সঞ্চার হইলে সীতা কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া স্নেহভরে সম্ভাষণ করিয়া লক্ষণকে বলিলেন, বৎস, ধৈর্য অবলম্বন কর। আর বিলাপ ও পরিতাপ করিও না। সকলই অদৃষ্টাধীন। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহাই ঘটিয়াছে। আমি তপোবনে থাকিয়া এই উদ্দেশ্যে ঐকান্তিক চিত্তে তপস্যা করিব— যেন জন্মান্তরেও তিনি আমার পতি হন।" [সীতার বনবাস]

এই ভাষা ও ভাবধারা যখন সরকারী স্কুলসমূহে পাঠ্য হইল, তখন মুসলমানেরা এক চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হইল। এ ভাষা কিছুতেই তাহারা প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। একবাক্যে তাহারা তাহাদের সন্তান-সন্ততিদিগকে শিক্ষা দিতে অসম্মতি জানাইল। William Hunter তাঁহার Indian Musalmans নামক গ্রন্থে তৎকালীন বাংলার মুসলমানের মনোভাব বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেছেন ঃ

www.pathagar.com

"The language of our Government schools in Lower Bengal is Hindu and the master are Hindus. The Musalmans with one consent spurned the instruction of their boys through the medium of this language of idolatry."

কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বনায় কালে কালে মুসলমানদিগকে ইংরাজী ভাষাও শিখিতে হইল, সংস্কৃত-বাংলাও শিখিতে হইল।

এই পাণ্ডিতী বাংলায় বুদ্ধির দীপ্তি ও মার্জিত রুচিবোধ থাকিলেও, এ ভাষা জনসাধারণের বোধগম্য হয় নাই। এই ভাষাকে লক্ষ্য করিয়া বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ Grierson মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন ঃ

"Literary Bengali, as now known, is the product of the present (19th) century. It direct cultivators were the Calcutta pandits who, however well-meaning, have ruined the language by their learning.

অবশ্য এই পণ্ডিতী বাংলার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইতে বেশী বিলম্ব ঘটে নাই। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষাকে একটা গতিহীন অচলায়তনে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ঠিক সেই সময়েই ভাগ্যক্রমে মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব হইল। উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও পাশ্চাত্যধর্মী মন লইয়া তিনি বাংলা ভাষার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই বাংলা ভাষাকে গণ্ডী-সংকীর্ণতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত যুক্ত করিয়া দিলেন। মাইকেলেই এ যুগে আর্য-বাংলার বিরুদ্ধে প্রথম মুক্তিযোদ্ধা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী কবি। তিনি না আসিলে বাংলা ভাষা কোন্ ধারায় কোন্ সমুদ্রে গিয়া বিলীন হইত তাহা ভাবিবার বিষয়।

ইহার পরে প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের হাতে বাংলা ভাষা আরও সহজ ও সবল হইয়াছে, সন্দেহ নাই; তবু ইহার সাহিত্য-রূপ এখনও জনগণের কাছে দুর্বোধ্য হইয়াই আছে।

শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়রে মতো অতি আধুনিক লেখকও একথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন ঃ "উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা যে খাত বদল করেছিল আজও সেই পথেই তার স্রোত বইছে। ইংরেজ এসেছে, তার ভাষা ও আঙ্গিকের প্রভাব এসেছে, বাংলা-রীতি তাতে আরও সমৃদ্ধি লাভ করেছে; কিন্তু উনবিংশ শতকের সেই প্রথম পর্বেই জনসাধারণের ভাষার সঙ্গে তার যে পার্থক্য রচিত হয়েছে আজও তা সমান্তরাল সরল রেখার মতই চলেছে। আজ যখন বাঙালি লেখকের রচনা জনমনস্পর্শী হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে তখন সে অভিযোগের পেছনে নাগরিক সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যই নয়, দেড়শ বছর আগে বাংলা ভাষার নববিধানও যে তার জন্য কতটা দায়ী, সে কথাও ভেবে দেখবার সময় এসেছে।"

এই মন্তবের পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের বর্তমান বাংলা সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

উনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম-সাহিত্য

রাজ্যহারা মুসলমানেরা যখন বুঝিতে পারিল যে, ইংরাজী ও বাংলা না শিখিয়া তাহাদের গত্যন্তর নাই, তখন তাহারা এইদিকে মনোযোগ দিল। এই নতুন যুগের প্রথম মুসলিম সাহিত্য-স্রষ্টা হইতেছেন মরহুম মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১)। তাঁহার প্রণীত 'বিষাদ-সিন্ধু' সাধু ভাষায় লিখিত হইলেও তাহার ভাষা যে কতো সাবলীল ও প্রাণবন্ত, নিম্নের উদ্ধৃতি হইতেই তাহা বুঝা যাইবে।

"রক্ত দর্শনে হোসেন চমকিয়া উঠিলেন। আজ ভয়শূন্য মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। সভয়ে চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলেন ঃ আবদুল্লাহ্ জেয়াদ, ওমর, সীমার এবং আরও কয়েকজন সেনা তাঁহার চতুর্দিক ঘিরিয়া যাইতেছে। সকলের হাতেই তীর-ধনুক। ইহা দেখিয়াই তিনি চম্‌কিয়া উঠিলেন। যে সমুদয় বসনের মাহাত্ম্যে তিনি নির্ভয়-হৃদয়ে ছিলেন, তৎসমুদয় এখন পরিত্যাগ করিয়াছেন; তরবারি তীর, নেজা, বল্লম, বর্ম, খঞ্জর কিছুই তাঁহার সঙ্গে নাই। কেবল দুইখানি হাতমাত্র সম্বল। অন্যমনস্কভাবে তিনি দুই এক পদ করিয়া চলিলেন, শত্রুরাও পূর্ববৎ ঘিরিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।" [বিষাদ-সিন্ধু]

কিন্তু মুসলিম কাব্য-সাহিত্য ও পুঁথির ধারা তখনও মন্থর গতিতে চলিতেছিল। এই সময়কার জনৈক মুসলিম কবির রচিত নিম্নের ব্যঙ্গ কবিতাটিতে কিছুটা আধুনিকতার ছাপ এবং উন্নত রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতাটি ইনকামট্যাক্সকে লক্ষ্য করিয়া রচিত ঃ

"বালেশ্বর বিচে গড় পদ্দা পরগনা
ভিক্টোরিয়া শাহাজাদী যার মালিকানা।
লেয়সন করোসন দুই লাট বন্দি,
খাজানা দাখিল করি মোরা হাত বান্ধি।
জরিপেতে বন্দবস্ত হইয়াছে যার
বহুত মশকেল দিতে হবে রাজকর।
তাহাতে যাহোক করি দুঃখেতে গুজরাণ
এইরূপে দিনপাত চালান রহমান
রাতদিন দোওয়া করি মহারাণীর তরে,
রাজ্যবৃদ্ধি হয় তার খোদাতালা করে।
এমন আমল দুটা হয় না জাহানে
এক জাগায় রাখে বাঘ বকরী দুইজনে।
কেহ কারো জবরদস্তি করিতে না পারে,
কায়েম হুকুম যে আইন অনুসারে।

www.pathagar.com

এই মতে কতদিন যায় গুজারিয়া
পালেন সবার তরে মেহের করিয়া।
তাহাতে আইল এক এমন রাক্ষস
তাহার বিখ্যাত নাম ইনকাম ট্যাক্‌স।"

এই ধারা এখনও বাঁচিয়া আছে। নজরুল ইসলামের হাতে ইহার রূপান্তর ঘটিয়াছে। আরবী-ফার্সী শব্দ দ্বারা, বলিষ্ঠ আঙ্গিক দ্বারা এবং ইসলামী ভাবধারা দ্বারা তিনি বাংলা ভাষাকে প্রচুর শ্রী ও সমৃদ্ধি দান করিয়াছেন।

উপসংহার

প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা ভাষার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় এতক্ষণ আমরা দিলাম। এই পরিচয়ে দেখিলাম বাংলা ভাষা আর্য ভাষা নয়, অনার্য ভাষা। অনার্য ভাষার অর্থে অসভ্য বর্বর অস্পৃশ্যদের ভাষা নয়– আর্য-বহির্ভূত নরগোষ্ঠীর ভাষা; অন্য কথায় বাংলার ভাষা–বাঙালিদের ভাষা। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, পরবর্তীকালে বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা দ্বারা কিছুটা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। কিন্তু সে প্রভাব 'অত্যন্ত নগণ্য' এবং 'অত্যন্ত আধুনিক'। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক্‌ বলেন ঃ

"বর্তমান বাংলা ভাষার উপর সংস্কৃতের প্রত্যক্ষ প্রভাব যেমন নগণ্য, তেমনই অত্যন্ত আধুনিকও বটে।"

[মুসলিম বাংলা সাহিত্য]

বাংলা ভাষার সংগঠনে সংস্কৃত হইতে যতটুকু সাহায্য আমরা লাভ করিয়াছি, তাহা আমরা অবশ্যই স্বীকার করি। কিন্তু বাংলা যে সংস্কৃতের দুহিতা এবং কাজেই আর্যভাষা এই দাবী অস্বীকার করি। আর্যামির গোঁড়ামি হইতে বাংলা ভাষাকে আমরা মুক্ত রাখিতে চাই। ইহাই হইবে বাংলা ভাষার কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথ।

আজ বাংলা ভাষা দ্বিধা-বিভক্ত। পশ্চিম বঙ্গের বাংলা এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা এক হইয়াও এক নয়। উভয়ের গতি ও লক্ষ্য বিভিন্ন। ইহাতে আমাদের আনন্দের কারণ আছে। এখানকার বাংলা সংস্কৃতের আওতা হইতে অনেক দূরে থাকিবে। সংস্কৃত একটি মৃতভাষা; সুতরাং মৃতের সহিত যাহারা যতো বেশী মিতালী করিবে, তাহারা ততো বেশী আড়ষ্ট ও প্রাণহীন হইবে। পাক-ভারত উপমহাদেশের বহু প্রাদেশিক ভাষা রহিয়াছে। যেমন বাংলা, উর্দু, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠি, আসামী ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে বাংলা ও উর্দুই যে শীর্ষস্থানীয়, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ লাভ করিয়াছেন। উর্দুর কবি ইকবাল আজ সারা জগতের বিপ্লবী কবি ও দার্শনিক। এই দুই ভাষাতেই বহু বিশিষ্ট মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এ গৌরব এক হিসাবে ইসলামের। উর্দু ও বাংলা যে আজ এত প্রগতিশীল ও জীবন্ত তাহার কারণ যে উহারা আর্য ভাষা নহে; অন্য কথায় সংস্কৃত হইতে উহাদের জন্ম হয় নাই। সংস্কৃত হইতে যে-ভাষা যতো দূরে রহিয়াছে, সে ভাষা আজ ততো জীবন্ত, ততো প্রগতিশীল। পাক-ভারত উপমহাদেশের সমস্ত

www.pathagar.com

আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে আজ যে উর্দু ও বাংলা ভাষাই সর্বাপেক্ষা উন্নত, বলিষ্ঠ ও ব্যাপক, তাহার অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, ইহাদের প্রকৃতি ও রক্তে আছে ইসলামের বিশ্বজনীন উদারতা ও মানবিকতার ছাপ। প্রচারধর্মী সাম্যবাদী মানুষেরাই ইহাদের জন্মদাতা ও পালয়িতা। বাংলা ভাষার গতিপথ লক্ষ্য করিলেও এ সত্য সহজেই বুঝা যায়। দ্রাবিড়, বৌদ্ধ, সুলতানী আমল পার হইয়া সে আসিল বৃটিশ আমলে। এখানে আসিয়া পাদ্রী ও পণ্ডিতদের ষড়যন্ত্রে সে অনেকখানি স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলিল বটে, কিন্তু মুক্তির নূতন পথ ধরিয়া বাহিরে আসিতে তাহার বিলম্ব ঘটিল না। এই মুক্তি-সংগ্রামে সাহায্য করিলেন মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি উদারধর্মী কবি-সাহিত্যিকেরা। পাকিস্তান আসিয়া তাহার রূপান্তর ঘটিয়াছে। সুখস্মৃতি ঘেরা পূর্ব পাকিস্তানই তো তাহার আদি বাসভূমি। এখানে আসিবা মাত্রই সে আবার তাহার হৃত গৌরব ফিরিয়া পাইয়াছে। উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষাও এখন পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। এই গৌরব বাংলা ভাষা অন্যত্র লাভ করিতে পারে নাই।

পূর্ব-পাক বাংলা সাহিত্যে এবারেও ইসলাম এক নূতন ভূমিকা গ্রহণ করিবে। ইসলামের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা ও মহামানবতার বাণী এবং তাহার রূপ, রস ও সুর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে প্রেরণা যোগাইবে এবং সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত খুলিয়া দিবে।

নজরুল-কাব্যের অবাঞ্ছিত অংশ

নজরুল-কাব্যের পাকিস্তান-সংস্করণ প্রকাশ করিবার যে প্রস্তাব আমরা করিয়াছি, বহু শিক্ষিত ব্যক্তি আমাদের সে প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। অনেক উকিল বন্ধুও জানাইয়াছেন যে, তাহাতে আইন-ঘটিত কোনো বাধারই সৃষ্টি হইবে না। এখন প্রয়োজন হইবে ছাঁটাই করার। কোন্ পুস্তকে কোন্ কোন্ অংশ বর্জনীয়, তাহাই এখন আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে। আমরা সেই বিচারই এবার করিব। অবশ্য আমাদের মতই যে অভ্রান্ত হইবে, তাহা আমরা বলি না। আমরা আমাদের নিজের মতামত প্রকাশ করিতেছি মাত্র। বলাবাহুল্য, ইসলাম এবং পাকিস্তানের পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা এই ছাঁটাই করিতেছি ঃ কাব্য বা সাহিত্যের দিক্ দিয়া নয়।

(১) অগ্নিবীণা

অগ্নিবীণা নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ১৩২৯ সালে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাতে মোট ১২ টি কবিতা আছে, যথা ঃ প্রলয়োল্লাস, বিদ্রোহী, রক্তাম্বরধারিণী মা, আগমনী, ধূমকেতু, কামাল পাশা, আনোয়ার, রণভেরী, শাতিল-আরব, খেয়াপারের তরণী, কোরবাণী ও মোহর্‌রম। এর ভিতরে ৭টি ইসলামী ভাবাপন্ন, বাকী ৫টি ইসলাম ও পাকিস্তানী আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। কাজেই আমাদের মতে এগুলি বর্জন করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত দেখুন ঃ

www.pathagar.com

প্রলয়োল্লাস

প্রথম পুস্তকের প্রথম কবিতাতেই কবি ভারতের মুক্তি-স্বপন দেখিতেছেন। অনাগত দিনের বিপ্লবের মধ্যে ধ্বংস আছে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে সৃষ্টির উল্লাসও আছে। প্রত্যেক প্রলয়ের বুকেই আছে নব সৃষ্টির উল্লাস। এই জন্যই কবি এ কবিতার নাম দিয়াছেন প্রলয়োল্লাস। যে প্রলয় আসিবে তাহাতে কবি উল্লসিত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য এই প্রলয়ের রূপ সম্পূর্ণ হিন্দুয়ানী এবং সেই জন্যই মুসলিম অনুভূতির পীড়াদায়ক। এই প্রলয়ের মধ্যে হিন্দু-ভারতেরই পুনর্জাগরণের স্বপ্ন তিনি দেখিয়াছেন। এর আবেদন এখন পাকিস্তানে কোথায়? কাজেই আদর্শের দিক দিয়া ইহা বর্জনীয়। দুই একটি উদ্ধৃতি দেখুন ঃ

"তোরা সব জয়ধ্বনি কর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য পাগল
সিন্ধুপারের সিংহদ্বারে ধমক হেনে ভাঙল্ আগল।
মৃত্যু-গহন অন্ধকূপে
মহাকালের চণ্ড-রূপে
বর্জ-শিখার মশাল জ্বেলে আস্ছে ভয়ঙ্কর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!...
দ্বাদশ রবির বহ্নি-জ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন-কটায়
দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায়
বিন্দু তাহার নয়নজলে
সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে
কপোল-তলে
বিশ্ব-মায়ের আসন তারি বিপুল বাহুর পর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!"

এখানে কবি প্রলয়ের দেবতা শিবের বর্ণনা দিতেছেন এবং সেই ভঙ্গিমাতেই তাঁর ধ্বংসের চিত্র আঁকিয়াছেন। প্রলয়-নাচনে দিগম্বর (শিব) নৃত্য করিতেছেন, সে নাচনে সৃষ্টি ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, কিন্তু নব-সৃষ্টির ইঙ্গিত দিতেছে তাঁরই ললাটে-আঁকা 'শিশু-চাঁদের কর!'-

"দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু-চাঁদের কর।"

তারপর কবি বলিতেছেন ঃ

"অন্ধকারার বন্ধ কূপে
দেবতা বাঁধা যজ্ঞ-যূপে
পাষাণ-স্তূপে
এইতো রে তার আসার সময় ঐ রথ-ঘর্ঘর,
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!

কবির 'রেনেসাঁর এই চিত্র দেখিয়া মুসলিম মন সাড়া দিবে না। কাজেই ইহা বর্জনীয়।

www.pathagar.com

বিদ্রোহী

নজরুলের 'বিদ্রোহী' বাংলা সাহিত্যে সত্যই একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এমন আবেগ, উচ্ছ্বাস ও সাবলীল গতিভঙ্গি এবং দৃপ্ত তেজ বাংলা কাব্যে ইহার পূর্বে ছিল না। সে দিক দিয়া কবিতাটি নিজেই একটা টাইপ এবং সাহিত্যে রক্ষা করিবার মতো। কিন্তু আদর্শের বিচারে বিদ্রোহীর মূল্য বিশেষ কিছুই নাই। চিন্তাশীল তরুণ মনেও এ সম্বন্ধে আজ জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে। বিদ্রোহের পশ্চাতে থাকা চাই একটা সত্য ও সুন্দরের আদর্শ। সমালোচকেরা বলেনঃ সেরূপ কোনো আদর্শের প্রেরণা এই কবিতার পশ্চাতে নাই। আমি কি হইব–এ যেন তারি একটা ফিরিস্তি। দান্তে বলিয়াছেনঃ প্রকৃত কবিতা হইবে "divine phantom of reality", বিদ্রোহীতে তেমন কোনো ধ্রুবের সন্ধান নাই। শ্রেষ্ঠ কাব্য বা শ্রেষ্ঠ আর্টের লক্ষণ হইবে সংক্রামকতা। কবির 'আমি' নিখিল-মনে ব্যাপ্ত হইয়া যাইবে, তবেই হইবে তাহা আর্ট। ব্যক্তি সেখানে নৈর্ব্যক্তিক হইবে, বিশেষ সেখানে নির্বিশেষ হইবে।

এই কবিতার মূল সুরও ইসলামের ধ্যান-ধারণার বিরোধী। "খোদার আসন আরশ ভেদিয়া" উর্ধ্বে উঠা অথবা "ভগবান বুকে এঁকে দেই পদচিহ্ন"–এসব ধারণা ইসলামী নয়। "জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য"–এসব সম্পূর্ণ হিন্দুদের পৌরাণিক আদর্শ। এর মধ্যে আছে শেরেকী ও পৌত্তলিকতার পয়গাম। এ কবিতা পড়িয়া কেহ শ্রেষ্ঠতর মুসলমান বা মানুষ হইতে পারিবে না, আল্লাহ্‌র প্রতি তার মনে কোনো প্রেম জাগিবে না, কোনো গঠন-মূলক মনোভঙ্গিমাও গঠিত হইবে না; একটা উচ্ছৃঙ্খল এলো-মেলো ঘূর্ণি-হাওয়াই তার মনে দোলা দিয়া যাইবে। কাজেই সে আদর্শ আমাদের জীবন-গঠনে কাজে লাগিবে না। দুঃখ-বিপদের ইসলামিক দর্শনই আমরা গ্রহণ করিব–বিদ্রোহী হইব না। 'অস্তাইনু বিস্-সাব্‌রে অস্-সালাত ইন্নাল্লাহা মাস্‌সাবেরীন" (ধৈর্য ও প্রার্থনার মধ্য দিয়া শক্তির সন্ধান করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গেই থাকেন)–ইহাই ইসলামের জীবন-দর্শন। এই সব কারণেই 'বিদ্রোহীর' কাব্যমূল্য যথেষ্ট থাকিলেও উহা ধর্ম, রাষ্ট্র এবং ব্যক্তিগত জীবন-বিকাশের বিরোধি বলিয়া আমরা মনে করি।

অবশ্য সজাগ মন লইয়া কবিতাটি পড়িলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু প্রত্যেক কাব্যেরই তো একটা প্রভাব আছে। 'বিদ্রোহীর' এই চিত্র তাই মন হইতে সরাইয়া রাখাই যুক্তিসঙ্গত।

রক্তাম্বরধারিণী মা

নামেই কবিতার পরিচয়। ভারতের মুক্তির উপায় স্বরূপ কবি এই "রক্তাম্বরধারিণী মা"-কে আহ্বান করিতেছেন। বর্তমান আলোকের যুগে এরূপ কবিতার মূল্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। এই সব Pagan ideas হয়তো আগে চলিত, আর চলিবে না।

নমুনা দেখুন ঃ

www.pathagar.com

রক্তাম্বর পরো মা এবার
জ্বলে পুড়ে যাক্ শ্বেত-বসন
দেখি ওই করে সাজে মা কেমন
বাজে তরবারি ঝনন্-ঝন্।

*   *

নিঃশ্বাসে তব পেজা-তুলো সম
উড়ে যাক মাগো এই ভুবন
অসুরে নাশিতে হউক বিষ্ণু-
চক্র মা তোর হেম-কাঁকন।

*   *

নিদ্রিত শিবে লাথি মারো আজ
ভাঙো মা ভোলার ভাঙ্-নেশা,
পিয়াও এবার অ-শিব গরল
নীলের সঙ্গে লাল-মেশা।
দেখা মা আবার দনুজ-দলনী
অশিব-নাশিনী চণ্ডী-রূপ;
দেখাও মা ওই কল্যাণ-করই
আনিতে পারে কি বিনাশ-স্তূপ!

টীকা নিষ্পয়োজন। এ কবিতা আমাদের চলার পথে আজ বিষের ক্রিয়া করিবে।

আগমনী

শ্রীদুর্গার আবাহন। উচ্ছ্বসিত মাতৃ-বন্দনা! হিন্দুরাও তাহাদের মায়ের স্তোত্র এরূপ জোরালো ভাবে লিখিতে পারে নাই!

রণ-রঙ্গিণী জগৎ-মাতার দেখ মহারণ
দশদিকে তাঁর দশহাতে বাজে দশ প্রহরণ!

*   *

খোল্ তোরণ
চল্ বরণ
করবো মা'য়
ডরছো কা'য়?
ধরবো পায় কার সে আর

www.pathagar.com

বিশ্ব মা-ই পার্শ্বে যার?

* *

ঘরে ঘরে আজি দীপ জ্বলুক!

মার আবাহন-গীত চলুক!

* *

স্বা-গতম! স্বা-গতম!

মা-তরম! মা-তরম!

ঐ-ঐ-ঐ বিশ্ব-কণ্ঠে

বন্দনা-বাণী লুণ্ঠে

"বন্দে মাতরম!"-

আগা-গোড়া এইরূপ।

ধূমেকতু

বিদ্রোহীর ছোট ভাই ঃ

"আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ
মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!"....

* *

"আমি জানি জানি ঐ স্রষ্টার ফাঁকি, সৃষ্টির ঐ
চাতুরী
তাই বিধির নিয়মে লাথি মেরে ঠুকি
বিধাতার বুকে হাতুড়ি!

অথবা

"ঐ ঈশ্বর-শির উল্লঙ্ঘিতে আমি আগুনের সিঁড়ি,
আমি বসিব বলিয়া পেতেছে ভবানী ব্রহ্মার বুকে পিঁড়ি!"

ভাবের দিক দিয়াও এই সব কবিতা অত্যন্ত অগভীর ও পশ্চাৎমুখীন। কাজেই এখন বর্জনীয়।

অবশিষ্ট 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার' 'রণভেরী', 'শাতিল-আরব', 'খেয়া-পারের তরণী', 'কোরবাণী' ও 'মুহর্‌রম' ইসলামী আদর্শে ও ধ্যান-ধারণায় অত্যুজ্জ্বল। 'কামাল পাশার' মতো সামরিক ছন্দের কবিতা বাংলা ভাষার আর দ্বিতীয়টি নাই। খেয়াপারের তরণীও ভাব-গাম্ভীর্যে অনবদ্য।

www.pathagar.com

বিষের বাঁশী

'বিষের বাঁশী' নজরুলের দ্বিতীয় কাব্য-গ্রন্থ। অগ্নিবীণা বাহির হইবার পর তিনি ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু পরে সেই গ্রন্থেরই তিনি নামকরণ করেন 'বিষের বাঁশী'। বলাবাহুল্য এই ধরনের নামও এখন হয়তো অনেকে পছন্দ করিবেন না। সাপ, সাপুড়ে, মনসা ইত্যাদির সঙ্গে মুসলিম মনের কোনো নিবিড় যোগ নাই। অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, প্রলয়-শিখা, ফণি-মনসা ইত্যাদি নামের মধ্যে তাই লুকাইয়া আছে একটা বিজাতীয় গন্ধ। কি কারণে জানিনা নজরুল এই সব নামই বেশী পছন্দ করিতেন। মনসা-দেবীর প্রতি তিনি অত্যাধিক অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর বহু কবিতা ও গানে সাপ ও সাপুড়িয়াদের reference দেখা যায়। 'বিষের বাঁশী', 'ফণি-মনসা' এবং 'সাপুড়ে' (নাটক)–এই তিনখানি পুস্তকেই দেখা যায় তাঁর সর্প-প্রীতি অথবা সর্প-ভীতি।

'বিষের বাঁশীতে মোট ২৫টি কবিতা। তন্মধ্যে একটি মাত্র 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম্' ছাড়া বাকী সবগুলি কবিতা ও গানই ভারতীয় টেক্‌নিকে লেখা। হিন্দু দেবদেবী ও হিন্দু-পুরাণ না জানিলে সে সব কবিতার অর্থ ও ভাব অনুসরণ করা কঠিন। পড়িতে বসিলে মনেই হয় না যে কোনো মুসলমানের লেখা পড়িতেছি। নিম্নে 'জাগৃহি' কবিতা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। ইহার প্রতিটি ছত্রে আছে– হিন্দু-পুরাণের reference ও allusion.

জাগৃহি

'হর হর হর শঙ্কর হর হর ব্যোম্'–
একি ঘন রণ-রোল ছায় চরাচর ব্যোম্!
হানে ক্ষিপ্ত মহেশ্বর রুদ্র পিনাক,
ঘন প্রণব-নিনাদ হাঁকে ভৈরব হাঁক
ধূধূ দাউ দাউ জ্বলে কোটি নরমেদ-যাগ
হানে কাল-বিষ বিশ্বে রে মহাকাল-নাগ!

আজ ধূর্জটি ব্যোমকেশ নৃত্য-পাগল
ঐ ভাঙলো আগল ওরে ভাঙলো আগল!
বোলে অম্বুদ-ডম্বরু কম্বু বিষাণ,
নাচে থৈ-তাতা থৈ-তাতা পাগলা ঈশান।...

এসো কৈলাশ হতে মাগো মানস-সরে
নীল উৎপল দলে রাঙা আঁচল ভরে

www.pathagar.com

এসো কন্যা উমা, এসো গৌরী রূপে,
বাজো শঙ্খ শুভ, জ্বালো গন্ধ ধূপে! ...
বাজো মঙ্গল শাঁখ, হোক শুভ-আরতি
এলো সুন্দর সৈনিক সুর-কার্তিক
এলো সিদ্ধিদাতা, হের হাসে চারিদিক! ...

ভাঁজো মোহিনী সানাই, বাজো আগমনী সুর
বড় কেঁদে ওঠে আজ হিয়া মাতৃ-বিধুর।
ওঠে কণ্ঠ ছাপি বাণী সত্য পরম–
বন্- দে মাতরম্! বন্‌দে মাতরম্!

৭২ লাইনের এই দীর্ঘ কবিতাটির প্রতি চরণে আছে এমনই উচ্ছ্বসিত দেবদেবী-প্রীতি ও শ্রদ্ধা-নিবেদন। এই কবিতার কোনো আবেদন আজকার দিনে আছে কি? হিন্দুরাও এত উগ্র হিন্দুয়ানী এ যুগে পছন্দ করিবে না, কারণ তাহাদের মনও এই সব পৌরাণিক কাহিনীর মোহ কাটাইয়া বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে। আলোক হইতে অন্ধকারে লইয়া যাইবার এই আহ্বান প্রত্যেক জিন্দাদিল্ মুসলমান অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গেই বর্জন করিবেন।

তূর্য-নিনাদ

এটি একটি স্বদেশী সঙ্গীত। হিন্দু-ভারতের আশা-আকাঙ্খার ভরপুর। সবটুকুই উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

কোরাস ঃ আজ ভারত-ভাগ্য-বিধাতার বুকে
গুরু-লাঞ্ছনা পাষাণ-ভার,
আর্ত-নিনাদে হাঁকিছে নকীব,-
কে করে মুশকিল আসান তার?

মন্দির আজি বন্দীর ঘানি,
নির্জিত ভীত সত্য, বদ্ধ স্বাধীন আত্মার বাণী,
সন্ধি-মহলে ফন্দীর ফাঁদ, গভীর আন্ধি-অন্ধকার!
হাঁকিছে নকীব,—হে মহারুদ্র, চূর্ণ করো এ ভগ্নাগার॥
রক্ত-মদের বিষ পাল করি
আর্ত মানব; স্রষ্টা কাতর সৃষ্টির তার নির্বাণ স্মরি!
ক্রন্দন বিশ্বে স্বনিছে প্রলয়-ঘটার হুহুঙ্কার–

www.pathagar.com

হাঁকিছে নকীব,—অভয় দেবতা, এ মহাপাথার করহ পার॥
কোলাহল-ঘাঁটা হলাহল-রাশি
কে নীলকণ্ঠ গ্রাসিবে রে আজ দেবতার মাঝে
দেবতা সে আসি?
উরিবে কখন্ ইন্দিরা, ক্রোড়ে শান্তির ঝারি
সুধার ভাঁড়?
হাঁকিছে নকীব,-আনো ব্যথা-ক্লেশ-মন্থন-ধন অমৃত-ধার॥
কণ্ঠ ক্লিষ্ট ক্রন্দন-ঘাতে,
অমৃত-অধিপ নর-নারায়ণ দারুময় ঘন মনোবেদনাতে।
দশভূজে গলে শৃঙ্খল-ভার দশ প্রহরণ-ধারিণী মা'র-
হাঁকিছে নকীব,-"আবিরাবির্ম এধি" হে নব যুগাবতার!
মৃত্যু-আহত মৃত্যুঞ্জয়,
কে শোনাবে তারে চেতন-যন্ত্র? কে গাহিবে
জয় জীবনের জয়?
নয়নের নীরে কে ডুবাবে বল্ বলদর্পীর অহঙ্কার?-
হাঁকিছে নকীব,-সেদিন বিশ্বে খুলিবে আরেক তোরণ-দ্বার॥

বোধন

এই কবিতাটি "য়ুসোফে গুম্ গশ্তা বাজ্ আয়েদ্ ব-কিন্আন গম্ মখোর্" নামক বিখ্যাত গজলের ছায়াবলম্বনে লিখিত। অতি সুন্দর কবিতা। গোড়াতে কবি ইহার অনুবাদ করিয়াছিলেন ঃ

"দুঃখ কি ভাই, হারানো য়ুসুফ
কেনানে আবার আসিবে ফিরে।"

কিন্তু পরে তিনি এই কবিতাটিকে ভারত-মাতার চরণে উৎসর্গ করিবার জন্য ইহার রূপ বদলাইয়া দিয়া এইরূপ করিলেনঃ

"দুঃখ কি ভাই হারানো সুদিন
ভারতে আবার আসিবে ফিরে।"

অভয়-মন্ত্র

এটি গান। কখন, কি জন্য লিখিত দেখুন ঃ

বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয়!

www.pathagar.com

কোরাস বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয়!

বল্, হউক গান্ধী বন্দী, মোদের সত্য বন্দী নয়!

বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ, পুরুষোত্তম জয়!

* *

আজ বক্ষের তোর ক্ষীরোদ সাগরে

অচেতন নারায়ণ ঘুম-ঘোরে

শুধু লক্ষ্মীর ভোগ লক্ষ্য তাঁহার নয় কিছুতেই নয়।

তোর অচেতন চিতে জাগাবে চেতনা নারায়ণ চিন্ময়।

* *

ক্ষীণ দুর্বল বলে খণ্ড 'আমির' হয় যদি পরাজয়

ওরে অখণ্ড আমি চির-মুক্ত সে, অবিনাশী অক্ষয়!..... ইত্যাদি। এই গানের এখন কোনোই আবেদন নাই।

আত্ম-শক্তি

একই ধরনের হিন্দু-রেনেসাঁর বাণী–

এসো বিদ্রোহী মিথ্যা সূদন আত্ম-শক্তি বুদ্ধ বীর!
আনো উলঙ্গ সত্য-কৃপাণ, বিজলী-ঝলক ন্যায় অসির।
তুরীয়ানন্দে ঘোষ সে আজ
আমি আছি' বাণী বিশ্ব-মাঝ
পুরুষ-রাজ!
সেই স্বরাজ!
জাগ্রত করো নারায়ণ-নর নিদ্রিত বুকে মর-বাসীর;
আত্ম-ভীত এ অচেতন-চিতে জাগো 'আমি'-স্বামী
নাঙ্গা-শির॥

এসো প্রবুদ্ধ এসো মহান
শিশু-ভগবান জ্যোতিষ্মান!
আত্মজ্ঞান-
দৃপ্ত প্রাণ!
জানাও জানাও, ক্ষুদ্রেরও মাঝে বাজিছে রুদ্র তেজ রবির!
উদয়-তোরণে উড়ুক আত্ম-চেতন-কেতন 'আমি আছি'র॥
–ইত্যাদি।

www.pathagar.com

কবি এখানে বেদান্ত-মত প্রচার করিতেছেন।

"অহম্ ব্রহ্মাস্মি"–আমিই ব্রহ্ম; আমার বিনাশ নাই–ইহাই তাহার বাণী। বলাবাহুল্য, এ বাণী সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী, কাজেই বর্জনীয়।

অন্যান্য কবিতা

মরণ-বরণ, বন্দী-বন্দনা, বন্দনা-গান, মুক্তি-সেবকের গান, শিকল-পরার গান, মুক্ত-বন্দী, যুগান্তরের গান, চরকার গান, জাতের বজ্জাতি–ইত্যাদি কাবিতা ও গান মাঝে মাঝে কিছু কিছু বর্জন করিলে রাখা যাইবে। এই সব গানের বানীর মেয়াদ ফুরাইয়া গেলেও বিগত স্বদেশীযুগের চিত্র হিসাবে বাংলা সাহিত্যে এগুলি রক্ষা করা যাইতে পারে। নিম্নলিখিত অংশগুলি পীড়াদায়কঃ-

"বল্ ভাই মাভৈঃ মভৈঃ,
নবযুগ ঐ এলো ঐ
এলো ঐ রক্ত-যুগান্তর রে।
বল্ জয় সত্যের জয়
আসে ভৈরব-বরাভয়
শোন্ অভয় ঐ রথ-ঘর্ঘর রে॥"...

"শুধু এই ভরসা রাখিস
মরিস্‌নি ভিমি গেছিস
ঐ শুনেছিস্ ভারত-বিধির স্বর রে।
ধর্ হাত ওঠ্ রে আবার
দুর্যোগের রাত্রি কাবার,
ঐ হাসে মা'র মূর্তি মনোহর রে॥

(যুগান্তরের গান)

"ভারত বস্ত্রহীন যখন
কেঁদে ডাক্‌লো-নারায়ণ!
তুমি লজ্জা-হারী করলে এসে লজ্জা নিবারণ,
তাই দেশ-দ্রৌপদীর বস্ত্র হর্‌তে
পারলো না দুঃশাসন-চোর॥

(চরকার গান)

চরকার গান, জাতের নামে বজ্জাতি, সব জাত জালিয়াত খেলছে জুয়া, ইত্যাদি গানগুলি গত যুগে প্রেরণা জুগাইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কবি যখন নিজ মুখে সভা-

www.pathagar.com

সমিতিতে এই সব গান গাহিতেন, তখন বিপুল একটা উন্মাদনার সৃষ্টি হইত। বলা বাহুল্য, এখন এই সব গানের বা ভাবধারার কোনোই appeal নাই।

"বিষের বাঁশী"র 'বিজয়-গান' সঙ্গীতটিও আর চলিবে না। কবি এই গানে ভারতের মুক্তি-স্বপন দেখিতেছেন ঃ-

"ঐ অভ্রভেদী তোমার ধ্বজা
উড়লো আকাশপথে
মাগো, তোমার রথ-আনা ঐ
রক্ত-সেনার রথে॥"

ঝড়

এ পুস্তকের সর্বশেষ্ঠ কবিতা 'ঝড়'। সমগ্র নজরুল-কাব্যেরও ইহা একটি নূতন সৃষ্টি। Shelly-র 'Ode to the West Wind'-এর মতোই উদ্দাম ও সাবলীল। কবিতার গম্ভীর শব্দ-ঝঙ্কার এবং উন্মাদ গতিভঙ্গি লক্ষ্য করিবার মতো—

ঝড়-ঝড়-ঝড় আমি-আমি ঝড়-
শন্-শন্-শন্‌শন্ শন্-কড়কড় কড়-

পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই ঝড়ের মাতম অনুভব করা যায়। স্থানে স্থানে বর্ণনা-ভঙ্গি অতি চমৎকার।

কিন্তু ঐ একই দোষে কবিতাটি দুষ্ট। একটু কিছু বলিতে গেলেই তিনি আনিয়া ফেলেন হিন্দুর দেবদেবীর reference ও allusion. হিন্দু পুরাণের প্রতি আমরা কোনো বিদ্বেষ পোষণ করি না। কিন্তু আমাদের কথা হইলঃ যা-ই কেন আমরা চিন্তা করিতে যাইব তাই কেন আমরা এই রঙে ও এই ভঙ্গিতে দেখিব? স্বদেশের সম্বন্ধে বলিতে গেলে দেবদেবী, স্বাধীনতা সম্বন্ধে বলিতে গেলে দেবদেবী, ছাত্র ও যুবশক্তি সম্বন্ধে বলিতে গেলে দেবদেবী, নারী সম্বন্ধে বলিতে গেলে দেবদেবী, বিশ্ব-প্রকৃতি সম্বন্ধে বলিতে গেলে দেবদেবী—এ কেমন কথা? কই, কোনো হিন্দু বা খৃষ্টান কবিকে তো তাহাদের নিজস্ব পুরাণ ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম শাস্ত্রের reference বা allusion দিতে দেখি না। ক্কচিৎ কোনো কোনো কবির কাব্যে ২/১টি ইসলামী reference দেখা যায় মাত্র। স্বাভাবিক নিয়মই হইল তাই। কিন্তু নজরুল এই স্বভাব-ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত পথে গিয়াছেন।

'ঝড়' কবিতাতেও তাঁর এই আদর্শ অক্ষুণ্ন আছে। দৃষ্টান্ত দেখুন—

"বন্দিল ত্রিকাল ঋষি।
ধ্যান-ভগ্ন রক্ত-আঁখি আশিস্
দানিল মহাকাল।
উল্লম্ফিয়া উঠিলাম আকাশের পানে তুলি বাহু,
আমি নব রাহু!

www.pathagar.com

হেরিলাম সে বারতা মহীয়সী মহালক্ষ্মী প্রকৃতির রূপ"...
—"প্রহলাদ-কুলের আমি কাল-দৈত্য-শিশু—
ঝাঁপাইয়া পড়িলাম 'মা আমার' বলে।
নাহি জানি কোন্ ফণী-মনসার হলাহল-লোকে-
কোন্ বিষ-দীপ-জ্বালা সবুজ আলোকে-
নাগ-মাতা কদ্রু-গর্ভে জন্মেছি সহস্র-ফণা নাগ,
ভীষণ তক্ষক-শিশু!"...
......"শিবের সুন্দর ধ্রুব আঁখি
যমের আরক্ত ঘোর মশাল-নয়ন"....
"জটা মোর নীহারিকা পুঞ্জ-ধূম
পাটল পিঙ্গাস
বহে তাহে রক্ত-গঙ্গা"...
—ইত্যাদি।

মোটের উপর গোটা কবিতাটিই হিন্দু-পুরাণের পটভূমিতে লেখা। এই সব অংশ বাদ দিলেও কবিতাটির অঙ্গহানি হইবে না বলিয়াই আমরা মনে করি। কারণ রাখার মধ্যে আর্ট নাই, বর্জন করার মধ্যেই আর্ট। কোন্টুকু বর্জন করিতে হইবে, তাহা না জানিলে আর্ট সৃষ্টি সার্থক হয় না।

(৩) গীতি-শতদল

গানের বই। প্রচ্ছদপটেই ঘোর আপত্তি। লোলরসনা বিকট কালী-মূর্তি-দুই পাশে দুটি প্রদীপ, দেখিলেই শরীর শিহরিয়া উঠে। পায়ের তলায় গ্রন্থকারের নাম লেখা। এই ধরনের প্রচ্ছদপটের সার্থকতা কী, বুঝা গেল না।

বইখানিতে মোট ১০১ টা গান আছে। এতে কোনো ইসলামী গান নাই। প্রায় ৪০ টি রাধা-কৃষ্ণের গান ও অন্যান্য হিন্দু দেব-দেবীর গান আছে; বাদ-বাকী সাধারণ গানগুলির মধ্যে অধিকাংশই ভালো গান; এগুলি সম্বন্ধে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিবার কথা নয়। রচনার মাধুর্য এবং সুরের অভিনবত্বে প্রায় প্রত্যেকটি গানই সার্থক ও সুন্দর। 'শুক্নো পাতার নূপুর পায়ে', 'পল্লী-বালিকা বনপথে যায়', 'ছন্দের বন্যা হরিণী আরণ্যা', 'ঘুমায়েছে ফুল পথের ধূলায়', 'এ ঘোর শ্রাবণ-নিশি কাটে কেমনে'-ইত্যাদি গানগুলি খুবই জনপ্রিয়।

নিম্নলিখিত গানগুলি খুবই জনপ্রিয়।

'ও তুই যাস্লো রাই-কিশোরী কদম তলাতে', 'চির কিশোর মুরলীধর কুঞ্জবন-চারী', এসো নূপুর বাজাইয়া যমুনা নাচাইয়া কৃষ্ণ কানাইয়া হরি', 'নাচিয়া নাচিয়া এসো নন্দ-দুলাল', 'তোমারে কি দিয়ে পূজি ভগবান', 'আমার নয়নে কৃষ্ণ নয়ন তারা', 'মন লহ নিতি নাম রাধা-শ্যাম', 'দাও দাও দরশন পদ্ম-পলাশ-লোচন', 'নাচিছে নটনাথ শঙ্কর মহাকাল',

www.pathagar.com

'বাজিয়ে বাঁশরী মনের বনে', 'নামো নটনাথ এ নট-দেউলে', 'জাগো যোগমায়া জাগো মৃন্ময়ী', ইত্যাদি।

এইসব গানে যে সব ভাবধারা ও আদর্শের রেখাপাত করা হইয়াছে, তাহা ইসলামী খেয়ালাতের সম্পূর্ণ বিরোধী তো বটেই, বর্তমান আলোকের যুগে অচলও। দৃষ্টান্ত দেখুন ঃ-

"এসো নূপুর বাজাইয় যমুনা নাচাইয়া
কৃষ্ণ-কানাইয়া হরি,
মাখি গোখুর ধূলিরেণু গোঠে চরাইয়া ধেনু
বাজায়ে বাঁশের বাঁশী॥"

–ইত্যাদি।

"নাচিয়া নাচিয়া এসো নন্দ-দুলাল।
মোর প্রাণে মোর মনে
এসো ব্রজগোপাল॥
এসো মহাভারতের দেবতা
আনো নৃত্যের তালে নব বারতা
এসো মধু-কৈটভ-অরি আনো নবগীতা
এসো নারায়ণ ভগবান বিশ্ব-ভপাল॥"

–ইত্যাদি।

"তোমারে কি দিয়া পূজি ভগবান
আমার বলে কিছু নাহি হরি,
সকলি তোমার যে দান॥
মন্দিরে তুমি মূরতিতে তুমি
পূজার ফুলে তুমি স্তব-গীতে তুমি
ভগবান দিয়ে ভগবান পূজা করিতে–
তুমি যদি ভাবো অপমান॥"

–ইত্যাদি।

"কেমন তব রূপ দেখিনি হরি
আপন মন দিয়ে তোমারে গড়ি
হাসো না কাঁদো তুমি সে রূপ হেরি
বুঝিতে পারি না–তাই কাঁদে প্রাণ॥
কোথায় শ্রীমুখ তব, কোথায় শ্রীচরণ
চন্দন দিব কোন্‌খানা॥

–ইত্যাদি।

www.pathagar.com

"অসুর বাড়ীর ফেরৎ এ
শ্বশুর বাড়ীর ফেরৎ নয়।
দশভূজার করিস পূজা
ভুল রূপে সব জগতময়॥
নয় গৌরী নয় এ উমা
মেনকা যার খেতো চুমা
রুদ্রাণী এ, এযে ভূমা
এক সাথে এ ভয়-অভয়॥
অসুর-দানব করলো শাসন
এই রূপে রাম অবতারে।
বেদ-সেনানী পুত্রে লয়ে
যার এই মা দিগ্বিজয়ে
সেইরূপ মা'র করলে পূজা
ভারতে ফের আসবে জয়॥"
এই সব গান হিন্দুদের নিকটও এখন মূল্যহীন।

এই পুস্তকে কতকগুলি ভালো কমিক গান আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়ঃ 'গিন্নির ভাই পালিয়ে গেছে, গিন্নি চটে কাঁই', 'হুলোরে তুই রাত-বিরেতে ঢুকিস নে হেঁসেলে'-ইত্যাদি। এগুলো বেশ রাখা চলিবে।

(৪) গুল-বাগিচা

এখানাও গানের বই। ৮৮টি গান আছে। ১৪টি ইসলামী গান। ১৬/১৭টি হিন্দু দেব-দেবীর গান। বাদবাকী নানা শ্রেণীর। ইসলামী গানগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই ভাবে ও সুরে চমকপ্রদ। 'গুল-বাগিচার বুলবুলি আমি রঙীন প্রেমের গাই গজল', 'উম্মত আমি গুনাহ্‌গার', 'ঈদজ্জোহার চাঁদ হাসে ওই' 'এলো শোকের সেই মোহার্‌রম', 'তওফিক দাও খোদা ইসলামে', 'নয়নের মনি আমার পিয়ারা মোহাম্মদ', 'বহিছে সাহারায় শোকের লু-হাওয়া', 'বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা', 'মারহাবা সৈয়দে মক্কী মদনী আল-আরাবী', 'মোহাম্মদ মুস্তাফা-সাল্লে আলা'-ইত্যাদি গানগুলি সত্যই সুন্দর। কিন্তু ঠিক ইহারই পাশাপাশি আছেঃ

'এসো এসো রসলোক বিহারী', 'স্বপ্নে দেখেছি ভারত-জননী তুই যেন রাজ-রাজেশ্বরী', 'এই দেহেরি রঙমহলায় খেলিছেন লীলা-বিহারী', 'ঘন-ঘোর মেঘ-ঘেরা দুর্দিনে ঘনশ্যাম, ভূ-ভারত চাহিছে তোমায়' ইত্যাদি গানগুলি— যা কোনো রকমেই আমাদের গাওয়া চলিবে না।

অন্যান্য সাধারণ গানগুলি অনায়াসে রাখা চলিবে- যদিও অনেকগুলি গানই তাহাদের মাদকতা হারাইয়াছে।

www.pathagar.com

(৫) প্রলয়-শিখা

এই পুস্তকের প্রচ্ছদপটও মুসলিম অনুভূতির পীড়াদায়ক। বিশ্ববুকে শিবের তাণ্ডব নৃত্য আমাদের মনে কোনো সাড়া জাগায় না।

পুস্তক খানিতে মোট ২০টি কবিতা আছে। এই কুড়িটি কবিতার মধ্যে একটিতেও কোনো ইসলামী গন্ধ নাই। সূচীপত্র দেখুন ঃ-

'প্রলয়-শিখা', 'নমস্কার', 'পূজা-অভিনয়', 'ভারতী-আরতী', 'বহ্নি-শিখা', 'বৈতালিক', 'সমর-সঙ্গীত', 'চাষার গান', 'মণীন্দ্র প্রয়াণ', 'নব-ভারতের হল্‌দিঘাট', 'যতীন দাস', 'শূদ্রের মাঝে জাগিছে রুদ্র', 'রক্ত-তিলক' ইত্যাদি। এই ধরনের কবিতাতেই বইখানি ভরপুর। এই ধরনের কবিতা পাকিস্তানে কাহারা পড়িবে এবং কেন পড়িবে, ভাবিয়া পাওয়া যায় না। দুই-একটি নমুনা দেখুনঃ

"বিশ্ব জুড়িয়া প্রলয়-নাচন লেগেছে ঐ
নাচে নটনাথ কাল-ভৈরব তাথৈ থৈ।
সে নৃত্য-বেগে ললাট-অগ্নি প্রলয়-শিখ্
ছড়ায়ে পড়িল হের রে আজিকে দিগ্বিদিক।

*   *

উর্ধ্ব হইতে এসেছি আমরা প্রলয়ের শিখা অনির্বাণ
জতুগৃহদাহ-অন্তে করিব জ্যোতির স্বর্গে মহাপ্রয়াণ।"

–(প্রলয়-শিখা)

"তোমাদের নমস্কার–
যাহার উদয়-আশায় জাগিছে রাতের অন্ধকার।....
...নমো দেবী নমো নমো"....

–(নমস্কার)

"এমনি শরৎ সৌরাশ্বিনে
অকাল-বোধন মহামায়ার
যে পূজা করিল বধিতে রাবণে
ত্রেতায় স্বয়ং রামাবতার,
আজিও আমরা সে দেবী-পূজার
অভিনয় করে চলিয়াছি!
লঙ্কা-সায়রী রাবণ ধরিয়া
টুঁটিতে ফাঁসায়ে দেয় কাছি।"

–(পূজা-অভিনয়)

www.pathagar.com

"জয় ভারতী শ্বেত-শতদল-বাসিনী
বিষ্ণু-চরণ-শরণ আদি বাণী!
কণ্ঠ-লীনা বাজিছে বীণা,
বিশ্ব ঘুরে গাহে সে সুরে
জয় জয় বীণাপাণি॥"

—(ভারতী-আরতি)

"মেলি শতদিকে শত লেলিহান রসনা
জাগো বহ্নি-শিখা স্বাহা দিগ্-বসনা!"...
"জাগো ভীমা-ভয়ঙ্করী-উন্মাদিনী,
রাঙা দীপক-আগুন-সুরে বীণা-বাদিনী।"

—(বহ্নি-শিখা)

"টলমল, টলমল পদভরে
বীরদল চলে সমরে॥...

কাঁপে মন্দিরে ভৈরবী—এ কি বলিদান!
জাগে নিঃশঙ্ক ত্যজিয়া শ্মশান!
দোলে ঈশান-মেঘে কাল প্রলয়-নিশান!
বাজে ডম্বরু, অম্বর কাঁপিছে ডরে॥

—(সমর-সঙ্গীত)

"আমাদের জমির মাটি ঘরের বেটি,
সমান, রে ভাই!
কে রাবণ করে হরণ
দেখবো রে তাই॥"—

*   *

"এবারে পূজোয় নতুন
বলি দে সে-সব পাঁঠা
দেখিবি আসবে ফিরে
শক্তিময়ী আবার হেথাই॥"

—(চাষার গান)

"দেবকী মাতার বুকের পাথর
নড়িল কারায় অকস্মাৎ,

www.pathagar.com

বিনা মেঘে হলো দৈত্য-পুরীর
প্রাসাদে সেদিন বজ্রপাত।"
*   *
"চিত্তপ্রিয়', 'মনোরঞ্জন',
'নীরেন' ত্রিশূল ভৈরবের!"–
*   *
"ভারতের পূজা-অঞ্জলি যেন
দেয় শিবে খাড়া নীল পাহাড়"....ইত্যাদি।
–(নব-ভারতের হল্‌দিঘাট)

"আমরা বাহিনী বিংশ-শতাব্দীর
মন্থন-শেষ অমৃত জলধির।
কল্কি-দেবের আগে-চলা দূত,
কভু ঝড়, কভু মলয়-মারুত,
কভু ভয়, কভু ভরসা লক্ষ্মী-শ্রীর।"
–(বিংশ শতাব্দী)

এই ধরনের ভাব ও আদর্শের অভিব্যঞ্জনায় পুস্তকখানি আগাগোড়া ভরপুর। 'বিংশ শতাব্দীর' তরুণরা এইসব কবিতা ও গান হইতে আজ কোন্ প্রেরণা লাভ করিবে?

(৬) বনগীতি

গানের বই। ৭১টি গান আছে। ইসলামী গান এই পুস্তকে নাই। ৩৩টি দেব-দেবী বিষয়ক গান ছাড়া অবশিষ্ট সবগুলিই সাধারণ গান। এই পুস্তকে অনেক ভালো গানও আছে। বাংলা সঙ্গীতে সেগুলি সত্যই নজরুলের অপূর্ব সৃষ্টি। এ গুলির মাদকতায় একদিন সারা বাংলা মশগুল হইয়া উঠিয়াছিল। 'কে নিবি ফুল কে নিবি ফুল', 'নদীর নাম সই অঞ্জনা', 'রুমুঝুমু রুমুঝুমু কে এল নূপুর পায়', 'পদ্ম দীঘির ধারে ধারে', 'ঐ দিতে এলে ফুল হে প্রিয়', 'পাষাণের ভাঙালে ঘুম', ইত্যাদি গজলগুলি অপূর্ব সুন্দর।

এই পুস্তকে এমন কতকগুলি শ্যামা-সঙ্গীত আছে যাহা ভাবালুতায় ও আন্তরিকতায় রাম প্রসাদের শ্যামা সঙ্গীতেরই অনুরূপ। এ গানগুলি প্রত্যেক হিন্দু-মনকে দোলা দিয়াছে। কাব্য-সৌন্দর্য্যেও সেগুলি ভরপুর। সম্ভবতঃ এই গানগুলির জন্যই কাজী আবদুল ওদুদ (এম-এ) সাহেব তাঁর "নজরুল-প্রতিভা" পুস্তকে বলিয়াছেন ঃ "ইসলামী সঙ্গীতের চাইতে শ্যামা-সঙ্গীত রচনায় নজরুল সার্থকতা অর্জন করেছেন অনেক বেশী।" এইসব গান শুনিয়াই শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী বলিয়াছিলেন ঃ "অন্তরেরও অন্তর দিয়ে অনুভব না করলে এমন সর্ব-দেববাদে মানুষ পৌঁছতে পারে না। কালো মেয়ের পায়ের তলায় আলোর নাচন দেখতে দেখতেই এগুলি লেখা।" দুই-একটি উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

www.pathagar.com

"আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়
দেখে যা আলোর নাচন
মায়ের-রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব
যার হাতে মরণ-বাঁচন।"
"শ্যামা তুই বেদেনীর মেয়ে
তাই মাঠে মাঠে বেড়াস ধেয়ে
তুই কোন্ দুখে এই ভেক নিলি মা
থাকতে, নিখিল ছেলেমেয়ে॥"
"আর লুকাবি কোথায় মা কালী
আমার বিশ্ব-ভুবন আঁধার করে
তোর রূপে মা সব ডুবালি॥
আমি পূজা করে পাইনি তোরে
এবার চোখের জলে এলি-
আমার বুকের-ব্যথার আসন পাতা
বস্ মা সেথা দুখ-দুলালী॥
বেশী দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন।

(৭) চন্দ্রবিন্দু

গানের বই। ৬২টি গান আছে। বিভিন্ন দেবদেবীর স্তুতিগান আছে ২৬টি। বাদ-বাকী বিভিন্ন বিষয়ক। একটি মাত্র ইসলামী গজল আছে এবং সেটি মনোরম-"বক্ষে আমার কাবার ছবি চোক্ষে মোহাম্মদ রসুল।" অন্যান্য অনেক ভালো গানও আছে। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষত্ব-বর্জিত গানের সংখ্যাও কম নয়। নিম্নে কয়েকটি দেবদেবী বিষয়ক গানের নাম করি ঃ-

'আদি পরম বাণী', 'ওহে রাখাল রাজ', 'চলো মন আনন্দ ধাম', 'জয় বাণী বিদ্যাদায়িনী', 'জাগো জাগো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারি', 'পূজা দেউলে মুরারী' ইত্যাদি।

পুস্তকের শেষ ভাগে কয়েকটি ভালো কমিক গান আছে।

(৮) নতুন চাঁদ

কবির শেষের দান। 'মোহম্মদী বুক এজেন্সী' কর্তৃক এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। ১৭ টি কবিতার সমষ্টি। নজরুল কাব্যে যদি কেহ দার্শনিকতা খুঁজিতে চান, তবে এই পুস্তকে তাহা পাইবেন। অবশ্য কোনো একটা বিশিষ্ট দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করিবার জন্যই যে কবি এই কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। নজরুলের রুগ্নাবস্থায় মোহাম্মদী বুক এজেন্সী এই কবিতাগুলি একত্র করিয়া 'নতুন চাঁদ' নাম দিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

কাজেই এলোমেলো ভাবের অনেক কবিতাও এর মধ্যে আছে। 'নতুন চাঁদ', 'চির-জনমের প্রিয়', 'আমার কবিতা', 'নিরুক্ত', 'সে যে আমি', 'অভেদম্', 'অভয়-সুন্দর', 'অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি', 'আর কতদিন', ইত্যাদি কাবতাগুলির মধ্যেই কবির পরিণত দার্শনিক চিন্তা প্রকাশ পাইয়াছে। এই দার্শনিকতার রূপ যে কী বুঝা কঠিন। ইসলামী গান ও কবিতার মধ্যে তিনি পূর্ণ তৌহিদবাদী, পরক্ষণেই তিনি দেবদেবীর পরম ভক্ত পূজারী; কখনও বা তিনি ঘোর শাক্ত, কখনও বা ঘোর বৈষ্ণব। 'নতুন চাঁদে' দেখা যাইতেছে ঃ তিনি একজন বৈদান্তিক। 'সোহহং', 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' (আমিই ব্রহ্ম),-'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (এক ছাড়া দুই নাই)' 'অভেদম্' (আল্লাহ্‌তে এবং আমাতে কোনো ভেদ নাই), এইসব মতবাদেই উপরক্ত কবিতাগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা ভালো। বেদান্তের 'অদ্বৈতবাদ' আর ইসলামের 'তৌহিদবাদ' কিন্তু এক নয়। 'এক ছাড়া দুই নাই' বেদান্তের এই মত শুনিতে ঠিক তৌহিদের মতোই লাগে; কিন্তু উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এমন কি যদি কেহ বেদান্ত মতে বিশ্বাস করে, তবে ইসলামী গণ্ডী হইতে সে বাহিরে যায় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বেদান্তের মত হইতেছে যে, এক ছাড়া দ্বিতীয় নাস্তি। বিশ্ব-নিখিলে যাহা কিছু আছে সমস্তই হইতেছে সেই পরম একের প্রকাশ। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পশুপক্ষী, তৃণলতা, সাগর-নদী-ইত্যাদি সবকিছু মিলাইয়া যে-বিরাট এক, তারই নাম ব্রহ্ম। অন্য কথায়ঃ মানুষ, গরু, চন্দ্র, সূর্য, বাতাস, আলো, ইত্যাদি সব কিছুই হইতেছে সেই পরম একের অংশ। কাজেই এক ছাড়া দু-এর কোনো স্থানই নাই। বলাবাহুল্য, ইসলাম এই মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। "আমরাই তিনি" (হামা উস্ত্) না বলিয়া সে বলে "আমরা তাঁর থেকে" (হামা আজ উস্ত্)। আল্লাহ্‌ই বিশ্বনিখিলের 'রব', তাঁহার নিকট হইতেই আমরা আসিয়াছি, তাঁহারই সৃষ্ট 'বান্দা' আমরা-ইহাই ইসলামী দর্শন। কাজেই আমাতে আল্লাহ্‌তে ভেদ নাই (অভেদম্)-এ সব কথা কোনো মুসলমান বলিতে পারে না। খালেক-মাখলুকের পার্থক্য ইসলামের বড় কথা। দুঃখের বিষয় নজরুল উপরক্ত কবিতাগুলিতে বেদান্ত-মতই গ্রহণ করিয়াছিনে এবং সেই তত্ত্ব-কথাই তিনি তাঁর কাব্যচ্ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন। এইখানে মুসলমানদের সমূহ বিপদের আশঙ্কা আছে। সুধার পিয়ালায় যেন বিষ মিশানো আছে; এ পিয়ালা পান করিলে মাদকতা আনে, সঙ্গে সঙ্গে তিলে তিলে ভিতর হইতে সে জীবনী-শক্তিকেও ক্ষয় করে। ভিতরকার মৃত্যুই জাতির পক্ষে সবচেয়ে বড় মৃত্যু। নিম্নে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি ঃ

"দেখিয়াছো সেই রূপের কুমারে গড়িছে যে এই রূপ,
রূপে রূপে হয়ে রূপায়িত যিনি নিশ্চল নিশ্চুপ।
কেবলি রূপের আবরণে যিনি ঢাকিছেন নিজ কায়া,
লুকাতে আপন মাধুরী যে জন কেবলি রচিছে মায়া।
সেই বহুরূপী পরম একাকী এই সৃষ্টির মাঝে
নিষ্কাম হয়ে কি রূপে সতত রত অনন্ত কাজে।...
আমরা সকলে খেলি তারই সাথে, তারই সাথে হাসি-কাঁদি
তারই ইঙ্গিতে পরম আমিরে শত বন্ধনে বাঁধি।

www.pathagar.com

মোরে 'আমি' ভেবে তারে 'স্বামী' বলি দিবাযামী নামি উঠি
কভু দেখি–আমি-তুমি যে অভেদ, কভু প্রভু বলে ছুটি।"

বেদান্ত-মতে একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য, আর সব কিছুই অনিত্য— সব কিছুই মায়া। এই ভাবই উপরে ব্যক্ত হইয়াছে। যাহা কিছু দেখি, সবই সেই –'একের' প্রকাশ। বীজেও তিনি–ফলেও তিনি। কবি তাই বলিতেছেন ঃ

"বীজ রূপে রই–নিজ রূপ কই! খুঁজিতে সহসা দেখি
সেই বীজ আমি মহীরুহ হয়ে ছড়ায়ে পড়েছি–একি!"

কবি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

"রুদ্রের রূপে সংহার করি, প্রেমময় রূপে কাঁদি
যারে তুমি বলো, সেই 'আমি' খুঁজি নিজের অন্ত-আদি।
সংসারে আমি সং সেজে আমি–শত প্রিয়জনে লয়ে
আপনারে ভোগ করিতে জন্মি বিপুল তৃষ্ণা হয়ে।"

বহু-রূপে সেই একই বিরাজমান; নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই পরম একই নিজেকে উপভোগ করে; অন্য কথায় জগৎ ব্রহ্মময়–ইহাই বেদান্তের সারমর্ম।

নজরুল সেই কথাই এখানে বলিতেছেন। শেষ দুই লাইনে এই ভাবধারা পূর্ণরূপ লাভ করিয়াছে ঃ

"নাহি অহিংসা হিংসা সেখানে, কেবল পরম শাম
রাজনীতি নাই, কোনো ভীতি নাই, 'অভেদম্' তার নাম।"

এই ভাবধারা ইসলামী আকিদার পক্ষে কতো মারাত্মক, মুসলমান তাহা ভাবুন।

অবশ্য এইসব কবিতার আদর্শ বিকৃত হইলেও স্থানে স্থানে অপূর্ব কাব্য-সৌন্দর্য প্রকাশ পাইয়াছে। 'আমার কবিতা' কবিতায় কবি তাঁর প্রিয়তমা রাধাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ঃ

"ভেবেছিনু আর জীবনে হবে না দেখা
সহসা শ্রাবণ-মেঘ এলো যেন হইয়া বজ্রের কেকা!
যমুনার তীরে বাজিয়া উঠিল আবার বিরহী বেণু
আঁধার কদম-কুঞ্জে হেরিনু রাধার চরণ-রেণু।
যোগ-সমাধিতে, মগ্ন আছিনু, ভগ্ন হইল ধ্যান
আমার শূন্য আকাশে আসিল স্বর্ণ-জ্যোতির বান।
চির চেনা তব মুখখানি সেই জ্যোতিতে উঠিল ভাসি
ইঙ্গিতে যেন কহিলেঃ "বিরহী প্রিয়তম, ভালোবাসি।"
আমি ডাকিলাম, "এসো এসো তবে কাছে।"
কাঁদিয়া কহিলে, "হের গ্রহতারা এখনো জাগিয়া আছে।

www.pathagar.com

উহারা নিভুক, ঘুমাক পৃথিবী, ঘুমাক রবি ও শশী,
সেদিন আমারে পাবে গো, লাজের গুণ্ঠন যাবে খসি।"
শেষোক্ত চারি লাইনের তুলনা নাই।

"অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি" কবিতাটি রবীন্দ্র-প্রশস্তি। রবীন্দ্রনাথকে নজরুল কি চোখে দেখেন, তাহাই তিনি এই কবিতার ব্যক্ত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি শুধু গুরুদেবই বলেন নাই; তারও উর্ধ্বে তিনি তাঁহাকে স্থান দিয়াছেন ঃ "চরণারবিন্দে-লহ-অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি
হে রবীন্দ্র, তব দীন ভক্ত এ কবির।"......
—"একা তুমি জানিতে হে, কবি মহাঋষি
তোমারি বিচ্যুত-ছটা আমি ধূমকেতু
আগুনের ফুলকি হলো ফাগুনের ফুল
অগ্নিবীণা হলো ব্রজ-কিশোরের বেণু,
শিব-শিরে শশিলেখা হলো ধূমকেতু
দাহ তার ঝরিল গো অশ্রু-গঙ্গা হয়ে।"

অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

"তোমারে দেখিতে গিয়া দেখিয়াছি আমি
বক্ষে তব চির রূপ-রস-বিলাসীরে!
হারায়ে ফেলেছি সেথা সত্তা আপনার
কাঁদিয়াছি রূপমুগ্ধা রাধিকার মতো।
হে কবি, আজিও মুনি সে চির-কিশোর
তোমার বেণুতে গাহে যৌবনের গান।
সেথা তুমি কবি নহ, ঋষি নহ তুমি,
সেথা তুমি মোর প্রিয় পরম সুন্দর!"

"কিশোর রবি" কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া নজরুল বলিতেছেন ঃ
"হে কবি, তোমারে নারায়ণরূপে এ-ভারত পূজা করে
যাইবার আগে জাগাইয়া তুমি যাও সেই রূপ ধরে।
দৈত্য-মুক্ত ব্রজের রাখাল কিশোরেরা ভয়হীন—
খেলুক সর্ব অভাব-মুক্ত হয়ে ব্রজে-নিশিদিন।"

এইখানেই আমরা এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করিতেছি। নজরুলের আরও যে-সমস্ত গানের বা কবিতার বই আছে, তাহাদের মধ্যেও এই একই দোষ অল্প-বিস্তর দেখা যাইবে। কাজেই এ বিষয় লইয়া আলোচনা বাড়াইয়া লাভ নাই। আমাদের বক্তব্য আশা করি এখন পরিস্ফুট হইয়াছে। ইসলামী দর্শন এবং পাকিস্তানের ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের আলোকেই আমরা নজরুল-কাব্যের বিচার করিয়াছি। আমরা আজ নূতন পথে জয়যাত্রা

www.pathagar.com

করিতেছি। প্রথমেই তাই আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শের নির্দেশ একান্ত প্রয়োজন। এই জন্যই আমরা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও এই অপ্রীতিকর আলোচনায় হাত দিয়াছিলাম। নজরুল আজ রোগ-শয্যায় শায়িত। এ অবস্থায় তাঁর কাব্যের বিরূপ সমালোচনা খুবই অশোভন হইল; সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি–নজরুলকে হেয় করা কখনোই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যাহা কিছু বলিয়াছি, ইসলাম ও পাকিস্তানের কল্যাণ কামনাতেই বলিয়াছি। নজরুলের সত্যিকার কল্যাণ আমরা কামনা করি এবং সেই জন্য তাঁহাকে পাকিস্তানে লইয়া আসিয়া অথবা বিদেশে পাঠাইয়া তাঁহার সুচিকিৎসার প্রস্তাব আমরা দিয়াছি; সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাব্যের একটা পাকিস্তানী সংস্করণ প্রকাশ করার প্রস্তাবও আমরা করিয়াছি। দেশবাসী এ সম্বন্ধে চিন্তা করুন। শুধু মুখের কথায় কেহ যেন নজরুল-প্রীতি না দেখান—ইহাই আমাদের অনুরোধ। নজরুল ইসলামের জন্য যে-কোনো সত্যিকার কল্যাণ-প্রচেষ্টার সঙ্গে যোগ দিতে আমরা প্রস্তুত আছি।

নজরুল রোগমুক্ত হইয়া আবার আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসুন—এই মোনাজাত করি। আমিন্।

নওবাহার, ১৩৫৭, ১৯৫০।

ইসলামী বাংলা সাহিত্যে রাসূলুল্লাহ্‌র জীবনী

বাংলা ভাষায় হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনচরিত সর্বপ্রথম কখন লেখা হয়, তা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। তবে এ কথা ঠিক যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই বাংলা ভাষায় রাসূলুল্লাহ্‌র জীবনী লিখবার সার্থক প্রয়াস চলে। এর পূর্বে পুঁথির ভাষায় রাসূলুল্লাহ্‌র জীবন কাহিনী কিছু কিছু লেখা হয়েছিল। এই পুঁথি গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল "কাসাসুল আম্বিয়া" অর্থাৎ নবীদিগের কাহিনী। এ এক বিরাট গ্রন্থ। হযরত আদম থেকে হযরত মুহম্মদ পর্যন্ত সমুদয় নবীদিগের জীবনী এই গ্রন্থে পুঁথির ছন্দে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। বলাবাহুল্য এই গ্রন্থের শেষ ভাগে স্থান পেয়েছে রাসূলুল্লাহ্‌র জীবন কথা। এই বিরাট গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন তিনজন কবি। রেজাউল্লাহ্, আমীরুদ্দিন এবং আশরাফ আলী। হুগলী জেলার মিয়াবেড় গ্রামের রেজাউল্লাহ্ এই গ্রন্থের সূচনা করেন। হযরত নূহের কাহিনী অবধি লিখে তিনি ইন্তিকাল করেন। তারপর নবীকাহিনী রচনার ভার পড়লো আমীরুদ্দিনের উপর। ইনি ছিলেন কলিকাতা কড়েয়ার অধিবাসী। তিনি হযরত মুহম্মদের (সা) খাদিজার সঙ্গে বিবাহ অবধি লিখতে পেরেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আশরাফ আলীর উপর এই গ্রন্থ শেষ করবার ভার পড়ে। আশরাফ আলীর বাড়ি ছিল ফরিদপুর জেলায়। হযরত মুহম্মদের (সা) বিবাহ থেকে হযরত আলীর কাহিনী পর্যন্ত লিখে ১২৬৭ সালের ১৮ই মাঘ তারিখে তিনি এই গ্রন্থ শেষ করেন। এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৬৮ সালে। প্রকাশক ছিলেন কাজী সফিউদ্দিন।

www.pathagar.com

এই গ্রন্থের অনুসরণে পরে আরও একখানি "ছহি বড় কাছাছল আম্বিয়া" রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়। ঢাকা জেলার গড়পাড়া গ্রামের মুন্সি তাজুদ্দিন ও মুন্সি মোহাম্মদ খাতের এই কিতাবের লেখক। কলিকাতা সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরী থেকে আফাজদ্দিন আহামদ কর্তৃক এই কিতাব প্রকাশিত হয়। ১৩১৭ সালের একটি সংস্করণ আমার কাছে আছে। তার ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা দিচ্ছি শুনুন।

"কেতাবেতে লিখিয়াছে শুন দিয়া মন।
মহাম্মদ মুস্তাফাকে হালিমা যখন
হাওলা করিয়া দিল মতলেবের তরে
বিদায় হইয়া গেল আপনার ঘরে।
হযরতের তরে তখন আমেনা লইয়া
আপনার ভায়ের ঘরে রহিলেন গিয়া।

এরপর এলো সুধাকরের যুগ। এযুগে পণ্ডিত রেয়াজুদ্দিন, শেখ রেয়াজুদ্দিন আহমদ, মুন্সী শেখ আবদুর রহিম প্রমুখ সাহিত্যিকগণ বাংলা সাহিত্যে বলিষ্ট ইসলামী ভাবধারা প্রবর্তিত করতে চেষ্টা করেন। রেয়াজুদ্দিন আহমদ সাহেব 'হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবন চরিত্র' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি যা লিখেছিলেন তাতে তৎকালীন মুসলিম সাহিত্যের অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক অবগত হওয়া যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপক জনাব আবদুল হাই প্রণীত "বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত" থেকে এই ভূমিকার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করছি ঃ

"আঁ হযরত (ছাঃ)-এর ছওয়ালে ওমরি (জীবন চরিত্র) আরবী, পারশী ও উর্দু ভাষায় অনেক আছে, কিন্তু প্রায় সাড়ে তিনকোটি বঙ্গীয় মুসলমানের মধ্যে ৫০ বৎসর পূর্বেও তাঁহার পবিত্র জীবনী কোন মুসলমান লেখক লেখেন নাই। সর্বপ্রথম কোরআনের অনুবাদকে নববিধানী ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের ভক্তশিষ্য বাবু গিরিশচন্দ্র সেন আঁ হযরত (ছাঃ)-এর একখানি জীবন চরিত বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করেন। উহাতে তাঁহার ব্রাহ্ম ধর্মবিশ্বাসের ছায়াপাত ছিল। পরে ১২৯১ কিংবা ৯২ সালে (প্রকৃতপক্ষে ১২৯৪ সাল অর্থাৎ ১৮৮৭ খ্রীঃ কলিকাতাস্থ ডালটন এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজদ্বয়ের সুযোগ্য আরব্য ও পারশ্যাধ্যাপক উৎসাহের জ্বলন্ত মূর্তি স্বজাতিগতপ্রাণ আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু মহানুভব মৌঃ মেয়রাজ উদ্দিন আহমদ মরহুম মনসুরের সাহায্যে 'মিহির ও সুধাকর' এবং মোসলেম হিতৈষী সম্পাদক ভ্রাতৃদ্বয় মুন্সী শেখ আঃ রহিম সাহেব আঁ হযরতের একখানি জীবন চরিত লিখিয়া মুদ্রিত করেন। পূর্বোক্ত মৌঃ সাহেব মরহুম আরবী এবং পারশী ভাষায় প্রামাণ্য ইতিহাস সমূহ হইতে ইহার মালমসলা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। কাজেই পুস্তকখানি উহাদের এবং মুসলমানদিগের পাঠের বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল।"

১৯২৬ খ্রীঃ এর ৬ষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ এই তার শেষ সংস্করণ।

www.pathagar.com

এরপর আমরা দেখতে পাই ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী রামপ্রাণ গুপ্তের "হযরত মোহাম্মদ", সঞ্জীবনী সম্পাদক বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্রের "মহম্মদ রচিত" এবং আবু হোসেনের "হযরত মোহাম্মদের জীবনী।" এই যুগে মধুমিয়াও "শান্তিবার্ত্তা" নামক রাসূলুল্লাহ্‌র একখানি জীবনী লিখে যশস্বী হন।

এর কিছুকাল পরে রংপুর নিবাসী খানবাহাদুর তসলিমউদ্দীন আহমদ 'সম্রাট পয়গম্বর' নাম দিয়ে সীরাত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয় কথা' নামে আরও একখানি বই তিনি লিখিছিলেন।

শেখ আবদুল জব্বার রচিত "হযরত মোহাম্মদ জীবনী" ও এই যুগের একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। পুস্তকখানি প্রথম কখন মুদ্রিত হয়, জানা যায়নি। তবে এর সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩২৩ সালে। ঢাকা আলবার্ট লাইব্রেরী ছিল এর প্রকাশক।

আধুনিক যুগের নূতন আলোকে বিজ্ঞানসম্মত সর্বপ্রথম সাধু ভাষায় যিনি রাসূলুল্লাহ্‌র বিস্তৃত জীবন চরিত লেখেন, তিনি হচ্ছেন জনাব মওলানা মোঃ আকরম খাঁ। তাঁর "মোস্তফা-চরিত" এ যুগের একখানি উল্লেখযোগ্য বই। বহু ঐতিহাসিক তথ্য ও গবেষণায় গ্রন্থখানি ভরপুর। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। ইহাতে ৭৭৫ পৃষ্ঠা আছে। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, গ্রন্থখানির প্রথম তিন সংস্করণের পর আর কোনো সংস্করণ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

"মোস্তফা-চরিত" ছাড়া জনাব মওলানা সাহেব "মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য" শীর্ষক আরও একখানি পুস্তক লিখেছিলেন।

এই সময়ে মরহুম এয়াকুব আলী চৌধুরী "নূরনবী" নাম দিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌র একখানি শিশুপাঠ্য জীবনী লিখে যশস্বী হন। এমন সহজ সরল মিষ্টি ভাষায় ছোট ছোট ছেলেমেয়দের উপযোগী করে রাসূলুল্লাহ্‌র জীবনী ইতিপূর্বে আর কেউ লেখেন নি। পুস্তকখানি শিশু সাহিত্যের সত্যি এক উপাদেয় সম্পদ।

কাব্যে রাসূলুল্লাহ্‌র জীবনী লিখেছিলেন শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক। পুস্তকখানির নাম ছিল "হযরত মোহাম্মদ"। পরবর্তীকালে নজরুল ইসলামও "মরু ভাস্কর" নাম দিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌র জীবনী কাব্যে গ্রথিত করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।

এরপর "বিশ্বনবীর" নাম করা যায়। ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। "বিশ্বনবী" কেন লিখলাম, কোন্ প্রেরণা আমাকে রাসূলুল্লাহ্‌র জীবনী লিখতে উদ্বুদ্ধ করলো, তা "বিশ্বনবী"-তেই প্রকট হয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ্‌র জীবনের বহু সৌন্দর্য ও চরিত্র-মাধুর্য মামুলি তত্ত্বকথার চাপে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। নূতন যুগের নূতন আলোকে সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ্‌র জীবন ও ধর্মাদর্শ কেমন দেখায়, যুগমনের জিজ্ঞাসা ও সংশয়ের কতোটুকু তিনি জবাব দিতে পারেন, বর্তমান জগতে তাঁর শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থার কোনো কার্যকরী আবেদন আছে কিনা এবং ভবিষ্যতের জন্যই বা সে কি পথ নির্দেশ করছে– এ সব সমস্যার উপর আলোকপাত করাই ছিল আমার প্রধান উদ্দেশ্য। অতি আধুনিক বিজ্ঞান এবং দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকেও তাঁর শিক্ষা ও

www.pathagar.com

জীবনাদর্শকে বিচার করা হয়েছে। সেখানেও তাঁকে দেখতে পেয়েছি আমরা অত্যুজ্জ্বল মহিমার বেশে। এক সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে যে "বিশ্বনবী" লেখা হয়েছে, সে কথা "বিশ্বনবীর" পাঠক নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন।

"বিশ্বনবী" লিখতে আমার প্রায় তিন বৎসর সময় লেগেছিল। আমি তখন হুগলী কলেজিয়েট স্কুলের হেড্ মাস্টার। মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গাতীর সংলগ্ন "ভূদেব ভবনে" তখন কলেজিয়েট স্কুল স্থানান্তরিত হয়। নীচের তলায় স্কুল চলতো। আমি বাসা নিয়েছিলাম উপর তলায়। ছাদ থেকে গঙ্গার অপরূপ শোভা আমার চোখে স্বপ্ন সৃষ্টি করতো। এখানে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। সেটা হলো–

আমি যখন এই স্কুলে যোগদান করলাম তখন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ভূদেব ভবনের সীমানার মধ্যেই গঙ্গাতীরের একদম সংলগ্ন সবুজ তৃণভূমির উপরে একটি সুন্দর মাটির বেদী দেখিয়ে আমাকে বললেন ঃ এইখানে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওপার থেকে প্রায়ই বিকেলে এসে বসতেন এবং ভূদেব বাবু ও অন্যান্য সাহিত্যিক বন্ধুদিগকে তাঁর "কপাল কুণ্ডলা" উপন্যাস পড়ে শুনাতেন। আশ্চর্যের বিষয় ঠিক সেই স্থানেরই মাথার উপরে বসে আমি "বিশ্বনবী" লিখতে শুরু করেছিলাম।

"বিশ্বনবী" সম-সময়ে রাসূলুল্লাহ্‌র আরও কয়েকখানি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তন্মধ্যে মোঃ ওয়াজেদ আলীর 'মরু ভাস্কর' মৌলানা আবদুল খালেক এম-এ, সাহেবের "সাইয়েদুল মুরছালীন", মৌলানা ফজলুল করিমের "আদর্শ মানব" এবং খানবাহাদুর আবদুর রহমান খানের "শেষ নবী" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত ছোট ছোট আরও কয়েককানি হযরত-জীবনী বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে। তোরাব আলী সাহেবের "ছোটদের মোস্তফা" এবং খান মঈনউদ্দীনের "আমাদের নবী" তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

রেডিও পাকিস্তানের সৌজন্যে, ১৯৫৯

পাক বাংলা ভাষা

পাক-বাংলা ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আজ আমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে।

পাক-বাংলার স্বরূপ কী হবে? তার সাহিত্যের ভাষাই বা কিরূপ হবে?

প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নের ভিতরেই রয়েছে। এক কথায় বলা যায় ঃ পাক-বাংলা সাহিত্যের ভাষা পাক-বাংলা হবে। বাংলাদেশ যখন বিভক্ত হয়েছে তখন বুঝতে হবে এর ভাষাও বিভক্ত হয়েছে। পাক-বাংলা বললেই তাই আর প্রাক্-পাকিস্তান যুগের মিলিত বঙ্গের সংস্কৃত-বাংলা বুঝাবে না। যে কারণে আমাদের রাষ্ট্রীয় সংস্থা স্বতন্ত্র হয়েছে, ঠিক সেই কারণে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যকেও হতে হয়েছে খানিকটা স্বতন্ত্র। কাজেই এই রূঢ় বাস্তবতাকে অস্বীকার করে বা এড়িয়ে গিয়ে কোনো লাভ নেই। একে মেনে নিয়েই নূতন পথে আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে। একান্তবর্তী পরিবার যখন জুদা হয়ে যায়, তখন সব সময়েই যে খুব একটা অমঙ্গলই ঘটে, তা কে বললো? পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র্য অনেক ক্ষেত্রেই নব নব সৃষ্টি ও সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়। মানুষের প্রগতিশীল মন চলা-পথে সব সময় চলতে চায় না। তার মনে আছে সৃষ্টির উল্লাস, রক্তে আছে দুঃসাহসিকতার

www.pathagar.com

উন্মাদনা। হয়তো নূতন পরিবেশে নিজের পায়ে দাঁড়াতে গিয়ে প্রথম প্রথম সে কিছুটা অসুবিধা বোধ করে; কিন্তু এ বাধা তার কেটে যায়, নব সৃষ্টির কৌতূহল অল্প দিনের মধ্যেই তাকে স্বাবলম্বী করে তোলে। ব্যক্তির জীবনে যা সত্য, জাতির জীবনেও তা একই রকম সত্য। কাজেই, আমরা যখন পৃথক বা স্বতন্ত্র হয়েছিই, তখন পেছনের দিকে আর আমরা তাকাবো না; সামনের দিকে অগ্রসর হবো–নূতন সৃষ্টি ও পুনর্গঠনের দিকে মন দেবো। এইখানেই স্বাতন্ত্র্যের কল্যাণ-রূপ। আমাদের নিজস্ব জমিনের উপরে নূতন ইমারত ও নূতন বাগ-বাগিচা তৈরি করে আমাদের দৈন্যকে যদি ঢেকে দিতেই না পারলাম, তবে আর –"লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান" বলে আস্ফালন করার কী মানে হলো? "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান" বললে তার সঙ্গে সঙ্গে "গড়কে লেঙ্গে পাকিস্তানকেও" মেনে নিতে হয়। লড়া শেষ হয়েছে–এখন এলো গড়ার পালা। এখন নেতিয়ে পড়লে চলবে কেন? জয় করার আগের দিনের চেয়ে পরের দিন কঠিন। নিরাশ হবার কিছু নেই। ইসলামের সনাতন পথ বেয়ে আমরা চলবো। আজকে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, এ কোনো নূতন সমস্যা নয়। ইসলাম যখনই যেখানে গিয়েছে, তখনই এই ভাষা-সমস্যার মোকাবেলা তাকে করতে হয়েছে। এলো সে পারস্যে। বিরাট বাইজানটিয়ান সভ্যতার হলো পতন। পারসীকেরা গ্রহণ করলো ইসলাম। কিন্তু তাদের ভাষার কি হলো?

অগ্নি-উপাসকদিগের পেহলবী ভাষা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল? না। আরবী ভাষার যাদুস্পর্শে সে পেল নূতন রূপ। ফলে ফারসী ভাষা হয়ে উঠলো ইসলামের দ্বিতীয় ভাষা। এই ভাষাতেই মরমী কবি মওলানা রুমী লিখলেন তাঁর অমর কাব্য "মসনবী" আর তা হয়ে উঠলো "ফারসী ভাষার কোরআন"।

গেল ইসলাম স্পেনে, সাতশো বছর ধরে উড়লো তার বিজয়-নিশান হিসপানির আকাশ-বাতাসে। স্পেনের সমস্ত ভাষা হয়ে গেল রূপান্তরিত এবং লেখা হতে লাগলো তা আরবী হরফে। সেই যে নূতন ভাষার সৃষ্টি হলো, তার নাম দেয়া হলো "আল জামিয়া"। ইসলাম এলো ভারতে। ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে তার হলো সংঘাত। ফলে এক অভিনব আন্তর্জাতিক ভাষার হলো উদ্ভব,–উর্দু ভাষা। ভাষা-জগতে এ এক অপূর্ব সৃষ্টি। একটা ভাষা থেকে আর একটা ভাষায় নামা ততো কঠিন নয়। ল্যাটিন থেকে ইংরাজীতে নামা যায়। সংস্কৃত থেকে হিন্দিতে নামা যায়। কিন্তু বহু ভাষাকে মিশিয়ে একটা নূতন ভাষা সৃষ্টি করা খুব বড় স্বাপ্নিক ও উদার দৃষ্টি-সম্পন্ন প্রতিভার প্রয়োজন। মুসলমানের স্বপ্ন ও ধ্যান-ধারণা আন্তর্জাতিক। তার দৃষ্টিভঙ্গি "Cosmopolitan." জাতীয়তাই তার বড় কথা নয়। জাতীয়তার সঙ্গে আন্তর্জাতীয়তাও তার লক্ষ্য। কাজেই তারাই সৃষ্টি করেত পারলো উর্দু ভাষা। আমার মনে হয়, মুসলিম ছাড়া কোনো অনুদার মন থেকে উর্দু ভাষার মতো সর্বজন ব্যবহার্য একটা গণতান্ত্রিক ভাষা উৎপাদিত হতে পারতো না। ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়ে উর্দু তাই এক নূতন সৃষ্টি আর এর কৃতিত্ব মুসলিমদের।

উর্দুর তাই বিশেষ কোনো আবাস ভূমি নেই। শুধু উর্দু কেন, দেশীয় অন্যান্য বহু ভাষাও ইসলামের সংস্পর্শে রূপান্তরিত হয়েছে। এ সবই সম্ভব হয়েছে আরবী জবানের সোনার ছোঁয়ায়। পশ্‌তু, সিন্ধি, পাঞ্জাবী–সব ভাষাকেই আরবী জবান তার নিজস্ব রূপ ও রং দিয়ে রাঙিয়ে দিয়েছে। সিলোনী মুসলমানেরা কথা বলে সিলোনী ভাষায়। কিন্তু সে ভাষা লেখে তারা আরবী হরফে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশেও বাংলা ভাষাকে আরবী ভাষা যে কি ভাবে কতোখানি প্রভাবান্বিত করেছে, তার আলোচনা বহুভাবে আমরা করেছি। বস্তুতঃ আরবীকে বাদ দিয়ে পাক-বাংলা ভাষার কল্পনা করা যায় না। শুধু উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে বাংলা ভাষা তার খাত বদল করেছে। এই খাত বদল যে বাংলা ভাষা-ভাষীদের পক্ষে কতো অকল্যাণকর হয়েছে। তা অনেকেই জানেন না। কিছুদিন আগে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা ভাষার খাত-বদল শীর্ষক একটি মূল্যবান প্রবন্ধে বর্তমান পণ্ডিতী বাংলার তীব্র নিন্দা করেছেন এবং বলেছেন যে, সহজ-বোধ্যতা গুণে পূর্বে আরবী-ফারসী মিশ্রিত জবানই ছিল বলিষ্ঠ ও স্বাভাবিক। বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ গ্রীয়ারসন সাহেবও এই কথাই বলে গেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"Literary Bengali as now known, is the product of the present (i. e. 19th) century. It's direct cultivators were Calcutta pandits, who, however well meaning have ruined this language by their learning."

নিতান্ত দুঃখের বিষয়, পাকিস্তান হাসিল হবার পরও আমরা কিন্তু সেই পণ্ডিতী বাংলাকেই আমাদের সাহিত্য ও ধ্যান-ধারণার বাহন করেছি। ফলে পাকিস্তানের মূল লক্ষ্য ও আদর্শের সঙ্গে আমাদের অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। এই বিড়ম্বনা থেকে আমাদের মুক্তি পেতেই হবে। এ আমাদের হীনমন্যতার পরিচয়। পাঠান ও মোগল আমলে বাংলাদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ থেকেও আমরা superiority complex নিয়েই বাংলা ভাষার সেবা করেছি। ইসলামী ভাংষা ভাষা তার নিজস্ব পথ কেটেই চলেছিল। যে কোনো পুঁথির ভাষা দেখলেই তা বুঝা যাবে। এমন কি বাংলা ভাষাকে মুসলমানেরা আরবী হরফে লেখাও শুরু করেছিল। এখন পর্যন্ত আরবী হরফে বাংলা পুঁথি বিদ্যমান এই সব প্রচেষ্টার মধ্যে দেখতে পাই আমাদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। নিজস্ব সুরটি বজায় রেখে আমরা নূতন পরিবেশের মধ্যে অনুপ্রবেশ করি এবং সেখানে নিজের আসন রচনা করি।

নিতান্ত দুঃখের বিষয় পূর্ব পাকিস্তানে আজ আমরা সেই বিশিষ্ট সুরটি যেন হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের লেখা ও কর্মশক্তি আজ বিক্ষিপ্ত। আমরা আজ আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী, নূতন পথে চলতে কুণ্ঠিত। চলা পথে চলাই আমাদের যেন কাম্য। এই অহেতুক ভয়-ভাবনাকে আমাদের অতিক্রম করতে হবে। আমাদের কঠিন পরিচয় ও বলিষ্ঠ আত্ম-প্রতিষ্ঠার শপথ গ্রহণ করতে হবে।

ভাষা হলো ভাবের বাহন। ভাব যদি ইসলামী হয়, তবে সে তার যোগ্য বাহন আপনা-আপনি খুঁজে নেবে। কাজেই আমাদের ভাষাকে পাক-বাংলা করে গড়ে তুলতে হলে আগে আমাদের মন রাঙিয়ে নেওয়া চাই–পাকিস্তানের রঙে, রূপে ও রসে। তাহলে তখন ভাষার বা প্রকাশভঙ্গির জন্য আমাদের আর ভাবতে হবে না। অবশ্য উলটোদিকেও কিছুটা সত্য আছে। ইসলামী ভাষা ব্যবহার করলে তবেই জাগবে ইসলামী ভাব বা ধ্যান-ধারণা। জোর করে কোনোটাই আনা সম্ভব হবে না। আত্মস্থ হতে কিছু সময় আমাদের লাগবে। নূতন কিছু শিক্ষা করা ততো কঠিন নয়। কিন্তু শেখা বিষয় ভুলে যাওয়া কঠিন।

www.pathagar.com

পাক বাংলা-সাহিত্য ভাষার পরিবর্তন আনতে হলে তাই আমাদের কুরআন শরীফের সঙ্গে পরিচয়ের দরকার হবে। ইসলামের বহু বিচিত্র রূপই হবে আমাদের প্রেরণার উৎস-মুখ।

বিভিন্ন স্রোতধারা এসে এই মিলন সাগরে পরস্পর মিলবে-তাহলেই বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা ঐক্য খুঁজে পাবো। এই কারণেই আরবী ভাষাকে পাকিস্তান রিপাবলিকের একটি অবশ্য পাঠ্য ভাষা-রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এটা খুব শুভলক্ষণ বলেই আমি মনে করি। এই ভাষার মাধ্যমেই বাংলা, উর্দু, সিন্ধী, পাঞ্জাবী পরস্পর এসে হাতে হাত মিলাবে।

আপনারা তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে, বাংলা ভাষাকে পাক-বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করতে হলে আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষার সংযোগ অপরিহার্য হয়ে উঠবে। বাংলা ভাষায় যে পরিমাণে আমরা আমাদের জাতীয় ভাব-ভাষার আমদানী করতে পারবো সেই পরিমাণেই আমাদের বাংলা ভাষা সমাজে নিজস্ব হবে। এটা কোনো অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত উক্তি নয়। দৈনন্দিন জীবনে বাংলার মুসলমান যে ভাষায় তার ধর্মকর্ম করে, হাসে, কাঁদে, কথা কয়, স্বপ্ন দেখে, জন্ম থেকে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যে ভাষা তার অন্তরে ছেয়ে থাকে, তার সাহিত্যের ভাষাও হবে ঠিক সেই ভাষা। বাড়াবাড়ি কিছুই নেই এতে। স্বাভাবিক ভাবেই এ কথা সত্য। ভাষা তো ভাবেরই বাহন।

বাংলা ভাষার আপন কল্যাণেই আমরা চাইছি আরবীর সঙ্গে এর সংযোগ, সংস্কৃতের সঙ্গে নয়। সংস্কৃত এখন একটা মৃত ভাষা (dead language)। এর আবেদন অত্যন্ত স্তিমিত। কাজেই মৃতের সঙ্গে যার নিবিড় যোগ থাকবে সেও মরবে। যে ভাষা চির-জীবন্ত এবং বৃহত্তর মানব গোষ্ঠির সঙ্গে যে জড়িয়ে আছে, তার সঙ্গে আমরা মিতালি করবো। আরবী একটা জীবন্ত ভাষা। সমগ্র মুসলিম জাহানের প্রাণের ভাষা আরবী। কাজেই এর সঙ্গে সংযোগ আমাদের জাতীয় জীবনে অপরিহার্য। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক Hitti কি সুন্দরই না বলেছেন ঃ

"The Babylonians, the Chaldaeans, the Hittites, the Phoenicians were, but are no more. The Arabs and the Arabic-speaking people were and remain."

অর্থাৎ ঃ ব্যাবিলোনিয়ান, চাল্‌ডীয়ান, হিটিইটিজ, ফিনিসিয়ান্ প্রভৃতি জাতিরা আগে ছিল, কিন্তু এখন আর নাই। আরবেরা এবং আরবী ভাষাভাষী জাতিরা আগেও ছিল, এখনও আছে।

কাজেই, আরবীর সঙ্গে পাক-বাংলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের প্রয়োজন আছে।

সংস্কৃত-ঘেষা বাংলার কাঠিন্য ও কর্কশরূপ একমাত্র আরবী-ফারসী শব্দ ও প্রকাশভঙ্গি দ্বারাই মোলায়েম ও মধুর হতে পারে। পুঁথির ভাষা দেখলেই তা বুঝা যাবে।

দৃষ্টান্ত দেখুন ঃ-

"এলাহি আলামিন আল্লা
রাজ্জাক সবার।
মানুষ করিল পয়দা
অনেক প্রকার ॥

www.pathagar.com

কেহ রাজা কেহ প্রজা
কেহ নেঘাবান।
কেহ তাঁবেদার কেহ
গায়ের প্রধান ॥
কেহ কানাখোঁড়া হয়ে
পড়ে থাকে ঘরে।
কেহ সালামতে, ফেরে
দেশ-দেশান্তরে ॥"

—(সহি কাছাছোল আম্বিয়া)

"আরব লস্কর পরে
কমজাত কুপর জোরে
এইরূপে করে বালা জারি
আমির মক্কায় থাকে,
শুইয়া স্বপন দেখে
কুফর করেছে দানাদারি ॥

—(আমির হামজা)

"হাতেম কহিল বিবি
শুন মেরা বাত।
জিন্দেগী থাকিলে ফের
হবে মোলাকাত ॥"

—(হাতেম তাঈ)

"বেটির জবানী শুনিল যখন।
দেলেতে এতবার তার হইল তখন ॥
দেল হৈতে পেরেশানি ঘুচে গেল তার।
কহে এবে বসে থাক ঘরে আপনার ॥"

—লায়লী মজনু)

"জৈগুণ আরজ করে হানিফার পায়।
আমার আরজ রাখ চল মদিনায়।।
আরাম হইলে তুমি আসিবে ফিরিয়া।
দুশমন করিব জের তলোয়ার মারিয়া ॥"

—(জৈগুণের পুঁথি)

এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, সব কবির ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিই এক। ঠিক এই ভঙ্গি বজায় রেখে আধুনিক যুগে নজরুল ইসলাম লিখলেন ঃ

"নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া।
আম্মা, লাল তেরা খুন কিয়া খুনিয়া ॥"

—(মুহর্‌রম্‌)

www.pathagar.com

এখানে আঙ্গিক পৃথক হলেও উভয় ভাষার আকৃতি, প্রকৃতি এবং উৎস-মূল যে এক, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। আধুনিক যুগেও আরবী-ফারসী শব্দ দিয়ে আমরা যে বাংলা ভাষাকে সুন্দরতর ও বলিষ্ঠতর রূপ দান করতে পারি, নজরুল ইসলাম তা দেখিয়েছেন।

পাক-বাংলা ভাষাকে গঠন করতে হলে ভাগীরথী তীরের বাক্রীতিকে হুবহু নকল করলেও চলবে না। পদ্মা, মেঘনা, কর্ণফুলীর তীরের দিকেও তাকাতে হবে। চাঁটগা, ঢাকা, রংপুর, যশোর ইত্যাদি স্থানে বাংলা ভাষার যে কথ্য রূপ আছে, তাকেও আমাদের সাহিত্যের অঙ্গিভূত করতে হবে। উপন্যাসের কথোপকথনে এসব ভাষা অনায়াসে ব্যবহার করা যায়। আর তাতে আর্টিস্টিক সৌন্দর্য আরও বাড়ে। ঢাকার তথাকথিত কুট্টি ভাষাতে এত রসমাধুর্য আছে যে, তা দিয়ে অনায়াসে আমরা সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারি। এমনি করেই পাক-বাংলা সাহিত্যকে আমাদের গড়ে তুলতে হবে।

এখানে কথা উঠতে পারে ঃ মুখে যা বলি, কাজে তা করি কই? ইসলামী বাংলা ভাষার কথা খুব প্রচার করি, কিন্তু লিখি তো সেই সংস্কৃত মার্কা বাংলা।

কথাটা ঠিকই। আমরা সবাই এখনো পশ্চিমবঙ্গের অনুকরণে লিখি। কিন্তু এতে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। পূর্বেই বলেছি, যা আমরা শিখেছি, তা ভুলে যাওয়া সহজ নয়। ভাষার রূপান্তরে তাই কিছুটা সময় আমাদের লাগবে। তাই বলে আমরা যে এখন থেকেই আমাদের আদর্শের কথা বলবো না, তার কোনো মানে নেই। আঁধারের মাধ্যমেই আমাদের আলোর পয়গাম শুনাতে হবে।

অনেকে অনুরূপ যুক্তি দিয়ে বলেন ঃ ইসলামের নামগন্ধও নেই, অথচ পাকিস্তানকে "ইসলামিক রিপাবলিক" বলে আমরা আস্ফালন করি। এ যুক্তিও ভুল। পাকিস্তানে এখানো ইসলামী জীবন-পদ্ধতি পুরাপুরিভাবে অনুসৃত হয়নি; তবু একে ইসলামী রাষ্ট্র বলতে বাধা নাই। একটা সুনির্দিষ্ট জাতীয় লক্ষ্যের পানে যখন আমরা এগিয়ে চলেছি, তখন, এখন থেকেই আমরা পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র বলতে পারি। ছেলেমেয়েদের নামকরণও একই পদ্ধতিতে হয়। আবদুর রহমান. খাদিজা খাতুন ইত্যাদি নাম এই আশাতেই রাখা হয় যে, কালে কালে তারা আল্লাহর দাস হবে বা খাদিজার মত মহীয়সী নারী হবে। সংগঠন ও সাধনার মুখে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য বা আদর্শের পরিচয় দেওয়া যায়। এটা একটা পদ্ধতির (Process) প্রশ্ন। কাজেই পদ্ধতির মধ্যেও সেই প্রতিষ্ঠানকে তার ঈপ্সিত নামে ডাকা যায়। একজন চিন্তাশীল ইউরোপীয় লেখক পাকিস্তানের "ইসলামিক রিপাবলিক" নামকরণ সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলেছেন ঃ

"To declare Pakistan an Islamic Republic was to proclaim an aspiration .... to set up an Islamic state, then, was the beginning and not the end of an adventure—' [Wilfred : Islam in Modern History.]

অর্থাৎ ঃ পাকিস্তানকে ইসলামিক রিপাবলিক ঘোষণা করার অর্থ হচ্ছে একটা আকাঙ্খাকে ঘোষণা করা–ইসলামী রাষ্ট্র রচনা তাই একটা দুঃসাহসিক উদ্যমের শেষ ফল নয়, তার প্রারম্ভ মাত্র।

ইসলামী বাংলা-ভাষাকেও এই আলোকে দেখতে হবে। এ ভাষা এখনো গড়ে ওঠেনি বটে, কিন্তু আমরা একে গড়ে তুলবো।

নাজাত

আজাদী সংখ্যা, ১৯৫৮

www.pathagar.com

বাংলা-সাহিত্যের রূপায়ণে ইসলামের প্রভাব

এ কথা এখন অস্বীকার করলে আর চলবে না যে, বাংলাদেশ বিভক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেও দ্বিধা-বিভক্ত হয়েছে। পাক-বাংলা এবং হিন্দু বাংলায় এখন তাই আর পূর্বের ধারাবাহিকতা নেই। বাংলা-সাহিত্যের ভাব-ধারা এখন তাই স্বতন্ত্র পথ বেয়ে চলেছে। বস্তুতঃ পাকিস্তান শুধু ভৌগলিক সীমারেখারই ওলট-পালট নিয়ে আসেনি, সে এনেছে আমাদের তাহজিব-তমদ্দুনেও একটা স্বাতন্ত্র্য ও বিপ্লব। কায়েদে আযম বলে গেছেন ঃ পাকিস্তান এনে দিলাম আমি, এখন একে গড়ে নাও তোমরা। তামদ্দুনিক পাকিস্তান গড়বার ইঙ্গিতই তিনি সেদিন আমাদেরকে দিয়েছিলেন।

পাকিস্তানকে তাই শুধু বাহিরে পেলেই আমাদের চলবে না। পাকিস্তানকে পেতে হবে আমাদের মনে, আমাদের ধ্যানে, আমাদের জীবনে, আমাদের স্বপ্নে। সাহিত্যে ও কাব্যে যদি না পাকিস্তান ছন্দোময়ী ও রূপময়ী হয়ে আসে, তবে বৃথাই আমাদের পাকিস্তান লাভের এই আস্ফালন!

এ কথা এখন সকলেই মেনে নিয়েছেন যে, পাকিস্তান হবে একটি ইসলামী রাষ্ট্র। এর মানে এই না যে, পাকিস্তানে একটি ধর্মরাজ্য গড়ে উঠবে। ইসলামের যে সব সনাতন আদর্শ ও মানবিক মূল্য আছে, তাকে ভিত্তি করেই পাক-রাষ্ট্র রচিত হবে।

তা যদি হয়, তবে আমাদের সাহিত্যকেও সেই পথে চলতে হবে। রাষ্ট্র ও তার সাহিত্য একমুখীন হওয়া দরকার। কাজেই রাষ্ট্র যদি ইসলামী হয়, তবে তার সাহিত্যও হবে মূলতঃ ইসলামী। এ কথার মানে অবশ্য এ নয় যে, যা কিছু লেখা হবে, সবই ইসলামী ছাঁচে ঢালাই হয়ে যাবে। ইসলামের অর্থ এত সংকীর্ণ নয়। ইসলামের একটা সহজ প্রবেশ গুণ আছে। সব কিছুর সঙ্গেই সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে জানে। সাহিত্য ইসলামী হলেও তাই বিশ্বজনীন হতে বাধ্য; কারণ ইসলামও বিশ্বজনীন। লক্ষ্য ও আদর্শ ঠিক রেখে আকাশচারী কবি-মন নিঃসীম নভোনীলিমার সর্বত্র ঘুরে আসতে পারে। সাহিত্য হবে সর্বজনীন; তাতে থাকবে সত্য, সুন্দরের ও মঙ্গলের প্রকাশ; এর সঙ্গে ইসলামের বিরোধ কোথায়? পাক-সাহিত্যের রূপায়নে ইসলাম তাই একটা বিশিষ্ট বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করবে।

দেশ জয়ের পর যেমন তার ধন-রত্নাদি বিজেতার হাতে আসে, পাকিস্তান লাভের পরে তেমনি এখানকার সাহিত্য ও শিল্প-ভাণ্ডার আমাদের হাতে এসেছে। এদের ভিতর থেকে যে যে সম্পদ আমাদের কাজে লাগবে বা উপভোগ্য হবে, তা অনায়াসেই আমরা গ্রহণ করবো। যা নিতে পারবো না তা বর্জন করবো। প্রাক-পাকিস্তান যুগের বাংলা-সাহিত্যে মুসলমানদের গৌরব করবার খুব বেশী কিছু ছিল না। গায়ের ইসলামী আদর্শেই সে সাহিত্য ছিল ভরপুর। আমাদের তাই সতর্কতার সঙ্গে সাহিত্যের মাল-মশলা বাছাই করতে হবে।

একটা কথা এখানে বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে। আমি বহুবার বলেছি ঃ পাকিস্তান তথা আযাদী লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বহু বিষয়েই মূল্য-জ্ঞান (sense of

www.pathagar.com

value) পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আগে যাকে খুব মূল্যবান বা লোভনীয় বলে মনে করতাম, এখন আর তা করিনে। কোলকাতা আগে ছিল আমাদের অনেকেরই আকর্ষণের বস্তু, এখন তা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভয়ের বস্তু। আবার যা ছিল এতদিন তুচ্ছ ও অবজ্ঞাত, তা-ই এখন নূতন মূল্য পাচ্ছে। সাহিত্য ও কাব্য সম্বন্ধেও তাই। আগেকার আদর্শ দিয়ে আজ আর পাকিস্তানের সাহিত্য বা কাব্যের মূল্যমান নির্ধারিত হবে না। অনেক জিনিসেরই এখন ডি-ভ্যালুয়েশান হয়ে যাবে। আবার অনেক জিনিসের রি-ভ্যালুয়েশানও হবে।

মুসলমানদের বাংলা সাহিত্য-সাধনা বিড়ম্বিত হয়েছে কয়েকটি কারণে। যে সাহিত্য এতদিন আমরা সৃষ্টি করেছি, ইসলামের মর্মবাণীর সঙ্গে তার নিবিড় যোগ ছিল না। ইসলামের প্রাণ-রসে নিষিক্ত হয়ে তা ফুটে বেরোয়নি। এইজন্য তা আমাদের জীবনে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। প্রাচীন পুঁথি সাহিত্যে অথবা অতি আধুনিক মুসলিম সাহিত্যেও সত্যিকার ইসলামী সুর ও রূপ কমই আছে। সাদী, হাফিজ, রুমী, ওমর খৈয়াম এঁরা তো এত দিনেও প্রাচীন হলেন না; তাজা-বতাজার গান এখনো সেখানে শোনা যায়; আমাদের মাত্র সেদিনের সাহিত্য, 'প্রাচীন' আখ্যা পেয়ে বস্‌লো। এতেই বুঝা যায়, আমাদের অতীতের সাহিত্যে সেই কালজয়ী চিরন্তনের ছাপ পড়েনি; তাই আমাদের জীবন থেকে সে সাহিত্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পশ্চাতে পড়ে আছে।

পাকিস্তানের পরিবর্তিত মনোভঙ্গিমায় ও নূতন পরিপ্রেক্ষিতে তাই আজ আমাদের একটা সাহিত্যিক বাছাই (purging)-এর দরকার হয়েছে।

একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি। আমাদের একদল কবি-সাহিত্যিক এখনো কিন্তু মনে করছেন যে, পাকিস্তান এসেছে, তাতে কি হয়েছে। কাব্য ও সাহিত্যে আমরা আগের ভাবধারা ও আদর্শেরই অনুসরণ করবো। পাকিস্তানকে তারা ভুল বুঝেছেন। আযাদীর আহ্বান তাদের কাছে বৃথাই এসেছে।

পূর্ব-পাক সাহিত্যের রূপায়ণে তাহলে ইসলাম যে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করবে, একথা এখন সহজেই অনুমান করা যায়। মাতৃভাষার কাজই হলো জাতির আদর্শ, ধ্যান-ধারণা ও ঐতিহ্যকে রূপ দেওয়া। বাংলার হিন্দুরা সে কাজ করেছেন। কিন্তু মুসলমানেরা তা করেন নি। তাই এই দুর্ভোগ। এখন সেইদিন এলো। জোর জবরদস্তির কোনো কথা নয়। সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের সাহিত্যে থাকবে এখন মুসলিম সংস্কৃতির ছাপ। শতকরা ৮০ জন লোক যে ভাবে কথা বলে, যেভাবে চলে, যেভাবে চিন্তা করে, তাদের সাহিত্যেও থাকবে তারই প্রতিধ্বনি। কাজেই বাংলা-সাহিত্যের ভাব, ভাষা, টেকনিক ও আদর্শ সবই এখন নূতন হতে বাধ্য। এই গণজাগণের যুগে আগের সেই অভিজাত বা বুর্জোয়া সাহিত্য আর চলবে না। মিলিত বঙ্গে ছিল কোলকাতা বা কৃষ্ণনগরের ভাষা ও, প্রকাশভঙ্গি আমাদের আদর্শ। অভিজাত সম্প্রদায় পূর্ববঙ্গের ভাষা ও আঙ্গিককে এতদিন করে রেখেছিলেন অপাংক্তেয় ও অস্পৃশ্য। পাকিস্তানের সীমানা থেকে কোলকাতা ও কৃষ্ণনগর বাদ পড়েছে। এখন তারা হিন্দুস্তানের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তাদের আদর্শ কি করে আমরা আর মেনে চলতে পারি। সাহিত্যের কৌলিণ্য যুগের তাই অবসান ঘটেছে, এ কথা বলা যায়।

www.pathagar.com

আজকের দিনে সাহিত্যে তাই আর শুধু অভিজাত সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকার থাকবে না; জনসাধারণেরও তাতে হিস্‌সা থাকবে। টলস্টয় এ সম্বন্ধে একটি বড় সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "সাধারণ শ্রমিকেরা যা উৎপন্ন করে, কবি সাহিত্যিকেরা তা যখন অনায়াসে ভোগ করে, তখন কবি-সাহিত্যিকদেরও তো উচিৎ কিছু কিছু এমন সাহিত্য রচনা করা– যা সর্বসাধারণও উপভোগ করতে পারে।" কাজেই এখন যে সাহিত্য রচিত হবে, তাতে দেশের অধিক সংখ্যক লোকের মনের খোরাক থাকবেই; তাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ ও দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি নিয়েই তা রচিত হবে। আর তা হতে গেলেই সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা, ইসলামী ঐতিহ্য, ইসলামী প্রকাশভঙ্গি, ইসলামী রূপ ও রস থাকবেই। অবশ্য এ কথা সত্য যে, জনসাধারণের ভাষা সাহিত্যে আনতে গেলেই তাকে রসোত্তীর্ণ হতে হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পূর্ব-পাক সাহিত্যে ইসলামী প্রভাব আসবেই। তার মানে হবে আমাদের জাতীয় আদর্শের বিরোধী ধ্যান-ধারণা এ-সাহিত্যে বর্জিত হবে। এই কারণে বাংলা সাহিত্যের অনেক অবদান পাকিস্তানে স্বীকৃতি লাভ নাও করতে পারে। তাতে অবশ্য তাদের সাহিত্য-মূল্য কমে যাবে না। পাকিস্তানের আদর্শের তাকিদেই এটা হবে। এটাকে তাই সাম্প্রদায়িকও বলা যাবে না। ধরুন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ঃ "হে মোর চিত্ত পূণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।" –এই কবিতাটি বাংলা কাব্য-কুঞ্জের একটি অনবদ্য কুসুম। কিন্তু এর কোনো আবেদন মুসলিমের কাছে থাকবে কি? শুধু ভারতের চতুঃসীমার মধ্যে তো মুসলানের মন সীমাবদ্ধ নয়! তার চোখে আছে এক-পৃথিবীর (one world)-এর স্বপ্ন! কাজেই এই বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে আছে।

শুধু হিন্দু সাহিত্যিক নয়, গত যুগের যে সমস্ত জাতীয়তাবাদী মুসলিম কবি-সাহিত্যিক বিজাতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্য থেকে প্রেরণা নিয়েছেন, পাক-সাহিত্যে তাদেরও স্থান পাওয়া কঠিন হবে। বিকৃত জাতীয়তাবাদ এখন আর চলবে না। মুসলিমের জাগ্রত জীবন-বোধ ঐ সব ভাব ও আদর্শের মধ্যে আর প্রেরণা খুঁজতে যাবে না।

একমাত্র ইসলামই আজকাল নূতন পৃথিবীকে প্রেরণা দিতে পারবে। গণতন্ত্র, নারী-স্বাধীনতা, সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্র, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, আন্তর্জাতীয়তা বা মানবতা–সব কিছুই ইসলামের দান। কাজেই বাংলা সাহিত্যের নব-জাগরণে ইসলামের আদর্শ হবে অপরিহার্য।

আমাদের হিন্দু ভাইদের এতে দমে যাওয়ার কিছুই কারণ নেই। ইসলামের সহনশীলতা ও পরমতসহিষ্ণুতার কল্যাণে পাক-সাহিত্যে তাদেরও স্থান হবে। তাদের পৌত্তলিক ভাব ও আদর্শ সম্বলিত লেখা ছাড়াও তাদের হাতে আমরা এমন অনেক কিছু আশা করি যা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে উপভোগ্য হবে। নূতন আঙ্গিকেও তারা অনেক কিছু সৃষ্টি করতে পারবেন। আর্টের জগতে কোনো শ্রেণী-ভেদ তো নেই।

পাকিস্তান আমাদের সামনে খুলে দিল এক নূতন সম্ভাবনার দুয়ার। নব সৃষ্টির ইঙ্গিতে তার আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন। কাজেই যাদের হাতে আছে জরিন্‌ কলম, চোখে আছে রঙ্গিন স্বপ্ন, প্রতিভাদীপ্ত সেই তরুণের দল এগিয়ে এসো।

রেডিও পাকিস্তানের সৌজন্যে, ১৯৫১

www.pathagar.com

নজরুল-কাব্যের অপর দিক

নজরুল ইসলাম এ যুগের একজন ক্ষণজন্মা প্রতিভা। বাংলা সাহিত্যে তাঁর দান অপরিসীম। বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গি দ্বারা, নব নব শব্দ-সম্পদ দ্বারা, মৌলিক চিন্তা ও ভাবধারা দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সত্যই তিনি সমৃদ্ধ করিয়াছেন। সঙ্গীতেও তাঁর দান অনন্যসাধারণ। বস্তুতঃ তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদের কোনোই প্রশ্ন নাই।

তবে কথা হইতেছে ঃ পাকিস্তানের পরিবর্তিত মনোভঙ্গিমায় ও নূতন পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কাব্য কতোখানি স্বীকৃতি পাইবে, তাহাই চিন্তার বিষয়। আমরা আজ পাকিস্তান লাভ করিয়াছি। আমাদের এখন লক্ষ্য নূতন, আদর্শ নূতন, পথ নূতন, মত নূতন, ভাষা নূতন। তামুদ্দুনিক পাকিস্তান রচনাই আমাদের এখন বড় স্বপ্ন। যে নূতন পথে আমরা আজ বাহির হইলাম, সে পথে নজরুল-কাব্য হইতে আমরা কতোখানি আলো ও প্রেরণা পাইতে পারিব, ইহাই আমাদের বিচার্য।

এই দৃষ্টিকোণ হইতেই আমরা আজ নজরুল-কাব্য পাঠ করিব। লা বাহুল্য, ইহা কবির সমগ্র কাব্য-পরিচয় নয়; একটা বিশেষ দিক মাত্র। নজরুলের অপরূপ কাব্য-সৌন্দর্যের বিচার আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে করিব।

নজরুলের কাব্য-পাঠের মূলসূত্র

পাকিস্তানের আলোকে নজরুল-কাব্য পাঠ করিতে হইলে কয়েকটি কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে ঃ

(১) ইসলামের একটি লৌহ-কাঠামো (steel frame) আছে; তাহাকে রদ-বদল করিবার সাধ্য কাহারও নাই। লা-শরীক্ এক আল্লাহ্‌কে মানা, তাঁর রাসূলকে মানা, সর্বপ্রকার পৌত্তলিকতা বর্জন করা, জন্মান্তরবাদ ও অবতারবাদ অস্বীকার করা–ইত্যাদি বিধি-নিষেধ দ্বারাই সে ফ্রেমটি গঠিত। নিঃসীম নভোনীলিমায় আকাশচারী কবিমন মুক্ত পাখা মেলিয়া সর্বত্র বিচরণ করিবার অধিকারী হইলেও এইখানে আসিয়া তাহার পাখাকে সংযত ও সংহত করিতেই হয়।

(২) কবিরা জাতির আশা-আকাঙ্খা ও ধ্যান-ধারণার প্রতীক। কবি-সাহিত্যিককে দেখিলেই গোটা জাতির চেহারা দেখা যায়। কবিরা তাই জাতির মানস-লোকের প্রতিনিধি। কবি নজরুল তাঁর কাব্যে বিশ্বস্ততার সহিত এই প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন কিনা, দেখিতে হইবে।

(৩) প্রতিভা মাত্রেই গ্রহণীয় বা বরণীয় হয় না। প্রতিভারও জাতিগত বা সম্প্রদায়গত রূপ আছে। বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যের একজন ক্ষণজন্মা প্রতিভা। কিন্তু মুসলমানেরা তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই; অথচ সেই বঙ্কিমই আবার হিন্দুদের কাছে পরম শ্রদ্ধার পাত্র। মুসলিম সমাজেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মওলানা আজাদ এ যুগের একজন অসাধারণ রাজনৈতিক প্রতিভা। কিন্তু যেহেতু তিনি মুসলিম জাতির আশা-আকাঙ্খার

www.pathagar.com

বিরোধী, এই কারণে তিনি আজ ধিকৃত। এমন কি গড়ের মাঠে ঈদের জামাতে ইমামতি পর্যন্ত তাঁহাকে করিতে দেওয়া হয় নাই। যে ফজলুল হকের কাছে সমগ্র মুসলিম-বাংলা ঋণী, তিনিই যখন মুসলিম লীগ ও কায়েদে আযমের বিরোধিত করিয়াছিলেন, তখন সমাজ তাঁহাকেও ক্ষমা করে নাই। রাজনীতিতে যাহা সত্য, কাব্য-সাহিত্যে তাহা আরও গভীরভাবে সত্য।

(৪) প্রত্যেক কবিকে বিচার করিতে হয় তাঁহার কাব্যের মূল প্রেরণা (inspiration) এবং আধ্যাত্মিকতা (spirituality) দেখিয়া। কবির সমগ্র কাব্যের মূল সুরটি কী, জাতির নিকট ও বিশ্বের নিকট তার বাণী (message) কী, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তিনি কোন্ গভীর রহস্যের সন্ধান দিলেন, তাঁর কাব্যে চিরন্তনের সুর কতোটুকু ধ্বনিত হইল, সত্য ও সুন্দরের অন্বেষা এবং অনির্বচনীয়ের ইঙ্গিত তাঁর কাব্যে কতোটুকু আছে–এইসব কথাই কাব্য-বিচারের বড় কথা–এইখানেই কবির সত্য পরিচয়। শুধু স্টাইল ও আড়ম্বরের মধ্যে কবি বাঁচেন না। জনৈক ইংরাজ সমালোচক তাই ঠিকই বলিয়াছেন ঃ– "Though style is an indispensable condition of success in poetry, it is by matter not by form that a poet has to take his final rank."

সত্যই তাই। বিশ্ব-কবিরা তাঁদের অন্তর্নিহিত ভাবধারার জন্যই বাঁচিয়া আছেন, বহিঃসৌষ্ঠবের জন্য নয়।

(৫) একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, বাংলাদেশ বিভক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাও দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে। পাকিস্তানের ওপারে-এপারে তাই কাব্য-সাহিত্যে এখন আর পূর্বের ধারাবাহিকতা নাই। দুই বঙ্গের বাংলা সাহিত্য এখন দুই ভিন্ন পথ ধরিয়া চলিবে। উভয় বঙ্গের পরিভাষার মধ্যেই এ সত্যের স্বাক্ষর আছে। পূর্বের অনেক আদর্শ ও ভাবধারাই তাই এখন অচল হইতে বাধ্য। ইহাতে কোনোই আশ্চর্যের কিছু নাই। পাকিস্তান লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বহু বিষয়ের মূল্য-জ্ঞান (sense of value) পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। পূর্বে কলিকাতা আমাদের নিকট যতোটা আকর্ষণের বস্তু ছিল, এখন আর তাহা নাই। আবার যাহা এতদিন অবজ্ঞাত ছিল, এখন তাহা নূতন মূল্য পাইতেছে। সাহিত্যেও একথা তুল্য রূপে সত্য। 'অখণ্ড-ভারতের' গান বা উভয় বঙ্গের মিলন-বাণী পাকিস্তানে এখন শুধু অশোভনই নয়, দস্তুরমত রাষ্ট্রদ্রোহিতাও।

(৬) সর্বপ্রকার পৌত্তলিক ভাব ও ধ্যান-ধারণা পাকিস্তানের সাহিত্যে আর আদর্শ হইবে না বা কোনো প্রেরণা দিবে না। হিন্দু কাল্চারের প্রতি কোনোরূপ অশ্রদ্ধা বা বিদ্বেষ বশতঃ একথা বলিতেছি না। আমাদের তামদ্দুনিক পাকিস্তান গঠনের তাকিদেই ইহা বলিতেছি। হিন্দু-কাল্চারের প্রতি আমরা কোনোরূপ আঘাত করিব না; আমরা শুধু চাই আমাদের নিজস্ব কাল্চার গড়িয়া তুলিতে। পাকিস্তানের মূল নীতি তো তাই। আমরা একটি স্বতন্ত্র জাতি এবং আমাদের তাহজিব-তমদ্দুন স্বতন্ত্র–এই ভিত্তি ভূমির উপরেই তো পাকিস্তান দাঁড়াইয়া আছে। কাজেই পাকিস্তানকে মানিলে ইহার পটভূমির দর্শন ও মূলমন্ত্রও স্বীকার করিতে হইবে, অন্যথায় পাকিস্তানের কোনোই অর্থ হয় না।

www.pathagar.com

এখানে আমাদের হিন্দু ভাইদিগকেও একটা কথা বলিয়া রাখি। পৌত্তলিকতা বর্জন অর্থে তাহারা যেন হিন্দু-বিদ্বেষ না বুঝেন। তাঁহাদের নিজেদের সাহিত্যে তাঁহারা দেবদেবীর মাহাত্ম্য বা বেদ-পুরাণের প্রসঙ্গ অনায়াসে বর্ণনা করিতে পারেন, তাহাতে আমরা কোনোই আপত্তি করিব না। আমরা চাই আমাদের জাতীয় সাহিত্যকে খাঁটি ইসলামী রূপে গড়িয়া তুলিতে। ইহাতে হিন্দু-সমাজের কোনোই আপত্তি থাকিবার কথা নয়। আমরা নিজের ঘর গড়িতে চাই, অপরের ঘর ভাঙ্গিতে চাই না। আমরা প্রয়োজন বোধে হিন্দুর শাস্ত্র পড়িব, তার কৃষ্টিকে শ্রদ্ধা করিব, কিন্তু যে সব আদর্শ ও ভাবধারা আমাদের জাতীয় জীবনের বিরোধী, তাহা আমরা গ্রহণ করিব না। এই সহজ কথাটা মানিয়া লইলেই উভয়ের মধ্যে আর কোনো মনোমালিন্য থাকে না।

পৌত্তলিকতা বর্জন আজকের কথা নয়; ইসলামী কৃষ্টির ধারাই এই। আরবেরা গ্রীক, রোমান ও ভারতীয় সভ্যতা হইতে অনেক কিছুই অনুবাদ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের পুরাণকে (mythology) তাহারা অনুবাদ করে নাই। এ সম্বন্ধে Draper তাঁহার "History of the Intellectual Development of Europe" নামক গ্রন্থে বলিতেছেন ঃ

"The Arabs never translated into their tongue the great Greek poets, though they so sedulously collected and translated the Greek philosophers. Their religious sentiments caused them to abominate lewdness of our classical mythology."

এই কথাগুলি মনে রাখিয়াই নজরুল-কাব্য পাঠ করিতে হইবে।

নজরুল-কাব্যে পৌত্তলিকতা

নজরুল কাব্যের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্যই হইল তার পৌত্তলিক ভাবধারা ও পৌত্তলিক প্রকাশ-ভঙ্গি। রামায়ণ-মহাভারত ও বেদ-পুরাণের allusion ও reference-এ নজরুল-কাব্য কণ্টকিত। কবির পরাজয়ের মনোভাব (defeatist mentality) এইখানে সুস্পষ্ট। গত যুগের আর দশজন মুসলমান কবি-সাহিত্যিকও যাহা করিয়াছেন, অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হইয়া নজরুলও ঠিক তাহাই করিয়াছেন, হিন্দুদের নিকট মুসলমানি গন্ধ যাহাতে প্রকাশ না পায়, এই জন্যই তাঁর এই আত্ম-বিস্মৃতি! এমন ভাবেই তিনি হিন্দু-ভাবধারার অনুসরণ করিয়াছেন যে, হিন্দু কবি-সাহিত্যিকদিগকেও হার মানাইয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্র হইতে অত allusion কোনো হিন্দু-কবি, সাহিত্যিককেও দিতে দেখি নাই। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও কোনোদিন দুর্গা-শিব-লক্ষ্মী-সরস্বতীর বন্দনা-গান রচনা করেন নাই। এমন কি পৌত্তলিকতাকে তিনি তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়াই গিয়াছেন ঃ

"মুগ্ধ ওরে স্বপ্নঘোরে
যদি প্রাণের আসন-কোণে

www.pathagar.com

ধূলায় গড়া দেবতারে
লুকিয়ে রাখিস সংগোপনে
চিরদিনের প্রভু তবে
তোদের প্রাণে বিফল হবে,
বাহিরে সে দাঁড়িয়ে রবে
কতো না যুগ যুগান্তরে।।"

এমনি সুস্পষ্ট ও কঠোর ভাষায় রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সমাজকে তার পৌত্তলিকতার জন্য নিন্দা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত কাব্যে ঝঙ্কৃত হইয়াছে এক অপরূপ ঐশী প্রেম। তাঁর 'গীতাঞ্জলি' যে কোনো মুসলমান ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত পড়িতে পারে।

ইকবালও এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। 'বাঙ্গে-দারায়' এক স্থানে তিনি কি সুন্দরই না বলিয়াছেন ঃ-

"সাচ্ কাহ্ দেউ আয় ব্রাহ্মণ আগর তু বুরা না মানে
তেরি সনম্ কদউঁ কো বুৎ হো গ্যায়ে পুরানে।।

অর্থাৎ ঃ হে ব্রাহ্মণ, যদি কিছু মনে না করো, তবে সত্য কথা বলি ঃ
তোমার মন্দিরের ঐ মূর্তিগুলি বড্ড পুরানো হইয়া গিয়াছে।

আশ্চর্যের বিষয় নজরুল ইসলাম ঠিক ইহার উল্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু হইয়া ইসলাম হইতে প্রেরণা সংগ্রহ করিয়াছেন, আর নজরুল ইসলাম মুসলমান হইয়া হিন্দু দেবদেবী ও বেদ-পুরাণের মধ্যে তাঁর আদর্শ ও প্রেরণা খুঁজিতেছেন।

শুধু কি তাই? সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেব-দেবীর পায় তিনি কিরূপভাবে 'মাথা নত' করিতেছেন, দেখুন ঃ

দুর্গা-বন্দনা ঃ

"খোল্ তোরণ
চল্ বরণ
করবো মা'য়?
ডরবো কা'য়?
ধরবো পায় কার সে আর
বিশ্ব মা-ই পার্শ্বে যার!---
ঘরে ঘরে আজি দীপ জ্বলুক
মার আবাহন-গীত চলুক
দীপ জ্বলুক
গীত চলুক
আজ কাঁপুক মানব কল-কল্লোলে

www.pathagar.com

কিসলয় সম নিখিল ব্যোম
স্বা-গতম!
স্বা-গতম!!
মা-তরম!
মা-তরম!!
ঐ ঐ ঐ বিশ্ব-কণ্ঠে
বন্দনা-বাণী লুণ্ঠে-
বন্দে মাতরম!!"--- ইত্যাদি

-(অগ্নিবীণা)

অন্য আর একটি কবিতায় কবি বলিতেছেন-
"জাগো যোগমায়া জাগো মৃন্ময়ী
চিন্ময়ী রূপে জাগো।
দশভূজা দশ প্রহরণ ধরি
আয় মা দশদিক আলো করি
দশ হাতে আনো কল্যাণ ভরি
নিশীথ শেষে উষা গো।।"-ইত্যাদি

-(গীতি-শতদল)

সরস্বতী বন্দনা-
"আদি পরম বাণী, উর বীণাপাণি।
আরতি করে তব কোটি কোবিদ জ্ঞানী।।
মূক ধরণী করে বেদনা আরতি
বাণী-মুখর তারে করো মা ভারতী
দাও মা, আশিস যাচে নিখিল প্রাণী॥
ব্রহ্মবাদিণী আদি বেদমাতা
এসো মা, কোটি-দল-হৃদি আসন পাতা
অশ্রুমতী মাগো, নব বাণীতে জাগো
রুদ্ধ দ্বার খোলো সাজিয়া রুদ্রাণী"।।-ইত্যাদি

-(চন্দ্রবিন্দু)

অন্যত্র ঃ
"জয় ভারতী শ্বেত-শতদল-বাসিনী
বিষ্ণু-চরণ-শরণ আদি বাণী।।-ইত্যাদি

-(প্রলয়-শিখা)

www.pathagar.com

শিব-বন্দনা ঃ

"নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ হে নটনাথ।
নব ভবনে করে শুভ চরণপাত।।"

কৃষ্ণ-বন্দনা ঃ

"মাধব বংশীধারী বনওয়ারী
গোবিন্দ কৃষ্ণ মুরারি।
গোবিন্দ কৃষ্ণ-মুরারি হে
পাপ-তাপ-দুখহারী।
কুরুক্ষেত্রে রণে পাণ্ডব-মিতা
কণ্ঠে অভয় বাণী ভগবদ্‌-গীতা
হে পূর্ণ ভগবান, পরম পিতা
শঙ্খ-চক্র-গদাধারী
পাপতারা কাণ্ডারী
ত্রিভুবন স্বজন-কারী।।"

–(বনগীতি)

অন্যত্র—

"এসো মহাভারতের দেবতা
আনো নৃত্যের তালে নব বারতা
এসো মধুকৈটভ-অরি আনো নবগীতা
এসো নারায়ণ-ভগবান বিশ্ব-ভূপাল।"–ইত্যাদি

–(গীতি-শতদল)

নারায়ণ-বন্দনা ঃ

"জাগো জাগো জাগো
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী।
কাঁদে ধরিত্রী নিপীড়িতা
কাঁদে ভয়ার্ত নরনারী।।
ব্যথিত হৃদয়ে ফেলিয়া চরণ
বেদনা-বিহারী এসো নারায়ণ
রুদ্ধ-কারার অন্ধ প্রাকার
বন্ধন অপসারি।।"–ইত্যাদি

হর-গৌরী-বন্দনা ঃ

www.pathagar.com

"জাগো হে রুদ্র, জাগো রুদ্রাণী,
কাঁদে ধরা দুঃখ-জ্বরজ্বর!
জাগো গৌরী, জাগো হর।
গ্রাসিল বিশ্ব লোভ-দানব
হা-হা-স্বরে কাঁদিছে মানব,
জাগো ভৈরবী জাগো ভৈরব
ত্রিশূল-খড়্গ ধরো ধরো।।"–ইত্যাদি
–(চন্দ্রবিন্দু)

সূর্য-বন্দনা ঃ–
"জবা-কুসুম-সঙ্কাশ ঐ
উদার অরুণোদয়।
অপগত তমোভয়।
জয় হে জ্যোতির্ময়।।"....ইত্যাদি
–(চন্দ্রবিন্দু)

প্রকৃতি-বন্দনা—
"কুসুম-সুকুমার শ্যামল -তনু
হে বনদেবতা, লহ প্রণাম।".....ইত্যাদি
–(চন্দ্রবিন্দু)

রাধা-কৃষ্ণ-বন্দনা—
"মন, লহ নিতি নাম রাধা-শ্যাম
গাহ হরি গুণগান
তব ধন-জন-প্রাণ যাহার কৃপার দান
জপ তারি নাম–
জয় ভগবান, জয় ভগবান।।"–ইত্যাদি
–(গীতি-শতদল)

শ্যামা-সঙ্গীত ঃ–
"তুই, লুকাবি কোথায় মা কালী।
আমার বিশ্ব-ভূবন আঁধার করে
তোর রূপে মা সব ডুবালি।।
আমি পূজা করে পাইনি তোরে
এবার চোখের জলে এলি

www.pathagar.com

আমার বুকের ব্যথায় আসন পাতা
বস্ মা সেথা দুখ-দুলালী।।"–ইত্যাদি

–(চন্দ্রবিন্দু)

বৈষ্ণব-সঙ্গীত—
"বাজিয়ে বাঁশী মনের বনে
এসো কিশোর বংশীধারী
চূড়ায় বেঁধে ময়ূর-পাখা
বামে লয়ে রাধা-প্যারী।।
আমার আঁধার প্রাণের মাঝে
এসো অভিসারের সাজে
নয়ন জলের যমুনাতে
উজান বেয়ে ছুটুক বারি।।"–ইত্যাদি
–(গীতি-শতদল)
"রাখো রাখো রাঙা পায়
হে শ্যামরায়।
ভুলে গৃহ স্বজন সবই সঁপেছি তোমায়।।"–ইত্যাদি
–(বনগীতি)
"এসো মুরলীধারী বৃন্দাবনচারী
গোপাল গিরিধারী শ্যাম।"...ইত্যাদি

–(বনগীতি)

এইরূপ অসংখ্য কবিতা ও গান নজরুলের আছে। পাঠক মনে করিবেন না যে, খুঁজিয়া খুঁজিয়া বুঝি মাত্র এইগুলিই পাওয়া গেল। তা নয়। দেব-দেবী সম্বন্ধীয় গান ও কবিতা নজরুলের এত অধিক আছে যে, কোন্টা রাখিয়া কোন্টা উদ্ধৃত কবির বুঝা যায় না। আমি মাত্র নমুনা স্বরূপ এক একটা কবিতা বা গানের কিয়দংশ করিয়া উদ্ধৃত করিলাম। যাহারা বিস্তৃত ভাবে জানিতে চান, তাহারা নজরুলের অগ্নিবীণা, দোলনচাঁপা, প্রলয়-শিখা, নতুন চাঁদ, গীতি-শতদল, বন-গীতি, চন্দ্রবিন্দু ইত্যাদি পুস্তক পড়ুন। একটা মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ইসলামী বিষয়বস্তু লইয়া নজরুল যে সমস্ত কবিতা ও গজল লিখিয়াছেন, তাহার সংখ্যা বড় জোর দুইশত হইবে, আর হিন্দু ভাবধারার কবিতা, শ্যামা-সঙ্গীত, বৈষ্ণব-সঙ্গীত, বাউল ইত্যাদি মিলাইয়া ৩০০ শতের কম হইবে না।

একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, আজকাল নূতন পৃথিবীকে বাণী দিবার মতো বা প্রেরণা দিবার মতো কোনো কিছু ভারতীয় পুরাণে (mythology-তে) নাই বলিলেই চলে। বিশ্বের সমস্ত বড় বড় চিন্তাধারার মূলে রহিয়াছে ইসলাম। নর-নারীর সমানাধিকার, মানুষে-মানুষে ভ্রাতৃভাব, সাম্যবাদ, বিশ্ব-মানবতা, নারী-স্বাধীনতা, আন্তর্জাতীয়তা ইত্যাদি

www.pathagar.com

সমস্ত কিছুই আজ ইসলাম হইতে উৎসারিত। চিন্তাশীল হিন্দু-মনীষীরা আজ আর তাঁদের পৌরাণিক ঐতিহ্যের মধ্যে নবজীবনের আলো খুঁজিয়া পাইতেছেন না। কাজেই তাঁহারও ঐসব কাহিনীর এখন কোনোই মূল্য দেন না। আশ্চর্যের বিষয়, নজরুল সেই ভারতীয় পুরাণের মধ্যেই একেবারে আকণ্ঠ ডুবিয়া গিয়াছেন এবং বিংশ-শতাব্দীর নবজাগরণের জন্য সেখানেই প্রেরণা খুঁজিতেছেন!

নজরুল ইসলামের দেবভক্তি সম্বন্ধে আমাদের মুখে কিছু শুনিলে পাঠকের হয়তো তেমন বিশ্বাস নাও হইতে পারে। কাজেই এ বিষয়ে হিন্দু-সমাজ কি মনে করেন, তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র কুমার ঘোষ বলিতেছেন ঃ

"নজরুল এ যুগের এই বন্ধন-বেদনার দুর্বিসহ জ্বালায় পাগল বাংলারই শুধু কবি নয়, সে আর এক ভাবী অখণ্ড-বাংলার অগ্রদূত–যে বাংলার শ্যামাঞ্চল তলে বাঙ্গালী হবে এক মায়ের ছেলে–একাঙ্গ, একাত্মা হিন্দু-মুসলমান কৃষ্টির পূর্ণ হরগৌরী রূপ। মুসলমান নজরুল যখন রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কীর্ত্তন রচে, তখন সে কী অনবদ্য! বাংলার শ্যামল মাঠে বাঁশের বাঁশীতে শাশ্বত তুরীয়ের দীপক রাগ গাইতে গিয়ে বাঁশী গেছিল ফেটে, তাই বাংলার সিদ্ধ ঋষি মহাযোগীশ্বর নজরুলকে আমরা এখনও দেখে দুচোখ জুড়াতে পারিনি। আশা আছে এও একদিন দেখবো।" –(গুলিস্তা, নজরুল সংখ্যা)

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী বলেন ঃ

"নজরুলের কবি-প্রতিভা বহু দিকে প্রসারী। ভালো-মন্দ, ছোট-বড় অনেক বিভাগেই তাঁর কবিত্বের আদর্শ আছে। কিন্তু আমি তাঁর দেশভক্তির এবং দেবভক্তির গভীরতায় মুগ্ধ হয়ে গেছি। অন্তরেরও অন্তর দিয়ে অনুভব না করলে এমন সর্বদেববাদে মানুষ পৌছতে পারে না। এই হচ্ছে আসল বৈদান্তিকতা। শিব-শ্যামা-হরি-দুর্গা-ঈশ্বর-ব্রহ্ম সব একাকার হয়ে গেছে। যে সব শ্যামা-সঙ্গীত তিনি লিখেছেন, সে তাঁর অনুভূত সত্য। রামপ্রসাদের মতোই 'কালো মেয়ের পায়ের তলায়' আলোর নাচন দেখতে দেখতেই লেখা। এ দুই চিন্তা, এই মন, এই প্রাণ যদি তিনি তাঁর দেশবাসীদের মধ্যে (মুসলমানদের মধ্যে!) কিছুও ছড়িয়ে দিয়ে যেতে পারেন, তারা ধন্য হবে।" –(গুলিস্তা, নজরুল সংখ্যা)

এই সব কথার ইঙ্গিত কি, পাঠক তাহা ভাবুন।

নজরুলের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত সরকার একটি চমৎকার ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য নজরুল কি করিয়াছিলেন, দেখুন ঃ–

"নজরুল চললেন লাভপুরের (বীরভূম) ফুল্লরা পীঠ দেখবার জন্য। ফুল্লরার দেবী-মন্দিরে নজরুল গাইলেন মাতৃনাম-গান। ভক্তির অমৃত-ধারায় সে গানের বাণী যেন রস-নিষিক্ত হয়ে মায়ের চরণে অর্ঘ নিবেদন করছে, সুরের ও তালের মধুর গতিচ্ছন্দে। যেমন ফুল্লরা-পীঠে, তেমন তারাশঙ্করের বাড়ীতে শ্যামা-সঙ্গীত গেয়ে সবান্ধবে নজরুল লাভপুর

www.pathagar.com

থেকে রওনা হলেন সেই দৈব ওষুধের জন্য বেলে গ্রামে। বেলের পৌঁছে সেখানকার দেবস্থানের প্রতিনিধিদের নির্দেশ মতো নজরুল একটি এঁদো পচা পুকুরে অবগাহন স্নান শেষ করে পবিত্র হয়ে সেই পুকুরের শ্যাওলা ও সেখানকার তেল প্রভৃতি নিয়ে কোলকাতায় ফিরে এলেন।"

-(যুগান্তর, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩)

এর উপর টীকা নিষ্প্রয়োজন।

এ তো গেল ইসলামের মূলকাণ্ড তৌহিদের বেইজ্জতির কথা। অন্যান্য শাখা-প্রশাখাতেও নজরুল কিরূপ আঘাত হানিয়াছেন দেখুন ঃ-

অবতারবাদ

অবতারবাদ এবং জন্মান্তরবাদ ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু নজরুল সেই অবতারবাদ ও জন্মান্তরবাদে ঘোর বিশ্বাসী-

"দুষ্কৃতিবিনাশায়যুগ-যুগ-সম্ভব
অধর্ম নিধনে এসো অবতার নব।"

-(চন্দ্রবিন্দু)

পাঠক, এইখানে গীতার "যাহা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি ভবতি ভারত" এই শ্লোকটি মিলাইয়া পড়িতে পারেন। দুষ্কৃতি ও অধর্মের গ্লানি যখনই জগৎ ছাইয়া যায়, তখনই শ্রীভগবান অবতাররূপে ধরায় নামিয়া সেই পাপ বিনাশ করেন-ইহাই এই শ্লোকের ব্যাখ্যা। মুসলিম কবি দুর্দিনে তাই শ্রীকৃষ্ণের শরণ মাগিতেছেন।

কবি জন্মান্তরবাদেও যে পুরা বিশ্বাসী, তারও পরিচয় তাঁর কাব্যে আছে ঃ-

"বাসনার বিপুল আগ্রহে
জন্মলভি লোকে-লোকান্তরে
উদ্বেলিত বুকে মোর অতৃপ্ত যৌবনা-ক্ষুধা
উদগ্র কামনা
জন্ম তাই লভি বারে বারে।"

-(পূজারিণী)

বন্দে-মাতরম

যে 'বন্দে-মাতরম' লইয়া এত বিরোধ-যে গানের বাণী ও ধ্যান-ধারণা ঘোর পৌত্তলিকতাপূর্ণ বলিয়া মুসলমানেরা তাহা আদৌ বরদাশ্ত করিতে পারিল না, কবি নজরুল সেই বন্দে-মাতরমেই নান্দী পাঠ করিতেছেন—

"ভাঁজো মোহিনী সানাই, বাজো আগমনী-সুর
বড় কেঁদে ওঠে আজ হিয়া মাতৃ-বিধুর!
ওঠে কণ্ঠ ছাপি বাণী সত্য পরম
বন্-দে মাতর্‌ম বন্-দে মাতর্‌ম।"

-(বিষের বাঁশী)

www.pathagar.com

ইসলামের দর্শনকেও নজরুল ইসলাম বিকৃত করিয়া দিয়াছেন। এইখানকার আঘাতই অত্যন্ত গীভর এবং মারাত্মক। নজরুল ইসলামের ভাবধারা সত্যই 'সর্বদেববাদের' পথ দিয়া অবশেষে বেদান্ত মতে আসিয়া পৌছিয়াছে। তাঁহার শেষের কবিতা গ্রন্থ "নূতন চাঁদে" তাঁর এই আত্মপ্রকাশ সুস্পষ্ট হইয়াছে। পূর্বে নজরুল বলিয়া আসিয়াছেন ঃ-

"তোমারে কি দিয়ে পূজি ভগবান!
মন্দিরে তুমি মূরতিতে তুমি-
পূজার পলে তুমি স্তবগীতে তুমি
ভগবান দিয়ে ভগবান পূজা করিতে-
তুমি যদি ভাবো অপমান।"
-(গীতি-শতদল)

অন্যত্র, বলিয়াছেন—

"তার খেলা ঘর তোর এ দেহ
সে তো নহে অন্য কেহ
সে যে রে তুই-তবু মোহ
ঘুচলো না তোর হায় পূজারী।"
-(গুলবাগিচা)

এখানে নজরুল ঘোর বৈদান্তিক। নিজেকে তিনি 'ভগবানের অংশ মেনে নিয়েছেন। এই ভাবই 'নূতন চাঁদ'-এ পূর্ণ-পরিণতি লাভ করিয়াছে ঃ-

"সকলের দেখ আপনারে শুধু
দেখ না পরম উদাসীন
দেখিলে দেখিতে যেখানেই তুমি
সেইখানে সে যে আছে লীন।
নাহি অহিংসা-হিংসা সেখানে
কেবল পরম শাম
রাজনীতি নাই কোনো ভীতি নাই
'অভেদম্' তার নাম।"

এই 'অভেদমই' বেদান্ত দর্শনের সার কথা। ইহাই হইতেছে 'অদ্বৈতবাদ'। 'একমেবাদ্বিতীয়ম' অর্থাৎ 'এক ছাড়া দুই নাই'-ইহাই বেদান্ত মত। এর অর্থ কিন্তু এ নয় যে, আল্লাহ্ এক ছাড়া দুই নয়। তাহা হইলে তো ইসলামের তৌহিদের সহিত বেদান্ত-মত মিলিয়াই যাইত। বেদান্তের মত হইতেছে যে, এক ছাড়া দুই-এর কোনো স্থানই নাই। চন্দ্র-সূর্য আকাশ-পৃথিবী মানুষ-গরু-যাহা কিছুই আছে-সমস্তই সেই একের প্রকাশ। এই

www.pathagar.com

পরম একের নামই ব্রহ্ম। তাহা হইলে আমি, তুমি, চেয়ার, টেবিল, ফুল, প্রতিমা, সবই সেই 'পরম একের' অংশ হইয়া যায়। অন্য কথায় মানুষ আল্লাহ্‌র অংশ হইয়া দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য, ইসলামী-দর্শন ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। খালেক-মাখলুক (স্রষ্টা-সৃষ্টি) সেখানে সম্পূর্ণ পৃথক। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, নজরুল ইসলাম ইসলামী দর্শন ছাড়িয়া বেদান্ত-দর্শনকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। গভীর গোপনে তিনি ইসলামের এই শরাবন্-তহুরার মধ্যে বিষ মিশাইয়াছেন। মুসলমান সমাজ তার কিছুই খবর রাখে কি?

অন্যান্য বিষয়ে

অন্যান্য বিষয়েও নজরুল তাঁর কাব্যে ও গানে কি আদর্শ ব্যক্ত করিয়াছেন, তার দুই একটা নমুনা দিতেছি—

চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুতে নজরুল ইসলাম 'ইন্দ্র পতন' (?) নাম দিয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছেন, তাহার একস্থানে তিনি বলিয়াছিলেন যে, চিত্তরঞ্জন যদি হযরত মোহাম্মদের (সা) পূর্বে জন্ম গ্রহণ করিতেন, তবে তাঁহার কাছেই কোরআন নাজিল হইত! এই কথায় চারিদিক হইতে ঘোর আপত্তি উঠিলে পরে কবি ঐ অংশ পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছেন। তবু ঐ কবিতায় চিত্তরঞ্জনকে এমন স্তুতিবাদ করা হইয়াছে যে, মুসলমানদের ধর্মানুভূতিকে আঘাত না করিয়াই যায় না। চিত্তরঞ্জনকে তিনি একদম পয়গম্বরের দরজায় তুলিয়া দিয়াছেন ঃ

"পয়গম্বর ও অবতার যুগে
জন্মিনি মোরা কেহ,
দেখিনিকো মোরা তাঁদের, দেখিনি
দেবের জ্যোতির্দেহ।
কিন্তু যখনি বসিতে পেয়েছি
তোমার চরণ-তলে
না জানিতে কিছু না বুঝিতে কিছু
নয়ন ভরেছে জলে!
সারা প্রাণ যেন অঞ্জলি হয়ে
ও-পায়ে পড়েছে লুটি
সকল-গর্ব উঠেছে মধুর
প্রণাম হইয়া ফুটি!----
"ইব্রাহিমের মতো বাচ্চার
গলে খঞ্জর দিয়া
কোরবানী দিলে সত্যের নামে,
হে মানব-নবী-হিয়া!

www.pathagar.com

ফেরেশ্‌তা সব করিছে সালাম,
দেবতা নোয়ায় মাথা
ভগবান-বুকে মানবের তবে
শ্রেষ্ঠ আসন পাতা!"

-(ইন্দ্রপতন)

ইহার প্রতিটি লাইনে রহিয়াছে অনৈসলামিক ভাব ও আদর্শের ছাপ। চিত্তরঞ্জন দাশকে হযরত ইব্রাহিমের পাশে রাখিয়া দেখিতে হইবে ইহা কল্পনা করিতেও শরীর শিহ্‌রিয়া উঠে!

রবীন্দ্রনাথকে কবি "অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি" দিয়া কিরূপে বরণ করিতেছেন দেখুন—

"ধ্যান-শান্ত মৌন তব কাব্য রবি-লোকে
সহসা আসিনু আমি ধূমকেতু সম
রুদ্রের দুরন্ত দূত ছিন্ন-হর-জটা
কক্ষ-চ্যুত উপগ্রহ।"

কবি এখানে নিজেকে মহাদেবের ছিন্ন-জটা বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। তারপর—

"একা তুমি জানিতে হে কবি মহাঋষি
তোমারি বিচ্যুত জটা আমি ধূমকেতু।
আগুনের ফুল্‌কি হলো ফাগুনের ফুল
অগ্নিবীণা হলো ব্রজ-কিশোরের বেণু—
শিব-শিরে শশি-লেখা হলো ধূমকেতু
দাহ তার ঝরিল গো অশ্রু-গঙ্গা হয়ে।

-(নূতন চাঁদ)

এখানে নজরুল রবীন্দ্রনাথকে শিব বানাইয়া নিজেকে তার কপালের অগ্নির সহিত তুলনা করিতেছেন, সেই শিবের শশিলেখাই ধূমকেতু হইয়াছে, আর তারি দাহ শান্ত হইয়া তার কাব্যে স্নিগ্ধ 'গঙ্গা' রূপ পাইয়াছে।

তারপর রবীন্দ্রনাথকে কবি একেবারে 'পরম সুন্দরের' পর্যায়ে তুলিয়া দিয়াছেন এবং নিজকে 'কমল' বানাইয়া তাঁর শ্রীচরণে আত্মনিবেদিত হইতেছেন—

হে কবি, আজও শুনি সে চির-কিশোর
তোমার বেণুতে গাহে যৌবনের গান
সেথা তুমি কবি নহ ঊষি নহ তুমি,
সেথা তুমি মোর প্রিয় পরম সুন্দর।
আজ আমি ভুলে গেছি আমি ছিনু কবি
ফুটেছি কমল হ'য়ে তব করে রবি
প্রস্ফুটিত সে কমল তব জন্মদিনে

www.pathagar.com

সমর্পিনু শ্রীচরণে, লহ কৃপা করি।"

-(নতুন চাঁদ)

ইহারই পাশে যখন দেখি যে ইকবাল, কায়েদ-ই-আযম বা অন্য কোনো মুসলিম মনীষী সম্বন্ধে নজরুল একদম নীরব, তখন মন সত্যই ব্যথিত হয় না কি?

উৎসর্গ-পত্র

মুসলিম কবি কিরূপ করিয়া অপরের নামে গ্রন্থ উৎসর্গ করিতেছেন দেখুন ঃ-

"ভাঙা বাংলার রাঙা যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর
শ্রী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ
শ্রীশ্রীচরণাবিন্দেষু"
-('অগ্নিবীণার' উৎসর্গ পত্র)
"বিশ্বকবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীশ্রীচরণারবিন্দোষু"
-(সঞ্চিতার উৎসর্গ)
"বিরাট প্রাণ কবি-দরদী
প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র
শ্রীচরণারবিন্দেষু,
"দেখিয়াছি হিমালয় করিনি প্রণাম
দেবতা দেখিনি, দেখিয়াছি স্বর্গধাম।
সেদিন প্রথম যবে দেখিনু তোমারে
হে বিরাট মহাপ্রাণ কেন বারে বারে
মনে হলো এতদিনে দেখিনু দেবতা।।"

-ইত্যাদি

(চক্রবাকের উৎসর্গ পত্র)

ভাবিয়াছিলাম হিন্দুদিগকে সন্তুষ্ট করিবার মোহে কবি এই ধরনের হিন্দু কায়দায় উৎসর্গ করিয়াছেন। কিন্তু একজন মুসলিম মহিলাকে গ্রন্থ উৎসর্গ করিতে গিয়া তিনি আরও একডিগ্রী উপরে উঠিয়াছেন-একেবারে জগজ্জননী মা-দুর্গা বলিয়া তার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়াছেন—

"বাংলার অগ্নি-নাগিনী মেয়ে মুসলিম-মহিলা-কুলগৌরব
-আমার জগজ্জননী স্বরূপা মা-
মিসেস্ এম, রহমান সাহেবার
পবিত্র চরণারবিন্দে-
-('বিষের বাঁশীর' উৎসর্গ পত্র)

www.pathagar.com

অন্যান্য হিন্দু নেতা বা মনীষীদের প্রতিও নজরুল যে সব প্রশস্তি লিখিয়াছেন, তাহা পড়িলে কিছুতেই মনে হইবে না যে, সে সব কোনো মুসলিম কবির রচিত। দেখুন—

মাদারীপুর শান্তি-সেনা-বাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাসের কারামুক্তিতে নজরুল গাহিতেছেন–

"স্বাগত শুদ্ধ রুদ্ধ-প্রতাপ প্রবুদ্ধ নর মহাবলী
দনুজ-দমন দধীচি-অস্থি, বহ্নি-গর্ভ দম্ভোলী!
স্বাগত সিংহ-বাহিনী কুমার! স্বাগত হে দেব-সেনাপতি
অনাগত রণ কুরুক্ষেত্রে সরথি-পার্থ মহারথী!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দবীর
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, শিরন পদ্মা-ভগীরথীর।।"

–(ভাণ্ডার গান)

শেখ ফরিদ বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ আউলিয়া। লাঠি-বিশারদ পূর্ণদাস হইলেন কিনা সেই শেখ ফরিদ! আশুতোষ মুখার্জি, যতীন দাস, গোকুল নাগ ইত্যাদি অনেকের মৃত্যুতেই তিনি এই কায়দায় শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন।

ঠিক ইহারই পাশাপাশি যখন দেখা যায়, মুসলিম মনীষীদিগের সম্বন্ধে নজরুল একটি লাইনও লেখেন নাই, তখন অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই মুসলিম মন ব্যথিত হইয়া উঠে নাকি?

পাকিস্তানের আলোকে নজরুল

এতক্ষণ আমরা নজরুল কাব্যপাঠ করিলাম ইসলামের আলোকে। এইবার দেখা যাউক তার রাজনৈতিক রূপ।

নজরুলকে পাকিস্তানের জাতীয় কবি বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু নজরুলের সবচেয়ে বড় অপবাদ যদি কিছু থাকে, তবে এই। নজরুল যা নন, তাঁর উপর তাই আরোপ করিলে তাঁকে হেয় করা হয়। পাকিস্তানের কবি হওয়া তো দূরের কথা, নজরুল ছিলেন ঘোর পাকিস্তান বিরোধী। তিনি গাহিয়াছিলেন 'অখণ্ড ভারতের' গান, তিনি দেখিয়াছিলেন হিন্দু-মুসলমান কৃষ্টির 'হরগৌরীরূপ'। ভারত জুড়িয়া হিন্দু, স্বাধীনতার যে সাধনা চলিতেছিল, নজরুল আসিয়া সেই সুরেই তাঁহার কণ্ঠ মিশাইয়া গান গাহিয়াছিলেন। সে-যুগের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকেই তিনি তাঁহার রাজনৈতিক আদর্শ রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলিম জাতির জন্য তিনি নূতন করিয়া কিছু ভাবেন নাই। ইকবাল যেমন 'নূতন মক্কার' স্বপ্নে (Vision of a new Mecca) বিভোর ছিলেন, সমগ্র মুসলিম জগতের মুক্তি ও কল্যাণ যেমন তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল, নজরুলের ধ্যানে সেরূপ কোনো সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল না। হিন্দু কালচারের দ্বারা তিনি সম্পূর্ণ বিজিত হইয়াছিলেন। পাকিস্তানের কথা বলিতে তাই তিনি লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইতেন। ঐ সব

www.pathagar.com

বিষয়ে কবিতা বা গান লিখিলে পাছে তার 'সাম্প্রদায়িক' রূপ প্রকট হইয়া পড়ে, এই ছিল তাঁর মনের আতঙ্ক। এই জন্যই 'পাকিস্তান' বা কায়েদ-ই-আযম সম্বন্ধে তিনি একটি কবিতা বা গানও রচনা করেন নাই। 'পাকিস্তান' এবং 'জিন্নার' নাম তখনকার দিনে হিন্দুদের নিকট উৎকট সাম্প্রদায়িকতার প্রতীক ছিল। কাজেই নজরুল হিন্দু-প্রীতির খাতিরে ঐ সব প্রসঙ্গ এড়াইয়া গিয়াছেন। 'যুগান্তর' সত্যই বলিয়াছেন—

"নজরুল চিরদিন হিন্দু-মুসলমান মিলনের গান গেয়েছেন। সেইজন্য লীগ-মহলে কোনোদিনই তাঁর খ্যাতি হয়নি। প্রচুর প্রলোভনের বিনিময়েও কেউ তাঁকে দিয়ে পাকিস্তানী কবিতা রচনা করতে পারেননি।"

–(যুগান্তর, ১০ই জ্যৈষ্ঠ্য, ১৩৫৩)

বস্তুতঃ নজরুল যে পাকিস্তান বা কায়েদ-ই-আযমের নাম পর্যন্ত শুনিতে পারেন নাই, তাহা জানা কথা। ইহা লইয়া তর্ক করিয়া কোনো লাভ নাই। তিনি ছিলেন "আগে ভারতবাসী, পরে মুসলমান।" মুক্তি আন্দোলন সম্বন্ধে তিনি যতো কবিতা ও যতো গান লিখিয়াছেন, সমস্তই ভারতী মার্কা। 'ভারত-জননীর' জন্য সমস্ত দেবদেবীর আহ্বান ও প্রশস্তি-গান তিনি গাহিয়াছেন। এসো দুর্গা, এসো শিব, এসো শ্রীকৃষ্ণ, এসো অর্জুন, এসো বিবেকানন্দ, এসো অরবিন্দ–বন্দিনী মার মুক্তি সাধন করো----ইহাই নজরুলের একমাত্র বাণী। আঁধার যুগের এই সব Pagan ideas আজকার দিনে চলে কি? বিংশ শতাব্দীর একজন আলোকপ্রাপ্ত মুসলিম কবির ঈমান, আকিদা ও বাণী কি এই?

নজরুল যে পাকিস্তানের গানই গাহেন নাই, 'অখণ্ড ভারতের' গানই গাহিয়াছেন এবং সে ভারতে যে মুসলিমের কোনো নামগন্ধও নাই, নিম্নে তাহার নজীর দেখুন—

"ভারত-লক্ষ্মী মা আয় ফিরে এ ভারতে
ব্যথায় মোদের চরণ ফেলে,
অরুণ আশার সোনার রথে ॥
বিজয়া তোর হলো কবে শতাব্দী চলিয়া যায়
ভারত বিজয়-লক্ষ্মী ভারতে ফিরে আয়।
বিসর্জনের কান্না মা
তুই এবার এসে থামা
সফল কর্ এ তপস্যা মা,
স্থান দে স্বাধীন ভারতে ॥"

–(সুরসাকী)

কবিরা স্বাপ্নিক। অনাগত ভবিষৎ তাঁহাদের চোখে ছায়া ফেলে। নজরুলের চোখে কোন্ স্বপ্ন নামিয়াছিল, দেখুন—

"স্বপ্নে দেখেছি ভারত জননী
তুই যেন রাজ-রাজেশ্বরী।।

www.pathagar.com

নবীন ভারত! নবীন ভারত!
স্তবগান ওঠে ভুবন ভরি।
পড়ুয়ারা পড়ে বকুল ছায়ে
সুস্থ সবল আদুল গায়ে
মেয়েরা ফিরিছে মুক্ত বায়ে
কলভাষে দিক্ মুখর করি।।"

-(গুল-বাগিচা)

আর একটি—
"ভোল লাজ ভোল গ্লানি জননী
মুক্ত আলোকে জাগো।
কবে সে ঘুমালি মরণ ঘুমে মা
আর জাগিলি না গো।।
শূন্য দেউল বন্ধ আরতি
কাঁদিছে পূজারী, নাহি মা মূরতি
পূজার কুসুম-চন্দন যায়
আঁখি-জলে ভাসিয়া গো।।
যে তিতিক্ষা যে শিক্ষা লয়ে
অতীতে ছিলি মা রাজরাণী হয়ে
লয়ে সে মহিমা পুন নির্ভয়ে
বিশ্ব বুকে দাঁড়া গো।।"

-(বনগীতি)

জগতে আজ দুর্দিন নামিয়াছে। চারিদিকে শুধু পাপ-তাপ ও হাহাকার; তাহা দেখিয়া করিব মনে ব্যথা জাগিয়াছে। এই দুর্দিনের ত্রাণকর্তারূপে তিনি কাহাকে স্মরণ করিতেছেন? হযরত মোহাম্মদকে? ইমাম মেহেদীকে? না! তিনি আহ্বান করিতেছেন ঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণকে ঃ-

"ঘন ঘোর মেঘ-ঘেরা দু'র্দিনে ঘনশ্যাম
ভূভারত চাহিছে তোমায়।
হরিবে ধরার ভার নাশিতে এ হাহাকার
আর বার এসো এ ধরায়।।
নিখিল মানব জাতি কলহ ও দ্বন্দ্বে
পীড়িত শ্রান্ত আজি কাঁদে নিরানন্দে
শঙ্খ-পদ্ম হাতে এ ঘোর তিমির-রাতে

www.pathagar.com

তিমির-বিদারী এসো অরুণ আভায়।।
কলিতে দলিতে এসো
এই দুখ-পাপ-তাপ্
দেহ বর সুন্দর,
শেষ হোক্ অভিশাপ
গদা-চক্র করে অরিন্দম এসো
হতমান দুর্বল মাগিছে সহায়।।"

(গুল-বাগিচা)

তারপরই কবি আশার বাণী শুনাইতেছেন ঃ

"ওরে ভয় নাই আজ, দুলিয়া উঠিছে
হিমালয় চাপা প্রাচী।
গৌরী-গিরির তুহিন ভেদিয়া
জাগিছে সব্যসাচী।।
দ্বাপর যুগের মৃত্যু ঠেলিয়া
জাগে মহাযোগী নয়ন মেলিয়া
মহাভারতের মহান বীর জাগে,
বলে আমি আসিয়াছি।
নব-যৌবন-জলতরঙ্গে
নাচেরে প্রাচীন প্রাচী।।"

-(বনগীতি)

তারপর নজরুলের স্বদেশের চিত্রও একবার দেখুন ঃ-

"আমার দেশের মাটি
ও ভাই , খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি।
এই মায়েরি প্রসাদ পেতে
মন্দিরে এর এঁটো খেতে
তীর্থ করে ধন্য হতে
আসে কতো জাতি।
মা, আঁধার রাতে একলা জাগে
আগলে রে ওই শ্মশান-ঘাঁটি॥"

এই স্বদেশের নায়ক কে? সেনাপতি কে? শুনুন ঃ

www.pathagar.com

"রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, প্রফুল্ল বাঙলার দেবতা। তাঁদের পূজার জন্য বাঙলার চোখের জল চির-নিবেদিত থাকবে। কিন্তু সেনাপতি কই? সৈনিক কোথায়? কোথায় আঘাতের দেবতা, প্রলয়ের মহারুদ্র? সে পুরুষ এসেছিল বিবেকানন্দ। সেনাপতির পৌরুষ-হুঙ্কার গর্জে উঠেছিল বিবেকানন্দের কণ্ঠে।" –(দুর্দিনের যাত্রী)

নজরুলের স্বদেশের এবং তার মূর্তির চিত্র এই। নজরুল যৌবনের কবি। ছাত্র ও যুবশক্তির জাগরণের বাণী তিনি দিয়াছেন। কিন্তু যে ছাত্র ও যুবশক্তির উদ্বোধন তিনি করতে চান, তার স্বরূপটা একবার দেখুন ঃ

"মোদের কক্ষচ্যুত ধূমকেতু প্রায়
লক্ষ্যহারা প্রাণ।
আমরা ভাগ্য-দেবীর যজ্ঞবেদীর
নিত্য বলিদান॥
যখন লক্ষ্মীদেবী স্বর্গে উঠেন
আমরা পশি নীল অতল
আমরা ছাত্রদল।
আমরা তাজদালুনে লাল করেছি
সরস্বতীর শ্বেতকমল
আমরা ছাত্রদল।।

–(বিষের বাঁশী)

'মায়া-মুকুর' কবিতাতে কবি ছাত্র সমাজকে এই বাণী দিয়াছেন–

"অনাগত মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে তোমরা সবে,
ধর্মরাজ্য আনিতে আবার মেতেছো মহোৎসবে।"

এই বাণী দিয়াই কি কবি আজ পাকিস্তানের ছাত্র সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিবেন?

কবির 'বাংলাদেশের' ছবি দেখুন–
"নমঃ নমঃ নমো বাঙলা দেশ মম
চির-মনোরম চির-মধুর।
বুকে নিরবধি বহে শত নদী
চরণে জলধির বাজে নূপুর।।
শিয়রে গিরিরাজ হিমালয় প্রহরী
আশিস মেঘবারি সদা তার 'পরে ঝরি
যেন উমার চেয়ে এ আদরিনী মেয়ে
ওড়ে আকাশ ছেয়ে মেঘ-চিকুর।।

www.pathagar.com

শরতে হেসে চলে শেফালিকা তলে
গাহিয়া আগমনী গীত মধুর।।"

-(বনগীতি)

'বিংশ-শতাব্দী' কবিতায় কবি তরুণদের কি চিত্র আঁকিয়াছেন দেখুন-

"হইল প্রভাত বিংশ শতাব্দীর
নব চেতনায় জাগো জাগো ওঠো বীর।"....
"আমরা ভেঙেছি রাজার সিংহাসন
করিয়াছি নরে আমরা গো নারায়ণ।
পায়ের তলার মানুষে টানিয়া
বসায়েছি দেব বেদীতে আনিয়া
কাটায়ে উঠেছি ধর্ম-আফিম-নেশা
ধ্বংস করেছি ধর্মযাজকী পেশা
ভাঙি মন্দির ভাঙি মসজিদ
ভাঙি গীর্জা গাহি সঙ্গীত
এক মানবের একই রক্ত-মেশা।
কে শুনিবে আর ভজনালয়ের হ্রেষা॥"

-(প্রলয়-শিখা)

মনে হয় যেন লেনিনের বাণী শুনিতেছি ঃ লেনিন বলিয়াছিলেন ঃ-

'We shall no more eat of this opium of the people.' ধর্মকে কম্যুনিস্টরা 'আফিম' বলিয়া অভিহিত করে। নজরুলও তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে-কবি মন্দির-মসজিদ সব ভাঙিয়া একাকার করিলেন। আজানকে 'হ্রেষা' (ঘোড়ার ডাক) বলিয়া বিদ্রূপ করিলেন, সেই কবিই আবার নরকে নারায়ণ করিয়া তাহাকে দেবতাদের বেদীমূলে আনিয়াছেন বলিয়া গর্ব করিতেছেন। হিন্দু দেব-দেবীকে দেখিলেই নজরুলের সব 'বিদ্রোহ' শান্ত হইয়া যায়।

পাকিস্তানের ছাত্র, যুবক ও অগ্রপথিকদল কবির এই সব বাণীর মধ্যে আজ কোন্ প্রেরণা লাভ করিবে?

নজরুলের সমর-সঙ্গীতেও ঐ একই কথা, একই সুর-

"টলমল টলমল পদভরে।
বীরদল চলে সমরে।।....
কাঁপে মন্দিরে ভৈরবী-একি বলিদান!
জাগে নিশঙ্ক শঙ্কর ত্যাজিয়া শ্মশান
দোলে ঈশান-মেঘে কালো প্রলয়-নিশান
বাজে ডম্বরু, অম্বর কাঁপিছে ডরে।।"

www.pathagar.com

এমনকি নজরুলের অতুলনীয় 'চল্ চল্ চল' মার্চ সঙ্গীতেও রহিয়াছে 'মহাশ্মশানকে' সজীব করিবার কথা–

"নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান"–

গোড়াতে 'মহাশ্মশান' স্থলে 'গোরস্তান' ছিল। নজরুল পরে 'গোরস্তা'নকে 'মহাশ্মশান' করিয়া দিয়াছিলেন। বোধ হয় গানটিকে 'অসাম্প্রদায়িক' করিবার জন্য।

চাষীর গান

নজরুল 'চাষীর গান' গাহিয়াছেন, কিন্তু সে চাষীটিও মুসলমান নয়!

"আমাদের জমির মাটি ঘরের বেটি
সমান, রে ভাই
কে রাবণ করে হরণ
দেখবো রে তাই।
এবারে পূজোয় নতুন
বলি দে সে-সব পাঁটা
দেখিবি আস্‌বে ফিরে
শক্তিময়ী আবার হেথাই।।

–(প্রলয়-শিখা)

এইরূপে যেদিক দিয়াই দেখি না কেন, নজরুলের ভাব ও প্রকাশভঙ্গির সহিত মুসলিম মন কিছুতেই সায় দিতে পারে না। যে কোনো বিষয় তিনি দেখিয়াছেন, হিন্দুর চোখ দিয়া দেখিয়াছেন, যে কোনো বিষয় ভাবিয়াছেন, হিন্দুর মন লইয়া ভাবিয়াছেন; যে কোনো বিষয় লিখিতে গিয়াছেন হিন্দুদের অনুকরণে হিন্দুয়ানি টেক্‌নিকে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনে দেবদেবী, মুক্তির গানে দেবদেবী, আযাদীর ধ্যানে দেবদেবী, ছাত্র ও যুবশক্তির উদ্বোধনে দেবদেবী, প্রশস্তি-গানে, চাষার গানে দেবদেবী–হিন্দুর বেদ-পুরাণের সঙ্গে সংযোগ না রাখিয়া তিনি কোনো কিছু বলেন নাই। এইখানে নজরুল ইসলাম শোচনীয়ভাবে দাস-মনোভাবের (Slave mentality) পরিচয় দিয়াছেন। আত্ম-প্রকাশে কোথায় তাঁহার স্বকীয় রূপ? কোথায় তাঁহার 'যুগপ্রবর্তক প্রতিভা'! মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎ ও অন্যান্য হিন্দু কবি-সাহিত্যিকরাও যে পথ দিয়া চলিয়াছেন। নজরুলও ঠিক সেই পথ দিয়াই তাহাদের পিছনে পিছনে চলিয়াছেন। ভাবে-ভঙ্গিতে মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের দলভুক্ত হইতে পারিলেই তিনি যেন নিজেকে বেশী গৌরবান্বিত মনে করিতেন। যে মনোভাব কাটাইয়া উঠিবার জন্য আমাদের এত চেষ্টা চলিতেছিল, বাংলা-সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা প্রবর্তনের যে সাধনা শুরু হইয়াছিল, নজরুল সেই আন্দোলকে এক যুগ পিছাইয়া দিয়াছেন। এখন আর শুধু হিন্দুদিগকে দোষ দিলে চলিবে না। হিন্দুরা নিজেদের সাহিত্যে-সৃষ্টিতে দেবদেবীর প্রসঙ্গ আনিয়া কিছুই

www.pathagar.com

অন্যায় করে নাই, ইহাই তো স্বাভাবিক। আপন আপন জাতীয় ঐতিহ্য ও আদর্শের রূপায়ণই তো কবি-সাহিত্যিকদের ধর্ম। কিন্তু নজরুল ইসলাম এইখানে চরম পরাজয় মানিয়াছেন। এর চেয়ে দুঃখের কথা জাতির পক্ষে আর হইতে পারে না। অতবড় প্রতিভাও যদি জাতিকে মুক্ত আলোকে আনিয়া তাহাকে সোজা করিয়া দাঁড় করাইতে না পারে, তবে আর কে পারিবে? বাংলা সাহিত্যে যে বিজাতীয় ভাবধারায় মুসলিম সমাজের মন ও মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন হইয়াছিল, নজরুল তাহা হইতে আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারেন নাই, বরং সে ভাবধারাকে তিনি আরও আমাদের মধ্যে সুদৃঢ় করিয়া দিয়া গেলেন! আমরা যাহা ভুলিতে চাহিয়াছিলাম, তিনি আমাদিগের মনে তাহাই বেশী করিয়া বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছেন।

নজরুল-কাব্য পড়িয়া এই বৈশিষ্ট্যই আমাদের চোখে ধরা পড়ে যে, তিনি স্রষ্টা ছিলেন, কিন্তু দ্রষ্টা ছিলেন না। কবিরা যুগের আগে আগে চলেন। অনাগত ভবিষ্যৎ তাঁহাদের চোখে ছায়া ফেলে। ইকবাল পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখিলেন এমন যুগে–যখন ভারতের মুসলমানদের কোনো বলিষ্ঠ আত্মচেতনাই ছিল না। আশ্চর্যের বিষয়, নজরুল ইসলাম সেই ইকবাল-যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াও পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখিতে পারিলেন না! তিনি দেখিলেন কিনা ভারত-লক্ষ্মীর স্বপ্ন! নজরুল ইসলামের পক্ষে এ এক মস্তবড় দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। পাকিস্তান আজ শুধু বাস্তব হইয়াই আসে নাই, সে চলিয়াছে এক নূতন জয়-যাত্রার পথে। অদূর ভবিষ্যতে ইসলাম যে অভিনব ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবে, পাকিস্তান তাহাতে এক গৌরবময় অংশ গ্রহণ করিবে। আফ্‌সোস্! সেদিন নজরুল ইসলামকে আমরা কোন্ দলে দেখিব? ইসলামের জয়-গৌরবের দিনে যখন দিকে দিকে দামাম মুবাজিবে, মুহুর্মুহু তকবীর-ধ্বনি উঠিতে থাকিবে, গগনে গগনে হিলালী ঝাণ্ডা উড়িতে থাকিবে, কাতারে কাতারে বীর মুজাহিদ দল মিছিল করিয়া সেই নিশানের তলে আসিয়া দাঁড়াইবে–ইকবাল, কায়েদ-ই আযম, মোহাম্মদ আলি ইত্যাদি বীরবৃন্দ অভিনন্দিত হইবেন, সেদিন নজরুলকে যদি আমরা গান্ধী-অরবিন্দ-বিবেকানন্দ-প্যাটেল-নেহরু-আজাদ-মদনীর দলে দেখি, তবে আমাদের দুঃখের সীমা থাকিবে না।

নজরুল ইসলামকে আমরা একটি 'যুগ প্রবর্তক' প্রতিভা বলিয়াই জানি। কিন্তু আজ আমাদের মনে এই জিজ্ঞাসা জাগে, কোন্ যুগের তিনি প্রবর্তন করিলেন? 'পাকিস্তাণি যুগের'? নিশ্চয়ই না; কারণ তিনি ছিলেন এই যুগ-প্রবাহের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে দাঁড়াইয়া। যুগ প্রবর্তনের কথাই যদি আসে, তবে বলিতে হইবে, তিনি চাহিয়াছিলেন, 'অখণ্ড ভারতের যুগ। তাঁর সমস্ত লেখাতে আছে সেই ধ্যান, সেই বাণী। কিন্তু সে যুগ তো আসে নাই! 'পাকিস্তান' আসিয়া নজরুলের সে সাধের স্বপ্ন একদম 'মাটি' করিয়া দিয়াছে। কাজেই বলা যায় নজরুলের যুগ আসে নাই এবং আসিয়া থাকিলেও পাকিস্তানের চাপে পড়িয়া তাহা খতম হইয়া গিয়াছে। আমরা সত্যই ভাবিয়া পাই না অতবড় একটা যুগ-প্রতিভা কেমন করিয়া একটা নূতন যুগের পায়ের ধ্বনি শুনিতে পাইল না। যে পাকিস্তান-যুগ তাঁহারই আঙিনার পাশ দিয়া চুপে চুপে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল, নীল আসমানে যার নিশান উড়িতেছিল, তারায় তারায় যার চোখের ইঙ্গিত লেখা ছিল, পাখির কলরবে যার আনন্দ-গান বাজিতেছিল, পদ্মা-মেঘনা-কর্ণফুলীতে যার ছায়া পড়িয়াছিল,

www.pathagar.com

মেহেদী-মাখা কাঁজল-আঁকা সেই পাকিস্তানের মেয়ের প্রতি নজরুল ভুলিয়াও তাকান নাই; তিনি তাকাইয়াছিলেন 'আশ্বিনের শিউলি-তলায় কে বালিকা চলে'–তাহার দিকে! ইহা কি সমগ্র মুসলিম সমাজের পক্ষে গভীর পরিতাপের বিষয় নয়?

এতক্ষণ আমরা দুইটি দৃষ্টিকোণ হইতে নজরুল ইসলামকে দেখিলাম ঃ (১) ইসলামের দৃষ্টিকোণ হইতে ও (২) পাকিস্তানের দৃষ্টিকোণ হইতে। ইসলামের আলোকে দেখিলে দেখা যায়, ইসলামের সনাতন আদর্শের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা তাঁর কাব্যে আছে। পাকিস্তানের আলোকে দেখিলেও দেখা যায়, পাকিস্তানের আদর্শ ও ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা তিনি বলিয়াছেন। পাকিস্তানে এই দুইটি ভাবধারার একটিও আর চলিবে না, একথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায়।

এই জন্যই বলিয়াছিলাম ঃ নজরুল এ যুগের একজন অসামান্য প্রতিভা হইলেও তাঁর কাব্য পাকিস্তানের পরিবর্তিত মনোভঙ্গিমায় কতোদূর স্বীকৃতি পাইবে, বলা কঠিন।

বারান্তরে আমরা কবির উজ্জ্বল দিকের আলোচনা করিব।

নওবাহার, ১৯৫০

সাহিত্যে অসাম্প্রদায়িকতা

সম্প্রতি কোনো একটি বার্ষিক পত্রিকায় "সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা" নামক একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি কিছুদিন পূর্বে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির' এক সভায় পঠিত হয়েছিল, আর তা শুনে শ্রোতৃমণ্ডলী সবাই একবাক্যে তার প্রতিবাদ করেছিলেন। সেই সমালোচনার ফলে লেখক বহুস্থানে তার উক্তি ও যুক্তিকে পাল্টিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু দুইকুল বজায় রাখতে গিয়ে কোনো কুলই তিনি রাখতে পারেননি; ফলে প্রবন্ধটির মধ্যে এত গোঁজামিল ও স্ব-বিরোধী উক্তি স্থান পেয়েছ যে, সেটা একেবারে অপাঠ্য হয়ে পড়েছে। লেখকের নিজের মত যাই হোক না কেন, তার বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে যদি একটা সামঞ্জস্য বা সুসংগতি থাকতো, তা হলেও লেখাটা ধৈর্য ধরে পড়া যেত। কিন্তু কোনো দিক দিয়েই কিছু হয়নি। প্রবন্ধটি পড়ে স্পষ্টতই মনে হয় লেখক কি যে বলতে চান, তা তিনি নিজেই জানেন না।

প্রবন্ধের শিরোনামা এবং ভঙ্গিমা দেখেই মনে হয়, লেখক সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী। তিনি আরম্ভ করেছেন সেই ভাবে। গোড়াতেই তিনি বলেছেন ঃ "সাহিত্য চিরন্তনের সাধনা-ক্ষেত্র। ইহাতে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই।" অর্থাৎ সাহিত্যের বাণী হবে দেশাল ও পাত্রাতীত। কিন্তু একটু অগ্রসর হয়েই তিনি বলছেন ঃ "সাহিত্যের অন্তরভাগ চিরন্তনের সাধনা-ক্ষেত্র হইলেও তার বহির্ভাগ দেশ-কাল-পাত্রেরই লীলাভূমি।" এমন কি একথাও বলে ফেলেছেন–"এই প্রকাশ-ভঙ্গি (অর্থাৎ বহিরঙ্গ) দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী করিতে না পারিলে সাহিত্য-সৃষ্টিই সার্থক হয় না, সুন্দর হয় না,–অস্বাভাবিক হইয়া উঠে।"

শুধু তাই নয়। বাংলা সাহিত্য যে মুসলমানদিগের হস্তে "অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই মুসলমানী রূপ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে", এবং এই স্বাভাবিক প্রকাশ-ভঙ্গিকে চিরন্তনের

www.pathagar.com

দোহাই দিয়ে হিন্দুগণ যে 'অভিশপ্ত' করবার মতলবে আছেন, এতে তিনি হিন্দুদিগকেও খুব খানিকটা গালিমন্দ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "ধর্মাদর্শের পার্থক্যে হিন্দু-মুসলমানের জীবনযাত্রা প্রণালীতেও (তথা সাহিত্যেও) যে একটা পার্থক্য ঘটিবে, ইহাতে বিচিত্রিতা কিছুই নাই।" শুধু যে তিনি ভাবের দিক দিয়ে সাহিত্যের মুসলমানী রূপের কথা বলেছেন, তা নয়; "ভাষায় মুসলমানী রূপ" সম্বন্ধেও তিনি হিন্দুদিগকে নসিহত করতে কসুর করেননি। তাঁর মত এই যে, "বাংলা সাহিত্যের ভাবে এবং ভাষায় অর্থাৎ অন্তরভাগে এবং বহির্ভাগে সর্বত্রই মুসলমানের নিজস্ব রূপ থাকা স্বাভাবিক।

পাঠক, লেখকের স্ববিরোধিতা দেখলেন। কোথা থেকে আরম্ভ করে কোথায় তিনি এলেন? প্রথমে বললেন ঃ সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই" আবার একটু পরেই এসে বললেন ঃ এ গণ্ডী না থাকলেই চলবে না। শুধু ভাষা নয়, ভাবের দিক দিয়েও বাংলা সাহিত্যকে 'মুসলমানী রূপ' দিতে হবে। কোথায় গেল অসাম্প্রদায়িকতা, কোথায় গেল 'অন্তরভাগ' আর 'বহির্ভাগ'! ভিতরে বাহিরে–সর্বত্রই তো তিনি সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী টেনে দিলেন। তাঁর কোন্ মতটা এখন গ্রহণ করবো?

ধরে নেওয়া গেল, লেখক তাঁর পূর্বমত বর্জন করেছেন। তা হলে তাঁর বর্তমান মত এই দাঁড়াচ্ছে যে, সাহিত্য চিরন্তনের সাধনা-ক্ষেত্র হলেও দেশ-কাল-পাত্র ভেদে তার ভাব ও ভাষায় স্বতন্ত্র রূপ চাই। কিন্তু ওঃ কপাল! মুসলমানের দিকে যেই ফিরে দাঁড়িয়েছেন, অমনি তাঁর মুখে আবার নূতন কথা! এইখানে এসে তিনি আবার সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি বলছেন ঃ "মুসলমান সমাজ ও সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিয়াছে।" এমন কি 'মুসলিম সাহিত্য' কথাটাই তিনি বরদাশত করতে পারেন না। ওটা নাকি 'অর্থ শূন্য একটা প্রলাপ' মাত্র। ইংরাজী সাহিত্য, পার্শী সাহিত্য, জাপানী সাহিত্য ইত্যাদি বলে কথা হতে পারে বটে, কিন্তু 'মুসলিম সাহিত্যের' কোনো মানে হয় না! কি উদ্ভট যুক্তি! এটাও কি বলে বুঝাবার প্রয়োজন রাখে যে, লেখকের বর্ণিত "ভাব" ও "ভাষার" "মুসলমানী রূপই" হচ্ছে মুসলিম-সাহিত্য? জাতি হিসাবে যখন কোনো ভাষার নামকরণ হবে, তখন বুঝতে হবে–সেই জাতির বিশিষ্ট ভাব, আদর্শ, ঐতিহ্য ও প্রকাশ-ভঙ্গিই তার ভাষায় রূপায়িত হয়েছে। হিন্দু-সাহিত্য, গ্রীক-সাহিত্য, ফরাসী-সাহিত্য ইত্যাদি বললেই প্রধানতঃ সেই ধারণাই মনে জাগে। প্রত্যেক ভাষারই একটা বিশিষ্ট রূপ ও মেজাজ আছে ঃ সে ভাষার নাম করলেই সেই বিশেষ রূপটির কথা মনে পড়ে। 'বাংলা-সাহিত্য' বললে সমগ্র বাঙালি জাতির ধ্যান-ধারণাই আমরা বুঝি। কিন্তু জাতি হিসাবে বাঙালি তো একটা জাতি নয়; 'বাঙালি' বলতে বাংলাদেশের হিন্দু, মুসলমান, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ইত্যাদি সবাইকেই বুঝায়। বিভিন্ন সম্প্রদায়কে মিলিয়েই বাঙালি জাতি। কাজেই বাংলা সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ রূপ আছে। এই বিশেষ রূপগুলিই তার সাম্প্রদায়িক রূপ। 'সাম্প্রায়িকতা' তাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনিবার্য হয়ে আছে। এটা কোন দোষের কথা নয়। হিন্দু যখন তার বেদ-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত ও অন্যান্য ঐতিহ্যকে রূপ দেবে, তখন তাকে আমরা বলবো হিন্দু-সাহিত্য। বৈষ্ণব যখন তার নিজস্ব ভঙ্গিতে সাহিত্য রচনা করবে, তখন তা হবে বৈষ্ণব-সাহিত্য। সেইরূপ মুসলমান যখন

www.pathagar.com

তার আপন ঐতিহ্য, আদর্শ ও ধ্যান-ধারণাকে রূপ দেবে, তখন তাকেও আমরা বলবো 'মুসলিম সাহিত্য'। এই সহজ সত্যটা লেখক কেন বুঝাতে পারেন না, বুঝা কঠিন। এখানে এসে লেখক অত্যন্ত বিকৃত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। হিন্দু ও বৈষ্ণবের বেলায় যা তিনি মেনে নিয়েছেন, মুসলমানের বেলায় তা তিনি মানেননি। হিন্দু বা বৈষ্ণব যখন তাদের সাহিত্যে আপন আপন বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলে, তখন সে-সাহিত্যে তিনি অসাম্প্রদায়িকতার রূপ দেখেন; কিন্তু মুসলমান যেই তার আপন আদর্শ ও রূপরসে সাহিত্য-সৃষ্টি করতে চায়, তখনই লেখক তার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার উগ্রগন্ধ অনুভব করেন। এই যুক্তির কোনো সারবত্তা স্বীকার করা যায় কি?

পাঠক লক্ষ্য করেছেন, উপরে লেখক ভাষার ন্যায় ভাবের দিক দিয়েও অর্থাৎ "অন্তরভাগেও" মুসলমানী রূপের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এসেছেন। কিন্তু একটু পরেই বলছেন ঃ "বাংলা-সাহিত্যের যে একটা মুসলমানী রূপ আছে, তাহা আমরা জানি এবং মানি। কিন্তু ইঁহাদের (কাহাদের?) কথার ভাবে বুঝা যায়-ইঁহারা শুধু মুসলমানী রূপের কথাই বলেন না, সাহিত্যের অন্তরটাকেও ইহারা মুসলমান করিয়া লইবেন। কিন্তু তাহা হয় না, কারণ তাহা করিতে গেলে সাহিত্য মুসলমানীতে পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সাহিত্য টিকিয়া থাকিবে না। সাহিত্যের অন্তর মানুষের বাণীতে পূর্ণ।" কী বিকৃত ধারণা ও হীনমন্যতা! এ যেন ঠিক 'ভদ্রলোক' ও 'মুসলমানের' পার্থক্যের মতো! 'মুসলমান' হলে আর সে 'ভদ্রলোক' হয় না-এতদিন এই কথাই জানতাম; এখন লেখক মহাশয়ের কাছে জানলাম-সাহিত্যে ইসলামী ভাব ঢুকলে তা আর সাহিত্য হয় না। অন্য কথায় ঃ 'মুসলমান' হলে সে যখন 'মানুষ' হয় না, তখন তার সৃষ্ট সাহিত্য সাহিত্য-পদবাচ্যও হয় না, কারণ সাহিত্যে থাকে 'মানুষের বাণী'-মুসলমানের বাণী নয়।

পাছে মুসলমানেরা ক্ষেপে গিয়ে একটা অনর্থের সৃষ্টি করে, এই ভয়ে লেখক আবার বলছেন, "মুসলমান চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিতে পারে ঃ কি! মুসলমান কি মানুষ নয়? তাহার বাণী কি মানুষের বাণী নয়? নিশ্চয়ই; তাহা কেহই অস্বীকার করে না। (অথচ উপরে কিন্তু ক'রে এলেন!) মুসলমান নিশ্চয়ই মানুষ এবং মানুষ হিসাবে তাহার স্থান নিশ্চয়ই সাহিত্যে আছে। কিন্তু তাহা মানুষের হিসাবেই আছে-মুসলমানের হিসাবে নহে।"

যাক্ মরতে মরতে বেঁচে গেল! মুসলমানের কপাল জোর বলতে হবে। লেখক এবার যখন Patronise করে বলছেন যে, মুসলমান নিশ্চয়ই মানুষ, তখন নিশ্চয়ই মুসলমান মানুষ! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ঃ -ইসলাম যদি চিরন্তন মানুষেরই মর্মবাণী হয়, আর মুসলমান যদি সেই শাশ্বত বাণীকেই তার সাহিত্যে রূপ দেয়, তবে তা সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারে কি না? ইসলামই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম-যাতে চির-মানুষের বাণী বিঘোষিত হয়েছে। কাজেই 'মানুষের বাণী' বলা আর 'ইসলামের বাণী' বলা মূলতঃ একই। আর যদি কোথাও সাহিত্যের সঙ্গে ইসলামের বিরোধই বা দেখতে পাওয়া যায়, তাতেই বা ভয় কি? ইসলামের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও সাহিত্য -সৃষ্টি সম্ভব। সাহিত্যে ইসলাম এলে যদি তা সাহিত্য না হয় তবে সে দোষ ইসলামের নয়-লেখকের। সেখানে বুঝতে হবে লেখকের হাতে সোনার কাঠির যাদুস্পর্শ নেই-আছে বাঁশের কলম।

www.pathagar.com

সাহিত্য সৃষ্টি উদ্দেশ্যবিহীন নয়। সাহিত্য জীবনেরই বিশ্লেষণ। ধর্ম সেই জীবনকেই তো ধারণ করে আছে। কাজেই ধর্মও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। তাকে বাদ দিয়ে সাহিত্য হয় না। ক্ষণিক উত্তেজনা বা তরল আনন্দ দানই সাহিত্যের লক্ষ্য নয়। কিন্তু লেখকের সাহিত্য স্বতন্ত্র রকমের। ধর্ম বা জীবনাদর্শের কথা উঠলেই তিনি তাকে সাহিত্য বলতে নারাজ। কিন্তু একটু ধীরভাবে ভেবে দেখলে দেখা যাবে–কোনো সাহিত্যই সাম্প্রদায়িক ছাড়া হতে পারে না। শারাব এক হলেও তা বিভিন্ন পান-পাত্রের মধ্য দিয়ে আনতে হয়। এটুকু সংকীর্ণতা অপরিহার্য। ইংরাজীতে একেই বলা হয়েছে "Local colouring" এই সাম্প্রদায়িক বা স্থানিক রূপ থাকলেই যে তা বিশ্ব-সাহিত্য হয় না, এ ধারণা ভুল। সাহিত্যে, শিল্পে, আর্টে বিশেষ নির্বিশেষ, ব্যক্তি নৈর্ব্যক্তিক হয়–সাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন হয়। বিশেষের মধে নির্বিশেষ আছে বলেই তা হয়ে ওঠে সর্বজনগ্রাহ্য। সাহিত্যের পরীক্ষাও তো সেইখানে। কাজেই এতে ভয় করবার কিছু নেই।

লেখক যাকে "অসাম্প্রদায়িক সাহিত্য" বলছেন, ন্যায়শাস্ত্রের নিয়মানুসারে তাও তো সাম্প্রদায়িক! সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতাকে এড়িয়ে যে সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করলো, তাও-তো আরেক ধরনের সাম্প্রদায়িক হয়ে দাঁড়ালো। কোনো দলকে যারা মানে না, তারাও তো আরেকটা স্বতন্ত্রদল–দল-না মানা দল! কাজেই এর থেকে মুক্তি কোথায়?

'সাহিত্য' আর 'ধর্মের' মধ্যে যদি তুলনা করতেই হয়, তবে ধর্মকে ফেলে শুধু সাহিত্য নিয়ে আমরা থাকতে পারি না। সাহিত্যের চেয়ে ধর্ম বড়। যুগধর্মের কল্যাণে বা মানুষের বিকৃত মনোবৃত্তির ফলে সাহিত্য যদি তার লক্ষ্যপথ থেকে বিচ্যুত হয় এবং দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষই যদি সেই বিকৃত সাহিত্যেকেই চিরন্তন মানুষের প্রাণের বাণী বলে ধরে নেয়, তবে বুঝতে হবে–মানুষের মূল্যবোধ ও নৈতিক আদর্শের অবনতি ঘটেছে।

যাদের সাহিত্য বিশ্বসাহিত্য বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে, তাদের সম্বন্ধেও যে আমাদের ধারণা নির্ভুল, সে সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ আছে। যে শেক্সপিয়ার সম্বন্ধে বর্তমান জগৎ এত উচ্চ ধারণা পোষণ করে, সেই শেক্সপিয়ারের গ্রন্থ সম্বন্ধেই মনীষী টলস্টয় নিতান্ত হীন ধারণাপোষণ করে গেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"I remember the astonishment I felt when I first read Shakespeare. I had expected to receive a great aesthetic pleasure, but on reading, one after another, the works regarded as his best—King lear, Romeo Juliet, Hamlet and Magbeth—not only did I not experience Pleasure, but I felt an insuperable repulsion and tedium and a denlet whether I lacked sense, since I considered works insignificant and simply bad which are regarded as the summit of perfection by the whole educated world."

সমগ্র শিক্ষিত জগৎ শেক্সপিয়ারের যে সব গ্রন্থ সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছে, তা পড়েও টলস্টয় কোনো আনন্দ পাননি। কাজেই বলা যেতে পারে, বাজারে যা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলে বিকিয়ে যায়, তা যে সর্বকালে সর্বলোকের কাছে বাস্তবিকই শ্রেষ্ঠ,; সে কথা বলা কঠিন। কার আনন্দ যে সাহিত্যের কষ্টি-পাথর সে প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত রয়ে গেছে।

www.pathagar.com

শাস্ত্রবাণী সম্বন্ধে লেখক একবার বলেছেন যে, সাহিত্যে শাস্ত্রবাণীর কোনো স্থান নেই। কিন্তু আবার করুণা করে বলেছেন যে, 'কোনো কোনো শাস্ত্রবাণীও সাহিত্যে স্থান পেতে পারে, আর তা বিশিষ্ট কোনো শাস্ত্রবাণী হলেও বিশ্বমানুষের প্রাণের বাণী বলে গৃহীত হয়ে থাকে।' লেখক একথা যদি বিশ্বাস করেন তবে ইসলামের বাণী দ্বারাও যে সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব, তা তিনি মানেন না কেন? কিন্তু সাহিত্যে ইসলাম ঢুকলে তা যদি 'মুসলমানিত্বে' ভর্তি হয়ে ওঠে, আর অপর কোনো শাস্ত্রবাণী ঢুকলে তা যদি বিশ্ববাণী হয়ে যায়, তবে আমরা নাচার।

লেখক শাস্ত্রবাণীর বিরুদ্ধে এত চটা, তার কারণ হচ্ছে শাস্ত্র অতীতের। অতীতকে তিনি দু'চোখ পেতে দেখতে পারেন না। তাই তিনি সবাইকে বর্তমানের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে উপদেশ দিয়েছেন। লেখকের মতে "অতীত অতীতই, তাহা মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে। অতএব অতীতপ্রীতি আমাদের মৃত্যুরাই অরিষ্ট লক্ষণ।"

লেখক অতীতের প্রতি যে রায় দিয়েছেন, তা টিকতে পারে কি? অতীত কখনও মরে ভূত হয়ে যায় না। সে চিরদিনই বেঁচে থাকে। বরং লেখকের অতি-সাধের বর্তমানেরই কোনো অস্তিত্ব নেই। কাকে, তিনি বর্তমান বলেন? অনাগত ভবিষ্যৎ প্রতি মুহূর্তে অতীতে পরিণত হচ্ছে। কালস্রোত অতীতে মিশেই একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাচ্ছে। এই উভয়ের সন্ধিক্ষণ– যাকে কল্পনা ছাড়া ধরা যায় না–সেইটুকুই আমাদের বর্তমান। বর্তমানকে নিয়ে কোনো কাজ চলে না। এক মুহূর্ত দেরী করলেই বর্তমান অতীতের আড়ালে লুকিয়ে যায়। অথচ আড়াল থেকেই সে সবকিছু নিয়ন্ত্রিত করে। তার প্রভাব কিছুতেই আমরা এড়াতে পারি না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌছে দেখি, বর্তমান আমাকে সেখানে পৌছে দিতে পারেনি; অতীতের পদক্ষেপগুলিই আমাকে সেখানে পৌছে দিয়েছে। গন্তব্য স্থানের শেষ পদক্ষেপের মধ্যে অতীতই কানে কানে কথা বলে যায়। অতীতের সঙ্গে যোগ-সম্বন্ধ রেখেই তবে না আমি আমার গন্তব্যস্থলে পৌছাতে পেরেছি! বর্তমান বলে যদি কিছু থাকে, তবে অতীতই তার নিয়ামক। অতীতের ভিত্তির উপরেই বর্তমান ও ভবিষ্যত খাড়া রয়েছে, সুতরাং অতীতকেও ভেঙে ফেললে সেই সাথে বর্তমান ও ভবিষ্যতও হুড়মুড় করে পড়ে যায়। বৃক্ষের অন্তরাত্মা ফুল হয়ে ফুটে উঠতে গিয়ে যদি বলে যে, অতীতের এই পুরাতন কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখাকে আমি মানিনা, এগুলোকে দূর করে দাও, তবে সে কি করে ফুটবে? মরুপথেই সে হারিয়ে যাবে। বস্তুতঃ কাল অখণ্ডরূপে এক। এর ধারাবাহিকতা কোথাও ছিন্ন করা যায় না। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত–একটার সঙ্গে অন্যটা অন্তর্বিজড়িত। কাজেই অতীত কখনো মরে ভূত হয়ে যায় না। গোপনে গোপনেই সে তার কাজ করে যায়। রবীন্দ্রনাথ তাই ঠিকই বলেছেন–

"হে অতীত; তুমি গোপনে গোপনে
কাজ করে যাও ভুবনে ভুবনে।"

বাস্তবিকই, বর্তমান জগতের যতো বড় বড় কীর্তি তা অতীতেরই দান। লেখক যদি অত চুল-চেরা হিসাবই করেন, তবে দেখবেন তার এই লেখাটাও অতীতের চৌহদ্দীর মধ্যে গিয়ে পড়েছে। এমন কি তিনি নিজেও। সুতরাং আত্ম-বিসর্জন ছাড়া তাঁর আর গত্যন্তর নেই। কথায় আছে, একই লোক একই নদীতে দু'বার গোসল করতে পারে না।

যে প্রবন্ধটির প্রতিবাদে লেখক এই প্রবন্ধটির লিখেছিলেন, সেটি হচ্ছে আমরাই লেখা একটি প্রবন্ধ, নাম–"মুসলিম সাহিত্যের গতি ও লক্ষ্য।" প্রবন্ধটি গত বৎসর মাঘ সংখ্যা 'মোহাম্মদীতে' ছাপা হয়েছিল। উক্ত প্রবন্ধে আমি এই কথাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলাম যে, আমাদের সাহিত্যের গতি ও লক্ষ্য নিয়ন্ত্রিত হবে–অতীত যুগের মুসলিম জ্ঞান-কর্ষণার লক্ষ্য ও আদর্শ দ্বারা। এ কথার দ্বারা আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, সেমিটিক কালচারের যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল–ইহকাল এবং পরকাল বা দীন-দুনিয়াকে মিলিয়ে জীবন-পথে অগ্রসর হওয়া।

আমাদের কালচারেরও সেই আদর্শ হবে। বিজ্ঞান এবং ধর্ম—দুই-ই আমাদের লক্ষ্য হবে। দুটোকে মিলিয়ে আমরা আমাদের কালচার গঠন করবো। আমরা প্রগতিপন্থীও হবো, আবার আমাদের অতীত ঐতিহ্যকেও বর্জন করবো না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লেখক এ কথার মর্ম অনুধাবন না করেই প্রতিবাদে বললেন যে, "এক শ্রেণীর মুসলমান সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যেকে কলমা পড়াইয়া মুসলমান করিয়া লইবার উদ্ভট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বাঙালী মুসলমান জাতিকে (?) অতীত মুসলমানী গৌরবের যুগে ফিরিয়া যাইতে আদেশ জারী করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা ভুলিয়া যান যে, অতীত অতীতই, তাহা মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে।"

আমরা গোঁড়ামি বা অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তাকে মোটেই পছন্দ করি না। সেগুলি নিশ্চয়ই দোষের। স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণ হওয়া যে নিতান্তই দরকার, সে কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু তাই বলে স্বাধীনতা ও প্রগতির নামে–উচ্ছৃঙ্খলতাকে তো প্রশ্রয় দিতে পারিনা। ধর্ম, নীতি ও জাতীয় আদর্শ বা ঐতিহ্যের রূপায়ণ সম্বন্ধে কোনো সাহিত্যকে সজাগ হতে বললেই যে সেটা একটা ঘোরতর চিন্তার বন্ধন বলে মনে করতে হবে, আমাদের ধ্যান-ধারণাকে আমাদের আঙ্গিকে রূপ দিতে গেলেই যে সেটা একদম অস্পৃশ্য সাম্প্রদায়িক সাহিত্য হয়ে দাঁড়াবে–এরূপ হীনমন্যতা যেন আমাদের মধ্যে না আসে। যে-কোনো সাহিত্য সম্বন্ধে চিন্তা করলেই দেখতে পাওয়া যায়– সমস্ত সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টিই ঐতিহ্য-ভিত্তিক। কবি-শিল্পীরা নিজ নিজ জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই তাঁদের শিল্প ও সাহিত্য রচনা করেছেন এবং সেই "সাম্প্রদায়িক" সাহিত্যই বিশ্বসাহিত্যরূপে পরিগৃহীত হয়েছে। মিলটন, শেক্‌সপিয়ার, হাফিজ, রুমী–কাকে রেখে কাকে উল্লেখ করবো? রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই কথা। বস্তুতঃ বিশ্ব-সাহিত্যের স্বরূপ ও প্রকৃতিই এই। বিশ্বসাহিত্য নূতন কোনো অশ্বডিম্ব নয়। আকাশ থেকেও তা মাটিতে পড়ে না। নানা বর্ণে, নানা রূপে, নানা গন্ধে তার প্রকাশ। বিশ্বের শাশ্বত যে প্রেম, তাজমহলে সেই প্রেমেরই ইসলামী রূপ। সৃষ্টির চমৎকারিত্বে তাজমহল তার সাম্প্রদায়িকতার সাম্প্রদায়িক গণ্ডী অতিক্রম করেছে।

সাহিত্যের কথাও তাই। সাম্প্রদায়িকতাকে বর্জন করে অসাম্প্রদায়িক হওয়া যায় না। নবসৃষ্টির চমৎকারিত্ব দিয়ে, চিরন্তর অনুভূতির আবেদন দিয়ে শিল্পকর্মকে বিশ্বজনীন করে তুলতে হয়। এইখানেই শিল্পীর পরিচয়।

মাসিক মোহাম্মদী,

আষাঢ়, ১৩৩৫, ১৯২৮

www.pathagar.com

যশোহর,-খুলনার ইতিহাস

(সমালোচনা)

ইতিহাসের প্রতি দিন দিন দেশবাসীর অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতেছে। যে সকল লেখক এহেন শুভার্থে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহারা দেশের লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু ইতিহাসের নামে যা-তা একটা কিছু লিখিলেই দেশবাসী লেখককে সম্মান করিবে না। বাংলার মতো দেশে যেখানে হিন্দু-মুসলমান দুইটি জাতি পাশাপাশি বাস করিতেছে, সেখানকার ইতিহাস লিখিতে গেলে অতীব সতর্কতার সহিত ন্যায়-বিচার করিয়া অপক্ষপাত ভাবে লিখিতে হইবে।

যাক। আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতেছে "যশোহর-খুলনার ইতিহাস।" দৌলতপুর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র মিত্র মহোদয় ইহার প্রণেতা। প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ড এখনও বাহির হয় নাই। এই প্রবন্ধে আমি উক্ত গ্রন্থের ঐতিহাসিক সমালোচনা করিতে পারি না। সেটা আমার পক্ষে অনধিকারচর্চা। কারণ, আমি ঐতিহাসিক নই। বিশেষতঃ ইতিহাসের হিসাবে ইহার সমালোচনা দুই বৎসর পূর্বে 'ভারতবর্ষে' বাহির হইয়াছিল বলিয়া মনে পড়ে। এই প্রবন্ধে আমি মুসলমানের পক্ষ হইতে দুই একটি কথা বলিব। কিন্তু তাহার পূর্বে আমি যে কতিপয় ভ্রমের সন্ধান পাইয়াছি তাহার উল্লেখ করিব।

সতীশবাবু তাঁহার ইতিহাসের ১৫ পৃষ্ঠায় নদী-সংস্থান সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা ভ্রমপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। গড়াই নদী সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন–"পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় কুষ্টিয়ার সন্নিকটে গরাই বা গড়াই নদী পদ্মা হইতে বাহির হইয়া নদীয়া জেলা দিয়া যশোহরে প্রবেশ করিয়া কুমার নদের সহিত মিশে এবং পরে কুমারের শাখা বারাসিয়া দিয়া দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হয়।" ইহা কি সত্য? গড়াই নদী যশোহরে প্রবেশ করিল কোথায়? আর উহা 'কুমার নদের' সঙ্গেই বা কোথায় মিলিল? কুমার ও গড়াই নদীতে সংযোগ আছে বটে, কিন্তু যদ্দারা উক্ত নদ-নদীদ্বয় সংযোজিত হইয়াছে, তাহার নাম 'কালিগঙ্গা বা কালি গাঙ'। উক্ত কালি গাঙ কুষ্টিয়ার গড়াই Bridge-এর কিঞ্চিৎ নিম্নে গড়াই নদী হইতে বাহির হইয়া শৈলকুপার উজানে কুমার নদে আসিয়া মিশিয়াছে, ইহাই আমারা জানি। গড়াই কোথাও সোজাসুজি কুমারে আসিয়া মিশে নাই।

অন্য স্থানে (১৬ পৃ.) লেখা আছে–"মাগুরা নগরের উত্তরাংশে 'মুচিখালি' নামক একটি খালের দ্বারা 'নবগঙ্গার' সহিত 'কুমারের' মিলন হইয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মুচিখালি দ্বারা নবগঙ্গার সহিত কুমারের আদৌ মিলন হয় নাই। বরং কুমার আসিয়াই মাগুরার নিম্নে নবগঙ্গার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। আমরা মুচিখালি দিয়া বহুবার নৌকায় যাতায়াত করিয়াছি; তদ্দারা জানিতে পারিয়াছি মুচিখালি গড়াই নদী হইতে বাহির হইয়া কচুন্দী, মাঝাইল ইত্যাদি গ্রামের মধ্য দিয়া কুমারে যাইয়া মিশিয়াছে। সুতরাং মুচিখালি দ্বারা নবগঙ্গার সহিত কুমারের মিলন হইয়াছে, ইহা সত্য নহে। পুস্তকের প্রারম্ভে যে মানচিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

এ স্থলে একটি কথা মনে পড়িল। সতীশবাবু ভূমিকায় লিখিতেছেন –"আমাদের দেশে প্রায় সকলেই (সুতরাং তিনি· বাদ!) দূরে বসিয়া ইতিহাস লেখেন। আমি এই নীতির অনুসরণ করি নাই।" সতীশ বাবুর এই কথাগুলি উপরোল্লিখিত ভৌগলিক

www.pathagar.com

বিভ্রান্তির সহিত খাপ খায় কি? এসব কি প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল? ঐতিহাসিক কাহিনী লিখিবার সময়েও তিনি বোধ হয় এই নীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন।

এখন মুসলমানদের সম্বন্ধে কথা। পুস্তকখানি আগাগোড়া ভালো করিয়া পড়িলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে, মুসলমানদের কথাগুলি যেরূপ ভাবে লেখা উচিত ছিল, সেরূপ ভাবে তিনি লেখেন নাই। গৌরবের কথা চাপিয়া গিয়া, যাহা কিছু অগৌরব ও অসুন্দর, তাহাই ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন মাত্র। স্থানে স্থানে অযথা অনৈতিহাসিক অপবাদ আরোপ করিয়াছেন। কোথাও-বা তাঁহার লেখনি যবন শব্দও উদ্‌গীরণ করিয়াছে।

তারপর লেখক মহোদয় ইসলাম প্রচার এবং মন্দির ধ্বংস সম্বন্ধে সেই মামুলী দোষারোপই করিয়াছেন। সেই তরবারীর সাহায্যে জোর করিয়া ইসলাম প্রচারের কথা, সেই মন্দির ভাঙিয়া মসজিদ নির্মাণের কথা। পাঠক উক্ত গ্রন্থের ২৫৮ ও ২৫৯ পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই ইহা বুঝিতে পারিবেন। কোনো বিশেষ প্রমাণ নাই, দলিল নাই, তবুও তিনি বলিতেছেন–"অন্য দেশে সেভাবে (তরবারীর সাহায্য জোর করিয়া) ধর্মমত প্রচারিত হউক বা না হউক, পাঠান আমলে বঙ্গদেশে যে হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার ফলে হিন্দু-বৌদ্ধের উপর অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছিল। ফলে এই দাঁড়াইয়াছিল যে, এদেশে বহু সংখ্যক লোক মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তজ্জন্য আজকাল দেখিতে পাই বঙ্গের অনেক স্থানেই হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক।" এ সম্বন্ধে আমার আর বক্তব্য কি? এতদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, ঐ সব কথা লিখিবার পূর্বে লেখক মহোদয় Arnold সাহেবের "Preaching of Islam" গ্রন্থ পড়েন নাই। আর, যদি পড়িয়াও থাকেন, তবে ইচ্ছা করিয়াই সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। কোরআন-হাদিস ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ তো পড়েনই নাই; কারণ তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন ইসলাম প্রচারে বল-প্রয়োগ বিধি আদৌ নাই। অবশ্য আইন থাকিলেই যে অপরাধ থাকিবে না, আমি উক্ত কথা দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিতেছি না। দু'এক স্থানে হয়তো বলপ্রয়োগ ঘটিয়া থাকিবে, কিন্তু তাহা অতি বিরল, সুতরাং ইহা লইয়া একটা সাধারণ সত্য গড়িয়া তুলিলে চলিবে কেন?

তারপর মন্দির ভাঙার কথা। এটা একেবারে অস্বীকার করিতে চাহি না। কারণ, যখন দেখিতে পাই–বর্তমান যুদ্ধে ইউরোপের কতো সুরম্য গির্জা কামানের গোলায় ধূলিস্যাৎ হইয়া গিয়াছে; যখন দেখিতে পাই, হিন্দুগণ বৌদ্ধ জাতিকে ভারত ভূমি হইতে প্রায় সমূলে উৎপাটন করিয়াছিলেন, যখন দেখিতে পাই, মারাঠা দস্যুগণ মুসলমানগণের অনেক মসজিদ ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল তখন মুসলমানদের হস্তে যে মন্দিরাদি কিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই, একথা জোর করিয়া বলা যায় না। কিন্তু বক্তব্য এই যে, ইহার কারণ সম্বন্ধে লেখক মহোদয় যাহা নির্দেশ করেন তাহা নহে। রাজনীতির সঙ্গে ঐ সব ঘটনার সম্বন্ধ আছে। "আল-এসলামে" এসলামাবাদী সাহেব এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন।

সকলের চেয়ে মজার কথা এই যে, সতীশবাবু লিখিতেছেন– "আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ববিশ্রুত পুস্তকাগারের ধ্বংসকারী মুসলমানের বংশধরগণ ধর্ম প্লাবিত মগধ-বঙ্গে আসিয়া কতোস্থানে কতো কি ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল,তাহা বলিবার নহে।" –(২৬০ পৃ.) কল্পিত ইতিহাসে এরূপ অনৈতিহাসিক প্রবাদ বাক্য স্থান পাইলে, তাহাতে দুখ করিবার কিছু নাই। কল্পিত বলিলাম, যেহেতু সতীশবাবু উৎসর্গ পত্রে নিজেই লিখিয়াছেন–"কল্পিত, সংগৃহীত ও রচিত যশোহর-খুলনার ইতিহাস সাদরে (Dr. P. C. Roy কে) উৎসর্গ

www.pathagar.com

করিলাম।" পাঠক দেখিতে পাইতেছেন ইতিহাস খানির উপাদান সম্বন্ধে লেখক মহোদয় তিনটি ভাগ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি মাত্র 'সংগৃহীত' আর সবটাই 'কল্পিত' ও 'রচিত'। সুতরাং, আশ্চর্যের কোনোই কারণ নাই। আর ঐ যে আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগার ধ্বংসের কথা, উহাতে আশ্চর্যের বিষয় নাই। লেখক মহোদয় Mr. Amir Ali সাহেবের History of Saracens অথবা Gibon ও Butler প্রমুখ ঐতিহাসিকদিগের গ্রন্থাদি পড়িয়া উক্ত লাইব্রেরী সম্বন্ধে কোনো তত্ত্ব না লইয়াই লিখিয়াছেন, আর হয়তো বা পড়িয়া থাকিলেও উক্ত মহাত্মাদিগের লিখিত ইতিহাসাদির কোনো মূল্য আছে বলিয়া তিনি মনে করেন নাই। তিনি হয়তো ভাবিয়াছেন তিনি যাহা জানেন তাহাই ধ্রুব সত্য। তিনি যাহা লেখেন তাহাই বেদবাক্য। গ্রন্থকার মহোদয়কে অন্ততঃ মৌলবী কাজী ইমদাদুল হক্ সাহেবের লিখিত প্রবন্ধমালার "আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন পুস্তকাগার" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

এই স্থানে একটি কথা মনে পড়িল। গ্রন্থকার ভূমিকার একস্থানে অন্য সব ঐতিহাসিকদের সম্বন্ধে অনুযোগ করিয়া বলিতেছেন—উহার সবগুলি কলিকাতার দ্বারবদ্ধ ত্রিতল গৃহে বসিয়া লেখা হইয়াছে। পাঠক, গ্রন্থকার সম্বন্ধে আপনাদের এখন কি মনে হয়? যশোহর-খুলনার ইতিহাস কোথায় বসিয়া লিখিত হইয়াছিল? নেপথ্যে উত্তর আসিবে—"দৌলতপুর কলেজ ট্যাঙ্কের পার্শ্ববর্তী একতল গৃহে, জানালা খুলিয়া সম্মুখস্থ চলন্ত ট্রেনের শোভা দেখিতে দেখিতে কল্পনার প্রেরণায় ও ক্ষণিক ভাবের উচ্ছ্বাসে" উহা লিখিত হইয়াছে। অন্ততঃ মুসলমানদের কথাগুলি।

বস্তুতঃ মুসলমানদিগের সম্বন্ধে তাঁহার স্বকল্পিত উক্তিগুলি অতীব আপত্তিজনক ও অপ্রীতিকর হইয়াছে এবং উহাতে পক্ষপাতিত্ব, একদেশদর্শিতা, সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রকাশ পাইতেছে। হিন্দুর বিষয়গুলি তিনি বেশ উজ্জ্বল মধুর করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন। অবশ্য ইহাতে আমাদের আপত্তির কিছুই নাই। কিন্তু নিজেকে বড় করিতে যাইয়া পরের যাহা গৌরব তাহা ঢাকিয়া ফেলিতে হইবে, তাহাকে অযথা মসিলিপ্ত করিতে হইবে এ কেমন কথা! ইহাতেই আমাদের আপত্তি।

২য় খণ্ড এখনও বাহির হয় নাই। জানিনা কতো কি আজগুবি নতুন কথা বুকে করিয়া সে আসিবে। কিন্তু গ্রন্থকার মহোদয়কে বলিয়া রাখিতেছি তিনি যেন মুসলমান কাহিনী লিখিবার সময় সংযত হইয়া, উদার হৃদয় লইয়া, ন্যায় বিচার করিয়া লেখেন। তিনি যেন সত্যের মর্যাদা রক্ষা করেন। আমরা জানি, যদিও তিনি Logic-এর প্রফেসর নহেন, তথাপি তিনি Inference ও Conclusion করিতে পটু। গল্প-উপন্যাস-কাহিনী জাতীয় পুস্তকাদি লিখিতে হইলে এ সব খাটে বটে, কিন্তু ঐতিহাসিকের প্রতি এ দোষ অমার্জনীয়। মহানুভব, উদার হৃদয়, শ্রদ্ধেয় বাবু ব্রজেন্দ্র দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় ঐতিহাসিকদিগকে উপদেশ ছলে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। তাহা সতীশবাবুর ন্যায় কল্পনা-প্রিয় ঐতিহাসিকের পাঠ করা একান্ত কর্তব্য। তিনি লিখিয়াছেন—"সত্যনিষ্ঠা ঐতিহাসিকের মূলমন্ত্র; সত্য নির্দ্ধারণের জন্য তাঁহাকে অনেক আপাত অপ্রীতিকর শ্রম স্বীকার করিতে হয়। যেখানে যে বিষয়ের যে প্রমাণ আছে, সংগ্রহ করিয়া অপক্ষপাত বিচার দ্বারা সত্যাসত্য নিরূপণ অবশ্য কর্তব্য; নতুবা যাহার তাহার মুখে অপ্রামাণ্য যে সে কথা শুনিয়া নির্বিচারে তাহা লিপিবদ্ধ করা ঐতিহাসিকের পক্ষে অমার্জনীয়।

সওগাত
বৈশাখ, ১৯২৬

www.pathagar.com

প্রেমের স্বপ্ন
(রূপক)

তার নাম ছিল ফুল। গুল-বাগিচার সেরা সুন্দরী সে, যৌবনের উচ্ছল বেদনাতে চির-চঞ্চল। পাতার আড়ালে দূর হতে তাকে দেখলে মনে হতো–সে যেন সত্যিকার ফুল-রাণী। সবুজ পাতার কবরী দুলিয়ে, অধরে রাঙা হাসি হেসে, বুকের পরতে পরতে বেহেশ্‌তের সুধা-গন্ধ মেখে সে শুধু সমীর দোলায় দুলতো। কানন-রাণীর আদুরী মেয়ে–বিশ্ব-ধরার ঝঞ্ঝা-বাদল দুঃখ-দৈন্যের সে যেন অতীত। সহজ তালে নেচে চলতো সে–এ সবের কিছু ধার ধারতো না।

বসন্তের রক্ত-সন্ধ্যায় কোথা হতে এক তরুণ বুল্‌বুল্‌ উড়ে এসে সেই কাননতলে অতিথি হলো। ফুলের আর বুল্‌বুলের চোখে-চোখে মিলন হলো। আঁখির ভাষায় প্রাণের আলাপ হলো; মুখ ফুটে কেউ কিছু বললে না। উভয়ের বুকে-বুকে যে গোপন বাণী ঘুমিয়ে ছিল, তা যেন মূর্তিমতী হয়ে চোখের পাতায় ভেসে উঠলো–ভাষাভরা বুকখানি যেন তারা নয়ননীলিমার বিছিয়ে দিল। তাই নয়ন দিয়ে তারা শুধু দেখল না–শুনলও।

কি জানি কেমন করে সে কথা কানাকানি হয়ে গেল। চাঁপা করবীর কানে কানে সমীরণ কি যেন চুপে চুপে কয়ে গেল, তরু-মর্মরে না-কওয়া কোন্‌ গোপন বাণী বিকাশ-বেদনায় চঞ্চল হয়ে উঠলো।

সেদিন বাসন্তী পূর্ণিমা। আকাশে-পাতালে সর্বত্র মিলনের বাঁশী বাজ্‌ছে,–গ্রহে গ্রহে, তারায় তারায়, তরু-লতায়, সাগর-তটিনীতে কেবলই অবিশ্রান্ত মিলন-কল্লোল। ভুবনে ভুবনে যে চির-বিরহের সুর নিশিদিন ধ্বনিত হচ্ছে, সেদিন যেন তার কতকাংশ তৃপ্তির আনন্দে সার্থক হয়ে উঠেছিল। তরলিত রজত-রেখায় কুমুদিন। সারা দুনিয়ায় বেহেশতের ছবি আঁকছিল। বিরহী-হিয়ার অতৃপ্ত সাধ-বাসনা সার্থক করে তুলবার জন্যই যেন উপযুক্ত প্রশান্ত মুহূর্ত।

কাননের নিস্তব্ধতা ভেদ করে সহসা বুল্‌বুল্‌ গান ধরলে। ভাঙা হৃদয়ের ব্যর্থতার গান,–না-পাওয়া ভালোবাসার চিরন্তন ব্যথ্যা। বুল্‌বুল্‌ তার মানসী প্রিয়ার গোপন সন্ধানে পাগল হয়ে পথে বেরিয়েছে; বিশ্বের সারা কানন-তল সে তন্ন তন্ন করে ফিরছে, তবু তার দেখা পেল না। যেন সে মঞ্জু-মঞ্জীরে ধীরে ধীরে একবার আসে, আবার আসে না। –যেন তার চরণের ধ্বনি একববার শোনা যায়, আবার পরমুহূর্তে কোন্‌ সুদূর নভোনীলিমায় মিলিয়ে যায়।......

এই তার গানের বাণী।

ফুল সারা প্রাণ দিয়ে বুল্‌বুলের গান শুন্‌লে। গানের ভিতরকার বিচ্ছুরিত বেদনাকে সে যেন তার সমগ্র হৃদয় দিয়ে ধরে নিলে। এক ফোঁটা নিশির শিশির অশ্রু হয়ে ঝরে পড়্‌লো। সে যেন বলতে চাইলো –'ওগো বিরহী প্রেমিক! তুমি যারে সারা দুনিয়ায় খুঁজে ফিরছো, সে আমি। আমি তোমার বেদনাকে ভালোবেসেছি–আমাকে গ্রহণ করো।' এই

www.pathagar.com

বলে সে তার হৃদয়ের সঞ্চিত সুধা অধর-পেয়ালায় ভরে নিয়ে বুল্‌বুলের মুখের কাছে তুলে ধরলে।

বুল্‌বুল পরিপূর্ণ আগ্রহে সে সুধা পান করলে। তার শুষ্ক মরু-দিল্ সরস হয়ে উঠ্‌লো। হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে সে ফুলকে চুম্বন করলে। নিখিল প্রকৃতি তার কাছে আজ সুন্দর হয়ে দেখা দিল। জীবনের সব বেদনাই যেন সার্থক হয়েছে–এই তার মনে হলো!

সকাল বেলা জেগে দেখে, ফুলের হাসি ম্লান হয়ে এসেছে,–জীবন-প্রভাতেই তার মর্মবীণায় পূরবীর বিদায়-মূর্ছনা বেজে উঠেছে। এ কি? স্বপ্ন? যারে পাই, সে চলে যায়, আর যারে চাই, তারে পাই না! নিবিড় করে প্রাণের মধ্যে তো কারেও পাওয়া হলো না! কেউ-ই তো নিঃশেষে ধরা দিল না! সারা জীবন এ কী অতৃপ্তির অভিশাপ!

ফুল ঝরে পড়লো। সেই ঝরা ফুলের সমাধির উপর ব্যথাহত বুল্‌বুল্ করুণ সুরে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলো। তারপর ক্লান্ত পাখা মেলে দিক্ চক্রবালের সুদূর সীমা-রেখায় মিলিয়ে গেল।

দূরে–অতি দূরে বেণু-বনের ভিতর দিয়ে বাঁশীর সুরে কে তখন গেয়ে যাচ্ছিল.....

"বেশ্‌নো আজ ন্যয় চুঁ হেকাএত্ মি কুনদ্
আজ জুদায়ীহা শেকায়েত্ মি কুনদ্৷"

সাহিত্যিক, ১৯২৮

ওরা যদি লড়তে আসে

(স্বপন-পশারী)

গভীর রাত্রি। নিস্তব্ধ নির্জন চারিধার। খবরের কাগজে পড়েছিলাম ভারত নাকি পাকিস্তানকে আক্রমণ করবে।

মনে মনে ভাবলাম ঃ ওরা যদি লড়তে আসেই, তবে তার নতিজা কী হব? ভারত জিতবে–না পাকিস্তান জিতবে? কোন্ পথ দিয়ে কেমন করে তারা আক্রমণ করবে? কারা কারা তাদের সাহায্য করবে? মুসলমানদের কর্তব্য তখন কী হবে? কেমন করে তারা দুষমনের মুকাবিলা করবে? নানা জিজ্ঞাসা এসে মনের মধ্যে ভিড় জমালো।

সমাধান কিছুই খুঁজে পেলাম না। কখন ঘুমিয়ে গেলাম.....

স্বপ্নে দেখছি ভোজপুরী পাহ্‌লোয়ানদের গদাহস্তে পায়তারা ও কুচকাওয়াজ। যুদ্ধ তাহলে লাগলোই? ঘাবড়ে গেলাম একটু।

হঠাৎ এক আজগবী আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমাকে উদ্দেশ্য করেই কে যেন বলে উঠলো ঃ যুদ্ধের কথায় ঘাবড়ে গেলে নাকি?

তা একটু ঘাবড়াবার কথা বৈ-কি! শিশুরাষ্ট্র পাকিস্তান.....

www.pathagar.com

তাতে কি? রাষ্ট্র শিশু হতে পারে, কিন্তু ইসলাম তো আর শিশু নয়। যুগে যুগে যা ঘটেছে, এখনও তাই ঘট্‌বে। সেয়ানা হয়ে বা তৈরী হয়ে যুদ্ধ করা ইসলামের ধাতে নেই! আদম-হাওয়া দুদিনও বেহেশ্‌তে থাক্‌তে পারলো না, অমনি শুরু হয়ে গেল শয়তানের সঙ্গে লড়াই! রাসূলুল্লাহর জীবনেও তো এই সত্যই দেখতে পাই। গোড়া থেকেই শুরু হলো লড়াই। মদিনায় যেতে না যেতেই জেহাদ করলেন তিনি কোরেশদের বিরুদ্ধে। বীর নবী চললেন বদর-প্রান্তরে! মাত্র ৩১৩ জন সিপাহি ---- নেই অস্ত্রশস্ত্র, নেই সাজসজ্জা! এই তো ইসলাম! এই তো মুসলমান! অনন্ত সংগ্রামের বাণী এনেছে ইসলাম। সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের জন্য সে যুগে জেহাদ করবে—এই তার ভাগ্য। কোনো ত্যাগ, কোনো দুঃখ-দহনকে সে ভয় করে না। প্রত্যেক কারবালায় অগ্নিস্নান করে সে আরও জিন্দা হয়ে ওঠে। মুসলমানকে হতে হয় তাই গাজী—মুজাহিদ। কেন তবে যুদ্ধের নামে ঘাবড়াচ্ছো! যুদ্ধ লাগলে ভারত কিছুতেই জিততে পারবে না।

কি করে বুঝবো?

কোরআন-পাকেই আছে তার নির্দেশ। সূরা আল্‌-ইমরানের দ্বাদশ রুকূ পড়োঃ

১০৯ (হে মুসলিমগণ!) তোমরাই জগতের মধে শ্রেষ্ঠ উম্মত। তোমরা এসেছো মানব-কল্যাণের জন্য। যা ন্যায় তাই তোমরা সকলকে করতে আদেশ করবে, যা অন্যায় তা করতে নিষেধ করবে; আর আল্লাহ্‌কে মেনে চলবে। গ্রন্থধারীরাও যদি তোমাদের মতো এমনই বিশ্বাসী হতো, তাহলে কী ভালোই না হতো তাদের জন্যে! তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাসী আছে, সত্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশই সীমা-লঙ্ঘনকারী।

১১০ তারা তোমাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না, শুধু একটু কষ্ট দেবে মাত্র। তারা যদি তোমাদের সাথে লড়তে আসে, তবে দেখবে তারা কেমন করে পিটটান দিয়ে ভেগে যায়। কেউ-ই তাদের সাহায্য করবে না।

১১১ তারা যে-কোনো স্থানেই থাক না কেন, দেখবে একটা হীনতা ও বেইজ্জতি তাদেরকে আচ্ছন্ন করে আছে; আল্লার দেওয়া নিয়ামতের প্রতিশ্রুতি এবং মানুষের সাহায্যের চুক্তিতে তারা টিকে আছে। তারা আল্লার অভিশাপ কুড়িয়েছে; তারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে বিশেষ একটা দৈন্যের দ্বারা; কারণ আল্লার নির্দেশ তারা মানেনি, আর অন্যায় রূপে নবীদের তারা হত্যা করেছে। এরূপ ঘটেছে, কারণ তারা অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী।

১১৫ নিশ্চয়ই যারা কাফের, তাদের ধন-দৌলত বা সন্তান-সন্ততি কোনো কিছুই আল্লার শাস্তি থেকে তাদের বাঁচাতে পারবে না; তারাই হচ্ছে দোজখের বাসিন্দা; অনন্তকাল ধরে তারা সেখানে থাকবে।

১১৬ এই জীবনে তারা যা-কিছু ব্যয় করছে তার উপমা হবে ঠিক এইরূপ ঃ যেমন শীত-ভরা একটা ঝড়ো-হাওয়া বয়ে গেল একদল অনাচারী লোকদের শস্য-ক্ষেত্রের উপর দিয়ে; বার্তা-প্রবাহ তাদের শস্য-ক্ষেত্রকে একদম পয়মাল করে

www.pathagar.com

দিয়ে গেল! ভেবে দেখ, আল্লাহ্ তাদের প্রতি এই অত্যাচার করেননি; তারা নিজেদের প্রতিই নিজেরা অত্যাচার করেছে।

১১৭ হে মুমিনগণ, নিজেদের লোক ছাড়া অন্য কাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের ক্ষতি করবার জন্য কোনো চেষ্টারই ত্রুটি করে না। যাতে তোমাদের ধ্বংস হয় তাই তারা কামনা করে। বিদ্বেষভাব তো তাদের মুখের কথাতেই প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু তাদের অন্তরের গুপ্ত অভিপ্রায়গুলি আরও ভয়াবহ। বস্তুতঃ তোমাদের উপকারের জন্যই এই নিদর্শনগুলি স্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিলাম–যাতে তোমরা সজাগ হতে পারো।

১১৮ অথচ সেই তো তোমরা–যারা (জেনে শুনেও) তাদের সঙ্গে মিতালি করো! কিন্তু (ঠিক জেনো) তারা তোমাদের মোটেই ভালো বাসে না, অথচ তোমরা আল্লার কিতাবের সবগুলিতেই বিশ্বাস করে থাকো। প্রকৃত ব্যাপার এই ঃ তারা যখন তোমাদের সঙ্গে মিশে, তখন বলে আমরাও বিশ্বাসী; কিন্তু যেই তারা নিভৃতে নিজেদের নিজেদের দলে ভিড়ে, অমনি তখন তোমাদের প্রতি দারুণ আক্রোশে তারা নিজেদের আঙুল কামড়ায়! বলো ঃ মরো নিজেদের ক্রোধ নিয়ে! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জানেন তাদের অন্তরে কি আছে।

১১৯ কোনো মঙ্গল যদি তোমাদের স্পর্শ করে যায়, সেটা তাদের অস্বস্তিকর লাগে, আবার তোমাদের যদি কোনো অমঙ্গল ঘটে, তবে তাতে তারা খুশি হয়। এ অবস্থায় তোমরা যদি একটু ধৈর্যধারণ করতে পারো আর হুঁশিয়ার হও, তাহলে ওদের দূরভিসন্ধিগুলি তোমাদের একটুও ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ওদের সমস্ত কর্মকেই ঘেরাও করে রেখেছেন।

কোরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হবে।

একটা অপূর্ব প্রাণবন্যায় আমাকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে চললো। কৌতূহল ভরা দৃষ্টি রেখে বললাম ঃ এ আয়াতগুলো তো ইহুদীদের জন্য নাজিল হয়েছিল। ভারতীয়দের বেলায় তা খাট্‌বে কি?

কেন খাট্‌বে না! পাত্র পৃথক হতে পারে, কিন্তু শারাব তো এক। কোরআন পাক বিভিন্ন পরিবেশ ও আধারের মধ্যে চিরন্তন সত্যকেই তো প্রকাশ করেছে। মহাসত্যকে নিজের জীবনে মিলিয়ে নিতে হয়। এই আয়াতগুলি পাকিস্তান ও ভারতের বেলায় অবিকল খাটে।

আমার মুখে বিস্ময়।

বুঝতে পারছো না? প্রথমেই বলা হয়েছে ঃ ওরা কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না, শুধু একটু কষ্ট দেবে মাত্র। ঠিকই হয়েছে। কয়লা বন্ধ করে বা পাকিস্তানের মুদ্রামান অস্বীকার করে তারা তোমাদের একটু কষ্ট দিচ্ছে মাত্র, তার বেশী কিছু নয়।

www.pathagar.com

তারপর ওদের জনবল, ধনবল ও বিপুল ঐশ্বর্যের কথা ভাবছো? কোনোই কাজে লাগবে না ওসব। তুহিন-ঝটিকা এসে শস্যক্ষেত্র সমূহকে যেমন নষ্ট করে দিয়ে যায়, এদের স্বপ্নের সোনালি ফসলও তেমনি করে বরবাদ হয়ে যায়। কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ, আফগানিস্তান–কতো যায়গাতেই না ওরা স্বপ্নের বীজ বুনছে। কিন্তু কোনো ফসল ঘরে উঠবে না। একটা দুরন্ত হিমেল হাওয়ায় সব পয়মাল হয়ে যাবে।

একটু হেসে বললামঃ সে তুষার-ঝটিকাটা বোধ হয় কাশ্মীর ও সীমান্ত প্রদেশের পাহাড় থেকেই নামবে!

অদৃশ্য বাণী বললে ঃ

তারপর বলা হয়েছে ঃ ওরা যেখানে যাবে বেইজ্জত হবে। ঠিক তাই হচ্ছে না কি? ইউ-এন-ও বা জগতের কাছে ওদের আর এখন কোনো মুখ আছে? ওদিকে লায়েক আলিও তো চম্পট।

আমি বললাম ঃ হায়দ্রাবাদ হারিয়ে যাওয়ায় যে দুঃখ পেয়েছি, তার চেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছি আমরা লায়েক আলীর এই বিস্ময়কর মুক্তিতে।

প্রশ্ন করলাম ঃ আচ্ছা ইহুদীরা তো নবীদেরকে হত্যা করেছিল, সেই জন্যই আল্লার অভিশাপ তাদের উপর নেমেছিল। ভারতীয়রা তো কোনো নবীকে হত্যা করেনি? এখানে কি করে মিলাবেন?

অদৃশ্যবাণী বললো ঃ মিলছে না? ইসলামের কোনো নবীকে খুন না করলেও এ যুগে ওদের দেবতা মহাত্মা গান্ধীকে তো ওরা খুন করেছে।

ঠিকই তো! লাফিয়ে উঠলাম উল্লাসে।

অদৃশ্যবাণী বললো ঃ ১১৭ আয়াত লক্ষ্য করো, হিন্দু-ভারতের মনের প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে এর মধ্যে। ওদের অন্তরের কী নিখুঁত চিত্র এ! আল্লাহ্ বলছেন ঃ কাফেরদেরকে বিশ্বাস করো না, ওদের, মধ্য থেকে বন্ধু বলে কাকেও গ্রহণ করো না, কারণ ওরা মুনাফিক। ওদের মুখে এক, আর মনে এক। মুখে ওদের ঘৃণার ভাব তো প্রকাশ পেয়েছে, ওদের অন্তরের কু-মতলবগুলি আরও ভয়াবহ। ওরা তোমাদের ভালো দেখতে পারে না, যাতে তোমাদের সর্বনাশ হয়, তাই ওরা কামনা করে। সত্যই, তাই নয় কি? পণ্ডিত নেহরু, সর্দার প্যাটেল থেকে আরম্ভ করে হিন্দুস্থানের খবরের কাগজওয়ালারা প্রত্যেকেই তো প্রকাশ্যে দারুণ মুসলিম-বিদ্বেষের পরিচয় দিয়েছে; ওদের অন্তরে আছে এর চেয়েও ভয়াবহ কু-মতলব। আল্লাহ্ তাই তোমাদেরকে হুঁশিয়ার করে দেবার জন্যই বলছেনঃ তোমাদের উপকারের জন্যই এই নিদর্শনগুলিকে আমি সুস্পষ্ট করে দিলাম–যাতে তোমরা সজাগ হতে পারো! কী জ্বলন্ত সত্যের স্পর্শ এই কথাগুলির মধ্যে!

অদৃশ্যবাণী বললো ঃ শেষের আয়াতটির তাৎপর্য বুঝলে? আল্লাহ্ বলছেন ঃ তোমরা যদি একটু টিকে থাকতে পারো এবং হুঁশিয়ার হও, তবে ওদের দুরভিসন্ধিগুলি একটুও তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। অপূর্ব ভবিষ্যদ্বাণী! কষ্ট সহ্য করে একটু টিকে

www.pathagar.com

থাকলেই দেখবে কতো নূতন নূতন ঘটনা ঘটে যাবে। শিখরা বিদ্রোহী হবে, নেটিভ স্টেটগুলি বিদ্রোহী হবে, কমিউনিস্টরা মাথা তুলবে, হিন্দুমহাসভা, রাষ্ট্রীয়-সেবক-সংঘ ও কংগ্রেসের মধ্যেও নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়া লাগবে; বাঙালি অ-বাঙালিতেও সংঘর্ষ লাগবে। হায়দ্রাবাদও আর একটা নূতন ভূমিকা অভিনয় করবে। এদিকে ভারতের মুসলমানদের উপর এই অহেতুক জুলুমবাজির দরুন তামাম মুসলিম জাহান এক হয়ে এর প্রতিকার করতে অগ্রসর হবে। মক্কার কাবা-শরীফে এর মধ্যেই তো পশ্চিম-বঙ্গের মুসলমানদের জন্য মোনাজাত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অনাগত দিনের এক রহস্যপূর্ণ ইঙ্গিত। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ লাগলেই দেখবে কতো দিক দিয়ে ভারত বিব্রত হয়ে পড়বে। কয় ফ্রন্টে তারা যুদ্ধ চালাবে? কাশ্মীর ফ্রন্টে যুদ্ধ পূর্ব সীমান্তে যুদ্ধ, ভিতরে যুদ্ধ, বাহিরে যুদ্ধ। কতো যুদ্ধ করবে ভারত? কোরআন-পাক তাই ঠিকই বলেছে ঃ ওরা যদি লড়তে আসে, তবে দেখবে ওরা কেমন পিটটান দিয়ে ভেগে পড়ে।

আমি লাফিয়ে উঠে বললাম ঃ ইনশাআল্লাহ্।

অদৃশ্যবাণী বললে ঃ আজ আর কোনো কিছু তোমায় বলবো না। আর একদিন বলবো তোমার অনেক নূতন কথা!

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মিনার থেকে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো ফজরের আজান।

নওবাহার, ১৯৪৯

www.pathagar.com

ইকবালের পয়গাম

"কবিরা শুধু স্রষ্টাই নন–দ্রষ্টাও। অনাগত যুগের পদধ্বনি তাঁরা শুনতে পান। জাতি যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, তখন কবি আসেন নকীবের বেশে–মুয়াজ্জিনের বেশে আলোকের আজান দিতে–কওমের ঘুমন্ত আত্মায় আগুন ধরাতে–কণ্ঠে ভাষা দিতে–বাজুতে কুয়ৎ দিতে–চোখে নব নব আশার স্বপ্ন দিতে। কবির কাব্যে থাকে কওমের আযাদীর ইশারা– তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। যুগে যুগে নবীরা যে কাজ করে যান ধর্মের দিক দিয়ে, কবিরা করে যান তাই তাহ্‌জিব-তমদ্দুনের দিক দিয়ে–জাতির স্বপ্ন-সাধ ও আশা-আকাঙ্খার দিক দিয়ে। সত্যিকারের কবিরা তাই যুগস্রষ্টা, এদের কাব্যে ও গানে জামানার মোড় ফিরে যায়।"

আল্লামা ইকবাল এ-যুগের তেমনি একজন কবি। একটা নূতন যুগের তিনি স্রষ্টা–একটা নূতন রাষ্ট্রের তিনি রূপকার। পাক-ভারতীয় মুসলমানদের নিদ্‌মহলার তিনি মুয়াজ্জিন। তাঁর জ্যোতির্ময়ী বাণী মুসলিম জাহানে এনেছে নব জীবন–নবজাগারণ।

কবির কণ্ঠ আজ নীরব, কিন্তু আমাদের কণ্ঠ আজ মুখর। ইকবাল আজ নেই, কিন্তু তাঁর বাণী তাঁর সুর ঝঙ্কৃত আজও আমাদের প্রাণে। যে বাণী–যে গান থেমে যাবার পরেও শোনা যায়, তাই ত চিরন্তন–তাই তো শাশ্বত। ইকবাল সেই শ্রেণীর কবি। তাঁর বাণী–তাঁর সুর–চিরন্তন সত্য ও সুন্দরের মর্যাদা পেয়েছে। ইকবালের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তাঁর কাব্য তাঁকে দিয়ে গেছে অমরতার স্বাক্ষর।

কবি ইকবাল যে চিরদিনের কবি–একটা তরল স্বপ্ন-বিলাস নিয়ে যে তিনি আসেননি, একথা তিনি গর্বের সঙ্গেই বলে গেছেন। সে ঘোষণা আত্মপ্রত্যয়ের আলোকে সমুজ্জ্বল। 'আসরারে-খুদী'তে তিনি বলছেন ঃ

I have no need of the ear of to-day
I am the voice of the poet of to-morrow.
My own age does not understand my deep meaning
My Joseph is not for this market.......
My song is of another world than theirs
This bell call other travellers to take the road
Many a poet was born after his death;
Opened our eyes when his own were closed."

অর্থাৎ ঃ আজকের শ্রোতা আমি চাই না
আমি আগামী দিনের কবি।
আমার নিজের জামানা আমার গূঢ় কথা বুঝবে না,
আমার ইউসুফ এই বাজারের জন্য নয়,

www.pathagar.com

আমার গান স্বতন্ত্র এক জগতের
আমার ঘণ্টাধ্বনি অন্য পথিকের ডাকে।
অনেক কবি মৃত্যুর পরে নূতন জন্ম পেয়েছে
আমাদের আঁখি খুলে গেছে তখন—
যখন তার আঁখি বন্ধ হয়েছে।

ইকবালের এই সুন্দর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে। ইকবালের মৃত্যুর পরে আজ আবার তার নবজন্ম হয়েছে আমাদের মধ্যে। তাঁর ঘণ্টাধ্বনি থেমে যাবার পর আজ যে দলে দলে তরুণ কাফেলা তাঁরি নির্দেশিত পথ বেয়ে চলেছে, এই তো তার বাণীর সত্যতার প্রমাণ।

ইকবাল যে শুধু কবিই ছিলেন, তা নয়: তিনি ছিলেন এ যুগের একজন মস্তবড় দার্শনিক। এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব। ইউরোপের প্লেটো, এরিস্টটল, হেগেল, নীটশে, বার্গোসঁ প্রভৃতি দার্শনিকদের মতবাদ পড়ে পড়ে আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাঁদের চোখ দিয়েই আমরা এতদিন আমাদের জীবন ও জগতকে দেখেছি আর ভেবেছি আমাদের বুঝি নিজস্ব কোনো দর্শনই নেই। ইকবাল সেই দৈন্য আমাদের ঘুচিয়েছেন। ইসলামের জীবন-দর্শনকে তিনি দিয়েছেন এক অভিনব রূপ। ইকবাল-কাব্যে তাই পাওয়া যায় ইসলামের অন্তর্মূর্তির সাচ্চা পরিচয়।

ইকবাল দর্শনের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হচ্ছে “খুদী”—যাকে বলা যেতে পারে আত্মা, Ego বা Soul। খুদীর জাগরণই হলো ইকবালের প্রধান পয়গাম। তিনি বলেন ঃ প্রত্যেক জীবের (Living Organism) মধ্যেই আছে এই আত্মশক্তির বিকাশ। সবকিছুর বেঁচে থাকা নির্ভর করে এই আত্মশক্তির উপলব্ধির উপর। সবল-দুর্বল বা ছোট-বড়োর তারতম্যও আসছে এই আত্মশক্তির তারতম্য থেকে। আত্মশক্তি বা ব্যক্তিত্ব (Individuality বা Personality) যার যতো বলিষ্ঠ, সে ততো বড়। কুল-মাখ্‌লুকের মূলে আছে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। সমগ্র তাই এই স্বতন্ত্র “খুদী”রই বিরাট সমন্বয়। একটা বিরাট ইমারতের কাছে তার প্রত্যেকটি ইট যেমন, গোটা মানব-সমাজের কাছে প্রতিটি ব্যক্তিই তেমন। প্রতিটি ইট ভালো আর মজবুত হলে যেমন ইমারতটিও মজবুত হয়, প্রতিটি ব্যক্তি সবল ও সক্ষম হলে গোটা মানব-সমাজও হয় তেমনি সার্থক ও সুন্দর। হিমালয় পাহাড় আর ধূলিকণা একই উপাদানে গঠিত, কিন্তু বিরাট শক্তি সঞ্চয় করে হিমালয় হয়েছে দুর্লঙ্ঘ্য ও শক্তিমান, আর পথের ধূলিকণারা সেই শক্তির সাধনা করেনি বলে হয়েছে চির-দুর্বল। সাগর তাদের অনায়াসে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তারা কাঁদে আর বলে ঃ দেখ দেখ, স্রোত আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল! ভিতর থেকে যে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে, তার কাছে তার পারিপার্শ্বিক সবকিছু নতি স্বীকার করে। চাঁদের চেয়ে পৃথিবী শক্তিমান ও আত্মস্থ। তাই চাঁদ অনুগত ভৃত্যের মতো পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। আবার সমগ্র গ্রহ-নক্ষত্রদের মধ্যে সূর্য হলো সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী, তাই সমগ্র গ্রহ-উপগ্রহ তাকেই করে পরিক্রমণ। এ সম্বন্ধে ইকবাল কি সুন্দরই বলছেন ঃ—

www.pathagar.com

"When the mountain loses its self
It turns into sands
And complains that the sea surges over it.
Because the Earth is firmly based on itself
The captive moon goes round it perpetually.
The being of the sun is stronger than that of the earth
Therefore is the earth fascinated by the sun's eye."

অর্থাৎ ঃ
পর্বত যখন খুদীকে হারায়,
তখন সে ধূলিতে পরিণত হয়
এবং সাগর তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।
পৃথিবী আত্মশক্তিতে অধিষ্ঠিত
কাজেই, বন্দী চাঁদ চিরকাল তারি চারি পাশে ঘোরে।
পৃথিবীর চেয়ে সূর্য অধিকতর বলবান–
তাই তো পৃথিবী সূর্যের দৃষ্টিতে সম্মোহিত।

বস্তুতঃ ইকবালের মতে খুদীই হলো সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র সার বস্তু, বাদবাকী সব অসার। যার খুদী নাই, তার কিছুই নাই। খুদীর শক্তি ও সম্পদেই জীবন সার্থক ও সুন্দর হয়। অন্য কথায়ঃ খুদীর পরিপুষ্টিই হলো জীবন-বিকাশের একমাত্র উপায়।

এখানে একটা কথা লক্ষ্য করার মতো। পাশ্চাত্য এবং প্রতীচ্য দর্শন এতকাল এই কথাই ঘোষণা করে এসেছে যে, একমাত্র ব্রহ্মই সৎ বস্তু, আর সব অসৎ বা অনিত্য। বিশ্বের সব কিছুই মায়া বা মরীচিকা; এদের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। মানুষের আত্মারও কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই– পরমাত্মারই সে অংশ বিশেষ; সেই পরমাত্মার বা পরমব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাওয়াই হলো মানব জীবনের একমাত্র পরিণতি। অন্য কথায় ঃ অদ্বৈতবাদ (Pantheism) বা "একমেবাদ্বিতীয়াম্"ই হলো একমাত্র দার্শনিক সত্য। প্লেটো, এরিস্টটল, কান্ট বা হেগল–এঁরাও কেউ আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেননি; বস্তু-জগতেরও কোনো সত্তা আছে বলে তাঁরা মনে করেননি। বস্তুর অন্তর্নিহিত রূপই (noumena) হলো তাদের মতে আসল সত্য। তাদের কাছে বস্তু-জগৎ ভাবজগতেরই ছায়া বিশেষ। আসল সত্য হলো Idea—বস্তু নয়। আত্মার স্বাতন্ত্র্য তাই তারা কেউ মানেন না। কিন্তু ইকবাল এই প্রচলিত দার্শনিক মতবাদকে উল্টিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ এই পরিদৃশ্যমান জগতও মিথ্যা নয়, যা আমরা দেখছি তাও সত্য। এর মূলে আছে প্রাণ-শক্তিরই লীলা-খেলা। জগৎ যে আছে–একথা কেমন করে আমরা অস্বীকার করবো! সৃষ্টি মিথ্যা নয়, অলীকও নয়। অবশ্য এই পরিদৃশ্যমান বস্তু-জগতই একমাত্র সত্য নয়; এর অতীতেও আর এক অদৃশ্য লোক (The great Unseen) আছে। সে সত্য আমাদের স্বীকার করতে হবে আর জানতে হবে যে, দুটোই সত্য। বস্তু জগতের সত্যকে জানা যায়

www.pathagar.com

জ্ঞান ও চিন্তা দিয়ে, আর অদৃশ্য লোকের সত্যকে জানতে হয় অনুভূতি বা Intuition দিয়ে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য দর্শন যেখানে নেতিমূলক, ইকবাল-দর্শন সেখানে হস্তি-মূলক। অন্যান্য দর্শনে যেখানে আছে জীবনের অস্বীকার (Negation of life) অথবা ভগবানের মধ্যে লয় প্রাপ্তি, ইকবাল সেখানে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছেন ঃ "আমি আছি" এই তেজোদৃপ্ত বাণী। তিনি বলেন ঃ বিশ্ব-সত্তার ভিতরে নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার মধ্যে মানুষের জয়-গৌরব নেই; অনন্তকাল বেঁচে থাকার মধ্যেই আছে জীবনের আকর্ষণ ও সার্থকতা। এ কথা কুরআনের সত্যের বাইরে নয়। পুণ্যবানেরা যে অনন্তকাল বেহেশতে বাস করবে (ওয়াহুম ফিহা খালেদুন) এ-ই আল্লার বাণী।

ইকবালের দর্শন তাই আত্মকেন্দ্রিক বা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। এই জগতে "খুদী" ছাড়া তিনি আর কিছুরই মূল্য দেন নি। তিনি বলছেন ঃ

"Thou alone art the Reality
in this universe
All the rest is Mirage."

অর্থাৎ ঃ একমাত্র তুমিই সত্য আর সব মিথ্যা।

এই 'খুদী' উপলব্ধি যার যতো বেশি হয়েছে, জীবনের মূল্য ও মান তার ততো বেশি।

"Only that truly exists which can
say : "I am"
It is the degree of intuition of
"I-am-ness" that determines the
plcace of a thing is the scale of being."

অর্থাৎ ঃ সেই সত্যিকার ভাবে বেঁচে থাকে যে বলতে পারে "আমি আছি" এই "আমি আছি" চেতনায় কম-বেশিতেই প্রত্যেক জিনিসের অস্তিত্ব পরিমিত হয়।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, ইকবালের মতে 'খুদী'কে শক্তিশালী করে গড়ে তোলাই হবে আমাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

এই 'খুদী'কে কি করে শক্তিসম্পন্ন করা যায়? ইকবালের মতে নব নব আশা ও আকাঙ্খা (desires) ই হলো 'খুদী'র খোরাক। আকাঙ্খার মধ্যেই 'খুদী' বেঁচে থাকে। যার আকাঙ্খা নেই তার 'খুদী'ও নেই। আকাঙ্খা হলো জীবন-সমুদ্রে তরঙ্গ বিশেষ গর্জন থেমে গেলে সমুদ্র হয় নীরব নিস্তব্ধ একটা হ্রদের মতো। সে হয় তখন শক্তিহীন–

"Desire Keeps the self in perpetual uproar
It is a restless wave of the self's sea
Negation of desire is death to the living
Even as absence of heat extinguishes the
flame."

www.pathagar.com

অর্থাৎ ঃ আকাঙ্খাই জীবনকে চির-চঞ্চল করে রাখে–
জীবন-সমুদ্রে আকাঙ্খা তরঙ্গ বিশেষ
আকাঙ্খার নিবৃত্তিই হলো জীবনের অবসান–
উত্তাপ না থাকলে অগ্নিশিখা যেমন মরে যায়।

বাঁচবার উদগ্র কামনা (will to live) অথবা একটা প্রাণচাঞ্চল্য (State of Tension)-ই হলো ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রধান অবলম্বন।

অবশ্য এই ব্যক্তিত্বের বিকাশ সহজ নয়। একটা নৈতিক নিয়ম-নিষ্ঠার ভিতর দিয়ে ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলতে হয়। উচ্ছৃঙ্খালার বা স্বেচ্ছাচারিতার আওতায় ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না। এর জন্য চাই নিয়মানুবর্তিতা। এ সম্বন্ধে কবির যুক্তি অতি চমৎকার। ফুলের সুরভি ফুলের পাপড়ির মধ্যে আবদ্ধ থাকে; কস্তুরীর সুন্দর খোশবুর জন্য দরকার হয় একটা মৃগনাভির আধারের। মুক্তি তাই নিয়মনিগড়ে আবদ্ধ। এ সম্বন্ধে ইকবাল বলছেন ঃ–

"Endeavour to obey,
O, heedless one!
Liberty is the fruit of compulsion."

অর্থাৎ ঃ ওরে বেখেয়াল, নিয়ম্ মেনে চল
আজাদী নিয়মানুবর্তিতারই ফল।

নিয়মানুবর্তিতার পরে আসে আত্ম-সংযমের কথা। নিজেকে নিজেই চালনা করতে হয়; সেটা যারা না পারে তারা পরের দ্বারা চালিত হয়। প্রত্যেকের তাই লক্ষ্য রাখা উচিতঃ আমি যেন অপরের দ্বারা চালিত না হই। এ কথার তাৎপর্য হলো এই যে, অপরের অন্ধ অনুকরণ করলে ব্যক্তিত্বের বিকাশে বাধা পড়ে। ক্রীতদাসের তাই কোনো ব্যক্তিত্ব নেই। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, আমাদের বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে আছে শুধু পরানুকরণের ব্যাপক আয়োজন। Iqbal's Educational Philosophy-তে তাই তিনি ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সংরক্ষণের কথা বিশেষভাবে বলেছেন ঃ–

"I will tell you a subtle point,
bright as a pearl
That you may distinguish between
the slave and the free,
The slave is by nature repetitive
His experiences are bereft of
originality
The free man is always
busily creative."

www.pathagar.com

অর্থাৎ ঃ আমি তোমাকে একটা মূল্যবান কথা বলবো–
যাতে তুমি ক্রীতদাস এবং স্বাধীন মানুষের তফাৎ বুঝবে;
ক্রীতদাস স্বভাবতই অনুকরণকারী
তার অভিজ্ঞতার কোনো স্বকীয়তা নাই
যারা স্বাধীন–তারা চিরদিই সৃষ্টিধর্মী।

ব্যক্তিত্ব বিকাশের চরম পরিণতি কোথায়? ব্যক্তিত্ব বা খুদীর শক্তি জাগরিত হলে আমাদের লাভ কি? ইকবাল বলেন ঃ খুদীর শক্তি জাগরিত হলে আমরা মানব-জীবনের চরম কাম্য আল্লার খেলাফত লাভ করতে পারি। আল্লার খলিফা (vicegerent of God) হওয়াই আমাদের জীবনের চরম কাম্য।

"It is sweet to be God's Vicegerent
in this world"

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আল্লার প্রতিনিধিত্ব করাই হলো মানুষের পরম গৌরব এবং চরম কাম্য। এর চেয়ে মানুষের আর কী-ই বা কামনার থাকতে পারে। রাজপ্রতিনিধির আসন তো সম্রাটেরই নীচে! সম্রাটের পরেই তো রাজ-প্রতিনিধির স্থান। মানুষ হবে সেই রাজপ্রতিনিধি–আল্লার খলিফা! কতো বড় গৌরব! এ মর্যাদা আল্লাহ্ মানুষের জন্য পূর্ব থেকেই নির্ধারিত করে রেখেছেন। আদম সৃষ্টির প্রাক্কালে তিনি ফেরেশ্তাদের ডেকে বলছেন ঃ "ইন্নি জায়েলুন ফিল আরদে খলিফা" অর্থাৎ, আমি দুনিয়ায় আমার খলিফা (মানুষ) সৃষ্টি করতে চাই।

কিন্তু যে-সে মানুষই তো আর আল্লার খলিফা হতে পারে না। এই মানুষের মধ্যে শয়তানও তো আছে। এই জন্যই প্রয়োজন হয় নিয়ম-নিষ্ঠার। শ্রেষ্ঠ নিয়ম-কানুন হচ্ছে রসুলুল্লার তরিকা। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চললে লক্ষ্যে পৌছুতে আমাদের ভুল হবে না।

আল্লার খলিফা হতে হলে আল্লাহ্কে পিয়ার করতে হবে, মহব্বত করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আল্লার গুণাবলীর অনুকরণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ তাই বলেছেনঃ "আখাল্লাকু বি আখ্লাকাল্লাহ" অর্থাৎ, তোমরা আল্লার গুণাবলীর অনুসরণ করো। অতি সত্য কথা। ধ্রুবের নৈকট্য লাভই তো শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ! কাজেই যে যতোখানি আল্লার নৈকট্য লাভ করবে সে ততোখানি শ্রেষ্ঠ।

এখানে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। আল্লার নৈকট্য লাভ করতে গিয়ে আল্লাতে বিলীন হয়ে গেলে চলবে না। সেখান থেকে শক্তি সঞ্চয় করে নিজের মধ্যে ফিরে আসতে হবে। এই সাতন্ত্র্য হলো ইকবাল দর্শনের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্কে ভালবেসেই আল্লার কাছে ছুটে যাবো, তাঁর কাছ থেকে শক্তি সঞ্চয় করবো, কিন্তু সেখানে থাকবো না, শক্তি সঞ্চয় করে নিজের মধ্যে ফিরে আসবো–এই হলো ইকবালের কথা।

"Abandon self and flee to God
Strengthened by God, return to thyself."

অর্থাৎ ঃ নিজেকে রেখে আল্লার কাছে ছুটে যাও
আল্লার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে

www.pathagar.com

আবার নিজের কাছে ফিরে এসো।

ইকবাল এখানে প্রচলিত সুফি মতবাদের বিরোধিতা করেছেন। অলস খোদা-প্রেম তাঁর কাম্য নয়।

চমৎকার! আল্লাহর নৈকট্য লাভের পর ফিরে আসবার দৃষ্টান্ত মিলে রাসূলুল্লার মি'রাজের মধ্যে। আল্লাহ্‌তালার চরম নৈকট্য লাভ করেও তিনি আবার ফিরে এলেন দুনিয়ায়, আর ঝাপিয়ে পড়লেন দ্বিগুণ উদ্যমে জীবন-সংগ্রামে। সমস্ত শক্তির উৎস-মুখ হচ্ছেন আল্লাহ্‌, কাজেই তাঁর সঙ্গে রাখতে হবে আমাদের নিবিড় যোগ। পক্ষান্তরে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যও আমাদের চাই। আল্লাহ্‌কে মানতেও হবে, আবার নিজের স্বাধীন সত্তাকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তক্‌দীর ও তদ্‌বীরের চমৎকার সমাধান হয়েছে এইখানে।

গ্রীক ও খৃষ্টান দর্শন ভারতীয় দর্শনের মতোই সন্ন্যাস-মূলক। দেহ বা জগতের কথা এরা ভাবেনি; আধ্যাত্ম জগতের কথাই ভেবেছে। অবশ্য পরবর্তীকালে ইউরোপ ঘোর জড়বাদী সেজেছে। হেগেলের দর্শনকে সম্পূর্ণ উল্টে দিয়ে কার্ল মার্কস নিয়ে এসেছেন এক নূতন-দর্শন। হেগেলের মতে আত্মাই একমাত্র সত্য, বস্তু কিছুই নয়, আবার মার্কসের মতে বস্তুই হলো একমাত্র সত্য, আইডিয়া বা আত্মা কিছু নয়। এই দর্শনের নামই হলো Dialectie materialism, বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ।

বলা বাহুল্য, হেগেল এবং কার্ল মার্কস–উভয়ের দর্শনই একপ্রান্তিক। একজন শুধু আইডিয়াকেই সত্য বললেন, আর একজন শুধু বস্তুকেই সত্য বললেন।

ইকবালের দর্শন ভিন্নরূপ। তিনি বস্তু এবং চৈতন্য (Matter and Spirit)-দুইকেই সত্য বলেন। চৈতন্যবাদীদের মতো তিনি সন্ন্যাসও মানেন না, আবার জড়বাদীদের মতো নিছক জড়বাদকেও স্বীকার করেন না, তাঁর দর্শন হলো দু'য়ের সংমিশ্রণ। তিনি বলেন ঃ বস্তু জগৎ মিথ্যা নয়; তবে পূর্ণ সত্য এর মধ্যে পাওয়া যাবে না। পূর্ণ সত্য পেতে হলে জড় এবং চৈতন্য দুটোকেই মানতে হবে।

বলা বাহুল্য এ-মত সম্পূর্ণ ইসলাম-সম্মত। ইসলাম দ্বন্দ্বমূলক (dialaectic) ধর্ম, দুই বিপরীতের সমন্বয়ই ইসলামের বৈশিষ্ট্য। আমরা প্রতিদিন তো আল্লার কাছে এই মোনাজাত করি ঃ হে আল্লাহ, ইহকালের এবং পরকালের যে কল্যাণ তাই তুমি আমাদের দাও!

সৃষ্টির মধ্যে প্রভুত্ব করতে হলে চাই একটা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব–চাই একটা জবরদস্ত 'খুদী'। 'খুদী' না জাগলে কোনো কিছুই সম্ভব নয়। ইকবাল দিয়ে গেলেন সেই বাণী।

ইকবালের বাণী তাই কোনো ব্যক্তি বা জাতি বিশেষের জন্য নয়–তার আবেদন বিশ্বজনীন। সকল মানুষের, সকল কালের তিনি কবি।

আত্মবিস্মৃত মুসলমান! ওঠো, জাগো, ঘুমন্ত আত্মশক্তিকে জাগাও। সিংহ হয়ে মেষ শাবকের মধ্যে তুমি বিচরণ করছো। তোমার অন্তরে আছে অসীম শক্তি–অনন্ত সম্ভাবনা! সেই নূতন রহস্য-লোকের দুয়ার খোলো। বিশ্ব আবার তোমার পায়ের ভৃত্য হবে।

নওবাহার, ২য় বর্ষ, ১৯৫১

স মা প্ত

www.pathagar.com

আমার চিন্তাধারা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আরয

এতদিনে 'আমার চিন্তাধারা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল। ১৯১৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত (হিসাব করলে ৪৬ বছর হবে) যত প্রবন্ধ লিখেছি, তার অধিকাংশই এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

প্রবন্ধগুলি কালক্রমিক এবং বিচ্ছিন্ন। কাজেই কোন বিশেষ বিষয়বস্তুর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এ গ্রন্থে পাওয়া যাবে না। এক একটা দৃষ্টিকোণ থেকে এক এক বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। তবে চিন্তাগুলি যত বিক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্তই হোক, দীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দীর পরিধিতে সেগুলি ব্যাপ্ত হয়ে আছে। আজ মনে পড়ে সেই ১৯১৭ সালের কথা। তখন আমি বি-এ ক্লাসের ছাত্র। সেই সময়ে এই পুস্তকের প্রথম প্রবন্ধ 'কবি ও বৈজ্ঞানিক' লিখেছিলাম। প্রবন্ধটি কলিকাতা মুসলিম ইন্‌ষ্টিটিউট হলে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির' এক অধিবেশনে পাঠ করি। সভাপতি ছিলেন জনাব মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব। (তিনি তখনও ডক্টর হন নি।) সেই থেকে আজ পর্যন্ত– কত ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়েই না আমার 'চিন্তাধারার' মোড় ঘুরেছে! কত রাতের অন্ধকারে কত নতুন প্রভাতে, কত বাদল-বরিষণে কূলে কূলে আছাড় খেয়ে, বালুচরের উপর দিয়ে গঙ্গা-ভাগীরথী মেঘনা-যমুনা পেরিয়ে এসে পৌঁছেছে সে এই পদ্মানদীর তীরে।

'আমার চিন্তাধারায়' তাই ঐতিহাসিক চেতনার ছাপ আছে। বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে সংগ্রামী-যুগ পেরিয়ে পাকিস্তানে এসেছি। যুগ-প্রবাহের সঙ্গে সংযোগ রেখে তাই প্রবন্ধগুলি পড়তে হবে। প্রবন্ধগুলি মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ 'পাকিস্তানের আগে' এবং 'পাকিস্তানের পরে'। আশা করি আমার চিন্তাধারার মূল্যায়নে এ বিভাগ কিছুটা সহায়তা করবে।

পুস্তকখানি আর একটা কারণে পাঠক-পাঠিকার কাছে আকর্ষণীয় হবে বলে আশা করা যায়। এই পুস্তক লেখকের অন্তর্লোকের একটি প্রবেশ দুয়ার। এই দয়ার দিয়ে পাঠক তার মনোলোকে প্রবেশ করবেন এবং সেই সুযোগে লেখকের অন্তর-মানুষটাকেও দেখে ফেলবেন।

আমার নিজের কাছেও পুস্তকখানি নতুন মূল্য পেল। আমার ৪৬ বছরের ছড়িয়ে পড়া মন আজ যেন আমার মুঠির ভিতরে এসে ধরা দিল। আমি তাকে এখন স্পর্শ করি, অনুভব করি,– আদর করি, ভালোবাসি।

জীবন-বীণার সবগুলি হারানো সুর আজ যেন খুঁজে পেয়েছি– সব স্মৃতি সব গান আজ যেন মনে পড়ছে। বই নয়–এ যেন আমারই আপন জীবনের প্রতিচ্ছবি, এ যেন আমারই আপন মনের প্রতিধ্বনি। কাজেই এ পুস্তকের পাঠক শুধু পাঠকই নন–লেখকও।

প্রবন্ধগুলির কালক্রম রক্ষা করায় লেখকের মন মানস ও দৃষ্টিভঙ্গী কি ভাবে বিবর্তিত হয়েছে, তা জানা পাঠকের পক্ষে সহজ হবে। পূর্বের কোন লেখার কোন পরিবর্তন করিনি। হয়ত এখন লিখলে অনেক কথা অন্য ভাবে লিখতাম। কিন্তু রদ-বদল করতে

www.pathagar.com

গেলে আমার চিন্তাধারার মৌলিকতা ও ধারাবাহিকতা নষ্ট হত। কোন কালে কি ভেবেছিলাম এবং কেমন করে ভেবেছিলাম, সেই তত্ত্ব জানায় আনন্দ আছে। ঠিক এই কারণে যেখানে একই বিষয়বস্তুর উপর একাধিক বার লিখতে হয়েছে, সেখানে পূর্বাপর ভাবের সংগতি সর্বত্র রাখতে পারিনি। ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আগে যা বলেছি, পরে তার থেকে কিছু নতুন কথাও বলেছি। অবশ্য এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। রাজনীতির ন্যায় কাব্য-সাহিত্য ও দর্শন-বিজ্ঞানেও এমন মত-পরিবর্তন স্বাভাবিক। এলিয়ট, রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল— প্রত্যেকের চিন্তা ধারাতেই পূর্বাপর কিছু-না কিছু স্ববিরোধিতা আছে।

সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতির সমস্যা বহু। এমন অনেক সমস্যা আছে যাকে এখনও স্পর্শ করিনি। পরবর্তী কালে হয় তো করব।

এই পুস্তক-সংকলনে অনেকের কাছেই আমি ঋণী। তন্মধ্যে 'মাহে-নও' সংম্পাদক কবি আবদুল কাদিরের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। নানা পত্রিকা থেকে অনেকগুলি হারানো প্রবন্ধ তিনি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। কবি জসীম উদ্দীন ও সৈয়দ আলী আহসানের কাছ থেকেও যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছি। প্রুফ-দেখা ও অন্যান্য ব্যাপারে স্নেহাস্পদ শাহাবুদ্দিনের আন্তরিক সহযোগিতা এই পুস্তকের প্রকাশকে ত্বরান্বিত করেছে।

পুস্তকের প্রকাশক শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র দত্ত আমার সাহিত্য-জীবনের সঙ্গে বহুকাল থেকে জড়িয়ে আছেন। আমার 'বিশ্বনবী' ও অন্যান্য বহু গ্রন্থের প্রকাশনায় ও মুদ্রণে তাঁর নীরব সেবা অনস্বীকার্য। এই প্রসঙ্গে তাঁকেও জানাই আমার মনের প্রীতি ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

মোস্তফা-মঞ্জিল ঃ ঢাকা

এপ্রিল , ১৯৬২

গোলাম মোস্তফা

www.pathagar.com

কবি ও বৈজ্ঞানিক

সুদূর অতীতে মানব যেদিন বিচিত্র-সুন্দর এই বিরাট বিশ্বের বুকে দাঁড়াইয়া অসীম রহস্যভরা প্রকৃতির পানে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে প্রথম দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, সেই দিনই কবিতার জন্ম।

প্রকৃতিই কবিত্বের উৎস। সে-ই মানুষকে কবি করিয়া তুলিয়াছে। যখন ভাষার সৃষ্টি হয় নাই, মানুষ যখন সবেমাত্র এই অদৃষ্টপূর্ব নবীন বিশ্বের নবীন অধিবাসী, তখনই প্রকৃতি-সুন্দরী আপনার সৌন্দর্য-লীলা তাহার নয়ন-সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। প্রভাতের অরুণ-কিরণ, বিচিত্র বিহংগরাজির বিচিত্র কূজন, সদ্যপ্রস্ফুটিত্য কুসুম-বালিকার সুরভিমাখা হাসির বিচ্ছুরণ, শ্যামসুন্দর তরুলতিকার মন্দমন্দ অংগ-শিহরণ, ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন গগন মণ্ডলে বিদ্যুৎ-স্ফুরণ ও বজ্র-আস্ফালন, সন্ধ্যাকাশে রক্ত-নদীর পরপারে অস্তোন্মুখ সূর্যের বিদায়-জ্ঞাপন–ইত্যাদি যাহা কিছু সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক, সকলই তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে শত-প্রকারের অনুভূতি ও ভাবের প্রবাহ ছুটাইয়া দিয়াছে। বিস্ময়-বিহ্বল মানুষ সেই ভাবগুচ্ছকে হৃদয়ের মাঝে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই; তাই সে ভাষা দিয়া তার অন্তরের অনুভূতিকে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। ভাষার সেই সৌন্দর্যমণ্ডিত ভাবের অবিভ্যক্তিই কবিতা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রকৃতির সহিত কবিতার-তথা কবিরও অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। প্রকৃতি যদি সৌন্দর্য দিয়া মানব-মনকে পাগল করিয়া না তুলিত, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী (Phenomena of Nature) যদি মানব-প্রাণে বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক না করিত, তবে মানুষের ভিতর কবিত্বের বিকাশ হইত কি না, সন্দেহ। সৌন্দর্য-বোধই কবিতার জননী।

এই সৌন্দর্য-চেতনা কাহার না আছে? অল্প-বিস্তর সকলেরই আছে। সুতরাং বলা যায় মানব-মাত্রই কবি, কেহ বা নীরব, কেহ বা সরব। প্রাচীন ভারতের সাহিত্যে অথবা হেলেনিক (Helelnic) সাহিত্যে দেখিতে পাই ঃ চন্দ্র-সূর্য ঝটিকা-বিদ্যুৎ ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া তৎকালীন কবি-দার্শনিকেরা অনেক রূপ-কাহিনী (Mythology) সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতিকে অতি-প্রাকৃতিক (supernatural) দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেবতাজ্ঞানে চন্দ্র-সূর্য আলো-বাতাসকে উদ্দেশ করিয়া বহু স্তোত্র (hymns) রচনা করিয়াছেন, ইন্দ্র-বরুণ, প্লুটো নেপচুন, লক্ষ্মী-সরস্বতী, প্যাণ্ডোরা ভেনাস্–ইত্যাদি ধরনের বহু দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছেন। এই রূপেই মূর্তিপূজা প্রচলিত হইয়াছে। এ ছিল প্যাগান যুগের কথা। প্রাকৃতিক দৃশ্যে দেবত্ব আরোপই ছিল এ যুগের বৈশিষ্ট্য। এই সব কল্পকাহিনী ও অন্ধবিশ্বাস জ্ঞানের দিক দিয়া মানব-জাতিকে প্রগতির পথে চালনা করে নাই সত্য, কিন্তু কল্পনা-বিলাসে ও কাব্য-সৃষ্টিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। বহু রোমন্টিক কাব্য ও কাহিনী এই যুগেই রচিত হইয়াছে।

www.pathagar.com

কবিতার উপর প্রকৃতির প্রভাব তাই স্মরণাতীত কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। াদের অমল-ধবল দীপ্তির মধ্যে কবি রূপসী নারীর মুখচ্ছবি দেখিতে পাইয়াছেন, নেহরিণীর চঞ্চল আঁখিকোণে তিনি তাহার নয়ন-ভংগিমা লক্ষ্য করিয়াছেন; ফণিনীর অংগ-সৌষ্ঠবে তিনি তাহার কুঞ্চিত বেণীর শোভা দেখিয়াছেন; চাঁদে-চকোরে বৃক্ষলতিকায়, সাগর-তটিনীতে তিনি প্রেম ও মিলনের মহিমা লক্ষ্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রকৃতির ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোন বস্তুই কবির চোখ এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। আকাশে-ভুবনে আলোকে-আঁধারে সর্বত্র সে সৌন্দর্য খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

কবির সঙ্গে প্রকৃতির যেন তাই আছে এক নিগূঢ় মিতালি। প্রকৃতি যখন প্রফুল্ল কবিও তখন উৎফুল্ল; প্রকৃতি যখন বিষাদে মলিন, কবিও তখন আনন্দহীন। প্রকৃতির সঙ্গে কবির হৃদয়বীণা যেন একতারে এক সুরে বাঁধা। কবির চোখে প্রকৃতি তাই জড়মূর্তি নহে–জীবন্ত, মানুষের মতই তার সুখদুঃখ হাসিকান্না–সব কিছুই আছে। কালিদাস, ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ, শেলী, হাফিজ, ওমর খৈয়াম প্রত্যেকেই তাই প্রকৃতির পটভূমিতে দাঁড়াইয়া কাব্য-রচনা করিয়াছেন।

কিন্তু কবিও প্রকৃতির এই চিরন্তন সম্বন্ধ পূর্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার কারণ বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাবও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কার। বৈজ্ঞানিক আসিয়া কবির কল্পনা-পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে; তার সমস্ত স্বপ্নসৌধ সে ভাঙিয়া দিতেছে। কবি এতদিন অবাধে আকাশ-ভুবনের সর্বত্র বিহার করিয়া ফিরিত, কিন্তু বৈজ্ঞানিক আসিয়া তাহার যে সাধে বাদ সাধিয়াছে। প্রেয়সীর নয়ন-কৌণে বিরহের অশ্রুবিন্দু দেখিয়া কবি মুক্তাবিন্দু জ্ঞানে যে গুলিকে প্রেম-সূত্রে গ্রথিত করিয়া প্রিয়ার কণ্ঠে পরাইয়া দিতে যাইতেছিল, অমনি বৈজ্ঞানিক আসিয়া সেই অশ্রুমালাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিল, উহা মুক্তা নহে–উহা দুইভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন মাত্র। কবি পূর্বে বাগানে ফুলের মধ্যে ফুলরাণীকে খুঁজিয়া ফিরিতেছিল, অমনি বৈজ্ঞানিক আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং শানিত অস্ত্র দ্বারা ফুলের পাপড়িগুলিকে কাটিয়া উদ্ভিদতত্ত্বের গবেষণা শুরু করিল। নিশীথের অন্ধকারে পূর্ণচাঁদ ও তারকা মণ্ডলীকে দেখিয়া কবি নন্দন-কাননের শোভা দেখিতেছিল, বৈজ্ঞানিক আসিয়া অমনি সেই চাঁদে গভীর খাত ও কঠিন পাহাড় আবিষ্কার করিল আর তারাগুলোকে এক একটা গ্রহ-উপগ্রহ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া কবিকে একদম বেকুফ বানাইয়া ছাড়িল। এই রূপে যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন, বৈজ্ঞানিকের ভয়ে কবি সর্বত্র আড়ষ্ট, শিহরিত ও সংকুচিত। বস্তুতঃ কোন স্থানেই বৈজ্ঞানিকের যাইতে বাকী নাই; সবখান হইতে সে কবি ও কল্পনাকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। নিদাঘ-দিবসে (Mid-Summer Day) কুঞ্জবাটিকায় এখন আর পরীর মেলা বসে না; আকাশ-বীণার তারে তারে এখন আর সংগীত-ধ্বনি শোনা যায় না। বৈজ্ঞানিক কলকারখানার বিকট গর্জনে আজ কোকিল-পাপিয়া দেশ ছাড়িয়াছে, আলোর নাচন স্তব্ধ হইয়াছে, সব সুর, সব ইংগিত থামিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ প্রকৃতির বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিকেরা দস্তুরমত অভিযান চালাইয়াছে। প্রকৃতি তাই তার গোপন সম্পদ লইয়া যেন আরও দূরে সরিয়া যাইতেছে। রহস্যের দুয়ার সে যেন এখন বন্ধ করিয়া দিতেছে।

www.pathagar.com

কিন্তু প্রকৃতিও সহজ পাত্রী নহে। বৈজ্ঞানিকের উপর সেও হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছে। সময়ে সময়ে সেও প্লাবন ভূমিকম্প ঝটিকা ঘূর্ণিবার্ত্যা ইত্যাদি মারণযন্ত্র দ্বারা বৈজ্ঞানিকের সকল প্রয়াসকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। কোন কঠিন ধাতব অস্ত্র বা বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা নয়—বরফস্তূপ দ্বারা সে সমুদ্র-জয়ী 'টাইটানিক; জাহাজকেও ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। কবিদের প্রতি সে এখনও সদয় আছে। তাই আমরা দেখিতে পাই—যুগে যুগে এক একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও এক একজন খ্যাতনামা কবিকে পাঠাইয়া দিয়াছে। টমসনের পাশে পোপ, নিউটনের পাশে মিলটন, জগদীশচন্দ্রের পাশে রবীন্দ্রনাথ এ-কথার সাক্ষ্য দিবে। এমনও ঘটিতেছে যে, কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মধ্যেই কবির জন্ম হইতেছে। ওমর খৈয়াম তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। প্রকৃতির কী অপরূপ প্রতিশোধ।

অধুনা বিজ্ঞানের যুগ আসিয়াছে। কাব্যের তাই আর তত আদর নাই। কবির কল্পনা এখন বিদ্রূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু তবুও হতাশ হইবার কিছু নাই। বিজ্ঞানের প্রতিপত্তি যতই বৃদ্ধি পাউক না কেন, জড়শক্তি যতই প্রবল হউক না কেন, কবিকে একেবারে নির্বাসিত করা কিছুতেই সম্ভব হইবে না। মানুষ শুধু কর্ম লইয়া বাঁচিতে পারে না। কর্মও চাই, কল্পনাও চাই, কাজও চাই, কথাও চাই। শুধু কথা দ্বারা কাজ হয় না বটে, কিন্তু কথা ছাড়াও ত কাজ হয় না। এ সম্বন্ধে জনৈক কবি বলিতেছেন ঃ

"Words are deeds, the words we hear
May revolutionise or rear
A mighty State. The words we read
May be a spiritual deed
Excelling any fleshly one
As much as the celestial sun\
Transcends a bonfire, made to throw
A light upon some rare show;
A simple proverb tagged with rhyme
May colour half the course of time.
The pregnant saying of a sage
May influence every coming age.
A song in its effect may be
More glorious than Thermopylae.

ঃ কথাই কার্য। কথার দ্বারাই জগতে বড় বড় কার্য সাধিত হইতেছে। কথার দ্বারা এক একটা যুগের স্রোত ফিরিয়া যাইতেছে। একটা গান থার্মোপালির যুদ্ধজয়ের চেয়েও মূল্যবান।

বাস্তবিকই কথার মূল্য আছে। কথার দ্বারাই কত ঘুমন্ত জাতি জাগিয়া উঠিতেছে, আবার কথার অভাবে কত জাগ্রত জাতি ঘুমাইয়া পড়িতেছে। দ্বিতীয় মেসেনিয়ার যুদ্ধে (Second Messenian War in Greece) স্পার্টাবাসীরা দৈববাণী (oracle)

www.pathagar.com

অনুসারে এথেন্সের নিকট একজন নেতার জন্য আবেদন করে। কিন্তু এথেন্সবাসীরা স্পার্টানদিগকে সাহায্য করিতে আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক ছিল না; অথচ দৈববাণীর অসম্মানও করা যায় না। তাই উভয় কূল বজায় রাখিতে গিয়া তাহারা টার্টিয়াস (Tyrtaeus) নামক একজন খোঁড়া লোককে স্পার্টান সৈন্যের অধিনায়করূপে প্রেরণ করে। টার্টিয়াস ছিলেন একজন কবি। স্পার্টাবাসীরা তাঁহাকেই নেতারূপে বরণ করিয়া লইয়া মেসেনিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করে। প্রথমতঃ মেসেনিয়ানরা জয়লাভ করিল। তদ্দৃষ্টে স্পার্টান সৈন্য ভীত ও হতাশ হইয়া পড়িল। কিন্তু এই সময়ে টার্টিয়াসের অনলবর্ষী সমর-সংগীতে স্পার্টানদের প্রাণে নববলের সঞ্চার হইল। নূতন উদ্যমে তাহারা আবার যুদ্ধদান করিল। এইবার মেসেনিয়ান সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল।

আরব ইতিহাসেও এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

বস্তুতঃ কবি না থাকিলে এই পৃথিবী কঠিন বাস্তবে পরিণত হইত। মাটির পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া আমাদের চিন্তা আর অনন্তের পথে উধাও হইতে পারিত না। নিরাকার আল্লার ধ্যান করাও তখন আর সম্ভব হইত না। সৃষ্টির অন্তরে কী গোপন রহস্য আছে, কোথাও কী ইংগিত আছে, কিছুই আমরা জানিতে পারিতাম না।

কবি কল্পনা লইয়া থাকে, ইহাই তাহার অপরাধ। কিন্তু একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, কল্পনা না হইলে বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান-সাধনাও অচল হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিক প্রথমতঃ কল্পনা বলে একটা থিওরী খাড়া করেন, পরে তাহাকে অবলম্বন করিয়া গবেষণা করিতে থাকেন। গবেষণা দ্বারা কল্পিত থিওরীটি সত্য প্রমাণিত হইলে তখনই তাহা বৈজ্ঞানিক তথ্যে পরিণত হয়। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিকের জন্যও কল্পনার প্রয়োজন আছে।

অতএব দেখা যাইতেছে কবি সহজ পাত্র নন। কবির আদর চিরকাল ছিল, আছে এবং থাকিবে। সেই কবির মহিমা গাহিয়া এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিলাম।[১]

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা

১৯১৭

১. ২৭।১২।১৭ তারিখে কলিকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউটে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

www.pathagar.com

আনোয়ারা

(সমালোনা)

ইহা একখানি সামাজিক উপন্যাস। মৌলভী নজিবর রহমান সাহেব কর্তৃক লিখিত এবং ৫ এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচসিকা।

বাঙালী মুসলমান এতদিন সম্যকরূপে বাংলা ভাষার সেবা করে নাই। সুখের বিষয় আজকাল এদিকে তাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। অনেক প্রতিভাবান তরুণ লেখকের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ৩/৪ বৎসরের মধ্যেই উপন্যাসাদি অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলির ভাব ভাষা ও ভংগী দেখিলে লেখকের প্রাণের আবেগ, অন্তরের আকাংখা ও গতিপথের সন্ধান পাওয়া যায়।

পুস্তক ও অনেকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুলির উপযুক্ত সমালোচনা হইতেছে না। সাহিত্যে সমালোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। উপযুক্ত সমালোচনার অভাবে লেখকগণ উৎসাহ পাইতেছেন না, কিন্তু নিজেদের দোষগুণ বুঝিতে পারিতেছেন না। সমালোচনা অনুকূলই হউক বা প্রতিকূলই হউক, উন্নত ধরনের (learned criticism) হইলে উহা হইতে লেখক অনেক বিষয় শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। যাহারা খেলোয়াড়, তাহারা নিজেদের ভুলচুক নিজেরা ততটা ধরিতে পারে না; দর্শকেরাই তাহা ভাল ধরিতে পারে।

যাক। আমাদের সমালোচনার বিষয়বস্তু হইতেছে উপন্যাস। অতএব উপন্যাস সম্বন্ধে এখানে দুই একটি কথা বলিলে বোধহয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উপন্যাস লইয়া আমাদের সমাজে রুচিবিরোধ ঘটিয়াছে। একদল ইহার ঘোর বিরোধী, অপর দল ইহার ঘোর অনুরাগী। তাহারা উপন্যাসকে সৎসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না। উপন্যাস দ্বারা জাতীয় চরিত্র গঠিত হয় না, উহা পাঠকের মনকে বিকৃত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়; লোকে অযথা sentimental বা ভাববিলাসী হইয়া উঠে, প্রকৃত কাজের লোক গঠিত হয় না—ইহাই তাহাদের যুক্তি ও অভিমত। কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও আংশিক ভাবে সত্য বটে। তরল ভাব ও হালকা রসবোধ বহুবিধ অকল্যাণের কারণ। জতির মেরুদণ্ড উহাতে দুর্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু অন্যদিক দিয়া দেখিতে গেলে উপন্যাসের যে কোনই মূল্য নাই, একথা স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত নই। সাহিত্যের দুইটি বিভাগ আছে ঃ উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ও সাধারণ সাহিত্য। উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস ইত্যাদি পরিমার্জিত বিষয়গুলির একচেটিয়া অধিকার; আর গল্প উপন্যাস ইত্যাদি যাহা কিছু সরস ও সাধারণের উপভোগ্য, তাহাই লইয়া সাধারণ সাহিত্য। এই দুই এর সংমিশ্রণেই সাহিত্যের পূর্ণতা। সুতরাং গল্প-উপন্যাসকে কি করিয়া আমরা সাহিত্যের আঙিনা হইতে তাড়াইয়া দিতে পারি? সাধারণ মানুষকে যেমন সমাজ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া যায় না, সাধারণ সাহিত্যকেও লোক-সাহিত্যক্ষেত্র হইতে তাড়ান যায় না। সকল কালের সকল সাহিত্যেই লোক-সাহিত্যের স্থান আছে। হোমারের 'ইলিয়াড', ভার্জিলের 'এনিড', হিন্দুর 'রামায়ণ-মহাভারত', মুসলমানের 'আলিফ্ লায়লা' এ কথার সাক্ষ্য দেয়।

তাছাড়া উপন্যাসের দ্বারা জাতিগঠনও সম্ভব। জাতীয় লক্ষ্য ও আদর্শের সহিত খাপ খাওয়াইয়া উপন্যাস রচনা করিলে তাহা দ্বারা সহজেই সমাজ-সংস্কার করা যায়। কথাই আছে "Example is better than precept". বাস্তবিক, উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা উপদেশ অনুযায়ী একটি আদর্শ দেখাইয়া দিলে উহাতে অধিকতর ফল লাভের সম্ভাবনা।

www.pathagar.com

গল্প ও উপন্যাসের দ্বারা সেই কাজ করা সহজ হয়। কিরূপে লোকের মনে পাপের সঞ্চার হয়, কোথায় কেমন করিয়া তাহার পরিণাম ফল ফলে, কিরূপে প্রেম ও পুণ্যের জয় হয়; সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে কিরূপে মানুষের মন খেলা করে—সমস্তই উপন্যাসের মধ্য দিয়া সুস্পষ্ট ভাবে ফুটাইয়া তোলা যায়। বস্তুতঃ মানুষের মনে রং ধরাইবার জন্য উপন্যাস এক শ্রেষ্ঠ উপকরণ। তাই আমার মনে হয় উপন্যাসকে একদম বর্জন না করিয়া উহাকে কাজে লাগানো আমাদের উচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস দ্বারা বাঙালী হিন্দুর নবজীবন লাভ হইয়াছে। এইরূপ সমাজসংস্কার ও জাতিগঠনমূলক উপন্যাস বর্তমানে আমাদেরও একান্ত প্রয়োজন।

যাহারা উপন্যাস লিখিতেছেন তাহাদের একটি কথা মনে রাখা উচিত। উপন্যাসের পরিবর্তিত হইতেছে। রোমান্টিক যুগ চলিয়া গিয়াছে, এখন মনস্তত্ত্বের যুগ আসিয়াছে। মানব-মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে রূপ দেওয়াই এখনকার উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। আমাদের লেখকগণ যাহা লিখিতেছেন তাহা অধিকাংশই রোমান্টিক। খুব আশ্চর্যজনক ঘটনার সমাবেশের নামই উপন্যাস নয়। মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণেই আজকার উপন্যাসের বড় কথা। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' 'নৌকাডুবি' ইত্যাদি এই শ্রেণীর উপন্যাস। বলা বাহুল্য এই ধরনের উপন্যাস আমাদের একটিও নাই।

উপরে উপন্যাস সম্বন্ধে সাধারণভাবে যাহা বলা হইল, 'আনোয়ারা' সম্বন্ধেও তাহা বলা যায়। ইহা অনেক স্থানে রোমান্টিক এবং অবাস্তবতা দোষে দুষ্ট। আধুনিক উপন্যাসের যে বিশেষত্ব, আনোয়ারাতে তাহা নাই। তবে একেবারেই যে ইহা অবাস্তব রূপকথার অনুরূপ, তাহাও নহে। বাস্তব জীবনের কিছু স্পর্শ ইহাতে আছে। আনোয়ারার চরিত্র সাধারণ মুসলমানের আশানুরূপ হইয়াছে, একতথ বলিতেই হইবে। আদর্শ পতিভক্তি, ধর্মপ্রাণতা, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, রন্ধন-নৈপুণ্য ইত্যাদি নারীধর্মের নানা গুণই আনোয়ারাতে বিদ্যমান। যে স্বামী আনোয়ারার মত স্ত্রী-রত্ন লাভ করিতে পারে, তাহার দাম্পত্য জীবন নিশ্চিতই মধুময় হইয়া থাকে। আনোয়ারা উচ্চশিক্ষিতা না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কিছু যায়-আসে না। "The brain-woman never interests us like the heart-woman." অর্থাৎ বুদ্ধিমতী নারী হৃদয়বর্তী নারীর মত আনন্দদায়িনী নয়। সেই হিসাবে আনোয়ারা-চরিত্র আমাদিগকে প্রচুর আনন্দ দেয়। আনোয়ারা উপন্যাসের জনপ্রিয়তার গূঢ় কারণ এই।

কিন্তু দুঃখের বিষয় কয়েকটি স্থানে লেখক এমন সব আজগৈবী ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন, যাহা আনোয়ারা-চরিত্রকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। লেখক অহেতুক তাঁর প্লটকে রোমান্টিক করিতে যাইয়াই সব মাটি করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, দুর্গা বৈষ্ণবীর প্ররোচনায় 'সঞ্জীবনীলতা' তুলিয়া আনিবার জন্য নিশীথ রাত্রে আনোয়ারা বাড়ির বাহির হইয়া যাওয়া কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নহে—আর্টের দিক দিয়াও নহে, বাস্তবতার দিক দিয়াও নহে। কোন নিষ্ঠাবান মুসলিম পরিবারের এরূপ ঘটনা নিতান্তই অস্বাভাবিক।

উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে আনোয়ারা "রূপার খাটে বসিয়া সোনার আলনায় চুল শুকানো" চরিত্রটিও অত্যন্ত হাস্যকর। রূপকথাতেই এসব অলস কল্পনা ভাল মানায়। এইরূপ ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি আরও অনেক আছে।

তবু বলিতে চাই, নানা দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এ যুগের মুসলিম উপন্যাসগুলির মধ্যে আনোয়ারাই অগ্রগণ্য।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা।

১৯১৮

www.pathagar.com

বীরাঙ্গনা খাওলা

(ঐতিহাসিক কাহিনী)

বীর-কেশরী খালেদের নেতৃত্বে মুসলিম সৈন্য দামেস্ক নগরী অবরোধ করিয়াছে।

এই সংবাদে রোমক-সম্রাট হেরাক্লিয়াস খুব চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। দামেস্ক তাঁহার অধীন একটি প্রদেশ; সুতরাং ইহার রক্ষা-কল্পে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। এতদুদ্দেশ্যে তিনি আজানাদিন প্রদেশে বিপুল সেনাসংগ্রহ করিলেন এবং ওয়ার্দ্দান নামক একজন বিচক্ষণ সমরনীতিবিশারদ ব্যক্তিকে তাহার অধিনায়কপদে বরণ করতঃ অচিরে দামেস্ক-দুর্গের অবরুদ্ধ সৈন্যদিগকে সাহায্য করিবার নিমিত্তি প্রেরণ করিলেন।

মহাবীর খালেদ এই সংবাদ পাইয়া একটু বিচলিত হইলেন। সম্মুখে-পশ্চাতে উভয় দিকেই শত্রু-সমাবেশ। কোন দিকে ফিরিবেন? যদি তিনি দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিয়া থাকেন, তবে ওয়ার্দ্দানের সৈন্য আসিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিবে। আবার যদি অবরোধ উঠাইয়া লইয়া ওয়ার্দ্দানের সহিত যুদ্ধদান করিতে যান, তবে সেই সুযোগে দুর্গস্থিত শত্রু-সৈন্য তাহার পশ্চাদনুসরণ করিবে। সৈন্যসংখ্যাও এত বেশী নহে যে, দুই দলে বিভক্ত করিয়া দুই দিকেই যুদ্ধ চালনা করেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনি সকলের নিকটে এ সম্বন্ধে পরামর্শ লইলেন। তখন অন্যান্য মুসলিম সৈন্যদল সিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল। সুতরাং তাহাদের সাহায্য লাভ করাও সম্ভব বলিয়া বোধ হইল না, কারণ তাহাদিগকে কেন্দ্রীভূত করিতে হইলে সময়ের দরকার। পরামর্শের পর অবশেষে স্থির হইল যে, দামেস্ক হইতে অবরোধ উঠাইয়া আজনাদিন অভিমুখেই যাত্রা করা যাউক। পথিমধ্যেই ওয়ার্দ্দানের সৈন্যদলকে বাধা প্রদান করিতে হইবে।

ফজরের নামাজের পর মঙ্গলবার খোদাতা'লার নিকট মুসলমানদের সর্ববিধ কল্যাণ এবং নিজেদের সংকল্পসাফল্য কামনা করিয়া সকলে দুর্গ-প্রাকার ছাড়িয়া চলিলেন। তখন প্রভাতের স্বর্ণ-প্লাবনে পূর্বাকাশ ভাসিয়া গিয়াছে। সেই রক্তিম আভা বিশ্ববুকে নামিয়া আসিয়া মোস্লেম সেনানীর ললাট-দেশ চুম্বন করতঃ তাহাদের ধর্মোজ্জ্বল মুখশ্রীকে আরও পবিত্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিল। হিরণ-কিরণের পুলকস্পশ খরধার মুক্ত তলোয়ারে বিশ্ববিজয়ী মুসলমান জাতির দোর্দণ্ড প্রতাপ অনুপম নির্ভীকতা, অসীম মনোবল এবং প্রবল বিজয়াকাঙ্ক্ষার রেখাপাত করিয়া গেল।

বিপক্ষীয়গণ দুর্গাভ্যন্তর হইতে যখন দেখিতে পাইল মুসলমান সৈন্য সদলবলে প্রস্থান করিতেছে, তখন তাহারা মনে করিল, নিশ্চয়ই ইহারা ভয়ে পলায়ন করিতেছে। নতুবা এমন সময় এমন ভাবে অবরোধ উঠাইয়া লইবে কেন? সুতরাং আক্রমণের ইহাই উপযুক্ত সুযোগ মনে করিয়া 'পল' এবং 'পিটার' নামক ভ্রাতৃযুগলের অধিনায়কত্বে তাহারা মুসলমান সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিল। দশ সহস্র পদাতিক সৈন্য লইয়া পিটার অগ্রসর হইলেন, এবং পল ছয় সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য পরিচালনা করিলেন।

www.pathagar.com

ইত্যবসরে খালেদ প্রমুখ বীরগণ প্রধান সৈন্যদল সহ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া অনেকদূর চলিয়া গিয়াছেন। রসদপত্র সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি সহ স্ত্রীপুত্রাদি পশ্চাদ্ভাগে রহিয়াছে।

পলের অশ্বারোহী সৈন্যদল অধিকতর ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হইয়া পার্শ্বস্থিত মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করিল। ক্ষণপরে পিটার তাহার পদাতিক সৈন্য লইয়া সাজ-সরঞ্জাম, রসদ-সম্ভার এবং পুত্রকন্যাদিসহ রমণীদিগকে ঘেরাও করিয়া ফেলিল। রমণীবৃন্দ যথাসাধ্য বাধাপ্রদান করিল বটে, কিন্তু অগণিত শত্রু-সম্মুখে তাহাদের ক্ষুদ্র বাধা প্রবল স্রোতের গতি পথে বালির বাঁধের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া ভাসিয়া গেল। সকলে বন্দী হইল। রমণী দলের মধ্যে বীরবর জেরারের সহোদরা ভগিনী অনিন্দ্য সুন্দরী রণরঙ্গিনী খাওলা অন্যতম।

আল্লাহু-আকবর ধ্বনিতে আকাশ প্রকম্পিত করিয়া মুসলমান সৈন্য বিপুল বিক্রমে পলের অশ্বারোহী সৈন্যকে আক্রমণ করিল। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই স্বর্গীয় তেজোদীপ্ত অল্পসংখ্যক মুসলমান সৈন্যের প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করা পলের একান্ত অসাধ্য হইয়া উঠিল। তাহার সৈন্যদল ক্রমে ক্রমে এত অধিক পরিমাণে নিহত হইতে লাগিল যে, অবশেষে পল তাহার ষষ্ঠি সহস্র সৈন্যের মধ্যে অতি অল্প-সংখ্যক সৈন্য লইয়া দামেস্কাভিমুখে পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইলেন।

ইত্যবসরে পিটার বন্দিনীদিগকে লইয়া দামেস্কের পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। ভ্রাতার সাহায্য কল্পে অগ্রসর না হইয়া তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন–অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করার ফলে মুসলমান সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। মুসলমানদিগের পরাজয় সম্বন্ধে তিনি স্থির নিশ্চিত ছিলেন, তাই তিনি আর ভ্রাতার সাহায্য করিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিলেন। নিমেষের মধ্যে মস্ত একটা শত্রু-বিজয় হইয়া গেল ভাবিয়া তাঁহার সৈন্যদল আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেল। তখন সকলে একটা নিভৃত স্থান দেখিয়া লুণ্ঠন লব্ধ যাবতীয় দ্রব্য নিজেদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইবার জন্য উপবেশন করিল। অদূরে একটি ক্ষুদ্র নহর প্রবাহিত হইতেছিল; তাহার পানিতে সকলে হস্তমুখ প্রক্ষালন পূর্বক প্রান্তরের মৃদুমন্দ সমীরণে ক্লান্তি দূর করিল। অতঃপর লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি এবং রমণীবৃন্দকে সকলের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইল। পিটারের অংশে রমণী-দুর্লভ খাওলা নির্দেশিত হইলেন।

বণ্টন শেষ হইলে সকলে শিবির সন্নিবেশ করতঃ ইচ্ছামত বিশ্রাম করিতে প্রস্তুত হইল। বন্দিনীদিগকে নিরস্ত্র করিয়া তাহাদের পাহারা কার্যে একজন গ্রীক সৈন্যকে নিযুক্ত করা হইল। রমণীবৃন্দ বাহিরে পড়িয়া নিজেদের শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিল।

খাওলা বীরবর জেরারের উপযুক্ত ভগিনী। রমণী-সুলভ আকুল ক্রন্দনে অথবা হা-হুতাশে ব্যাপৃত না হইয়া তিনি মুক্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, এরূপ ভাবে বিধর্মীদিগের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে তাহাদের ভোগের দাসী হইতে হইবে। এই জ্ঞান তাহার বলিষ্ঠ আত্মমর্যাদাকে বারে বারে আঘাত দিতে লাগিল। তাহারা যে একটা বীর জাতির বংশ-সম্ভূতা, একথা মুহুর্মুহু তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; সঙ্গিনীদিগকে সম্বোধন করিয়া তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে বলিতে

লাগিলেন, কি! আমরা কি মহাপুরুষ হজরতের অনুবর্ত্তিদিগের বংশ-সম্ভূতা নই; আমাদের পিতা, আমাদের ভ্রাতা, আমাদের স্বামী, আমাদের পুত্র কি বীর নামে পরিচিত নয়? তাহাদের তেজোবীর্য্য কি আমাদের শিরায় শিরায় রক্ত-কণিকায় প্রবাহিত হইতেছে না? তাই যদি হয়, তবে কোন্ প্রাণে কোন হস্তে আমরা তাঁহাদের শুভ্র পবিত্র নামে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিব? স্বজাতির গৌরব রক্ষা কল্পে, সতীত্ব ও ধর্ম রক্ষা কল্পে, এস আমরা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হই।

খাওলার সঙ্গিনীদিগের মধ্যে হামজা-বংশীয়া বীরজায়াগণ অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাদের সকলেই অশ্বারোহণে সুনিপুণা, তীর এবং বর্শা নিক্ষেপে সিদ্ধহস্তা। তাঁহারা খাওলার সেই জ্বালাময়ী ধিক্কারবাণী শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, "বোন, উপায় কি? তরবারি, বর্শা, অথবা তীরধনক কিছুই যে আমাদের নাই!"

খাওলা উত্তর করিলেন—"কিছুই নাই বটে; কিন্তু শিবিরের এই সকল কাষ্ঠখণ্ড ত আছে? এস, প্রত্যেকে ইহার এক একখানি লও। ইহা দ্বারাই আমরা যুদ্ধ করিব। খোদার অনুগ্রহে নিশ্চয়ই আমরা জয়যুক্ত হইব। আর যদি না হই, তাতেই বা ক্ষতি কি? বীরাঙ্গানার মত একে একে শত্রু-হস্তে জীবন বিসর্জন দিব, তথাপি এমনভাবে জীবিত থাকিয়া আমাদের স্বদেশ ও স্বজাতির মুখে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিতে পারিব না।"

অফিরা নাম্নী একজন বীররমণী খাওলার এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। অতঃপর সকলে সেইসব কাষ্ঠদণ্ড একে একে তুলিয়া লইলেন। খাওলা সকলকে বৃত্তাকারে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া দিয়া বলিলেন—'নড়িও না, ঠিক হইয়া দাঁড়াও! সম্মুখে যাহাকে পাইবে, তাহারই মস্তক লক্ষ্য করিয়া বিপুল বিক্রমে আঘাত করিবে। সাবধান, শত্রু যেন তোমাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে না পারে।"

খাওলার যে কথা সেই কাজ। একজন গ্রীক সৈন্য এই সময় তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। তখনি খাওলার এক আঘাতে বেচারার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। এই গোলযোগে পিটার আসিয়া দেখিলেন ব্যাপার গুরুতর। সৈন্যদিগের দ্বারা তিনি তাহাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং সকলকে শান্ত করিবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু নারীবাহিনী অটল অচল। পক্ষান্তরে যিনিই তাহাদের দণ্ডসীমার মধ্যে আসিতে লাগিলেন, তিনিই আহত হইলেন।

সেই এলোকেশে রণরঙ্গিনী বেশে ভীতিহীনা দণ্ডপাণি খাওলার মুখাবয়ব এক অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। কি সু-উন্নত দেহ। মাংসপেশী সমন্বিত কি সুগোল নিটোল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ! কি মনোরম গঠনভঙ্গিমা। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল নয়ন-তারার কি বহ্নি-দীপ্তি। দেখিলে মনে ভয় ও বিস্ময় জাগে।

খাওলার উজ্জ্বল-মধুর সৌন্দর্য্য দর্শনে পিটার অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সৈন্যদিগকে বলিয়া দিলেন, "সাবধান, একটি অস্ত্রও যেন কাহারও অঙ্গে নিক্ষিপ্ত না হয়।" তৎপর নিজে নানাবিধ প্রেমপূর্ণ মৃদু বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন,—"সুন্দরী, শান্ত হও; এ দুঃসাহস পরিত্যাগ কর। অসংখ্য সৈন্যের বিরুদ্ধে তোমাদের এই যুদ্ধপ্রচেষ্টা নিতান্তই বাতুলতার পরিচায়ক। তুমি জান, মুহূর্ত মধ্যে আমার সৈন্যদল তোমাদের ক্ষুদ্র অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া দিতে পারে; অতএব শান্ত হও। কিসের জন্য এত বিপুল প্রয়াস? শত্রু জয় করিবে? ভাল, তাই যদি, তবে রণমূর্তি পরিহার কর, বিনাযুদ্ধে শত্রুজয়

www.pathagar.com

হইবে। আমার এই বিশাল হৃদয়-রাজ্য তোমাকেই সমর্পণ করিতেছি; এস, তুমি তাহার রাণী হইবে। সৈন্যসামন্ত, ধন-সম্পদ সকলি তোমার পদমূলে উৎসর্গ করিব। হে সুন্দরী, আমি তোমাকে ভালবাসি।"

এই অযাচিত প্রেম-সম্ভাষণে সতী-সাধ্বী খাওলার ক্রোধ আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইল।–"ওরে বিধর্মী কুক্কুর, এত বড় স্পর্ধা!" বলিতে বলিতে খাওলার বিস্ফারিত নয়নদ্বয় অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল।

খাওলার এই ঘৃণাসূচক ভীতি-প্রদর্শনে পিটারের মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। বলিলেন–"সুন্দরী! সৌন্দর্য-গর্বে বিভোর হইয়া একেবারে কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়াছ? এখনও বলিতেছি, ক্ষান্ত হও, নতুবা মরণ নিশ্চিত।"

খাওলা একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন–"মরণ? আরব রমণী ধর্ম ও সতীত্ব রক্ষার জন্য মরণকে হাসিয়া বরণ করিতে জানে। সেজন্য তারা শত্রুকে একটুও ভয় করে না।"

শুনিয়া পিটারের ধৈর্যচ্যুতি হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সৈন্যদিগকে হুকুম দিলেন–"আক্রমণ কর।" আদেশ প্রাপ্তি মাত্র সৈন্যগণ রমণী দিগের প্রতি ধাবিত হইতে উদ্যত হইল। কিন্তু পিটার ইঙ্গিতে তাহাদিগকে থামাইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "মরণ যে অতি নিকট? কে তোমাদিগকে রক্ষা করিবে?

খাওলা উর্দ্ধদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক বলিলেন, "রক্ষাকর্ত্তা আল্লাহ।"

"বটে! তবে দেখ।"–এই বলিয়া তিনি পুনরায় সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন–"আক্রমণ কর!"

এমন সময় ও কি! অদূরে ও কিসের শব্দ! এ যে অশ্বনিচয়ের সমবেত পদনির্ঘোষ। পিটার দেখিতে পাইলেন, বীরেন্দ্র জেরার সসৈন্যে তীরবেগে তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছেন।

দেখিয়াই পিটারের সর্বাঙ্গে কম্প উপস্থিত হইল। তাড়াতাড়ি তিনি সৈন্যদিগকে ক্ষান্ত হইতে আদেশ দিলেন। খাওলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ফিরিয়া যাও। তোমরা মুক্ত। তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিলাম!: এই বলিয়া তিনি সদলবলে পলাইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। রণ-রঙ্গিণী খাওলা তখন দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন ঃ "কেন, প্রণয়-বাসনা নিমেষেই মিটিয়া গেল? যাও কোথায়?" এই বলিয়া তিনি হস্তস্থিত দণ্ড দ্বারা পিটারের অশ্বের পদে ভীমবেগে আঘাত করিলেন। অশ্বের সঙ্গে সঙ্গে পিটার ভূমিতলে পতিত হইলেন। এমন সময় জেরার আসিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

দামেস্ক-দুর্গের পতন হইল। খাওলার সেই রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি আর নাই। ভীষণ ঝটিকাবর্ত্তের পর প্রকৃতি যেমন শান্তভাব ধারণ করে, খাওলার মধ্যেও তেমনি একটা প্রশান্তি নামিয়া আসিয়াছে; রক্তিম অধরে হাসি ফুটিয়াছে; বিজয়োৎফুল্ল নয়ন-কোণে বিদ্যুৎ খেলিতেছে।

"আল্লাহু-আকবর" ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল। দামেস্ক-দুর্গের মাথার উপর ইসলামের হিলালী ঝাণ্ডা সগৌরবে উড়িতে লাগিল।

সওগাত

১৯১৮

www.pathagar.com

শিশুর শিক্ষা

প্রকৃতিবাদী ফরাসী মনীষী রুশো (Rousseau) বলিয়াছেন ঃ

"Coming from the hand of the Author of all things, everythings is good; in the hands of man everything degenerates.

অর্থাৎ ঃ স্রষ্টার হাত হইতে যাহা কিছু আসে সবই সুন্দর; মানুষের হাতে পড়িয়া সবই বিকৃত হইয়া যায়। কথাটি সর্বাংশে সত্য না হইলেও মানব-শিশুর বেলায় অনেকখানি সত্য। শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে থাকে অতি পবিত্র-অতি নির্মল। কিন্তু মানুষের হাতে পড়িয়া সে অন্যরূপ হইয়া যায়।

অবশ্য রুশোর কথা এখানে সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লওয়া যায় না। রুশো হয়ত বলিতে চান শিশুর লালন-পালনও শিক্ষার ভার প্রকৃতির উপর ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত; সেখানে মানুষের কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। কিন্তু মানুষ ত আর পশু নয়; সে বিবেক ও জ্ঞানসম্পন্ন (rational) জীব; একটা বিশেষ লক্ষ্য ও আদর্শ দ্বারাই সে চালিত হয়। কাজেই তার শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবন-পদ্ধতি প্রকৃতি হইতে অনেকাংশে স্বতন্ত্র না হইয়াই যায় না। মানুষের দ্বিতীয় স্বভাব (Second Nature) আছে; সে স্বভাব তার শিক্ষা, আচার-ব্যবহার, পারিপার্শ্বিকতা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রভাবে গড়িয়া উঠে। এইজন্য মানুষের সভ্যতা, রুচি ও আদর্শের অনুযায়ী করিয়াই শিশুকে গড়িয়া তুলিতে হয়। শিশুর লালন-পালন ও শিক্ষাদান তাই আমাদের অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ এক কর্তব্য।

কিরূপ শিক্ষা শিশুকে দিতে হইবে? সে শিক্ষা কি প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হইবে? কোন লক্ষ্য ও আদর্শের দ্বারা সে শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হইবে? আমাদের হাতে শিশুর শিক্ষা সঠিক হইতেছে কিনা, কেমন করিয়া আমরা তাহা বুঝিব? ভালমন্দ বিচার করিবার মাপকাঠি আমাদের কী?

এ বড় কঠিন প্রশ্ন।

আমাদের মনে হয় ঃ মধ্য পথ ধরিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে। স্বভাব কী চায় তাহাও যেমন আমাদিগকে দেখিতে হইবে, মানব-সমাজ কী চায় তাহাও ঠিক তেমনই আমাদিগকে দেখিতে হইবে। শিশু নিঃসহায় হইয়া আমাদের হাতে আসে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সে অত দুর্বল নয়। নানা অস্ত্রে ভূষিত হইয়াই এই শিশু-বীরদল দুনিয়ার বুকে লাফাইয়া পড়ে। কাজেই তাহাদিগকে যত সহজ ও নিরীহ বলিয়া মনে হয়, আসলে কিন্তু তাহারা তত সহজ পাত্র নয়। বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহাদের গায়ে হাত দেওয়া উচিত।

শিশুকে কিভাবে আমরা লালন-পালন করি এবং কোথায় আমাদের ভুল হয়, সেই কথাই সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব। অন্য কাহারও কথা পরে হইবে, শিশুর যিনি জন্মদাত্রী, সেই জননী কি করেন, তাহাই আগে দেখা যাউক।

আমরা প্রথমেই বলিয়া রাখিতে চাই ঃ জননীর স্নেহই শিশুর প্রথম ক্ষতির কারণ। আমাদের সতর্কতা সর্বপ্রথম এখান হইতেই আরম্ভ হওয়া উচিত।

মাতাপিতা প্রাণ দিয়া শিশুকে ভালবাসেন ও লালন-পালন করেন কেন? উদ্দেশ্যঃ পরবর্তী কালে সে যাহাতে সত্যিকার 'মানুষ' হইয়া জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। ইহাই যদি লক্ষ্য হয়, তবে প্রত্যেক মাতাপিতার দৃষ্টি রাখা উচিত—শিশুর প্রতি তাঁহাদের স্নেহ ও মমতা যেন সেই মহান উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হইয়া না দাঁড়ায়।

www.pathagar.com

কিন্তু জননী অনেক সময় সে কথা ভুলিয়া যান। অহেতুক স্নেহ করিতে গিয়া সন্তানের বহু অমঙ্গলই তিনি ডাকিয়া আনেন। স্তন্যদুগ্ধই হউক অথবা গোদুগ্ধই হউক; শিশু যখন খাইতে চাহে না, তখনও জননী জোর করিয়া শিশুকে দুধ খাওয়ান। শিশু কতখানি খাইতে পারে বা কখন কখন তাহার ক্ষুধা লাগিতে পারে, সে সব কথা চিন্তা না করিয়াই তিনি শিশুকে দুগ্ধ পান করান। শিশু যখন ঝিনুকের দুধ ওগ্‌রাইয়া ফেলে, তখনও ছাড়াছাড়ি নাই। জোর করিয়াই দুধের ঝিনুক তিনি তাহার মুখে পুরিয়া দেন। এখানে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। স্বভাব চায় না অথচ মা ছাড়েন না! দুধ কম খাইলে পাছে শিশু কাবু হইয়া যায়, এই তাঁর ভয়। ফলে শিশুর পেটের অসুখ দেখা দেয়, লিভার খারাপ হয় এবং অন্যান্য উপসর্গ বাড়ে। কাজেই এখানে স্নেহকে কিছুটা সংযত করা প্রয়োজন। সময় এবং পরিমাণ ঠিক করিয়াই শিশুর দুগ্ধ পান করান উচিত। শিশু কাঁদিয়া উঠিলেই যে বুঝিতে হইবে তার ক্ষুধা পাইয়াছে, এরূপ মনে করা ভুল। শিশুর ভাব-প্রকাশের একমাত্র উপায়ই ত কান্না। কোন্ খেয়ালে সে কাঁদে কে বলিবে। হয়ত মাকে না দেখিয়া কাঁদে, না হয় ত ক্রিমির জন্য পেট কামড়ায় বলিয়া কাঁদে, না হয়ত অন্য একটা কিছুর অভাবের বেদনায় কাঁদে! সুতরাং সব কান্নার ভিতর দিয়াই সে যে দুধ চায়, ইহা হইতেই পারে না।

অতএব শিশুর কান্নাকেই আমাদের প্রথম বুঝা উচিত। এই কান্না অতি ভয়ংকর। কান্নাকে না বুঝিলে শিশুর শিক্ষা কিছুতেই নির্ভুল হইতে পারে না। গোড়াতেই গলৎ ঘটিয়া যায়।

শিশুর কান্নায় অত্যধিক মনোযোগী হইলে শিশু স্বভাবতই বুঝিতে পারে কান্না দ্বারাই তাহার সকল সাধ পূর্ণ হইতেছে। সুতরাং কান্নাকে সে তাঁর সাধ-পূরণের উপায় স্বরূপ মনে করিয়া লয়। শিশু যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই যে কান্নার গুণ বুঝিতে পারে। শিশু যখন খাইতে শিখে, হাঁটিতে পারে, অথচ কথা বলিতে পারে না, তখন সে একটু সজাগ ভাবেই কান্নার অস্ত্র নিক্ষেপ করে। প্রথম খাওয়া শিখিয়াই সে সবকিছু খাইতে চায়. খাওয়ার প্রতি তার লোভ বাড়িয়া যায়। বিস্কুট, লজেন্স, মিষ্টি, পিঠা, মাছ, গোশ্‌ত, কমলালেবু যাই কিছু সে দেখে, সবই সে বেশী বেশী খাইতে চায়। কিছু হাতে দিলে চলে না। সেটুকু খাইয়া আবার সে দাবী করে। নিজেরা কিছু খাইতে গেলে অমনি সে আসিয়া পাশে দাঁড়ায় আর নানারূপ দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে। একটু রাগ করিলেই বস্ কান্না জুড়িয়া দেয়। তখন বাধ্য হইয়া আবার একটা অংশ দিয়া তাহাকে শান্ত করিতে হয়। এখানে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথম বারের কান্নায় তার কিছু করুণ মিনতি থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় বা তৎপরবর্তী কান্নায় আর মিনতির ভাব থাকে না, সেখানে আসে তার হুকুম। অশ্রুর হুকুম! রুশো তাই ঠিকই বলিয়াছেন ঃ

"The first crying of children is a prayer. If we do not heed to is well, this cry scon becomes a command."

অর্থাৎ ঃ শিশুর প্রথম কান্না একটি প্রার্থনা। যদি এই প্রার্থনার প্রতি আমরা মনোযোগী না হই, তবে শীঘ্রই ইহা আদেশে পরিণত হয়। কথাটি খুবই সত্য, সন্দেহ নাই। শিশু যখন কোন কিছু আব্দার ধরিয়া না পায়, তখন সে যে-কান্না কাঁদে, তাহা দস্তুর মত একটা ছোট-খাটো বিদ্রোহ! Locke-এর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় ঃ সেটা একটা "open declaration of their insolence or obstinacy" অর্থাৎ বিদ্রোহ বা জিদের প্রকাশ্য ঘোষণা।

www.pathagar.com

সুতরাং শিশুর জীবন-গঠনের প্রাক্কালে মাতাপিতাকে এই অশ্রুর যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইবে। শিশুর ভালমন্দের জ্ঞান ত নাই, কাজেই যেকোন বিষয়ে আব্দার করিলেই যে তাহা পূরণ করিতে হইবে, তাহা কিছুতেই সমর্থন যোগ্য নহে। অবশ্য সব কান্নাকেই যে অবহেলা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি না। প্রকৃত বেদনা বা অভাবের অনুভূতি হইতে যদি কান্না আসে, তবে প্রথমবারেই তাহা পূরণ করা উচিত। মাতাপিতার করুণায় শিশু যেন আস্থা না হারায়। কিন্তু যেখানে পরিষ্কার বুঝা যাইবে যে শিশু অন্যায় আব্দার বা জিদ ধরিয়াছে এবং সে আব্দার রক্ষা করিলে তাহার অকল্যাণ হইবে, তখন কিন্তু মাতাপিতাকে কঠোর হইতেই হইবে! কিছুতেই সেরূপ আব্দারকে তাঁরা যেন প্রশয় না দেন। কিছু মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়া তাহাকে থামানোও বিপজ্জনক। মাতাপিতার এরূপ মিথ্যা আচরণ দেখিয়া দেখিয়াই শিশুরা পরে মিথ্যা কথা বলিতে শিখে। কেঁদো না সোনা-মানিক, তোমাকে একটা ভা-ল রাঙা ঘোড়া কিনে দেবো, অনেক লবেঞ্চুস এনে দেবো- এই ধরনের কথা বলা ভাল নয়। যদি কিছু বলিতেই হয়, তবে যেন কাজেও তাহা করা হয়। জিদ্দী কান্নার সময় বরং শিশুর প্রতি অবজ্ঞা দেখানো ভালো। গোড়াতেই বলিয়া দিলে হয় ঃ চুপ কর, নয়ত তোমার কোন কথা আমি শুনব না। শিশু যদি চুপ করে ভালই, নইলে মাতাপিতাকেই কঠোর হইয়া চুপ করিতে হইবে; হাজার কাঁদিলেও তাঁহারা যেন সেদিকে ভ্রূপেক্ষপ না করেন। এখানে কিছু শিথিলতা দেখাইলেই বিপদ ঘটে। শিশু ভাবে, একটু জোর দিয়া কাঁদিয়া যখন কিছুটা পাইয়াছি, আর একটু জোর দিয়া কাঁদিলে নিশ্চয়ই আরো বেশি পাইব। কিন্তু যদি একবার সে বুঝিতে পারে যে, তার কান্নায় কোন ফল হয় না, তখন সে ঐ অস্ত্র ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করে। অবশ্য শিশু নত হইলে তখন তার প্রতি সহানুভূতি দেখান উচিত। এ অবস্থায় রুশোর উপদেশ যুক্তিসঙ্গত। তিনি বলিতেছেন ঃ

> "So long as he cries, I will not go to him;
> as soon as he stops, I will run to him;.

অর্থাৎ ঃ যতক্ষণ শিশু কাঁদিবে, ততক্ষণ আমি তার কাছে যাইব না; যেই থামিবে অমনি তার কাছে দৌড়াইয়া যাইব।

অতএব পরিষ্কারই দেখা যাইতেছে, শিশুর কান্নাকে কন্ট্রোল না করিতে পারিলে ফল উল্টা ফলে। মাতাপিতা কোথায় শিশুকে শাসন করিবে, তাহা না হইয়া শিশুই মাতাপিতাকে শাসন করে! এই জন্যই দার্শনিক Locke বলেন ঃ শৈশবেই বরং শিশুর প্রতি কিছুটা নিষ্ঠুর হইয়া (অন্তরে নয়, প্রকাশ্যে) বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ভালবাসা ও স্নেহ জ্ঞাপন করিতে হয়।

কান্নাকে প্রশ্রয় দিলে শিশুর চরিত্র কিরূপ বিকৃত হইয়া পড়ে তাহার দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি ঃ

একটি ছেলে কোন কিছু চাহিয়া না পাইলেই অভিমান করিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িত। ছেলের মা হাসিয়া হাসিয়া তাহাকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলিয়া লইতেন। খোকা তখনও কথা বলিতে শিখে নাই, অথচ তার এত দুষ্টামি। খোকার মার কিন্তু এটা খুব ভাল লাগিত। তিনি উহার পুনরভিনয় করাইতেন। দুই-এক দিন করে দেখা গেল, খোকার যে-কোন অভাব পূর্ণ না হইলে, অথবা একটু কিছু চোখ রাঙাইলে বা তিরস্কার করিলেই অমনি সে শুইয়া পড়ে, কিছুতেই উঠিতে চাহে না। এমন কি হামাগুড়ি দিয়া ঘরের দাওয়ার

www.pathagar.com

একদম কিনারে গিয়া পা ঝুলাইয়া দেয়; যেন সে ইচ্ছা করিয়াই পড়িয়া যাইবে। মা তাড়াতাড়ি গিয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া আনেন। দুই চারিদিন এইরূপ দেখিয়া একদিন আমি খোকার মাকে বলিলাম, ধরিও না, দেখি কি করে। খোকার মা তাহাই করিলেন। প'ল প'ল! গেল! গেল!—ইত্যাদি কোনরূপ সহানুভূতিসূচক শব্দও তিনি করিলেন না। খোকা অনেকক্ষণ সেইরূপ ভাবেই পড়িয়া যাইবার ভান করিয়া থাকিল। অনেকক্ষণ পরে যখন সে দেখিল কেহই তুলিতে বা ধরিতে যাইতেছে না, তখন সে নিজেই খানিকটা সরিয়া আসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দুই একদিন এইরূপ করিবার পর দেখা গেল তাহার এই অভ্যাস দূর হইয়াছে।

ইচ্ছা করিলে শিশুর এইরূপ অনেক বদভ্যাসই ত্যাগ করান যায়।

মাতাপিতার স্নেহ-মমতা আর একদিক দিয়াও শিশুর জীবন গঠনে অন্তরায় সৃষ্টি করে। শিশুকে সব সময়ে আমরা সতর্ক পাহারা দিয়া রাখি—যাহাতে বিপজ্জনক কোন কাজে সে হাত না দেয়। ছুরি-কাঁচি হাতে লইলে, রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করিতে গেলে অথবা ঐরূপ অন্য কোন কাজ করিতে দেখিলে আমরা তাড়াতাড়ি ছুরিটা তার হাত হইতে কাড়িয়া লই বা রৌদ্রের মধ্য হইতে ধরিয়া আনি। এরূপ সতর্কতার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, অন্যথায় মারাত্মক বিপদ ঘটিতে পারে। কিন্তু দুঃখ ও বিপদের সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতা হইতে শিশুকে দূরে রাখিয়া দিলেও তার মস্তবড় অকল্যাণ করা হয়। মানব-জীবন কুসমাস্তৃত নহে। এর অধিকাংশ পথই কণ্টকিত। দুঃখ ও বেদনার মধ্য দিয়াই মানুষকে চলিতে হয়। কাজেই, জীবনে যে-দুঃখ অনিবার্য হইয়া আছে, তাহার কোন আভাস বা অভিজ্ঞতা না দিয়াই তাহাকে সংসারে ছাড়িয়া দেওয়াও আমাদের উচিত নয়। আমরা ত চাই যে শিশু যেন বড় হইয়া জীবন-যুদ্ধে জয়ী হয়। অতএব, যেসব কাজে কিছু কিছু বিপদ আছে, তাহার ধারণা প্রথম হইতেই শিশুকে দিতে হইবে। মারাত্মক কোন অভিজ্ঞতা দিতে চাই না বটে, কিন্তু ছোটখাটো দুঃখ ও বিপদের অভিজ্ঞতা দেওয়া দরকার। ছুরিতে একটু হাত কাটিয়া যাওয়া, একটু আছাড় খাইয়া পড়িয়া যাওয়া—এই ধরনের দুঃখে মাতাপিতার বরং কিছু উৎসাহ দেওয়া উচিত। শিশুকে একেবারে 'good boy' করিয়া রাখা উচিত নয়। এ বিষয়ে রুশোর কথাগুলি প্রণিধান যোগ্য। রুশো তাঁহার কল্পিত শিশুপুত্র 'এমিল' (Eamile) সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ

"Far from taking care that Emile does not hurt himself
I shall be dissatisfied if he does and so grows
up unacuainted with pain."

অর্থাৎ ঃ এমিল কোনরূপ আঘাত পাইলে আমি দুঃখিত হইব না, কিন্তু কোনরূপ আঘাত না পাইয়া, জীবনের দুঃখ-বেদনা সম্বন্ধে কোনরূপ অভিজ্ঞতা না লইয়া সে যদি বড় হইয়া উঠে, তবেই আমি দুঃখিত হইব।

অতএব আমাদের শিশু-শিক্ষার মূলনীতি হইবে ঃ

"Neither slave nor tyrant."

অর্থাৎ ঃ শিশুকে একেবারে ক্রীতদাসও করা হইবে না, আবার তাহাকে দারুণ ডংকাবাজও করা হইবে না।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
১৯২২

www.pathagar.com

ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ

কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতি-কবিতায় যে-ভাব ও আদর্শ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহার সহিত ইসলামের চমৎকার সাদৃশ্য আছে। তাঁহার ভাব ও ধারণাকে যে-কোন মুসলমান অনায়াসে অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারে। বাংলা ভাষায় আর কোন কবি এমন করিয়া মুসলমানের প্রাণের কথা বলিতে পারেন নাই। শুধু বাংলা ভাষা কেন, জগতের কোন অমুসলমান কবির হাত দিয়াই এমন লেখা বাহির হয় নাই। পৌত্তলিকতা, বহুত্ববাদ, নিরীশ্বরবাদ, জন্মান্তরবাদ, সন্ন্যাসবাদ প্রভৃতি যে সমস্ত ধারণা ইসলামী আদর্শের ঘোর বিরোধী, তাহা রবীন্দ্রনাথের লেখায় অনুপস্থিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সর্বপ্রথমেই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে—ইসলাম কী এবং উহার বিশেষত্ব কী; কারণ তাহা হইলে ইসলামের সহিত রবীন্দ্রনাথের কোথায় কতটুকু মিল আছে, তাহা বুঝিবার সুবিধা হইবে।

ইসলামের বিশেষত্ব

(১) খোদাতা'লাকে এক ও অদ্বিতীয় প্রভুত মনে করা— ইসলামের মূল মন্ত্রই হইতেছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" (এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই)। নিখিল বিশ্বের নিয়ামক তিনি, জীবন-মরণের প্রভু তিনি, "আমরা তোমাকেই আরাধনা করি, এবং তোমারই নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি" ইহাই মুসলমানের দৈনন্দিন প্রার্থনা।

(২) খোদাতালার মহান ইচ্ছার সম্মুখে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা—তাঁহার ইচ্ছাকে সর্ব অবস্থায় জয়যুক্ত করাই ইসলামের প্রধান শিক্ষা। সফলতা নিষ্ফলতা সুখ-দুঃখ সম্পদ-বিপদ–সমস্তই তাঁহারই দান। এখানে অহমিকা নাই, আমিত্বের কোন গর্ব নাই। রিক্ত-মুক্ত ভাবে খোদা-তালার জন্যই সমস্ত কাজ করিতে হয়।

(৩) খোদাতালা এবং তাঁহার সৃষ্টজীবের সহিত প্রেম স্থাপন করা— ইসলামের ধাতুগত অর্থও হইতেছে শান্তি। সুতরাং ইসলাম শান্তির ধর্ম। এখানে বিরোধ নাই, বিদ্রোহ নাই, আছে কেবল শান্তি, আছে কেবল প্রেম—খোদাতা'লার সহিত প্রেম, তাহার সৃষ্টির সহিত প্রেম।*

(৪) বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস বর্জন করা—ইসলাম বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস কখনো অনুমোদন করে না; সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করিয়া ধর্ম্ম-সাধন করিতে বিধান দেয়। খোদাতা'লা দত্ত এই আলো-বাতাস, এই ভোগ-বিলাস, এই প্রিয়-পরিজন সমস্তই ব্যর্থ করিয়া দিয়া

---

*"A Muslim, according to the Holy Quran, is he who has made his peace with God and man, with the Creator as well as His creatures. Peace with God impiles submission to His will Who is the source of all purity and goodness, and peace with man implies the doing of good to one's fellowmen."–Muhammad Ali : Preface to his 'Holy Quran'.

www.pathagar.com

নির্জন বনে একাকী ধ্যান-মগ্ন অবস্থায় মুক্তি-সাধন করা ইসলামের বিধি নয়। বিশ্বের পরতে পরতে আপনাকে জড়াইয়া দিয়া অন্তরে অন্তরে অনন্ত প্রেমরাজ্যে বাসা বাঁধাই ইসলামের অনুমোদিত ধর্ম-পদ্ধতি।

(৫) জনমান্তরবাদ অস্বীকার করা-

(৬) সাম্য ও বিশ্বপ্রেম স্থাপন করা—ইসলামে কৌলিন্য প্রথা নাই। এখানে সকলেই ভাই ভাই। মানুষ হিসাবে ব্রাহ্মণ শূদ্র রাজ্য প্রজা ধনী ভিক্ষুক সকলেই সমান।

ইহাই হইতেছে মোটামুটি ভাবে ইসলামের বিশেষত্ব। এখন আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব—রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে এই সমস্ত ভাব ও আদর্শ কতখানি অভিব্যক্ত হইয়াছে। অবশ্য ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতাই নিঃশেষে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। সেরূপ করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। ইসলামী এই ভাব সমন্বিত এত কবিতা রবি বাবু লিখিয়াছেন যে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখান অসম্ভব।

গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালী, গীতপঞ্চাশিকা, শেফালি, কেতকী ও অন্যান্য গানের বই সমস্তই খোদা-প্রেমবিষয়ক গানে ভরপুর। তত্ত্বান্বেষী পাঠক রবি বাবুর ঐ সব পুস্তক পড়িলেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আত্ম-সমর্পণ

সর্ব প্রথমেই গীতাঞ্জলির প্রথম কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে-

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধূলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।
নিজেরে করিতে গৌরবদান
নিজেরে কেবলি করি অপমান
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।
আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে
তোমারি ইচ্ছা করহে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।
যাচি হে তোমার চরম শান্তি
পরাণে তোমার পরম কান্তি
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়-পদ্ম দলে।"

www.pathagar.com

এই কবিতাটিকে আমি সর্বোচ্চ স্থান দি। 'সূরা ফাতেহার' সহিত ইহার চমৎকার মিল আছে। মাত্র এই একটি কবিতার দ্বারাই কবির সমস্ত কবিতার প্রকৃতি ও মূলসুর নির্ণয় করা যায়। এই কবিতার ভিতরে ইসলামের প্রায় সব সত্যেরই সমাবেশ হইয়াছে। একমাত্র খোদাতা'লাকেই সর্বময় প্রভু মনে করিয়া তাঁহার চরণ-তলে মাথা নত করা; নিজের অক্ষতা নিবেদন করা এবং তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনা করা, অহমিকা বিসর্জন দিয়া খোদার ইচ্ছাকেই জয়যুক্ত করা, অন্য কিছু কামনা না করিয়া খোদাতা'লারই 'চরম শান্তি' ও 'পরম কান্তি' প্রার্থনা করা,—এ সমস্তই খাঁটি ইসলামের কথা। কোরান শরীফে আছে–পরকালে বেহেশতে শুধু চিরশান্তি বিরাজ করিবে; সকলের মুখেই "শান্তি" "শান্তি" রব উত্থিত হইবে। আর বেহেশতের দার্শনিক ব্যাখ্যাও হইতেছে— খোদাতা'লার দিদার লাভ করা। পুণ্যবানেরা সেখানে সর্ব্বদা খোদা'তালার দিব্য কান্তি অনুভব করিবে। এই দুইটি কথার সহিত

"যাচি হে তোমার চরম শান্তি
পরাণে তোমার পরম কান্তি"

এ কথার কী গভীর সম্বন্ধ।

অন্যত্র কবি বলিতেছেন,–

"ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা
প্রভু তোমার পানে তোমার পানে
তোমার পানে।
যায় যেন মোর সকল গভীর আশা
প্রভু তোমার কানে তোমার কানে
তোমার কানে।"

এখানেও কবি শুধু খোদা'তালাকেই একমাত্র লক্ষ্যস্থল মনে করিতেছেন এবং নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অভিযোগ তাঁহারই সকাশে নিবেদন করিতেছেন।

অনিত্য সংসারে সকল ঠেলিয়া একমাত্র খোদা'তালাকেই যে কামনা করিতে হয়, সে সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন–

"চাই গো আমি তোমারে চাই
তোমায় আমি চাই
এই কথাটি সদাই মনে
বলতে যেন পাই।
আর যা কিছু বাসনাকে
ঘুরে বেড়াই দিনেরাতে
মিথ্যা সে সব, মিথ্যে ওগো
তোমায় আমি চাই।"

ইসলামের শিক্ষাও ত এই। খোদা'তালাকে পাওয়াই সত্যিকার পাওয়া, আর যা কিছু সমস্তই মিথ্যা।

www.pathagar.com

কবি যে পৌত্তলিকতা বা সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেন না, তাহা নিম্নের কবিতা হইতে অতি সুন্দর ভাবে বুঝা যায়–

"মুগ্ধ ওরে স্বপ্ন ঘোরে
যদি প্রাণের আসন কোণে
ধূলায় গড়া দেবতারে
লুকিয়ে রাখিস সংগোপনে–
চিরদিনের প্রভু তবে
তোদের প্রাণে বিফল হবে
বাহিরে সে দাঁড়িয়ে রবে
কত না যুগ যুগান্তরে।"

এই সমস্ত কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ খাঁটী ইসলামী ভাবেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। একমাত্র খোদা'তালাকেই তিনি অদ্বিতীয় প্রভু মনে করেন, তাঁহারই চরণে তিনি মাথা নত করেন, তাঁহারই সকাশে সাহায্য প্রার্থনা করেন; তিনি ছাড়া আর কোন "ধূলায় গড়া দেবতারে" আপন মনে স্থান দেন না।

প্রেম ও শান্তি স্থাপন

এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার কোন প্রয়োজন নাই। এ প্রবন্ধের প্রায় সব কবিতাই ত গভীর ঐশী প্রেমের পরিচায়ক। প্রেম না থাকিলে আত্ম-সমর্পণ ও মিলন কিসের। রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর সকল কবিতাতেই একটা অতৃপ্ত মিলনের আকাঙ্ক্ষা সূচিত হইয়াছে। কোথাও তিনি উদ্ধত ভাবের বা বিদ্রোহের পরিচয় দেন নাই। "তুমি এস, আমার 'হৃদয়-প্রদ্ম-দলে দাঁড়াও, "গানের সুরের আসনে বস," ঐ যে তুমি "আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে,' "যেও না সেথা হেলায় ঠেলে'—ইত্যাদি ভাবের বিরহ ও বেদনার অভিব্যঞ্জনায় সমস্ত কবিতা ভরপুর। রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকৃতিও মিলন-প্রয়াসী। নিখিল বিশ্বের ছোট বড় সকলকেই তিনি তাঁহার উদার হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন; সকলকেই তিনি ভালবাসিতে পারিয়াছেন। তিনি বলিতে পারিয়াছেন ঃ "জগত আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ, জগত-প্রাণে মিলি গাহিছে এ কী গান।" বাস্তবিকই তিনি "বিশ্ব-জগতের" সহিত এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাকে আলাদা করিয়া দেখিলে তাঁহাকে বুঝা যাইবে না। নিখিল বিশ্বের মর্ম্মে মর্ম্মে যে সহজ সুরের ঝঙ্কার উঠিতেছে, তাহারই মধ্যে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তিনি যেন বিশ্বপ্রকৃতিরই বেশী আপন, আমাদের তত নন! কোরান শরীফে আছে–

"আল্লাহ্ মানবমণ্ডলীকে যে নিজের ফিৎরাতের (Nature) উপর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা দৃঢ় ভাবে অবলম্বন কর। আল্লাহর সৃষ্টিতে রদ-বদল নাই, ইহাই সরল দিন' (ধর্ম্ম)–সুরা রুম, ৩০ আয়াত। রবীন্দ্রনাথ সেই "প্রকৃতির'ই সন্তান। তিনি প্রকৃতিকে বাস্তবিকই দৃঢ় ভাবে অবলম্বন করিয়াছেন।

www.pathagar.com

বিশ্ব প্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথ

কোরান শরীফে আছে–

"নিশ্চয়ই স্বর্গে মর্ত্তে বিশ্বাসীদিগের জন্য অনেক নির্দশন আছে।"–সূরা আল-জাসিয়া, ৩ আয়াত। "এবং রাত্রি ও দিনের পরিবর্ত্তনের মধ্যে এবং খোদা'তালার লোকের জীবন ধারণের জন্য মেঘ হইতে পৃথিবীতে যাহা প্রেরণ করেন এবং যদ্দারা মৃতকে পুনর্জ্জীবিত করেন, (তাহার মধ্যে) এবং আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের মধ্যে তাহাদের জন্য অনেক নির্দশন আছে—যাহারা চিন্তা করে।–সুরা আল জাসিয়া, ৫ আয়াত। কোরানের এই বাণী রবীন্দ্রনাথের জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। প্রকৃতিকে তিনি যেভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা গভীর অনুভূতি-প্রসূত। সূর্য-চন্দ্র, আঁধার-আলোক, সন্ধ্যা-প্রভাত, ঝঞ্ঝা-বাদল, বর্ষা-বসন্ত প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্য দিয়া তিনি একমাত্র খোদাতালারই অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছেন। দৃশ্য দেখিতে দেখিতে দৃশ্যের আড়ালে লুকান সেই বিরাট পুরুষের সন্ধান পাইয়া তাঁহার মন উদাস আকুল চঞ্চল হইয়াছে। কবি বলিতেছেন–

"এই যে তোমার প্রেম ওগো
হৃদয়-হরণ!
এই যে পাতায় আলো নাচে
সোনার বরণ।
এই যে মধুর আলস ভরে
এই ভেসে যায় আকাশ পরে
এই যে বাতাস দেহে করে
অমৃত ক্ষরণ,
এই ত তোমার প্রেম ওগো
হৃদয়-হরণ।"

প্রেমিকের উপযুক্ত কথাই বটে। বসন্তে কবি গাহিতেছেন–

"আজি গন্ধ-বিধুর সমীরণে
কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে
আমি পুলকিত কার পরশনে।"

অন্যত্র–

"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
মোর পরাণে দখিন বায়ু লাগিছে
কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে
এই সৌরভ–বিহ্বল রজনী
কার চরণে ধরণীতল জাগিছে!

www.pathagar.com

ওগো   সুন্দর বল্লভ কান্ত
তর   গম্ভীর আহ্বান কারে!"

বর্ষায়—

"হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে!"

অন্যত্র তিনি বাদল-বরিষণের ভিতর দিয়া খোদাতা'লাকে কেমন সুন্দরভাবে আহ্বান করিতেছেন—

"এস হে এস সজল-ঘন
বাদল-বরিষণে
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে
এস হে এ-জীবনে।"

শরতে—

"শরতে আজ কোন্ অতিথি
এল প্রাণের দ্বারে
আনন্দ গান গা রে হৃদয়
আনন্দ গান গা রে।
যে এসেছে তাহার মুখে
দেখরে চেয়ে গভীর সুখে সনব
দুয়ার খুলে তাহার সাথে
বাহির হয়ে যা রে।"

ঝড়ের রাতে—

"ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ সম
নাই যে ঘুম নয়নে মম
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম
চাই যে বারে বার।"

প্রাকৃতিক দৃশ্য সকলেই দেখিয়া থাকি, কিন্তু এমন ভাবে কয়জন দেখি। স্বর্গে-মর্ত্যে যে "অসংখ্য নিদর্শন" আছে, সে কথা ত মিথ্যা নয়। চোখ থাকিলে সে-সব নিদর্শন যে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অবশ্য ইসলাম Pantheism ও paganism-কে সমর্থন করে না।

www.pathagar.com

সুখ-দুঃখ

ইসলাম সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে জীবনে-মরণে খোদাতালারই জয়-গৌরব ঘোষণা করে। কোরান বলিতেছে–

"বল (হে মোহাম্মদ) নিশ্চয়ই আমার আরাধনা, ত্যাগ, জীবন ও মরণ সমস্তই আল্লার জন্য।'–সূরা আল-আনাস,১৬৩ আয়াত। কবি ইহারই সহিত সূর মিলাইয়া বলিতেছেন ঃ–

"সুখী হও দুঃখী হও, তাহে চিন্তা নাই
তোমরা তাঁহারই হও, আশীর্ব্বাদ তাই।"

... ...

"বাঁচান বাঁচি মারেন মরি
বল ভাই ধন্য হরি।
সুধা দিয়ে মাতান যখন
ধন্য হরি ধন্য হরি
ব্যথা দিয়ে কাঁদান যখন
ধন্য হরি ধন্য হরি।"

এই সমস্ত কবিতাতে কবি এই কথাই বলিতেছেন যে, সুখে-দুঃখে, জীবনে-মরণে খোদাতালাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। সাফল্য বা বিজয়-গৌরবের মধ্যেও যে খোদাতলারই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিতে হয় আর সকল জয়-গৌরব যে তাঁহারই চরণে নিবেদন করিয়া দিতে হয়, যে কথা কবি তাঁহার নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্তি উপলক্ষে রচিত কবিতায় অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন–

"কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে
আজ ফাগুন দিনের সকালে।
তার বর্ণে তোমার নামের রেখা
গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা
লুকিয়ে তুমি ঐ গানেরি আড়ালে
আজ ফাগুন দিনের সকালে।"

অন্যত্র এই সম্বন্ধেই বলিতেছেন–

"এই মণিহার আমার নাহি সাজে,
এরে পরতে গেলে লাগে, এরে
ছিঁড়তে গেলে বাজে।
তাই ত বসে আছি
এ হার তোমার পরাই যদি
তবেই আমি বাঁচি।

www.pathagar.com

মুসলমানগণ দৈনন্দিন জীবনে প্রতি কাজে বলে ঃ 'শোকর, আল্‌হামদুল্লিাহ্!' ইহাও তাই। দুঃখ-দৈন্যকে কবি ঠিক ইসলাম অনুযায়ীই গ্রহণ করিয়াছেন। দুঃখ-দৈন্য পূর্বজন্মের কর্মফল এমন কথা তিনি কোথাও প্রকাশ করেন নাই। জীবনের সার্থকতার জন্য যে দুঃখ-দৈন্যেরও প্রয়োজন আছে, দুঃখ যে খোদাতা'লার বিশেষ অনুগ্রহেরই রূপান্তর, সুখ-সম্পদ ছাড়া জীবনের যে মহত্তর লক্ষ্য আছে, এই কথা মনে করিয়াই কবি সগৌরবে দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। এ সম্বন্ধে কোরান বলিতেছে ঃ –

"হে বিশ্বাসিগণ! ধৈর্য এবং প্রার্থনার ভিতর দিয়া সাহায্য প্রার্থনা কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদিগের সহিত।"–সূরা বাকারা ১৫৩ আয়াত। "এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে ভয়, সম্পদ-হানি, জীবন-হানি, ফল-হানি বা ঐরূপ কিছু দিয়া পরীক্ষা করিব; এবং যাহারা ধৈর্যশীল তাহাদিগের নিকট সুসংবাদ প্রেরণ করিব (অর্থাৎ ধৈর্যের পুরস্কার দিব)"–সূরা বাকারা ১৫৫ আয়াত। "তাহাদেরই উপরে (অর্থাৎ উক্ত ধৈর্যশীলদিগের উপরে) তাহাদের প্রভুর দিক হইতে আশীর্বাদ এবং করুণা (বর্ষিত হইবে।)"–

—ঐ ১৫৭ আয়াত

কবি বলিতেছেন—

"আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভরে।
এ যে তব দয়া জানি জানি হায়
নিতে চাও বলে ফিরাও আমায়
পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন
তবে মিলনেরি যোগ্য করে।"

... .

"দুঃখ যদি না পাবে ত
দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে।"

... ...

"পুষ্প দিয়ে মার যারে
চিনল না সে মরণকে
বাণ খেয়ে যে পড়ে সে যে
ধরে তোমার চরণকে।"

... ...

"লাগে না গো কেবল যেন
কোমল করুণা,

www.pathagar.com

মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ
ব্যর্থ করো না।”

... ...

‘দুঃখ-রথের তুমিই রথী
তুমিই আমার বন্ধু
তুমিই সঙ্কট, তুমিই ক্ষতি
তুমি আমার আনন্দ।”

... ...

“এই করেছ ভাল নিঠুর
এই করেছ ভাল
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বাল।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো।
যখন থাকে অচেতনে
এ চিত্ত আমার
আঘাত সে যে পরশ তব
সেইত পুরস্কার!”

....

‘দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল।”

ইহাই রবীন্দ্রনাথের দুঃখ-দৈন্যের দার্শনিক ব্যাখ্যা। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, সকল অবস্থাতেই তিনি খোদাতা'লাকে বন্ধু বলিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়াছেন। লক্ষ্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি স্থির-নিবদ্ধ, কোন অবস্থাতেই তিনি সেই লক্ষ্যপথ হইতে স্খলিত হন নাই। মুসলমানগণও দুঃখের দিনে বলিয়া থাকে—“আমারা আল্লার নিকট হইতে আসিয়াছি এবং আল্লাই আমাদের লক্ষ্য।”—(সূরা বাকারা ১৫৬ আয়াত)।

বৈরাগ্য বা সন্যাস

রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্য ও সন্যাসবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। গম্ভীরভাবে তিনি ঘোষণা করিতেছেন—

www.pathagar.com

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ কবি যোগাসন সে নহে আমার।
যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।"

ইহাই ত ইসলাম। অসংখ্য বন্ধন মাঝে মুক্তি লাভ করাই ত প্রকৃত পৌরুষের কাজ। কোরান বলিতেছে-"এবং যে সন্যাস ব্রত (খৃষ্টানগণ) সৃষ্টি করিয়াছে তৎসম্পর্কে আমি তাহাদিগকে কিছুই বলি নাই। পৃথিবীতে তোমাদের জন্য যে (ভোগের) স্বত্ব নির্ধারিত আছে, তাহা বিস্মৃত হইও না।"

"হে মুসলমানগণ! খোদাতা'লা তোমাদের জন্য যে সমস্ত জিনিস বৈধ করিয়াছেন, তাহা অবৈধ করিও না।" হযরত মোহাম্মদের জীবনের গতিও এই পথেই চলিয়াছে। সংসারের সমস্ত বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া তিনি অধ্যাত্ম জগতে বিহার করিতেন।

সাম্য ও বিশ্বপ্রেম

সাম্য ও বিশ্বপ্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠিক ইসলামের উক্তিরই প্রতিধ্বনি তুলিয়াছেন-

"যুক্ত করহে সবার সঙ্গে
মুক্ত করহে বন্ধ
সঞ্চার কর সকল কর্মে
শান্ত তোমার ছন্দ।"
"এস হে আর্য এস অনার্য
হিন্দু মুসলমান।
এস এস আজ তুমি ইংরাজ
এস এস খৃষ্টান।
এস ব্রাহ্মণ, শুচি কর মন
ধর হাত সবাকার
এস হে পতিত, হোক অপনীত
সব অপমান ভার।"

কোরান বলিতেছে-

"সমস্ত মানবমণ্ডলী এক জাতি"-সুরা বাকারা (২১৩ আয়াত।) "হে মানব, নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে এক পুরুষ ও এক নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে বংশ ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা পরস্পরকে চিনিতে পার।"-সূরা আল্-হুজুরাত, ১৩ আয়াত।

www.pathagar.com

অন্যত্র কবি মানুষ হইয়া মানুষকে ঘৃণা করার জন্য তাঁর দেশবাসীকে তিরস্কার করিতেছেন ঃ

“হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।”

তের শত বৎসর পূর্বে ইসলাম যে সত্য গম্ভীরভাবে ঘোষণা করিয়াছে, আজ তাহা নূতন করিয়া রবীন্দ্রনাথের মুখে ধ্বনিত হইতেছে।

উপসংহার

এইরূপে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গীতি-কবিতাতেই ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও আদর্শ ব্যক্ত হইয়াছে। অশরীরী ভাবও (spirit of abstraction) তাঁহার কাব্যের আর একটি বিশেষত্ব। পারস্যের সুফী কবি হাফিজের সুর বাঙালী কবিদের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রকাব্যেই শুনিতে পাওয়া যায়।

বস্তুতঃ, রবীন্দ্রকাব্যে ইসলামের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথকে লইয়া এইখানে মুসলমানদের গর্ব করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা

১৯২২

www.pathagar.com

আর্টের স্বরূপ

আধুনিক সাহিত্যে 'আর্টের আলোচনা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। গল্পে, উপন্যাসে, কাব্যে, কবিতায়, চিত্রে, নাটকে, সঙ্গীতে—আর্ট এমন ভাবেই প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছে যে, তাহাকে এড়াইয়া ঐ সব বিষয়ে কোন কথা বলা আজকাল একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। সাহিত্যের বাজারে যাঁহারা বিকিকিনি করেন, তাঁহারাও এ-সম্বন্ধে খুবই সজাগ। তাই দেখিতে পাই, কোন একখানি উপন্যাস বা কাব্য প্রকাশিত হইলে সেখানি আর্টের দিক দিয়া সার্থক হইল, কিংবা একেবারে মাটি হইয়া গেল', মাসিক সাহিত্যের সমালোচক সে কথা উল্লেখ করিতে ভুলেন না, কেননা এ কথা তাঁহার বেশ ভাল রকমই জানা আছে যে, ঐ শ্রেণীর কোন পুস্তক-সমালোচনায় আর্টের উল্লেখ না করিলে সমালোচনা বা সমালোচকের মূল্য বাড়ে না। যে কোন একখানা উপন্যাস বাহির হইলেই তাহার বিজ্ঞাপনে লেখা হইয়া থাকে—"আর্টে ও মনস্তত্ত্বে অনুপম", "ফরাসী আর্টের নিপুণ নিদর্শন" ইত্যাদি ইত্যাদি। আর্ট লইয়া তর্ক-বিতর্কও নিতান্ত কম হয় না। কেহ বলেন–"Art for art's sake," কেহ বলেন–"আর্ট ধর্মনীতি বা সভ্যতার কোন তোয়াক্কা রাখে না।" কেহবা বলেন "গুরু মহাশয়-গীরি করা আর্টের কাজ নয়,"–এইরূপ ধরনের অনেক কথাই শুনা যায়।

বস্তুতঃ আর্ট সম্বন্ধে অনেকের ধারণাই পরিচ্ছন্ন নয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমি তাই আর্ট সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

আর্ট কী?

এই প্রশ্নের উত্তর আর্ট-প্রেমিকগণ যত সহজ মনে করিয়া বসিয়া আছেন, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তত সহজ নয়। আর্টবাদী হয়ত এক কথায় ইহার উত্তর দিবেন–'সৌন্দর্য-সৃষ্টিই আর্ট।' কিন্তু উত্তরে মোটেই সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। আর্ট যদি সৌন্দর্য-সৃষ্টিই হয়, তবে সৌন্দর্য জিনিষটা কি? সেটা ত আমাকে আগে বুঝিতে হইবে। কাজেই আর্ট কি, এই প্রশ্নের পূর্বে সৌন্দর্য কি, ইহাই সর্বাগ্রে আমাদিগকে মীমাংসা করিতে হইবে।

সৌন্দর্য কি?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কতকগুলি মৌলিক বিষয় আছে, যাহাদের কোন সঠিক সংগা দেওয়া চলে না। গন্ধ কি, আস্বাদ কি, এ সব প্রশ্নের কোন সংগা নাই। তবে পরিপার্শ্বের অবস্থা বর্ণনা দ্বারা এই সব বিষয়ের একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়া যাইতে পারে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই সৌন্দর্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে এবং এই কারণেই আর্টের সংগাও বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

প্রাচীনকালে সৌন্দর্য সম্বন্ধে কাহারও কোন সঠিক ধারণা ছিল না বা এ সম্বন্ধে কোন দার্শনিক কোন গবেষণাও করেন নাই। গ্রীস দেশের পণ্ডিত সক্রেটীস, প্লেটো, এরিষ্টটল প্রভৃতির মতে 'যাহাই কার্যকরী তাহাই সুন্দর।" অর্থাৎ তাঁহার সৌন্দর্যকে মঙ্গল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই। কথিত আছে, সক্রেটীসের নাসা-রন্ধ্র ও মুখ-গহ্বর অতিমাত্রায়

www.pathagar.com

প্রশস্ত ও কদাকার হইলেও তিনি উহাদিগকেই অপেক্ষাকৃত সুন্দর বলিতেন, কেননা বাতাস ও খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের পক্ষে উহারাই অধিকতর কার্যকরী ছিল। সৌন্দর্য সম্বন্ধে প্রাচীন কালের প্রায় সকল দার্শনিক ও পণ্ডিতই এই মত পোষণ করিতেন। শুধু প্রাচীন যুগ কেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে সৌন্দর্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মতভাবে কেহই কোন আলোচনা বা গবেষণা করেন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (১৭১৪-১৭৬২) জার্মানীতে বম্‌গার্টেন (Baumgarten) নামক জনৈক খ্যাতনামা দার্শনিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে সুশৃঙ্খলার সহিত আলোচনা আরম্ভ করেন। আধুনিক সৌন্দর্য-বিজ্ঞানের (Aesthetics) তিনিই একরূপ জন্মাদাতা। তাঁহার মতে সৌন্দর্য অনুভূতির বিষয়ীভূত। চিন্তা (thinking) দ্বারা সত্য, ইচ্ছা (will) দ্বারা মঙ্গল এবং অনুভূতি (feeling) দ্বারা সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করা যায়। সত্য মঙ্গল এবং সুন্দরের মূল্যাধার হইতেছে-সেই একমাত্র খোদাতালা। চিন্তার ভিতর দিয়া, নৈতিক ইচ্ছার ভিতর দিয়া এবং যৌন্দর্যানুভূতির ভিতর দিয়া—তিন উপায়েই তাঁহাকে লাভ করা যায়। সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া তিনি বলেন, "অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরস্পরের মধ্যে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও সমগ্রের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানই সৌন্দর্য। (A correspondence of the parts in their mutual relation to each other and in their relation to the whole). সৌন্দর্যের উদ্দেশ্য সম্বন্দে তিনি বলেন—আনন্দ-দান এবং অন্তরে কোন একটা কামনার উদ্রেক করাই সৌন্দর্যের উদ্দেশ্য। আর্ট সম্বন্ধে তাঁহার মত—"সৌন্দর্য সৃষ্টি করাই আর্টের প্রধান লক্ষ্য, তবে প্রকৃতির ভিতর হইতেই আর্টের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে, কেননা সেই চরম ও পরম অশরীরী সৌন্দর্য (Absolute Beauty) প্রকৃতির ভিতর দিয়াই সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

অতএব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, বম্‌গার্টেনের মতে সৌন্দর্যের একটা অন্যনিরপেক্ষ মৌলিক রূপ (Absolute Beauty) আছে; সৌন্দর্যের সহিত আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষার সম্বন্ধ আছে এবং সৌন্দর্যই আর্টের প্রাণ।

বম্‌গার্টেনের অব্যবহিত পরেই সুলজার মেণ্ডেলসোহন্ মরিজ প্রভৃতি লেখকবৃন্দ আর এক নূতন মত প্রাচর করেন। তাঁহারা বলেন-আর্টের লক্ষ সৌন্দর্য নয়, মঙ্গল। নৈতিক সুসম্পন্নতাই (moral perfection) আর্টের উদ্দেশ্য।

কিন্তু পরবর্তী কালে উইলকেনম্যান উপরোক্ত উক্তির বিরুদ্ধে এই মত প্রচার করেন যে, শুধু সৌন্দর্যই আর্টের লক্ষ্য; তাহার সহিত মঙ্গল ভাবের কোনই সম্বন্ধ নাই। লেসিং, হার্ডার, গ্যেটে প্রভৃতি অনেকেই এই মত পোষণ করেন। অবশেষে খ্যাতনামা দার্শনিক ক্যান্ট (Kant) সৌন্দর্য ও আর্ট সম্বন্ধে আর এক নূতন কথা বলেন। তাঁহার মত এইরূপ—মানুষ যে নিজে প্রকৃতির মধ্যে রহিয়াছে এবং তাহার বাহিরেও যে প্রকৃতি রহিয়াছে, এ জ্ঞান তাহার আছে। বহিপ্রকৃতির মধ্যে যে সত্যের সন্ধান করে এবং নিজের মধ্যে সে মঙ্গলের সন্ধান করে। চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা এই দুই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। কিন্তু চিন্তা ও ইচ্ছা ছাড়া মানুষের আরও একটি অনুভূতি আছে—যাহা চিন্তা বা ইচ্ছার কোনই ধার ধারে না। সে হইতেছে সৌন্দর্যানুভূতি। কাজেই ক্যান্টের মতে চিন্তা

www.pathagar.com

বা ইচ্ছার উদ্রেক না করিয়া এবং মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে কোনই সম্বন্ধ না রাখিয়া যাহাই আনন্দ দান করে, তাহাই সৌন্দর্য। অন্য কথায়, সৌন্দর্য তাহাকেই বলা হইবে,যাহা দেখিলে আনন্দ পাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু লাভ-লোকসানের কোনই কথা উঠিবে না। আর্টের ধারণাও তাঁহার এইরূপ। তাঁহার মতে আনন্দদানই আর্টের উদ্দেশ্য।

ক্যান্টের পরবর্ত্তী লেখকগণের মধ্যে হেগেলের (Hegel) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সৌন্দর্যকে তিনি আর একভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন— খোদাতালা দুই উপায়ে আত্মপ্রকাশ করেন (১) ভাবরূপে (subjectvely) এবং (২) বস্তুরূপে (objectively)। বস্তুর ভিতর দিয়া সেই ভাবময়ের উজ্জ্বল বিকাশই সৌন্দর্য। আত্মাই প্রকৃতপক্ষে সুন্দর; বাহিরের এই সৌন্দর্য সেই আত্মার সৌন্দর্যের বহির্বিকাশ। হেগেলের মতে সত্য এবং সুন্দর একই বস্তু। তফাৎ এই —সত্য হইতেছে সেই ভাবময়ের আসল বস্তুবিহীন রূপটি (Idea)—যাহা শুধুই চিন্তা ও ধারণার বিষয়; আর সৌন্দর্য হইতেছে সেই সত্যেরই বাস্তব বিকাশ। সত্য যখন বাহিরে রূপ পরিগ্রহ করে, তখন ইহা শুধু সত্য নয়, সুন্দর হইয়াও দেখা দেয়।

'শিলার' নামক আর একজন খ্যাতনামা দার্শনিক বলেন-"সসীমের মধ্যে অসীমের অনুভূতিই হইতেছে সৌন্দর্য এবং হৃদয়ে এই অনুভূতির উদ্রেক করাই আর্টের কার্য।

এইরূপভাবে ফিক্‌টে, হারবার্ট, ডারউইন প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা দার্শনিক সৌন্দর্য ও আর্ট সম্বন্ধে নানাভাবে নিজেদের মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেহই কোন সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন নাই।

উপরিউক্ত মতবাদগুলিকে মোটামুটিভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়-

(১) সৌন্দর্যের একটা স্বাধীন অশরীরী সত্তা (Absolute Being) আছে;

(২) সৌন্দর্য বলিয়া আসলে কিছুই নাই, যাহাই আনন্দ দান করে, তাহাই সৌন্দর্য।

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত মতদ্বয়ের কোনটাই সন্তোষজনক নহে। প্রথমটি শুনিতে খুব গুরুগম্ভীর হইলেও উহা নিতান্তই হেঁয়ালীপূর্ণ, দুর্বোধ্য এবং ধারণাতীত। উহার দ্বারা সৌন্দর্য সম্বন্ধে মনের মধ্যে কোন ধারণাই জমাট বাঁধিয়া উঠে না। দ্বিতীয়টি সহজবোধ্য হইলেও নিতান্তই ভ্রমপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। কেননা যাহাই আনন্দ দান করে, তাহাই যদি সৌন্দর্য হয়, তবে সৌন্দর্যের কোনই আদর্শ (standard) থাকে না। একই বস্তু একজনের নিকট সুন্দর এবং অন্য জনের নিকট অসুন্দর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কারণ সৌন্দর্যানুভূতি সকলের সমান নহে। ঠিক একই কারণে এহেন অনিশ্চিত ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান আর্টেরও কোন স্থিরতা থাকে না; আর্টের নামে স্বেচ্ছাচার আরম্ভ হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, আর্টকে সৌন্দর্যের ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়া ব্যাখ্যা করিতে গেলে প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যাখ্যাই করা হয় না; উহা এক হেঁয়ালী হইতে আর এক হেঁয়ালীতে লইয়া যায় মাত্র।

আর্ট তবে কী? আমার মতে টলষ্টয় যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাই ঠিক। তিনি বলেন, আর্টকে সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে সর্বপ্রথম কর্ত্তব্য এই হইবে যে, আনন্দকে বাহিরে রাখিয়া আর্টকে দেখিতে হইবে। অর্থাৎ সৌন্দর্য ও আনন্দের সহিত আর্টকে যোগ-সম্বন্ধ

www.pathagar.com

ভাব দেখিতে হইবে না। আর্ট মানব জীবনেরই একটি ক্রিয়া বা অবস্থা; মানুষের মনোভাবের পরস্পর আদান প্রদানেরই ইহা অন্যতম উপায় স্বরূপ। বাকশক্তি যেমন মানুষের চিন্তা ও অভিজ্ঞতার বিষয় অপর সকলের নিকট পৌঁছাইয়া দেয় এবং পরস্পরের মধ্যে একটা যোগ স্থাপনা করে, আর্টও তদ্রূপ মানুষের অন্তরের অব্যক্ত অনুভূতিকে অপর হৃদয়ে পৌঁছাইয়া দেয়। মানুষ যাহা চিন্তা করে বা দেখে, তাহা কথার দ্বারা অনায়াসে সে অপরের নিকট ব্যক্ত করিতে পারে; কিন্তু অন্তরের অন্তস্থলে সে যাহা অনুভব করে, তাহা সাধারণ কথার দ্বারা সম্যক প্রকাশ পায় না; সেইখানে আর্টের প্রয়োজন হয়। সুতরাং আর্টকে অনুভূতির ভাষা বলা যাইতে পারে। নিজ অন্তরে যাহা অনুভব করা যায়, অপর হৃদয়ে তাহাই অবিকল পৌঁছাইয়া দিবার কলা-কৌশলই আর্ট। টলষ্টয় বলেন ঃ-

"Art is a human ativity, consisting in this, that one man consciously, by means of certain external signs, hands on to others, feelings he has lived through and that others are infected by these feeling and also experience them."

অর্থাৎ আর্ট একটি মানবীয় ক্রিয়া, যদ্দ্বারা কোন মানুষ সজ্ঞানে কতিপয় প্রক্রিয়া দ্বারা নিজের মনের অনুভূত কোন ভাবকে এমনভাবে অপরের মনে পৌঁছাইয়া দেয় যে, অপরের মন সেই ভাবে সংক্রমিত হইয়া নিজেই উহা উপলব্ধি করিতে পারে।

কতিপয় দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক ঃ –

একটি অনাথিনী বিধবা তাহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যুশোকে নিশীথ রাত্রে করুণ কণ্ঠে এমন ভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার মনের ব্যথা বাহিরে ব্যক্ত করিতেছে যে, শ্রোতার মনেও সেই বেদনা সঞ্চারিত হইয়া গেল। এইখানে বলা যাইতে পারে যে, সেই ক্রন্দনের ভিতরে আর্ট আছে। স্বদেশে স্বজাতির লাঞ্ছনা ও দুর্দশায় ব্যথিত হইয়া কোন দেশনেতা স্বদেশবাসীর সম্মুখে এমনভাবে বক্তৃতা দান করিলেন যে, বক্তার মনের ব্যথা ও ভাব শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়েও ছড়াইয়া গেল এবং সকলেই বক্তার সহিত একমত হইয়া দেশের কার্যে আত্মনিয়োগ করিল। এখানেও আর্ট ক্রিয়া করিল। কোন লোক জঙ্গলের মধ্যে বাঘের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া আসিয়া তাহার বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট এমন ভাবে উহার বর্ণনা দিল যে, সকলেই যেন সেই ভাব ও অবস্থা আপন প্রাণের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল এবং চক্ষুর সম্মুখে যেন সেই দৃশ্যাবলী দেখিতে লাগিল। এখানেও বর্ণনাকারীর বর্ণনায় যথেষ্ট আর্ট প্রকাশ পাইল। কোন ঔপন্যাসিক, কবি বা চিত্রশিল্পী কোন একটি বিষয় আপন প্রাণে উপলব্ধি করিয়া অথবা কোন একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া উপন্যাসে কবিতায় বা চিত্রে তাহা এমন ভাবে ফুটাইয়া তুলিল যে, পাঠক বা দর্শক সকলেই সেই ভাবের ভাবুক হইয়া পড়িল। এখানে তাহাদের সৃষ্টিতে আর্ট আসিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে আরব্যোপন্যাসের কথা। কাহিনীগুলি আর্টে পরিপূর্ণ, কারণ ঐ সমস্ত গল্প পড়িতে পড়িতে পাঠক একেবারে তন্ময় হইয়া যায়,—লেখকের প্রাণে যে ভাবরাশি খেলা করিয়াছে, পাঠকও ঠিক সেই ভাবরাশি আপন প্রাণে অনুভব করিতে পারে।

www.pathagar.com

অতএব দেখা যাইতেছে, অনুভূতির আন্তরিকতা এবং সংক্রামকতাই আর্টের প্রধান লক্ষণ। সে অনুভূতি সুখের হউক, দুঃখের হউক, সৌন্দর্যের হউক, কুৎসিতের হউক, আনন্দের হউক, বেদনার হউক—তাহাতে কিছু যায় আসে না। অনুভূতিবিহীন রং-চং সাজ-সজ্জা, শব্দালঙ্কার বা অভিনয় আর্ট নহে,–তা সে যতই সুন্দর হউক না কেন। প্রকৃত আর্ট সৃষ্টির মূলে সত্যানুভূতি (Sincerity of feeling) থাকা চাই, আর তার প্রকাশ-ভঙ্গী বা বহিঃসৌষ্ঠব (technique) এরূপ হওয়া চাই যেন তাহার ভিতর দিয়া আর্টিষ্টের মনের আসল ভাবটি অপর হৃদয়ে সংক্রমিত হইয়া পড়ে। যে আটিষ্টের অনুভূতি যত গভীর হইবে এবং প্রকাশভঙ্গী যত সহজ ও সুন্দর হইবে, তাহার আর্টও তত পরিমাণে সার্থক ও সুন্দর হইবে।

এ স্থলে বলিয়া রাখা ভাল, কোন লোক হাসিতে হাসিতে অপর সকলকে হাসাইলে বা হাই তুলিয়া অপরকেও হাই তুলিতে বাধ্য করিলে, তাহা আর্ট হইবে না। ব্যাঘ্র-কবলে পতিত কোন লোকের ভীতিসঙ্কুল মুখাকৃতি বা প্রাণভয়ে পলায়ন ও প্রাণভয়ে পলায়ন ও ভয়ার্ত্ত চীৎকার আর্ট নহে। ফটোগ্রাফিও আর্ট নহে। আর্ট কতকটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জিনিষ। আগে কিছু প্রাণ দিয়া অনুভব করা চাই, পরে তাহাই বিশ্বস্ত ভাবে প্রকাশ করা চাই, তবেই সেখানে আর্ট ফুটিবে। কোকিলের কুহু কুহু ডাকটিই আর্ট নহে; কিন্তু যদি কোন ছেলে মেয়ে অবিকল কোকিলের মত করিয়া ডাকিতে পারে, তবেই সেখানে আর্ট আসিল। আর্ট স্বভাব নহে,—স্বভাবের অনুকরণ, (a representation, and not a reality.)

উপরে যাহা বলা হইল, উহাই আর্ট সম্বন্ধে টলষ্টয়ের অভিমত এবং আমার বিশ্বাস, এই মতই ঠিক। বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আর্ট-সমালোচক বিখ্যাত ইটালীয়ান দার্শনিক বেনেডেটো ক্রোস (B. Corce)–যিনি সৌন্দর্য বিজ্ঞানকে এক স্বতন্ত্র ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন,—তিনিও আর্টের যে সংগা দিয়াছেন, তাহাও টলষ্টয়ের সংজ্ঞার সহিত অবিকল মিলিয়া যায়। ক্রোস বলেন–"Art is expression of impression". অর্থাৎ অনুভূতির প্রকাশই আর্ট। টলষ্টয়ও ত এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন।

এই পর্যন্ত যাহা বলা হইল, আশা করি আর্টকে চিনিবার পক্ষে উহাই যথেষ্ট। কিন্তু আর্টকে আরও ব্যাপকতর ভাবে বুঝিতে হইলে আর্টের সহিত সত্য, মঙ্গল ও সুন্দরের কি সম্বন্ধ,তাহাও আমদিগকে জানিতে হইবে।

www.pathagar.com

আর্ট ও সত্য

উপরে বলা হইয়াছে যে, স্বভাব বা সত্যের অনুকরণই হইতেছে আর্ট। সুতরাং সত্যই হইতেছে আর্টের প্রাণ। সত্য ছাড়া আর্ট বাঁচিতেই পারে না। আর্টিষ্টের সৃষ্টি বাস্তবতার কত কাছাকাছি, তাহাই দেখিয়া তাহার সফলতার বিচার করিতে হইবে। দৃশ্যচিত্রে বা অভিনয়ে অস্বাভাবিকতা আসিলেই তাহা একেবারে ব্যর্থ হইয়া যায়। ধরুন রঙ্গমঞ্চে সীতা অভিনীত হইতেছে। সীতা যদি হাল ফ্যাশানের বেশভূষা করিয়া আসিয়া দাঁড়ায়, রাম যদি হ্যাট-কোট পরিয়া সিংহাসনে উপবেশন করে, শিল্পী যদি ইডেন গার্ডেনের এক কুঞ্জবনের অনুকরণে বাল্মিকীর তপোবন অঙ্কিত করিয়া দেখায়, এবং অভিনয়ে যেখানকার যে ভাবটি সম্যকরূপে ফুটিয়ে না উঠে, তবে সে অভিনয় দেখিয়া কি কেহ মুগ্ধ হইতে পারে? কখনই না। অভিনয় তখন একটি প্রহসনে পরিণত হয় মাত্র।

অতএব দেখা যাইতেছে, অস্বাভাবিকতাই আর্টের মৃত্যুর কারণ। আর্টিষ্ট যাহাই অঙ্কিত করিতে চাহেন না কেন, প্রকৃতির ভিতরে থাকিয়াই তাহা করিতে হইবে। অস্বাভাবিক বা অতিপ্রাকৃতিক কোন কিছুই তিনি অঙ্কিত করিতে পারেন না, করিলে তাহা আর্ট হিসাবে ব্যর্থ হইয়া যায়। গ্রীষ্মকালের একটি চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে প্রকৃতির গুমট ভাব, গরমের জ্বালায় মানুষের অস্থিরতা; গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিয়া বা শিথিল করিয়া পাখা দিয়া বাতাস খাওয়া ইত্যাদি ভাবই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে; কারণ ইহাই সত্য বা স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতা যত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জীবন্ত করিয়া ফুটাইয়া তুলা যাইবে, আর্টিষ্টের সৃষ্টি ততই সুন্দর বলিয়া বিবেচিত হইবে। গল্পে উপন্যাসে কাব্যে সর্বত্রই এই একই নিয়ম! স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া কোন আর্টিষ্টই চলিতে পারে না।

সত্য বা স্বাভাবিকতাই যখন আর্টের প্রাণ এবং এই সত্যের মূলে যখন সকল সত্যের মূলাধার সেই খোদাতালা, তখন এ কথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে, সকল আর্টের মূলই হইতেছে সেই সত্যময় খোদাতালা। তিনিই আর্টের কেন্দ্র স্বরূপ; তাঁহাকে ঘিরিয়াই সমস্ত আর্ট প্রকাশ পায়।

এইখানে একটা সমস্যা উঠিতে পারে। স্বাভাবিকত্ব রক্ষা করাই যদি আর্টের প্রধান লক্ষ্য হয়, তবে অনেক অশ্লীল বা কুৎসিত ভাবের চিত্রকেও আর্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কারণ সেগুলিও স্বভাবতঃ সত্য। কুৎসিতের মধ্যেও যে আর্ট আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আর্ট হইলেই ত হয় না। প্রত্যেক জিনিষেরই ভাল-মন্দ ত আছে। আর্টের ভিতরেও এই শ্রেণীর আর্ট নিতান্ত জঘন্য আর্ট, ইহাদিগকে বর্জন করিয়া চলা সর্বতোভাবে আমাদের কর্ত্তব্য। 'বাতাস আমাদের জীবন ধারণের উপায়'—এ কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও আমরা যেমন প্রাণনাশক দূষিত বাতাসকে বর্জন করিয়া অক্সিজেনপূর্ণ বিশুদ্ধ বাতাসেরই সন্ধান করি, আর্টের বেলায়ও অবিকল এইরূপ। আর্টে সত্য ও স্বাভাবিকতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে বলিয়া যে নির্বিচারে যে-সে সত্য ঘটনাকেই আর্ট-সৃষ্টির উপাদান বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। বাস্তবতাকে এই অর্থে গ্রহণ করিলে ভুল করা হইবে। এই শ্রেণীর আর্টকে নিছক realistic art বা প্রত্যক্ষদ্যোতিক

www.pathagar.com

আর্ট হইবে। যাহাই প্রকৃতিতে আছে,নির্বিচারে তাহাই অঙ্কিত করিয়া লোক-চক্ষুর সম্মুখে ধরা এই আর্টের কর্ম। বর্তমানে এই শ্রেণীর আর্টবাদীর সংখ্যাই বেশী। তাহারা জীবনের আস্তাকুঁড় হইতে কুৎসিৎ পচা জিনিষ তুলিয়া আনিয়া realistic art এর নামে চালাইতে চান। গল্পে উপন্যাসে কাব্যে ও চিত্রে এই মনোভাব অধিকাংশ লেখকদিগের মধ্যে দেখা যাইতেছে। তাঁহারা সত্য বা স্বাভাবিকতাকে অনুকরণ করিতে চান করুন, ইহা খুব ভাল কথা! কিন্তু তাঁহারা যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন, তাহা সত্য সত্যই সত্য কিনা,সেটুকু ত চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। নিত্য যাহা চোখের সামনে ঘটিতে দেখিতেছি, অনেক সময় তাহা সত্য হয় না। বাস্তবতার মধ্যেও যে মিথ্যা লুকাইয়া আছে, এ সত্য তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে। টলষ্টয় ঠিকই বলিয়াছেন ঃ

"Truth will be known not by him who knows only what has been, is and really happens, but by him who recognises what should be according to the will of God".

অর্থাৎ যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, ঘটিতেছে বা ঘটে, তাহাই যে সত্য বলিয়া জানে, সে প্রকৃত সত্যকে চিনে নাই। খোদাতালার ইচ্ছা অনুসারে কি ঘটা উচিত তাহাই যে উপলব্ধি করিতে পারে, সে-ই সত্যকে চিনিয়াছে।

আর্টিষ্টের সত্য-সাধনা এইরূপই হওয়া উচিত। অন্ধ realist না হইয়া তাহাকে idealist বা আদর্শবাদীও হইতে হইবে। কোন লম্পট-প্রকৃতি ধনী যুবক সমাজ-শাসন ও নীতিধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়া বিলাসব্যসনে মহাসুখে কালাতিপাত করিতেছে দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন যে, সে প্রকৃতই সুখী, তবে তিনি ভুল করিবেন। প্রকৃত সুখী সে নয়, কেননা খোদাতালার বিধানে ঐরূপ জীবনের মধ্যে সুখ নিহিত নাই। পক্ষান্তরে "হিতোপদেশ" বা "ঈশপের গল্প" সমূহ সত্য না হইলেও সত্য, কেননা খোদাতালার ইঙ্গিত যে কোনদিকে, তাহা ঐ সব গল্পে পরিষ্কারভাবে দেখান হইয়াছে।

অতএব স্বাভাবিকতার খাতিরে অতিস্বাভাবিকতা ভাল নয়। স্বাভাবিক সত্যের সহিত আদর্শ সত্যের যোগ থাকা চাই; নতুবা কোন শিল্পীর আর্টই সার্থক হইবে না। স্বাভাবিক সত্যের মধ্যে যাহা অসত্য, তাহা বর্জন করিতে হইবে এবং অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা স্থান বিশেষে আদর্শ সত্যেরও সৃষ্টি করিতে হইবে।

আর্ট ও সৌন্দর্য

টলষ্টয় আর্টের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং আমরাও যাহা সমর্থন করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে হয়ত অনেকে মনে করিতে পারেন, আর্টের সহিত সৌন্দর্য্যের বুঝি কোনই সম্বন্ধ নাই। এ ধারণা ভুল। সৌন্দর্য্যের সহিত যে আর্টের কোনই সম্বন্ধ থাকিবে না, টলষ্টয় এমন কথা বলেন নাই। সৌন্দর্য ও আনন্দ হইতে আর্টকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তিনি উহার সঠিক স্বরূপ দেখাইয়াছেন মাত্র। পূর্বে লোকের ধারণা ছিল, সৌন্দর্য ও আনন্দ যাহার মধ্যে আছে, তাহাই আর্ট। টলষ্টয় এই ধারণাকে ভাঙিয়া দিয়া আর্টকে জীবনের মধ্যে সহজভাবে

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যাহাই সুন্দর ও আনন্দদায়ক, তাহাই আর্ট—এ কথার তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন বটে, কিন্তু যাহাই আর্ট তাহাই যে সুন্দর ও আনন্দদায়ক হইবে না, তাহা ত তিনি বলেন নাই। বস্তুতঃ আর্টের সহিত সৌন্দর্যের কোন বিরোধ ত নাই-ই, বরং ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সত্য যেমন আর্টের প্রাণ, সৌন্দর্য তেমনই আর্টের পরিচ্ছদ। সৌন্দর্য ছাড়া আর্ট বাহিরে আসে না। সৌন্দর্যের সহিত আর্টের এতই ঘনিষ্ঠতা যে বাহিরের লোক তাহার এই উজ্জ্বল বহিরাবরণ দেখিয়া মনে করিয়াছে, সৌন্দর্য ও আর্ট একই বস্তু।

উপরে রঙ্গমঞ্চের দৃষ্টান্তে দেখান হইয়াছে, অভিনয় ও দৃশ্যাবলী যত পরিমাণে স্বাভাবিক বা সত্য হয়, তত পরিমাণে উহা সুন্দর দেখায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে সৌন্দর্যের সহিত সত্যের সম্বন্ধে আছে। সত্য যেখানে পরিষ্কার ভাবে বাহিরে আত্ম-প্রকাশ করে, সেখানে তাহা সুন্দর না হইয়াই পারে না। ইহা খোদাতালারই বিধান। তিনি যেমন সত্য ও মঙ্গল স্বরূপ, সেইরূপ সুন্দরও। বিশ্ব-প্রকৃতিতে তাই এত রূপের লীলা। বস্তুতঃ সৃষ্টির দুই মূলীভূত উপাদানই হইতেছে সুর আর রূপ। একটু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে সুরও দূরীভূত হইয়া যায়, থাকে কেবল রূপ, কেননা যাহা সুর তাহাও রূপ। রূপের অন্তরালে 'অরূপ রতন' বিরাজিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাকে পাইতে হইলে এই 'রূপ-সাগরেই' ডুব দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথও তাই ঠিকই বলিয়াছেন–

"রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করে।"

মানুষ এই রূপের মধ্যেই ডুবিয়া আছে। সুতরাং তাহার নিজস্ব সৃষ্টিতে যে রূপ বিদ্যমান থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক।

সৌন্দর্যের সহিত আর্টের এই যে প্রমাণের যোগ, ইহা আর্টেরই বিশিষ্ট প্রকৃতি। বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, প্রত্যেক বিষয়েরই একটা স্বতন্ত্র প্রকৃতি বা মেজাজ আছে। বিজ্ঞান ও দর্শনের মূল লক্ষ্য সত্য-উপলব্ধি হইলেও প্রত্যেকের গতিপথ স্বতন্ত্র। বিজ্ঞান যে-পথ দিয়া চলে, দর্শন সে-পথ দিয়া চলে না, সে চলে আর এক নূতন পথ দিয়া। সেইরূপ আর্টের পথও বিভিন্ন। তার পথ হইতেছে সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া। এই পথ দিয়াই সে আমাদিগকে সত্যের সন্নিধানে লইয়া যায়।

অতএব দেখা যাইতেছে, আর্টের সহিত সৌন্দর্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সৌন্দর্য ছাড়া আর্ট বাহিরে প্রকাশ পাইতেই পারে না।

আর্ট ও মঙ্গল

সত্য যদি আর্টের প্রাণ হইল, সৌন্দর্য যদি তাহার পরিচ্ছদ হইল, তবে লক্ষ তাহার কী হইবে? কোথায় কোন উদ্দেশ্য সে যাত্রা করিবে?

আর্টের লক্ষ্য হইবে মঙ্গল। এই 'মঙ্গল-গ্রহের' দিকেই তাহাকে ছুটিতে হইবে। বিশ্ব-মানুষের কল্যাণ সাধনই হইবে তাহার চরম লক্ষ্য।

www.pathagar.com

আর্ট ও নীতি

এইখানে আর্টের সহিত নীতির (morality) কথা আসিয়া পড়ে! এই প্রশ্ন লইয়া যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। একদল বলেন, আর্টের ভাল-মন্দ বিচার করিতে হইবে, নতুবা আর্টের নামে স্বেচ্ছাচার আরম্ভ হইবে। আর একদল বলেন— ওরূপ নৈতিক বিচার (moral judgment) আর্টের বেলায় খাটিবে না। একদল বলেন—নৈতিক সুসম্পন্নতাই (moral perfection) আর্টের উদ্দেশ্য। অন্য দল বলেন—নিছক আনন্দ দানই আর্টের উদ্দেশ্য; ভালমন্দ বা মঙ্গলামঙ্গলের সে কোন ধার ধারে না। আর্টিষ্টের সৃষ্টিতে সৌন্দর্য ও আনন্দের সন্ধান পাওয়া গেল কি না, তাহাই শুধু বিচার্য। নীতি বা মঙ্গলের অনুশাসন মানিয়া চলিলে আর্টিষ্টের সৃষ্টি পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হয়, কোন নূতন সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না।

এই মতদ্বয়ের কোন্‌টি সত্য? আমার মনে হয়, আর্ট যে নীতির গণ্ডীর বাহিরে, ইহা হইতেই পারে না। কোন বাধাবন্ধ নাই, শাসন-শৃঙ্খলা নাই, সংযম-শুচিতা নাই,—আর্টিষ্ট যাহা খুশী তাহাই করিয়া চলিবেন, আর তাহাই আর্টের নামে কাটিয়া যাইবে, ইহা বাতুলের উক্তি। ইহার নাম স্বাধীনতা নয়, উচ্ছৃঙ্খলতা। "গুরু মহাশয়গিরী করা আর্টের কাজ নয়"—ইহা না হয় স্বীকার করিলাম; কিন্তু তাই বলিয়া আর্টে যে কোনই সংযম-শাসন থাকিবে না, এ কেমন কথা? আর্ট মানব জীবনে এমন কী এক দুর্লভ পদার্থ, যার জন্য নীতিধর্ম ও মঙ্গলকে জলাঞ্জলি দিয়া তাহার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে? আর্ট এমনই বা কী বস্তু যাহার নামে অকল্যাণ ও দুর্নীতিকে অকাতরে জীবনের মধ্যে বরণ করিয়া লইয়া অধোগতির পথে যাইতে হইবে? মঙ্গল ও সুনীতির নামে এত কেন আপত্তি? নূতন সৃষ্টির' ব্যাঘাত ঘটিবে, তাই? সৌন্দর্য ও আনন্দকে স্বাধীনভাবে উপভোগ করা যাইবে না, তাই? কতটুকু ব্যাঘাত ঘটিবে? কতটুকু লোকসান হইবে? আমার ত মনে হয় আর্টের নামে যাঁহারা স্বাধীনতার দাবী করেন তাঁহারা হয়ত এ সব লাভ-লোকসানের বিষয় আদৌ চিন্তা না করিয়াই একে অপরের দেখাদেখি প্রচলিত ধূয়ার প্রতিধ্বনি করেন মাত্র; নয় ত তাহারা আসলেই অতি বদ, তাহাদের মতলবও নিতান্ত খারাপ। নৈতিক চৌহদ্দী বজায় রাখিয়া কি সৃষ্টি সম্ভব নয়? বরং সৃষ্টির এক প্রধান শর্তই হইতেছে নিয়ন্ত্রণ।

আর্টিষ্টের সৃষ্টি নৈতিক বিচারের গণ্ডীর মধ্যে আসিবে না কেন? আর্ট যখন একটি মানবীয় ক্রিয়া (human activity) এবং মানুষ যখন একটি সামাজিক ও নৈতিক জীব (social and moral being), তখন তার সৃষ্টিতে বা শিল্পকর্মে ভালমন্দের বিচার যে চলিবে, ইহা ত নিতান্তই স্বাভাবিক। যে কার্যের ভিতর কোন উদ্দেশ্য (intention) নিহিত আছে, তাহা যে নৈতিক গণ্ডীর ভিতরে অসিবে, নীতি-শাস্ত্রের ইহা ত খুবই সোজা কথা। শিল্পী যখন কাব্যে উপন্যাসে বা চিত্রে কোন সুন্দর বা কুৎসিৎ ভাব অঙ্কিত করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন, তখন তার মধ্যে কোন-না-কোন একটা উদ্দেশ্য ত থাকেই। তার সৃষ্টি সকলে দেখুক এবং তাহাকে সুখ্যাতি করুক–এ উদ্দেশ্য প্রত্যেক শিল্পীর অন্তরেই বিরাজিত। অন্ততঃ তার সৃষ্টিকে বাহিরে প্রকাশ করিবার আনন্দটুকু

www.pathagar.com

উপভোগ করাও ত একটা উদ্দেশ্য। যদি কোন উদ্দেশ্যই না থাকিবে, তবে শিল্পীরা আপন আপন সৃষ্টিকে জনসাধরণে প্রচার করিতে এত ব্যগ্র কেন? আপনার সৃষ্টি আপনারই অন্তর্তৃপ্তির জন্য গোপন করিয়া রাখিলেই ত চলিত। তাহা যখন দেখি না, তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে, আর্টিষ্টের সৃষ্টি উদ্দেশ্য বিহীন নহে।

আটিষ্ট যাহাই বলুন না কেন, তার সৃষ্টি যখন জনসমাজে প্রচারিত হয়, তখন নিশ্চয়ই তার একটা প্রভাব আছে। কাজেই সে প্রভাব ভাল কি মন্দ, সে বিচার সমাজ করিবেই। "আর্টের খাতিরে আর্ট", 'নীতি-ধর্মের সহিত আটের কোন সম্বন্ধ নাই'–ইত্যাদি বলিয়া শত চীৎকার করিলেও কোন ফল হইবে না। সামাজিক জীব হিসাবে আমার যেমন কতকগুলি ব্যক্তিগত অধিকার (rights) আছে, সেইরূপ কতকগুলি কর্ত্তব্য-বন্ধনও (duties and responsibilities) আছে। আপন বাড়ীতে স্বাধীন ভাবে কাজকর্ম করিবার আমার পূর্ণ অধিকার থাকিলেও আমি যখন-যাহা-খুশি তাহাই করিতে পারি না। প্রতিবেশীর তাহাতে অসুবিধা ও আপত্তি আছে কিনা, তাহার প্রতি আমার লক্ষ্য রাখিতে হয়, নতুবা আইন আমলে আসে। সেইরূপ আটিষ্টের সৃষ্টিও যখন সমাজের সংস্পর্শে আসিতে বাধ্য, তখন সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণের দিকে আর্টিষ্টকে লক্ষ্য রাখিতেই হইবে। আর্টিষ্ট যদি সমাজ-গণ্ডীর বাহিরে এক জনহীন "Palace of Art"-এ বাস করিয়া "Art for art's sake" ইত্যাদি বুলি আওড়াইতেন, এবং যাহা-খুশি-তাহাই করিতেন, তবে তাঁহার উপর কোন বিচারই চলিত না। কিন্তু যতক্ষণ তিনি সমাজের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া কোন কার্য করিবেন—তা সে আর্টই হউক আর অপর কিছুই হউক—ততক্ষণ তাঁহাকে ভালমন্দের বিচারাধীন থাকিতেই হইবে।

আর্ট ও মনোবিজ্ঞান

মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে দেখিলেও আর্টকে নৈতিক গণ্ডীর মধ্যে ফেলা যায়। মানব-মনের মাত্র তিন অবস্থা ঃ–thinking, feeling, willing, অর্থাৎ হয় সে চিন্তা করিবে, নয় সে অনুভব করিবে, নয় সে কিছু ইচ্ছা করিবে। এই তিন মনোবৃত্তির বাহিরে মানুষ থাকিতেই পারে না। সত্য ও জ্ঞান চিন্তা-সাপেক্ষ, সৌন্দর্যানুভূতি, প্রেম প্রভৃতি অনুভূতি-সাপেক্ষ এবং মঙ্গলামঙ্গল ইচ্ছা-সাপেক্ষ। অন্য কথায় 'সত্য' 'সন্দুর'ও 'মঙ্গলের' মূল ভিত্তিই হইল thinking, feeling এবং willing. এই তিনটি মনোবৃত্তি পরস্পর স্বতন্ত্র—এমন কি স্থানে স্থানে বিরোধী হইলেও, পরস্পরের মধ্যে মিলও কিন্তু যথেষ্ট। অন্তরে যখন প্রেম জাগ্রত হয়, চিন্তা বিবেক বা মঙ্গলামঙ্গলের কথা তখন দূরে থাকে। চিন্তা করিতে গেলে অনেক স্থলে হয় তা প্রেম করাই হয় না। আবার কার্যক্ষেত্রে নামিয়া কবির মত শুধু ধ্যান করিতে গেলে, হয় ত সে কার্যই পণ্ড হইয়া যায়। যে মানুষ ডুবিয়া মরিতেছে, তাহাকে দেখিয়া যদি যুক্তিতর্ক দ্বারা কর্ত্তব্য স্থির করিতে যাই, তবে সে বেচারার আর উদ্ধার নাই। ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে, এই তিনটি মনোবৃত্তি পরস্পর কত স্বতন্ত্র। কিন্তু অনেক স্থলে ইহাদের মধ্যে পরস্পর মিলও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞান জন্মিলেই অনুভূতি জন্মিতে পারে, এবং পরে তাহা হইতে কর্মপ্রবৃত্তিও

www.pathagar.com

জাগিয়া ওঠে। স্বদেশ বা স্বজাতির লাঞ্ছনা ও দূরবস্থার কথা যখন জানিতে পারি, তখন অন্তর-তলে বেদনার অনুভূতি আপনা-আপনিই জাগিয়া উঠে এবং সেই অনুভূতি হইতেই দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। অনুভূতি হইতেও অনেক সময় জ্ঞানে পৌঁছিতে পারি। এইরূপে জ্ঞান, অনুভূতি এবং কর্ম্মস্পৃহা পরস্পর পরস্পরকে অনেক সময় সাহায্য করিয়া প্রত্যেকের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেয়। পরস্পর স্বতন্ত্র হইলেও কেহই স্বাধীন ভাবে চলে না। প্রেম, ক্রোধ প্রভৃতি অনুভূতি-প্রধান মনোবৃত্তিগুলি যখন স্বাধীন ভাবে কাজ করে, তখনই জগতে মহা অনর্থ সাধিত হয়। কিন্তু তাহারা যখন বিবেক বা জ্ঞানের শাসন মানিয়া চলে তখনই তাহারা সুন্দর ও সার্থক হয়।

আর্টও যখন এই feeling-এর অন্তর্ভুক্ত, তখন সেও একেবারে বিবেক ও নীতির বাহিরে থাকিতে পারে না। সত্য ও মঙ্গলের দ্বারা সংযত হইয়া চলিলেই সে প্রকৃতপক্ষে সুন্দর হয়।

আর্ট ও প্রকৃত

উপরে বলা হইয়াছে, আর্ট হইতেছে স্বভাবের অনুকরণ। সুতরাং এইবার আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিব স্বভাবের মধ্যে কোন মঙ্গলভাব বা নৈতিক প্রভাব নিহিত আছে কি না। যদি থাকে, তবে আমাদের আর্টেও উহা স্বতঃসিদ্ধ ভাবে থাকিবে।

স্বভাব বা প্রকৃতির অনসুকরণ করাই আর্টের কাজ। প্রকৃতিকে ছাড়িয়া আর্ট দাঁড়াইতেই পারে না। প্রকৃতিই হইতেছে আর্টের প্রতিষ্ঠাভূমি। কিন্তু এই প্রকৃতি নিজেই একটা আর্ট—স্বয়ং খোদাতলা ইহার শিল্পী। কাজেই দেখা যাইতেছে, মানুষের আর্ট হইতেছে খোদার আর্টের সন্তান। অর্থাৎ আমাদের আর্টের অবস্থা ঠিক নাতী-নাতিনীর অবস্থার ন্যায়। Dante তাই বলিয়াছেন।ঃ-

> "Nature takes its method and its ends
> From God, Whose mind in
> skill and art is shown,
> Your Art, as far as may be, close behind
> Follows, as scholars near
> their teacher tread;
> So in your Art we may
> God's grandchild find".

এখন দেখা যাউক, খোদার আর্টের মধ্যে— অর্থাৎ এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে খোদাতালা কোন মঙ্গলভাব নিহিত রাখিয়াছেন, না তিনিও "Art for art's sake" নীতির অনুসরণ করিয়াছেন। একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, এই যে নানা বর্ণে নানা বৈচিত্র্যে প্রকৃতি আমাদের সম্মুখে নিত্য নব নব মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে, ইহা কোন খেয়ালী বিধির সৃষ্টি নয়, ইহার মধ্যে মঙ্গলভাব ওতপ্রোতভাবে নিহিত রহিয়াছে। বসন্তের

www.pathagar.com

দখিন হাওয়ায়, কুসুমের হাসির হিল্লোলে, ভরা-বাদরের জল-কল্লোলে, চন্দ্র-সূর্যের আলোক-পাতে,-ফুলে ফলে বর্ণে গন্ধে,—সর্ব্বত্রই কার যেন মঙ্গল হস্তের সুখ-স্পর্শ অনুভব করি। প্রভাতে অরুণ কিরণ বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় কি অপরূপ শোভাই না ফুটাইয়া তুলে। কিন্তু সেই শোভা ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া নিখিল বিশ্বের সুপ্ত প্রাণে সে নব-জীবনের পুলক-স্পন্দনও আনিয়া দেয়। ফুল-শাখায় দোলা দিয়া, কচি ধানের বুকের উপর ঢেউ খেলাইয়া, বাতাস বহিয়া যায়, কিন্তু তার মধ্য দিয়া সে মানুষের ঘরে-ঘরে সঞ্জীবনী-সুধাও দান করিয়া চলে। অন্ধকার রাত্রিতে তারকা-বালারা মিষ্টি চোখে মুচকি হাসি হাসিয়া ধরার মানুষকে শুধু পাগলই করে না, ধ্রুবতারা হইয়া তাহারা কত দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের পথ নির্দেশও করিয়া দেয়। কত বর্ণে, কত গন্ধে পুষ্প বিকশিত হইয়া উঠে, কিন্তু তারাও মানুষের অশেষ কল্যাণে আত্ম-নিয়োগ করে। ফল হইয়া মানুষের কাজে লাগাই হইতেছে ফুলের জীবনের গোপন সাধনা এবং যতক্ষণ এই সাধনা সিদ্ধ না হয়, ততক্ষণ যেন তার সৌন্দর্য সার্থক হইয়া উঠে না। নদনদী শুধু প্রকৃতির আনন্দ ও শোভাবর্দ্ধনই করে না, জনপদের ভিতর দিয়া দিকে দিকে প্রবাহিত হইয়া সে মানুষের বহু কল্যাণ সাধনও করিয়া থাকে। বস্তুতঃ যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই দেখিতে পাই—সৌন্দর্য ও আনন্দের মধ্য দিয়া জগতের মঙ্গল-সাধনই প্রকৃতির উদ্দেশ্য।

খোদাতালার আর্টের ইহাই যখন লক্ষ্য, তখন মানুষের আর্টের কেন ইহার ব্যতিক্রম হইবে? সত্য বটে, প্রকৃতিতে অসুন্দরের বা অমঙ্গলেরও অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে। ঝড় ভূমিকম্প অনাবৃষ্টি বন্যা প্রভৃতিও প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাই বলিয়া উহারাই প্রকৃতির চরম সত্য নয়। আর ঐগুলি যে প্রকৃতই অমঙ্গল, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। আমাদের জ্ঞান নিতান্তই সসীম। এই সসীম জ্ঞান লইয়া অসীমের লীলা কি করিয়া আমরা বুঝিব? তাই দেখিতে পাই, আমাদের নিকট যাহা অমঙ্গল বলিয়া অনুভূত হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা অমঙ্গল নয়। অতি উর্দ্ধ হইতে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, তথাকথিত অনেক অমঙ্গলই আর এক বৃহত্তর মঙ্গলের কারণ স্বরূপ। সুতরাং এ কথা আমরা অনায়াসে বলিতে পারি যে, খোদাতালা তাঁহার সৃষ্টিতে সর্বত্রই মঙ্গল-ভাব নিহিত রাখিয়াছেন।

এখানে একটা কথা উঠিতে পারে যে, প্রকৃতিতে যাহা অমঙ্গল বলিয়া মনে হয়, তাহা যদি প্রকৃত অমঙ্গল না হয়, তবে মানুষের সৃষ্টিতেও যাহা আমরা অমঙ্গল বলিয়া মনে করি, তাহাও ত প্রকৃত অমঙ্গল না হইতেও পারে। পরিণামে সব অমঙ্গলই ত মঙ্গলপ্রসূ হইবে। এ কথা অনেকটা সত্য বটে। কিন্তু মানুষের কৃত অমঙ্গলকে মঙ্গলে পরিণত করিতে প্রকৃতি এত দীর্ঘ সময় গ্রহণ করে যে, তাহার ফল ভোগ করিবার পূর্বেই বহু লোক ধ্বংস মুখে গিয়া পৌঁছে। বহিঃপ্রকৃতির অমঙ্গল ভাব অপেক্ষা মানুষের অমঙ্গল ভাব দ্রুত কার্যকরী, মানুষের কাজ মানুষের উপর সহজেই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। কাজেই কোন মানুষকেই দুর্নীতি বা অমঙ্গল ভাব প্রচার করিতে দেওয়া নিরাপদ নয়।

অনেকে বলেন, আর্টে নীতি ও মঙ্গলের শাসন চলিলে আর্টিষ্টের সৃষ্টি ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয়, স্বাধীন সৃষ্টি অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। 'স্বাধীন সৃষ্টির' দ্বারা তাঁহারা যে কি বোঝেন, বুঝি না। মানুষের স্বাধীন সৃষ্টির অর্থ কী? তার সৃষ্টি স্বাধীন হইতে পারে কি? কখনই নয়। মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ, সে অন্যনিরপেক্ষ নয়, সুতরাং স্বাধীন সৃষ্টি তাহার হস্তে কি করিয়া

www.pathagar.com

সম্ভব? একমাত্র খোদাতালাই স্বাধীন সৃষ্টি করিতে সক্ষম, কেননা তাঁহার সৃষ্টি অন্য কাহারও অপেক্ষা রাখে না। ইচ্ছা করিলেই তিনি যাহা খুশী তাহাই করিতে পারেন। এ হেন স্বাধীন সৃষ্টি মানুষ কি করিয়া আশা করিতে পারে? কাজেই মানুষের স্বাধীন সৃষ্টির কোন অর্থই হইতে পারে না। তাহাকে কোন না কোন নিয়মের অধীন হইয়া সৃষ্টি করিতেই হইবে। অতএব স্বাধীন সৃষ্টির নামে নীতি ও মঙ্গলকে দূরে ঠেলিয়া ফেলা তাহার পক্ষে নিতান্তই ধোকাবাজী।

তবে এখানে এইটুকু বলিতে পারি যে, "সদা সত্য কথা বলিবে, চুরি করা বড় পাপ" ইত্যাদি ধরনের নীতিবাক্যই যে বাছিয়া বাছিয়া আর্টে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে তাহা নহে। আর্টিষ্টের নীতি-শাস্ত্র একটু স্বতন্ত্র ধরনের। নীতি-শাস্ত্রের গণ্ডীর মধ্যে রাখিয়াও তাহাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে। পদে পদে পথ-নির্দ্দেশ করিতে গেলে তাহার সৃষ্টি ব্যাহত হয় বটে, কিন্তু এমনও ত হইতে পারে যে, একটা ব্যাপক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও সে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে। স্বভাবের সৃষ্টিতেও ত এমন একটা ব্যাপক বাউণ্ডারী লাইন আছে।

এত বিধি-নিষেধ, এত সীমানা-নির্দ্দেশ মোটেই দরকার হয় না—আর্টিষ্ট যদি প্রকৃতপক্ষেই খাঁটী আর্টিষ্ট হন। যার মধ্যে প্রতিভা আছে, সত্য সাধনা আছে, অন্তর্দৃষ্টি আছে, হৃদয় যাহার পবিত্র, উদ্দেশ্য যাহার সাধু, সেই আর্টিষ্টকে সমস্ত বাধা-বন্ধন হইতে একেবারে মুক্ত করিয়া দিলেও তাহার সৃষ্টি কিছুতেই সৎ ছাড়া অসৎ হইবে না। কুশ্রী জিনিষও তাঁহার তুলিকার যাদু স্পর্শে সৎ ও সুন্দর হইয়া দেখা দিবে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি বিহীন কোন লোক আর্টিষ্ট সাজিলেই সে কেবলই তর্ক করিবে এবং আইনের ফাঁক খুঁজিয়া নিজের প্রবৃত্তিকে সমর্থন করিবার চেষ্টা করিবে। এত তর্ক, এত আলোচনা—এ শুধু তাহাদের জন্য। সাদী, হাফেজ, রুমী, মাইকেল, এঙ্গেলো, র‍্যাফেল প্রভৃতির জন্য নয়।

উপরে যাহা বলা হইল, আশা করি তাহা দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, কোনদিক দিয়াই আর্টের আঙিনা হইতে আমরা নীতি ও মঙ্গলকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিতে পারি না।'

আর্ট ও মানব-জীবন

আর্টের চরম সার্থকতা মানুষের আপন জীবনে। আর্টের ক্ষেত্র শুধু কাব্য-উপন্যাসই নয়, আর্টের ক্ষেত্র সুবিস্তীর্ণ মানব-জীবন। তুলি দিয়া, রং দিয়া বাইরে কোন শিল্পবস্তু সৃষ্টি করিলেই আর্ট পূর্ণবিকশিত হয় না; আপন-আপন জীবন-পটে শিল্প রচনা করিতে পারিলে তবেই আর্টের চরম সদ্ব্যবহার করা হয়। ম্যাডোনা, মোনালিসা শিল্প হিসাবে যত সার্থক সৃষ্টিই হোক—তাহারা প্রাণহীন নির্জীব। জীবন্ত ম্যাডোনা বা জীবন্ত মোনালিসা বিশ্বধরার স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকিলে কি অধিকতর সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক হয় না? কি পুরুষ, কি নারী, পৃথিবীর যাবতীয় মহৎ ও সুন্দর মানব চরিত্রগুলিকে আর্টের আলোকে এইরূপে ব্যাখ্যা করা যায়। বলা যায় প্রত্যেকে তারা আর্টিষ্ট এবং প্রত্যেকে তারা নিজের জীবন শিল্পকে সুন্দর করিয়া রচনা করিয়াছে। জীবনের মাঝে আর্টকে এই ভাবে গ্রহণ করিলে তখন আর "Art for Art's sake" থাকে না তখন হয় "Art for Man's sake." আর্টের এই প্রয়োগই চরম প্রয়োগ এবং এখানেই তার সার্থকতা।

www.pathagar.com

আর্টের সার্বজনীনতা ও সহজবোধ্যতা

এই স্থানে আর একটী প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। শ্রেষ্ঠ আর্টের নিদর্শন কী? সত্য সুন্দর ও মঙ্গল তিনই না হয় বিদ্যমান রহিল, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এমনও ত হইতে পারে যে, কোন আর্ট সহজেই লোকের বোধগম্য হইতে পারে, কোন আর্ট বা নিতান্ত দুর্বোধ্য ও সাধারণের উপভোগের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে কোন্ শ্রেণীর আর্টকে শ্রেষ্ঠ বলা যাইবে? যাহা আপামর সাধারণ সকলেই বুঝিতে পারে তাহাই, না যাহা কতিপয় মুষ্টিমেয় লোককেই কেবল আনন্দ দেয়, তাহাই?

টলষ্টয় বলেন, যাহা সর্বসাধারণেই উপভোগ করিতে পারে, তাহাই শ্রেষ্ঠ আর্ট। আর্টিষ্ট যখন কোন একটা নূতন ভাব আপন প্রাণে উপলব্ধি করিয়া জনসাধারণে তাহা প্রচার করিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার আর্ট সৃষ্টি করেন, তখন তাহা যত সহজে লোকের বোধগম্য হইতে পারে, ততই সুন্দর বলিয়া মনে করিতে হইবে। লোকে যদি কিছু নাই বুঝিল, তবে সে আর্টের সার্থকতা কোথায়? হজরত ইব্রাহিমের পুত্র-কোরবানি, ইউসুফ-জুলেখার প্রেম-কাহিনী, রাম-লক্ষ্মণ ও সীতার উপাখ্যান প্রভৃতিই টলষ্টয়ের মতে শ্রেষ্ঠ আর্ট, কারণ উহাদের অন্তর্নিহিত ভাবনিচয় সহজেই লোকে গ্রহণ করিতে পারে।

কিন্তু বর্তমান আর্টবাদী ও সমালোচকবৃন্দ টলষ্টয়ের এই উক্তি হয়ত মানিতে চাহিবেন না। তাঁহারা বলিবেন, ওরূপ ভাবে আর্টের বিচার করিলে নিতান্ত নিম্নস্তরের আর্টকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হয়। শিক্ষা, সাধনা বা মার্জিত রুচির কোনই মূল্য থাকে না। পাঁচালি, জারি, গ্রাম্য কবি-গান, বটতলার পুঁথি, রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলী, এই সমস্তকেই তাহা হইলে রুমি, হাফিজ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির উপরে আসন দিতে হয়।

এই দুই মতের কোন্‌টি সত্য? আমার মনে হয়, দুই দিকেই সত্য নিহিত আছে। টলষ্টয়ের মতকে নির্বিচারে মানিয়া লইলে বাস্তবিকই মুড়ি-মিছরী সব এক দর হইয়া যায়। এ কথা সর্ববাদিসম্মত যে, শিক্ষা সভ্যতা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা মানুষের রুচি ও বোধশক্তি উন্নত ও মার্জিত হয়, সাধারণ লোক যাহা বুঝিতে না পারে বা তাহার নিকট যাহা ভাল না লাগে, কোন শিক্ষিত লোকের নিকট তাহা সহজবোধ্য ও আনন্দদায়ক হইতে পারে। একজন অশিক্ষিত স্থূলরুচিবিশিষ্ট গ্রাম্য লোক একজন সুশিক্ষিত মার্জিত রুচি-সম্পন্ন ভদ্রলোকের সহিত কোন উন্নত ভাবকে সমভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে, এরূপ আশা করা নিতান্তই অসঙ্গত। প্রকৃতির গূঢ় মর্ম শিক্ষিত ও উন্নতমনা ব্যক্তির নিকটেই সমধিক বোধগম্য, কোন নিরক্ষর অজ্ঞ লোকের নিকট নয়। কাজেই দেখা যাইতেছে, সর্বসাধারণের বোধগম্য করিয়া আর্ট রচনা করিতে গেলে আর্টকে অনেকখানি নীচে নামিয়া আসিতে হয়; উন্নত ভাব ও সৌন্দর্যানুভূতিকে আশ্রয় করিয়া আর কোন আর্ট রচনা সম্ভবপর হয় না।

কিন্তু অন্য দিকেও বলিবার যথেষ্ট আছে। আজকাল এক শ্রেণীর তথাকথিত আর্টিষ্টের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারা, আর্টের নামে তাঁহাদের ভাবকে এমন ঘোরালো-পেঁচালো

www.pathagar.com

করিয়া প্রকাশ করা আরম্ভ করিয়াছেন যে, সাধারণ লোকে ত তার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝিতেই পারে না। মেটারলিঙ্ক, ডারলেন প্রভৃতি ফরাসী কবিগণ হেঁয়ালি সৃষ্টির উদ্দেশ্য লইয়াই কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এখনো অনেক ফরাসী কবির মত এই যে, কবিতার একটা না একটা কিছু হেঁয়ালি বিদ্যমান থাকা চাই-ই, নতুবা উহা কবিতাই হইবে না। সম্ভবতঃ এই মনোভাব লক্ষ্য করিয়াই টলষ্টয় উপরোক্ত মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আর্টের নামে ভাবহীন রচনা বা প্রাণহীন দেহ যে উচ্চ মূল্যে বিকাইয়া যাইবে, ইহাও ত ঠিক নয়।

এখন এ সমস্যার সমাধান হইবে কিরূপে? আর্টকে সহজবোধ্য করিতে গেলেও অনেক উন্নত ভাব আর্টে ধরা পড়ে না, আবার উন্নত ভাবের সমাবেশ করিতে গেলেও অনেক স্থলে ভাবহীন হেঁয়ালির সৃষ্টি হইয়া পড়ে। কোন্ পথ অবলম্বনীয়?

আমার মতে দুই-এর কোনটাকেই একক ভাবে গ্রহণ করা সমীচীন হইবে না। আর্টিষ্টকে দুই কূলই রক্ষা করিতে হইবে। মার্জিত রুচি-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য যেমন উন্নত ভাবের আর্ট চাই, সাধারণের জন্যও সেইরূপ সহজবোধ্য আর্ট চাই। সাধারণের উৎপন্ন দ্রব্যে যেমন কবি, সাহিত্যিক আর্টিষ্ট ও বড় লোকদের অধিকার আছে, সাহিত্যিক ও আর্টিষ্টদের উৎপন্ন দ্রব্যেও সাধারণের তেমনই একটা দাবী আছে। এই গণতন্ত্রের যুগে সাহিত্যে ও ললিত কলায় পূর্বের আভিজাত্য রক্ষা করিতে গেলে চলিবে না। সকলেরই ন্যায্য দাবী বুঝিয়া দিতে হইবে। শিল্পীদের শ্রেণী বিভাগের তাই প্রয়োজন আছে।

আর্টের খাতিরে আর্ট

"Art for art's sake" এই কথাটি প্রায়ই যার-তার মুখে শুনা যায়। আর্টে নীতির প্রশ্ন উঠিলেই অনেকে এই একটি কথার দ্বারা নীতিবাদীর মুখ বন্ধ করিয়া দেন। যেন এ কথাটা কেহই জানে না, একমাত্র তিনিই ইহার মর্ম বুঝেন। কিন্তু এত আদরের এই বাঁধা বুলিটার অর্থ যে কি, তাহা যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে অনেকেরই কিন্তু চক্ষুস্থির হইয়া পড়িবে! "আর্টের খাতিরে আর্ট" এ কথাটা কোথা হইতে আসিল এবং ইহার তাৎপর্যই বা কি? ইহা দ্বারা আনন্দমূলক আর্টিবাদী কী যে বুঝেন, বুঝি না। আর্টকে আর্টের মত করিয়াই সেবা করিতে হইবে, নীতি ধর্ম্ম, সমাজ বা অন্য কোন কিছুর সহিত জড়িত করিয়া দেখিতে হইবে না, ইহাই যদি ইহার অর্থ হয়, তবে এ কথার ভিতর নূতনত্ব কী রহিল? আর নূতন যুক্তিই বা এমন কি দেখান হইল যার জন্য নীতি বা মঙ্গলের প্রবেশ একদম নিষিদ্ধ হইয়া গেল? "খাওয়ার খাতিরে খাও", ধর্মের খাতিরে ধর্ম্ম কর," "কর্ত্তব্যের খাতিরে কর্ত্তব্য কর" ইত্যাদি কথার যাহাই অর্থ হউক না কেন, ইহাদের উদ্দেশ্যের কথা ত কিছুতেই ধুইয়া মুছিয়া যায় না। তুমি খাও, কেন খাও?– খাবার খাতিরে খাও। এর কি কোন একটা সঙ্গত অর্থ হয়? খাবার খাতিরে যদি খাও, তবে ছাই-ভস্ম গু-গোবর খাও না কেন? তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝা যাইতেছে, খাবার খাতিরে খাইলেও তোমার অন্তরে একটা কিছু উদ্দেশ্য লুক্কায়িত আছে। সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার পক্ষে যেসব জিনিষ উপযোগী, তাহাই তুমি খাও, আর সেগুলি উপযোগী নয়, তাহা খাও না। সেইরূপ "কর্ত্তব্যের খাতিরে কর্ত্তব্য" করিলেও তার একটা উদ্দেশ্য ত থাকিবেই। আর কিছু না থাকুক, অন্ততঃ কর্ত্তব্যের খাতিরে কর্ত্তব্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়ার

www.pathagar.com

যে আনন্দ, তার উপভোগটুকুও ত একটা উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য বিহীন কোন কাজ জগতে আছে কি? বাতুল যাহারা, একমাত্র তাদের কাজই উদ্দেশ্যহীন। কাজেই উদ্দেশ্য যদি থাকিল, তবে তাহার উপর বিচারও চলিবে।

বস্তুতঃ ইহা একটা যুক্তিও নয়, নূতন তথ্যও নয়। সংসারের সমস্ত সম্বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া কেহই কোন কাজ করিতে পারে না। পরিপার্শ্বের সহিত যোগ-সম্বন্ধ ভাবেই আনাদিগকে সমস্ত করিতে হয়। আর্টকেও আমরা কোন মতে তার পরিপার্শ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারি না। "লাট সাহেবের বাড়ী" অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে হইলেও পরিপ্রেক্ষণার ভিত্তিতে (perspective view) আনিয়া উহাকে অঙ্কিত করিতে হইবে। অর্থাৎ উহা যে কোথায় অবস্থান করিতেছে, উহার চতুষ্পার্শে গাছ-পালা, বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট কোথায় কি আছে, তাহা দেখাইতে হইবে, নতুবা কিছুই বুঝা যাইবে না! কাজেই দেখা যাইতেছে, আর্টকে উহার পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সেবা করিবার উপায় নাই। সেরূপ করাও যা, মাছকে পানি হইতে পৃথক করিয়া দেখাও তাই। "আর্টের খাতিরে আর্ট" চর্চ্চা করিতে গেলে আর্টের মৃত্যু অনিবার্য।

এই মারাত্মক কথাটি কোথা হইতে আমদানী হইল, তাহার সন্ধান করিতে গেলে আমাদের দাসমনোভাবই মূর্ত্ত হইয়া ধরা দিবে। পশ্চিম হইতে আমদানি করা এই কথাটা কিরূপ নির্বিচারেই না আমরা গ্রহণ করিয়াছি। অর্থ জানি না,তাৎপর্য বুঝি না, কবে কোথায় কিরূপ অর্থে কে ইহা প্রথম বলিয়াছিল তাহার খবর রাখিনা, অথচ হরদম বলিয়া চলি, "Art for art's sake"! "Art for art's sake"!

কথাটার উৎপত্তি কোথা হইতে হইল, তাহা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও নিশ্চিতরূপে স্থির করিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ জার্মান দেশে অষ্টাদশ শতাব্দীতে August Wilhelm Schlegel নামক এক ব্যক্তি এই মতবাদ প্রথম প্রচার করেন। যে যুগে এই কথা প্রচার করা হইয়াছিল, জার্মানির পক্ষে যে যুগ বিশ্লেষণের যুগ। সমস্ত জিনিষকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখাই সে যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল। তা ছাড়া ধর্ম ও নীতির বন্ধনও তখন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই আর্টকে কোন লোক হয় ত বিশ্লেষণের দৃষ্টিতেও দেখিয়া থাকিবে। অথবা নীতিধর্মবর্জিত আনন্দ-মূলক আর্টবাদ (Aesthetic hedonsim) হইতেই এই কথার উদ্ভব হইয়া থাকিবে। ইহা ছাড়া ইহার অন্য কোন ব্যাখ্যা নাই।

পরবর্ত্তী কালে Whistler নামক জনৈক আমেরিকান আর্টিষ্ট "Art for art's sake"—এই নীতি খুব জোরে-শোরে প্রচার করিতে আরম্ব করেন। কিন্তু তিনি কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা একটু জানিলেই তাঁহার মতের কতখানি মূল্য তাহা বুঝা যাইবে। তিনি ছিলেন একজন মাথা-পাগলা লোক। আর্টিষ্ট যাহাই ভাল বুঝিবে তাহাই করিবে এবং সাধারণ লোক ও সমালোচকদিগের আর্ট বুঝিবার কোন ক্ষমতা নাই—ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বিখ্যাত ইংরাজ আর্ট-সমালোচক রাস্কিনের বিরুদ্ধে এক মানহানির মোকদ্দমা দায়ে করেন, কারণ তিনি তাঁহার চিত্রাবলীকে "এক কৌটা রং সাধারণের মুখের উপর ছুঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে" (a pot of paint flung on the public face), এই বলিয়া সমালোচনা করিয়াছিলেন। বিচারে তিনি রাস্কিনের বিরুদ্ধে এক ফার্দ্দিং ক্ষতিপূরণ পাইয়াছিলেন! (Vide Encyclopaedia Britanica)

www.pathagar.com

Whistler-এর দেখাদেখি ইংরাজ-লেখক Oscar Wilde-ও "Art for art's sake" নীতি অনুসরণ করিয়া জীবন যাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনিও অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার গৃহ ময়ুরপুচ্ছ, লিলি ফুল প্রভৃতি দিয়া সাজাইয়া রাখিতেন এবং উহাদের মত করিয়া জীবন যাপন করিতে প্রয়াস পাইতেন।

এইরূপ ধরনের লেখক দ্বারাই Art for art's sake" মতবাদ উদ্ভূত হইয়াছিল। উহারই ঢেউ আসিয়া বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়াছে।

আর্টের ভবিষ্যৎ

আর্টের এই বিকৃত রূপ বেশীদিন থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। ইহার প্রতিক্রিয়া অনিবার্য। যৌন আবেদন লইয়া আর্ট রচনা করিলে সে আর কতদিন মানুষের তৃপ্তিসাধন করিতে পারিবে? উহা একঘেঁয়ে না হইয়াই পারিবে না। নব নব ভাব (fresh feeling) না দিতে পারিলে সে আর্ট মানুষকে বেশী দিন আনন্দ দান করিতে পারে না। তা ছাড়া মানুষ তাহার জীবনে শুধু যৌন সম্বন্ধকেই বড় করিয়া দেখে নাই। যৌন সম্বন্ধ ছাড়া তাহার আরও মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। তাই শুধু যৌন ক্ষুধার খোরাক দ্বারা তাহার আত্মা বাঁচিতে পারে না, আরও কোন উন্নত খোরাক তাহার চাই। আর্টের মধ্য দিয়া সেই খোরাক তাহাকে দিতে হইবে। আর্টে ভাল মন্দ—দুই-ই যুগে যুগে ছিল, আছে এবং থাকিবে। আলোকের পাশে যেমন অন্ধকার আছে, সত্যের পাশে যেমন মিথ্যা আছে, সৎ অর্টের পাশে তেমনই অসৎ আর্টও থাকিবে। দেহ যতদিন আছে, দেহের ক্ষুধাও ততদিন থাকিবে। ইহা প্রকৃতিরই নিয়ম। এ নিয়ম হাজার চেঁচামেচি করিয়াও কেহ খণ্ডন করিতে পারিবে না। সুতরাং কোন্ আর্ট থাকা উচিত আর কোন্ আর্ট থাকা উচিত নয়, তাহা আমাদের প্রশ্ন নয়; আমাদের প্রশ্ন হইতেছে–কোন্ আর্ট আমাদিগকে গ্রহণ করা উচিত।

উপসংহার

আর্টের নানা দিক ত আমরা দেখিলাম। এখন আমাদের প্রশ্ন এই–কিরূপ আর্ট আমাদের চাই? তদুত্তরে আমি বলিব–আমাদের আর্ট সঙ্কীর্ণ হইবে না। আমরা সত্য সুন্দর এবং মঙ্গল–তিনজনকেই চাই। যে আর্টে এই তিনেরই অনুকরণ থাকিবে, তাহাকেই আমরা শ্রেষ্ঠ আর্ট বলিব। আমাদের মনের ভিতর যখন সত্য সুন্দরও ও মঙ্গলের মৌলিক উপাদান রহিয়াছে, তখন একটাকে ছাড়িয়া একটাকে গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না। সৌন্দর্য এবং আনন্দকে আমরা বয়কট করিতে চাহি না; কিন্তু তাহার সহিত সত্য ও কল্যাণকে সঙ্গে করিয়া আনিতে বলি। খোদাতালার আর্টকে আমরা সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ করিতে চাই। তাঁহার আর্টে আমরা যেমন সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল–তিনেরই সমাবেশ দেখি, আমাদের আর্টেও সেইরূপ সত, সুন্দর ও মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই। তাঁহার আর্টের সঞ্চার হয়, সসীমের মধ্যে অসীমের অনুভূতি লাভ করি, আমাদের আর্টেও সেই সত্য, সুন্দর ও আনন্দের স্পর্শ আমরা চাই।

মাসিক মোহাম্মদী

১৯২৬

www.pathagar.com

মুসলিম সাহিত্যের গতি ও লক্ষ্য

বাংলা সাহিত্যের বর্তমান ভাবধারায় মুসলমানের জাতীয় সত্তা যে সম্যক রূপে পরিস্ফুট হইতে পরিতেছেনা, তাহার জন্য যে স্বতন্ত্র সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজন ঘটিয়াছে, এ কথা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এ সম্বন্ধে অনুভূতি যাহাদের খুবই তীব্র, এমন অনেক মুসলমান ইতিমধ্যেই পাক্কা 'মোছলমান' বনিয়া গিয়াছেন। দোষ-গুণের বিচার না করিয়া এ কথা অনায়াসেই বলা যায় যে আত্মোপলব্ধি ও আত্ম-প্রতিষ্ঠারই ইহা শুভ লক্ষণ।

বাংলা ভাষা প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের হস্তেই লালিত ও পালিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় মুসলমানদের গাফলাতির ফলে তার তালিম কিন্তু পুরাদস্তুর মুসলিম জনোচিত হয় নাই। পুঁথি-সাহিত্যের প্রতি লক্ষ করিলেই বুঝা যায় তার ধারা ও আদর্শে কিছুটা ত্রুটি ঘটিয়াছিল। নিজেদের শৈথিল্য, অক্ষমতা ও অদূরদর্শিতার ফলে এ ভাষা কালে কালে তাহাদের হাত ছাড়া হইয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই কতিপয় হিন্দু পাদ্রী ও হিন্দু পণ্ডিতের মিলিত চেষ্টায় বাংলা ভাষার রূপ পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। এতদিন বাংলা ভাষা ছিল আরবী ফারসী শব্দ মিশ্রিত হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ ভাষা; কিন্তু এখন হইতে হিন্দু পণ্ডিতেরা আরবী ফারসী শব্দ বর্জন করিয়া ইহাকে সংস্কৃত মুখীন করিয়া তুলিলেন; ফলে মুসলমানদিগের বাংলা জবান কোন-ঠাসা হইয়া গেল। রাজ অনুগ্রহে পুষ্ট হইয়া হিন্দু বাংলা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল' মুসলিম বাংলা ধীরে ধীরে স্তিমিত হইয়া অবজ্ঞার অন্ধকারে মুখ লুকাইল।

এক শতাব্দী পরে মুসলমানদের আবার চৈতন্যোদয় হইতেছে; বাংলা ভাষাকে তাহারা আবার আপনার করিয়া লইবার সাধনায় মগ্ন হইয়াছে।

কিন্তু পরিবর্তিত পরিবেশে অনেকগুলি নূতন সমস্যা আসিয়া দেখা দিয়াছে। জাতীয় সাহিত্য চাই—শুধু এই কথাই আমরা বলিতেছি, কিন্তু সে সাহিত্যের আকৃতি ও প্রকৃতি কিরূপ হইবে, তাহার লক্ষ্য ও আদর্শ কী হইবে, সে সম্বন্ধে কোন কথাই আমরা বলিতেছি না। কেহ কেহ বলিতেছেন পূর্বের সেই পুঁথি সাহিত্যেই আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে; কেহ বলিতেছেন পণ্ডিতী বাংলার মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় অরবী ফারসী শব্দ ঢুকাইয়া ইসলামী ভাব-ধারার প্রবর্তন করিতে হইবে; কেহ বলিতেছেন আরবী বর্ণমালা দিয়াই বাংলা ভাষা লিখিতে হইবে। অনুলিখন প্রণালী (transliteration) লইয়াও কেহ কেহ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এই সমস্ত সমস্যা একেবারে উপেক্ষনীয় না হইলেও আসল প্রশ্ন এ নয়। জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইলে তার অর্থ কি, উদ্দেশ্য কি এবং লক্ষ্য কি হইবে সেই বিষয়ে সর্বাগ্রে আমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে। নতুবা রাশি রাশি আরবী ফারসী শব্দ ঢুকাইলেও, অথবা 'স'-কে 'ছ' দিয়া লিখিলেও জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে না। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে আমাদিগকে তাই প্রথমেই কী হইবে?

সে লক্ষ্য সে আদর্শ তবে কী হইবে?

এক কথায় বলিতে চাই–অতীত যুগের মুসলিম জ্ঞান-কর্ষণার আদর্শ ও লক্ষ্য যাহা ছিল, আমাদিগকেও সেই আদর্শ ও লক্ষ্যের অনুসরণ করিতে হইবে।

কথাটা হয়ত অস্পষ্ট হইয়া গেল। মুসলিম কালচারের প্রকৃতি ও লক্ষ্য কী ছিল তাহা যতক্ষণ পর্যন্ত না জানিতে পারিতেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এ বিষয়ে কোনই পরিচ্ছন্ন ধারণা জন্মিবেনা।

www.pathagar.com

মুসলিম কালচার

মুসলিম কালচার অর্থে আমরা সেমিটিক কালচারকেই বুঝি। এই কালচারের বৈশিষ্ট্য হইল ধর্ম ও কর্ম, দীন ও দুনিয়ার সমন্বয়। দেহকেও সে মানে, আত্মাকেও মানে। এই সমন্বয়ী মনোভাবই ইসলামের বৈশিষ্ট্য। মুসলিম বা ইসলামী কালচারের প্রকৃতি তাই একপ্রান্তিক নহে; ইহা উদার ও মিলনধর্মী। এর মধ্যে কোন সংকীর্ণতা নাই। স্বয়ং রসুলুল্লাই বলিয়াছেন ঃ 'জ্ঞান-সাধনার জন্য প্রয়োজন হইলে সুদূর চীনদেশ পর্যন্তও যাও।' হজরত আলী রসুলুল্লার জীবদ্দশাতেই আপন প্রাণে সে বাণীর বাস্তব রূপ দান করিলেন। নিজে ত নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিলেনই, অপর সকলকেও জ্ঞান সংগ্রহের জন্য প্রকাশ্যভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে রসুলুল্লাহ জীবদ্দশাতেই মদিনা নগরে মুসলমান জাতির বিরাট জ্ঞানকর্ষণার সূত্রপাত হইল।

হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পর বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া আরবগণ যখন দ্বি-গ্বজয়ে বাহির হইল, তখন তাহাদের লক্ষ্য শুধু দেশ-বিজয়ই ছিল না, জ্ঞান-আহরণও ছিল তাহাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। জ্ঞানের দিক দিয়া দেখিতে গেলে তৎকালে জগতের অবস্থা যে নিতান্তই শোচনীয় ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সমগ্র জগৎ তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। গ্রীস, রোম, মিসর, ও ভারতের প্রাচীন জ্ঞান-শিখা তখন নির্বাপিত প্রায়। একমাত্র সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়াতেই প্রাচীন গ্রীসের সেই গৌরবোজ্জ্বল জ্ঞান-প্রদীপ তখনও মিটি মিটি জ্বলিতেছিল। বহু গ্রীক গ্রন্থাবলী সিরীয় ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল এবং তাহাদের ভিতর দিয়াই গ্রীসের জ্ঞানালোক এশিয়া খণ্ডে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

জ্ঞান-আহরণে বহির্গত হইয়াই গ্রীকজাতির এই প্রাচীন জ্ঞান-ভাণ্ডারের সহিত আরবদিগের প্রথম সাক্ষাত ঘটিল। সিরিয়া মেসোপটেমিয়া ও পারস্য বিজয়ের পর উম্মাইদ খালিফাগণের সময়ে রাজধানী যখন মদিনা হইতে দামেস্ক নগরে স্থানান্তরিত হইল, তখন এইখানে সিরিয়ান পারসিক প্রভৃতি জাতির সঙ্গে তাহাদের পরস্পর পরিচয় হইতে লাগিল। এই সংস্পর্শের ফলেই মুসলমানগণ গ্রীক দর্শন-বিজ্ঞান আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু উম্মাইদ খলিফাগণ প্রতিনিয়ত যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকায়, তাঁহারা জ্ঞানানুশীলনের প্রতি বড় একটা মনোযোগ দিতে পারিলেন না। কাজেই মুসলমানদিগের নব-জাগ্রত জ্ঞান-পিপাসা তথায় তৃপ্ত হইলনা। তাহাদের পিপাসা ও ব্যাকুলতা আরও বাড়িয়া গেল।

অতঃপর আব্বাসীয় খলিফাগণের সময়ে যখন বাগদাদের রাজধানী স্থাপিত হইল, তখন হইতেই মুসলমানদিগের প্রকৃত জ্ঞান-সাধনা আরম্ভ হইল। মহামতি খলিফা মনসুরের আদেশক্রমে এরিষ্টটল্, টলেমী, ইউক্লিড প্রভৃতি গ্রীক পণ্ডিতদিগের দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী আরবী ভাষায় প্রথম অনুবাদ করা হইল। শুধু গ্রীক নহে, ভারতীয় এবং পারসিক জ্ঞান-ভাণ্ডারও উন্মুক্ত করা হইল। তাহাদের মধ্যে সেখানে যতটুকু গ্রহণযোগ্য ছিল, সমস্তই গ্রহণ করা হইল। ষষ্ঠ খলিফা আল্-মামুনের খেলাফত কালে মুসলমানদিগের এই জ্ঞান সাধনা চরমোৎকর্ষ লাভ করিল। বিশ্বের তৎকালীন সমস্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার মুসলমানদিগের করতলগত হইল। দর্শন, বিজ্ঞান, রসায়ন, জোতিষ, খগোল,

www.pathagar.com

ভূগোল, গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, চিকিৎসাশাস্ত্র, ইতিহাস, কাব্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা প্রভৃতি নানা বিষয়ক জ্ঞানানুশীলনে তাঁহারা প্রবৃত্ত হইলেন। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা—সর্বত্রই যখন গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, সেই সময়ে একমাত্র মুসলমানগণই এইরূপে জ্ঞান-শিখা জ্বালাইয়া অন্ধকারের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিলেন।

শুধু যে বাগদাদেই মুসলমানদিগের এই জ্ঞান-চর্চ্চা সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। কায়রো, মরক্কো, কর্ডোভা, গ্রানাডা, সিভিলি, টলেডো প্রভৃতি স্থানেও মুসলমানদিগের বহু জ্ঞানকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল। এইরূপে এশিয়া হইতে আফ্রিকা এবং ইউরোপে সে আলোক ছড়াইয়া পড়িল। ইউরোপের খৃষ্টানগণ নানা দেশ হইতে আসিয়া স্পেনীয় মূরদিগের পাদমূলে বসিয়া জ্ঞান শিক্ষা করিতে লাগিল এবং স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া স্বজাতীয়দিগের মধ্যে উহা প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। ইউরোপীয় সভ্যতার এইখানেই সূচনা।

মৌলিক দানের জন্যও মুসলমান জাতি জগতে বড় হইয়া আছে। প্রত্যেক নূতন সৃষ্টির অর্থই হইতেছে সর্বাগ্রে পুরাতনের সন্ধান লওয়া। কি আছে এবং কি নাই, ইহা না জানিয়াই যাহারা নূতন সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সৃষ্টি সব সময়ে সার্থক হয়না। কাজেই মুসলমানগণ সর্বপ্রথম পুরাতনের সন্ধান লইয়াছিল। তাহা ছাড়া বিশ্ব-মানুষের উন্নতি ও সভ্যতার এরূপ কোন জাতি-বিচার করাও চলেনা। হাজার যুগের হাজার ধারার পরস্পর মিলন ও সংঘর্ষে মানুষের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। দেশ, কাল বা জাতিভেদে কোন সভ্যতাই এককভাবে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। কাজেই মুসলমানগণ কাহার নিকট হইতে কি ধার লইয়াছেন, সে বিচার করিতে গিয়া তাহার বিরাট দানকে অস্বীকার বা খাটো করিবার প্রবৃত্তি আদৌ প্রশংসনীয় নহে। মুসলমানগণ যদি মৌলিক কিছু দান নাও করিতেন, তবুও মাত্র প্রাচীন জ্ঞান-সভ্যতাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য এবং বর্তমান সভ্যতার সহিত তাহার ধারাবাহিকতা (Continuity) রক্ষা করিবার জন্যও জগৎ তাহাদের নিকট চিরঋণী হইয়া থাকিত।

মুসলমানদিগের মৌলিক দান সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বর্তমান জগতের বড় বড় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক মতবাদগুলি প্রধানতঃ মুসলমানদিগের নিকট হইতেই ধার-করা। নিউটন, গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস, কেপ্লার ডেকার্ট, লক, ডারউইন, কলম্বস, ভল্টেয়ার প্রভৃতি জ্ঞান-জগতের যুগ-প্রবর্ত্তক আবিষ্কারকগণ সকলেই মুসলমানদিগের নিকট ঋণী। বস্তুতঃ মডার্ণ ইউরোপের জন্মদাতাই মুসলমান। ইউরোপের ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৪৫২) ইউরোপে এক বিরাট নব জাগরণ সংঘটিত হয়। ইহাকে (Renaissanoce' বলে। এই Renaissance. এর সঙ্গে সঙ্গেই Modern Europe-এর আরম্ভ। কিন্তু এই জাগরণ সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদিগেরই দীর্ঘ সাত শত বৎসরের জ্ঞান-চর্চ্চার অমৃতময় ফল। ইউরোপকে জাগাইবার জন্য এত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইত না—যদি ইউরোপ সোজাসুজি ইসলামের এই বিপুল জ্ঞানালোকের সংস্পর্শে আসিতে পারিত। আরবগণের দক্ষিণ ফ্রান্স আক্রমণ যদি ব্যর্থ না হইত, তবে এই পথ দিয়াই ইসলাম তাহার আলোক

www.pathagar.com

বর্তিকা হস্তে ইউরোপের অন্তর্দেশে গিয়া পৌঁছিতে পারিত, আর তাহা হইলে সাতশত বৎসর পূর্বেই আমরা ইউরোপের এই নব-জাগরণ দেখিতে পাইতাম। মিঃ আমির আলি ঠিকই বলিয়াছেন ঃ-

"Had the Arabs been less keen for the safety of their sopils, less divided among themselves, had they succeeded in driving before them the barbarian hosts of Charles Martel, the history of the darkest period in the annals of the world would never have been written. The Renaissance, civilization, the growth of intellectual liberty would have been accelerated by seven hundred years." —The Spirit of Islam

বর্তমান সভ্য জগৎ মুসলমানদিগের নিকট যে কতখানি ঋণী, নিম্নের উদ্ধৃতি সমূহ হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে ঃ-

"After a chequered career in the east, it (Hellenic culture) passed over to the western Muslim community in Spain, where it had a very specialised development, which finally made a deeper impression on Christian and Jewish thought than on that of the Muslims themselves and attained its final evloution in North East Italy, where, as an antiecclesiastical influene, it prepared the way for the Renaissance."

–Arabic thought and its place in History–by O' Leary.

"The real home of Averroism was the University of Bologna with its sister University of Padua and from these two centres an Averroistic influence spread over all North East Italy, including Venice and Ferrara, and so continued until the 17th century" —O. Leary

The adoption of the sign 'zero' (Arabic zifr) was a step of the highest importance. —Arab Civilization–by J. Hell,

"About the year 820 A.D. the mathematician Alkharrizmi wrote a text book of Algebra in examples and this elementary treatise—translated into Latin–was used by western scholars down to the sixteenth century"

Arab Civilization by J. Hell.

"In the domain of Trignometry the theory of sine, consine and tangent is an heirloom of the Arabs. The brilliant epochs of Peurbach of Regeomontanus, of Copurnicus cannot be recalled without reminding us of the fundamental and preparatory labours of the Arab mathematicians." —J. Hell.

www.pathagar.com

"Two of the oldest Muslim astronomers Al-Faragni and Al-Battani (d.929) were the preceptors of Europe" —J. Hell

"Up to the sixteenth century the ninth volume of the works of Razi (Latin Rases) and the canon of Avicina constituted the basis of lectures on Medicine in the Universities of Europe." –J. Hell

অধিক উদ্ধৃত করা বাহুল্য মাত্র। আশা করি, ইহা হইতেই বুঝা যাইবে বর্তমান বিশ্ব-সভ্যতায় মুসলমানদিগের দান কতখানি।

এতক্ষণ যে মুসলমানদিগের জ্ঞান-চর্চার ধারাবাহিক ইতিহাসের একটা মোটামুটি বিবরণ দিলাম, ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে–বর্তমান সভ্যতার সহিত অতীত যুগের মুসলিম সভ্যতার যোগসূত্র প্রদর্শন করা এবং মুসলিম জ্ঞান-সাধনার সার্থকতা প্রতিপন্ন করা।

কিন্তু আমার আসল কথাটি এখনও বলা হয় নাই। মুসলমানদিগের এই যে বিরাট জ্ঞান-সাধনা, যাহার ফলে আজ সমগ্র জগৎ আলোকিত, ইহার প্রকৃতি ও লক্ষ্য কী ছিল? কোন্ আদর্শে তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন? .

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায়—অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় জ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রেও মুসলমানগণ ইসলামের চিরন্তন আদর্শকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। 'দীন' এবং 'দুনিয়া'–দুইটিই যে আমাদের কাম্য,–একটাকে ছাড়িয়া একটাকে অবলম্বন করা যে ন্যায়সঙ্গত নহে,–কোরআন হাদিসের এই শিক্ষাই মুসলমানদিগের সমগ্র জ্ঞান-সাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। সাহিত্য যেমন জাতীয় জীবন-গঠনের উপাদান, তেমনই আবার ইহা জাতীয় জীবনেরই–প্রতীক। জাতির ধর্ম্ম, জীবনাদর্শ, সামাজিক রীতিনীতি ও বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করিয়াই সাহিত্য গড়িয়া উঠে। সুতরাং মুসলমানের জ্ঞান-সাধনাও তাহাদের জাতীয় আদর্শের পথ ধরিয়াই যে চলিয়াছিল, এসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন অবকাশ নেই। কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।

জ্ঞান-আবিষ্কারে বহির্গত হইয়া মুসলমানগণ জগতের সমস্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার তন্ন তন্ন করিয়া ফিরিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু গ্রীক বা Hellenic culture-কেই তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞান-সৌধের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারত এবং পারস্য হইতেও তাঁহারা কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা সেরূপ উল্লেখযোগ্য নয়। ভারতীয় গণিতশাস্ত্র হইতে তাঁহারা দশমিক বিন্দু প্রথা (decimal system) জোতির্বিদ্যার কিয়দংশ, হিতোপদেশের গল্প এবং এই শ্রেণীর আরও কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন। পারস্য হইতে কাব্য, শিল্প, সুফীবাদ ও আরও কিছু তমদ্দুনিক উপকরণ ধার লইয়াছিলেন। কিন্তু এই দুই দেশের কোন সভ্যতাই মুসলমানদিগের জ্ঞান-সাধানার উপর সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, কোনটিকেই তাঁহারা আদর্শরূপে গ্রহণ করে নাই। পক্ষান্তরে পারস্য সভ্যতা মুসলমানদিগের যাদু-স্পর্শে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়া নিজের স্বকীয়তা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। ভারতীয় সভ্যতা হইতেও ইসলাম বিশেষ কিছুই প্রেরণা

www.pathagar.com

লাভ করে নাই, ইহা অতি সত্য কথা। ভারতীয় ষড়দর্শন, বেদ, পুরাণ, রামায়ণ মহাভারত—ইহাদের কোন বিশেষ প্রভাবই মুসলিম কালচারের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একমাত্র গ্রীক কালচারই মুসলমানদিগের মনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

কিন্তু একটি বিশেষ লক্ষ করিবার বিষয় এই যে, ভারতী, পারসিক এবং গ্রীক কালাচারের নিকট মুসলমানগণ অল্প-বিস্তর ঋণী হইলেও এবং এই তিন বিজাতীয় আদর্শের মুকাবেলায় দীর্ঘ সাতশত বৎসর ধরিয়া জ্ঞান সাধনা করিলেও তাহারা কিন্তু ইসলাম-বিরোধী কোন আদর্শ বা ভাবধারাকেই গ্রহণ করে নাই। দর্শন বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য যেখান হইতেই যে উপকরণ সংগ্রহ্ করুক না কেন, প্রত্যেকটিকেই তাহারা রূপান্তরিত করিয়া ইসলামী বেশে নূতনভাবে জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে। ভারত ও পারস্যের কথা ত ধর্তব্যের মধ্যেই নহে; যে গীক বা Hellenic culture-কে তাহারা তাহাদের জ্ঞান-সৌধের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার ভিতরেও যাহা কিছু অনৈসলামিক, সমস্তই তাঁহারা সতর্কতার সহিত বর্জন করিয়া চলিয়াছিল। গ্রকি দর্শন-বিজ্ঞান এত আলোচনা করিলেও গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী (Greek mythology) কিন্তু মুসলমানগণ কোনও দিনই গ্রহণ করে নাই। এ সম্বন্ধে Draper তাঁহার সুবিখ্যাত "History of the Intellectual Development of Europe" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ

"The Arabs never translated into their own tongue the great Greek poets, though they so sedulously collected and translated the Greek philosophers. Their religious sentiments and sedate character caused them to abominate the lewdness of our classical mythology and to denounce indignantly any connection between the licentious, impure Olympean Jove and the Most High God as unsufferable and unpardonable blasphemy."

বলা বাহুল্য এই কারণেই ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীও মুসলমানগণ সর্বত্র বর্জন করিয়াছেন। তা ছাড়া পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় সভ্যতার আদর্শের সহিত ইসলামের বহু ক্ষেত্রে মিল থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রে আবার বিরোধও রহিয়াছে। পৌত্তলিকতা, অবতারবাদ, পুনর্জন্মবাদ, জাতিভেদ, গোঁড়ামি, কুসংস্কার, সংসার-বিমুখতা, বা বৈরাগ্য-ইত্যাদি ভারতীয় সভ্যতার বিশেষত্ব। গ্রীক সভ্যতার বিশেষত্ব কিন্তু তাহা নহে। জীবনকে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করাই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। Aristotle-এর কথায় বলিতে গেলে ঃ "To live happily and beautifully" অর্থাৎ সুখে এবং সুন্দরভাবে জীবন-যাপন করাই তাহাদের শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শ। এই আদর্শের সহিত মুসলিম আদর্শের মূলতঃ কোন বিরোধ ত নাই-ই, বরং চমৎকার সাদৃশ্য আছে। বলা বহুল্য এই সব কারণেই মুসলমানগণ গ্রীক কালচারের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে এখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মুসলমানদের হস্তে যে বিচিত্র জ্ঞান-সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা হেলেনিক কাল্‌চার ও সেমেটিক কালচার

www.pathagar.com

এই দুই-এর পরস্পর সংমিশ্রণ। কর্মজীবনের জন্য মুসলমানগণ নানা বিষয়ে গ্রীকদিগের নিকট হইতে জ্ঞান-সংগ্রহ করিয়াছিল, কিন্তু ধর্মজীবনের জন্য তাঁহারা জগতের কাহারও নিকট ঋণী নহে। একমাত্র কোরান-হাদিস হইতেই তাঁহারা প্রেরণা লাভ করিয়াছিল। হেলেনিক কাল্‌চারের বৈজ্ঞানিক ভাব (scientific spirit) এবং Semitic culture এর ধর্মভাব (religious spirit) মুসলমানদিগের হস্তে চমৎকার মিশিয়া গিয়াছিল; দীন্‌ এবং দুনিয়ার অদ্ভুত সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। মুসলিম কালচারের ইহাই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য।

উপসংহার

অতীত যুগের মুসলিম জ্ঞান-কর্ষণার যে আদর্শ ও যে লক্ষ্য ছিল, আমাদিগকেও সেই আদর্শে ও সেই লক্ষ্যে চলিতে হইবে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের দুইটি দিক থাকিবে, একদিকে দীন, অন্য দিকে দুনিয়া। অন্য কথায় আমাদের সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক ভাব এবং ধর্মভাব-দুই-ই থাকিবে; আত্মাও থাকিবে দেহও থাকিবে—এবং এই দু-এর সমন্বয়ে একটা পরিপূর্ণ জীবন্ত সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে। এইরূপে আমাদের জাতীয় জীবন-দর্শনের সঙ্গে আমাদের জাতীয় সাহিত্য একসুরে বাঁধা হইবে। আমাদের লক্ষ্য অনেক উচ্চে। এবার আর Hellenic culture নয়, এবার World culture বা জগতের সমগ্র জ্ঞান-সাধনার উপরে আমাদের হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। যেখানে যেটুকু বিকৃতি ও বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, তাহাই আমাদিগকে পূরণ করিতে হইবে। ঠিক প্রাচীন যুগের হেলেনিক কালচারের ন্যায় বর্তমান যুগের বিশ্ব-কালচারও নিতান্ত Godless বা ধর্মভাবশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এই ত্রুটি সংশোধনের কাজ হইবে ইসলামের। বিশ্ব সভ্যতার সহিত আবার আমাদের কালচারের সংযোগ-সাধন করিতে হইবে। এই সংযোগের ফল গতবারের অপেক্ষা এবার আরও ব্যাপক ও মধুর হইবে। সমগ্র জগৎ সে দান হাসি মুখেই গ্রহণ করিবে। সংস্কার, সংরক্ষণ, সমন্বয় ও সংযোজন—এই কয়টিই হইল মুসলিম কালচারের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি থাকিবে।

মাসিক মোহাম্মদী

১৯২৭

www.pathagar.com

দার্জিলিং—ভ্রমণ

কলিকাতা হইতে রাত্রি দশটায় 'নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে' দার্জিলিং ভ্রমণ উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। বহুক্ষণ জাগিয়া ছিলাম; তারপর কখন এক দুর্বল মুহূর্তে ঘুমাইয়া পড়িলাম। সে ঘুম যখন ভাঙিল, তখন দেখি ট্রেন আসিয়া 'ঈশ্বরদি' ষ্টেশনে থামিয়াছে।

কোন খানে যে সূর্যোদয় হইল, মনে নাই। একটু বেলা হইলে মাঠের মধ্যে ও ঘরের কোণে কৃষক নরনারীদের দেখিতে পাইলাম। তাহাদের অদ্ভুত বেশভূষা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। পুরুষদের পরনে নেংটি, আর মেয়েদের পরণে দেশী তাঁতের একখানি মাত্র মোটা শাড়ী। তাহাদের এই দৈন্যের মধ্যেও এক নূতন সৌন্দর্য দেখিলাম। মনে হইল, ইহাদের বেশ-ভূষা খুব স্বাভাবিকই হইয়াছে। কচি ধান ও পাটের কারুকার্য-করা শ্যামল আঁচল-দোলানো দিগন্তবিস্তৃত মাঠ; সর্বত্র মাটির মায়ের শ্যামল স্নেহে আচ্ছন্ন, কোথাও কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই; এ হেন মাঠের মধ্যে বিলাসব্যসনানুরক্ত সভ্যতাভিমানী কৃত্রিম নরনারীর অবস্থান কি নিতান্তই অস্বভাবিক ও অশোভন হইত না? মাটির বুকের শ্যামল স্নেহ ভোগ করিবার যোগ্য বেশভূষাই উহাদের।

উভয় পার্শ্বের শোভা দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় শিলিগুড়ি পৌঁছিলাম।

শিলিগুড়ির হইতে যখন দার্জিলিং-এর গাড়ীতে উঠিলাম, তখন হইতেই মন আমার বাহিরের রূপ ও আনন্দ গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। প্রকৃতি আমার চোখের সামনে সে অপরূপ গ্রন্থ খুলিয়া ধরিল, তাহা পড়িবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল।

দুই-তিনটি ষ্টেশন অতিক্রম করিতেই প্রকৃত পাহাড়-অঞ্চল আরম্ভ হইল। তখন বুঝা গেল, গাড়ী ক্রমশঃই উর্ধ্বদিকে উঠিতেছে। দুই পার্শ্বে গভীর নিস্তব্ধ অরণ্য; তাহার মধ্যে শাল, শিশু ও অন্যান্য প্রকাণ্ড বৃক্ষসমূহ সগর্বে দণ্ডায়মান। মাঝখান দিয়া পাহাড় কাটিয়া রেলপথ বসান।

এই রেলপথটি এক অতি আশ্চর্য কীর্তি। পাহাড়ের ধার দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া কি সুন্দর ভাবেই না রেল-লাইন চলিয়া গিয়াছে! স্থানে স্থানে লাইন পাহাড়ের এত কিনারায় স্থাপিত যে, গাড়ি হইতে নীচের দিকে তাকাইতে ভয় হয়। কি গভীর খাত! পাতাল-পুরীর ধারণা এইখানে যেন মনের মধ্যে দানা বাঁধিয়া উঠে। এইখান দিয়া যাইবার সময় প্রকৃতির কোন দুষ্ট মেয়ে যদি পাশে দাঁড়াইয়া গাড়িখানাকে একটু ধাক্কা দেয়, তবে একটা কী বিরাট কৌতুকই না সেই গভীর অরণ্যের মধ্যে সংঘটিত হইয়া যায়। যাত্রিপূর্ণ গাড়িখানার কী দশা হয় তখন! পতনোন্মুখ নরনারীর মিলিতকণ্ঠে কী করুণ আর্তনাদই না ফুটিয়া উঠে। মনের ভিতর এরূপ দুষ্ট খেয়াল যে না হইতেছিল, এমন নয়। ভাবিতেছিলাম, গাড়িখানা যায় পড়িয়া যাক! সেই সময়ে প্রকৃতির কৌতুক-লীলা আমিও খানিক উপভোগ করিয়া লইব। এতবড় একটা দুর্ঘটনাতেও কি চিরমৌনা প্রকৃতি তাহার স্বভাব ভুলিয়া অজ্ঞাতসারে একটা উচ্চ আর্তনাদ করিয়া উঠিবে না?

www.pathagar.com

গাড়ি যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই মনে হইতে লাগিল, প্রকৃতির গুপ্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছি। পাষাণ-প্রাকারের মধ্যে প্রকৃতির এ কী গম্ভীর সৌন্দর্যের লীলাখেলা। কী মধুর শ্যামলিমা! সত্যই এ যেন প্রকৃতির মর্মর-প্রাসাদ! বাহিরে পাষাণ-প্রাচীর, কিন্তু অন্তঃপুরের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে নব নব সৌন্দর্যের অপূর্ব বিলাস। মাঝে মাঝে ঝরণাগুলি বহু উর্ধ্ব হইতে অবলীলাক্রমে উপল-বীথির উপর দিয়া মর্মর-ধ্বনিতে কী সহজ নৃত্যেই না নিম্নপথে নামিয়া যাইতেছে। যেরূপ বেগে ঝরণা-ধারা নিম্নদিকে ছুটিয়া চলিতেছিল, তাহার চেয়েও দ্রুততর বেগে আমার মন ঐ ঝরণা-পথ বাহিয়া উর্ধ্বদিকে উহার উৎস-মুখে ধাবিত হইতেছিল। কোন গোপন গহনে প্রকৃতির সেই স্নেহ-ধারার উৎসব চলিয়াছে? কোথায় বসিয়া সে এত শোভা আর এত করুণা দিকে দিকে ছড়াইয়া দিতেছে?

সমস্ত পথ মনে হইতেছিল কোন এক জাগ্রত স্বপ্নপুরীর মধ্য দিয়া চলিয়াছি। যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই দেখি সবুজের কাজল-মায়া তরু-পল্লবে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। কোথাও বা শুভ্র মেঘের ঘনিমা, কোথাও বা আলো-ছায়ার লুকোচুরি খেলা! তাহারা কি জীবন্ত স্বপ্ন, না অপর কিছু,-ভাবিয়াই পাই না। যে রহস্যময়ীর রূপের আভাস প্রতিনিয়ত নয়ন-সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার স্বরূপ কিছুতেই যেন ধরিতে পারি না! সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে করি, হয়ত ঐখানে পৌছিলে তাহার দেখা ভাল করিয়া মিলিবে, কিন্তু যখন সেখানে পৌছি, তখন মনে হয়—যেন পিছন দিকে তাহার অনেকটা ছাড়িয়া আসিলাম, আবার সম্মুখে খানিকটা বাড়িয়াও গেল! দৃশ্যের বিশালতার তুলনায় দুই চক্ষুর দৃষ্টি-সংকীর্ণতা যে কত বেশি, তাহা সেইদিন বেশ বুঝা গেল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে দার্জিলিং পৌছিলাম।

পরদিন ভোর বেলা আকাশ খুব পরিষ্কার ছিল। চিরতুষারাবৃত কাঞ্চনজংঘার শিখরে শিখরে অরুণ কিরণ পতিত হওয়ায় কী অলৌকিক দৃশ্যই না ফুটিয়া উঠিল! ঐখানেই কি প্রকৃতির গুপ্ত ভবন? ঐ যে নানা রং-এর বৈচিত্র্য, উহা কি সেই মর্মর-সৌধেরই শিল্প-প্রহেলিকা? কত সুরক্ষিত ঐ ভবন। বৈদেশিক আক্রমণের ভয় নাই; এরোপ্লেন, ডিনামাইট,সবই সেখানে হার মানিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

বার্চ্চা হিল, অবজারভেটরি হিল, জালা পাহাড় ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত ইত্যাদি স্থানসমূহ একে একে বেড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। সবই যেন মায়াপুরীর এক একখানি স্বপ্নচ্ছবি! ঐ যে কাঞ্চনজংঘা, ঐ যে ধবলগিরি, ঐ যে এভারেস্ট, ঐ যে তিব্বত, ঐ যে চীন, ঐ যে নেপাল–সমস্তই যেন এক স্বপ্নের রাজ্য! সন্ধ্যার প্রাক্কালে অস্তমিত সূর্যের ম্লান আভায় যে দৃশ্য ফুটিয়া উঠে, তাহা প্রাণের মধ্যে আনন্দ ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করে। এই সময় অবজারভেটরি হিলের উপর হইতে কাঞ্চনজংঘার দিকে চাহিয়া থাকিলে মনে এক অব্যক্ত ভাবের উদয় হয়। নেপাল এবং সিকিম অঞ্চল হইতে সন্ধ্যাপূজার ঘন্টাধ্বনি অস্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া আসে, আসে, সেই সঙ্গে কোথাও বা নাম-না-জানা বনপাখীর করুণ তান মিশিয়া যায়। প্রকৃতির এই গোধূলিবেলার ম্লান পাণ্ডুর ছবি দেখিলে প্রাণের মধ্যে কিসের যেন গোপন ব্যথা ঘনাইয়া আসে!

www.pathagar.com

দার্জিলিং-এর আবহাওয়ার প্রধান বিশেষত্ব–ইহার কুয়াসা। সব সময়েই কোন না কোন স্থানে ইহার উৎপত্তি হইতেছে। দূর পাহাড়ের বৃক্ষ ও তরুলতার মাথার উপর দিয়া যখন শুভ্র পুঞ্জীভূত কুয়াসা ধীরে ধীরে উত্থিত হইতে থাকে, তখন কি সুন্দরই না দেখায়! মনে হয় যেন প্রকৃতির গুপ্ত অন্তঃপুরে মহা ধুমধামে রান্না চড়িয়াছে; তাহারই ধুম্ররাশি তরুশিরের উপর দিয়া আকাশে উঠিতেছে। আহা, সেই মহাভোজের আনন্দ-উৎসবে যদি আমার দাওয়াৎ আসিত।

অবজারভেটরি হিলের উপরে মহাকাল-মন্দির একটি দর্শনীয় বস্তু। এখানে আসিলে প্রাচীন বৌদ্ধ-যুগের কথা মনে পড়ে। উহার কিঞ্চিৎ নিম্নে একটি সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইলাম। সুড়ঙ্গের মুখ সুস্পষ্টরূপে দেখা যায় বটে, কিন্তু ভিতরে অধিক দূর দৃষ্টি চলে না; ঘন অন্ধকারে সমস্ত পথ সমাচ্ছন্ন। এই সুড়ঙ্গ-পথ কোথায় শেষ হইয়াছে, কেহ বলিতে পারে না। শুনা যায়, একবার এক সাহেব না-কি এই সুড়ঙ্গ-পথ আবিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু আর ফিরিয়া আসেন নাই। মানুষের মৃত্যু-দ্বারাও অবিকল এইরূপ! এপারে জীবনের চঞ্চল নৃত্য, ওপারে ঘন অন্ধকার। সেই পথের যাত্রীদল কোন দিনই ফিরিয়া আসে না; সেই পথের শেষ কোথায়, তাহাও কেহ বলিতে পারে না।

দুই-তিন দিন পরে এক দিন এক বন্ধুর সহিত টাইগার হিলে বেড়াইতে গেলাম। এইখান হইতেই সূর্যোদয়ের অপূর্ব দৃশ্য এবং হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখর এভারেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। টাইগার হিল 'ঘুম' ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে। আমরা 'ঘুম' পর্যন্ত ট্রেনে গিয়া সেখান হইতে ঘোড়া লইলাম। কি ভীষণ জঙ্গলের মধ্য দিয়া সেই পথ! বাঘ ভালুকের ভয় অপেক্ষা জঙ্গলের ভয়ই যে প্রথম আমাকে পাইয়া বসিল। সৌন্দর্যও কি এত ভয়ংকর হয়!

টাইগার হিলে পৌঁছিলাম, কিন্তু পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দিকে কুয়াসা এরূপ নিবিড়ভাবে ঘনীভূত হইয়া আকাশ-পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল যে, মনে হইল যেন সমস্ত প্রকৃতি একটা ধবল অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল! কোথাও আর দৃষ্টি চলিল না,—সমস্ত একাকার। শুধু তাই নয়; মুষলধারে বৃষ্টিও আরম্ভ হইল। কি করি, মনের দুঃখে সেই বৃষ্টির মধ্যেই নিরাশ প্রাণে ফিরিয়া আসিলাম। সেখানকার অবজারভেটরি ঘরটার এক স্থানে লিখিয়া রাখিয়া আসিলাম–

"হায় কুহকী, শুধুই ফাঁকি!
তোমার দেখাই রইল বাকি।"

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা

১৯২৭

www.pathagar.com

কাব্য-সমালোচনা

সমালোচক হওয়া সোজা কথা নয়। এর মত দায়িত্বপূর্ণ কাজ আর নাই বলিলেই চলে। এ কাজের যোগ্যতা অর্জন করিতে হইলে গভীর জ্ঞান, ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন। কবি যাহা লিখিবেন, কবি যাহা আঁকিবেন, সমালোচক আপন প্রাণের মধ্যে সে সব ত আয়ত্ব করিবেনই, তা ছাড়া সে সম্বন্ধে মতামত দিবার উপযোগী আরও বেশি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাহাকে অর্জন করিতে হইবে। কবি যেখান হইতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, যেখান হইতে কথা বলিবেন, সমালোচক তারও উর্ধ্বে উঠিবেন; নতুবা কবির সৃষ্টির স্বরূপ তিনি সম্যকরূপে বুঝিতে পারবেন না। কাব্য-সমালোচনার জন্য তাই কবি-প্রাণের নিতান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় যার তার হাত দিয়া সমালোচনা বাহির হইলে ফল যাহা হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। বস্তুতঃ খুব কম লোকেই সাহিত্য সম্বন্ধে কথা বলিবার যোগ্যতা রাখে। বিখ্যাত ইংরাজ সমালোচক John Moulton ঠিকই বলিয়াছেন—

"One who takes up Physiology or History can hardly escape learning something of these Sciences. But of those who understand themselves to be engaged in the study of literature, I believe that the great majority never reach it, but remain stranded in what are it outskirts."

জ্ঞান এবং যোগ্যতা অর্জন ছাড়াও সমালোচককে ধীর-স্থির এবং পঠন-সহিষ্ণু হইতে হইবে। নিরপেক্ষ মন লইয়া আলোচ্য বিষয় একাধিক বার তাঁহাকে পাঠ করিতে হইবে। অন্ততঃ তিনবারের কম কোন পুস্তক পড়িয়া সে সম্বন্ধে মতামত দিতে যাওয়া নিতান্তই অসঙ্গত। কোন বিখ্যাত সমালোচকও এই কথাই বলেন–

"Always read a book three times, the first time to see what it is all about, the second time to see what it says, the third time in an attitude of friendly hostility."

কিন্তু বড়ই লজ্জার বিষয়, আমাদের আজকালকার অনেক সমালোচকই কোন বই ভাল করিয়া না পড়িয়াই, এমন কি একবারও না পড়িয়া সমালোচনা লিখিতে বসেন। তার ফল এই যে, কোন কবির কাব্য সমালোচনা করিতে গিয়া হয়ত তাহার মধ্যে কোন কিছুই প্রশংসার মত পান না, নয়ত এমন এক এক স্থান উদ্ধৃত করিয়া 'কি সন্দুর!' ইত্যাদি বিশেষণ লাগাইয়া দেন—যাহা প্রকৃতপক্ষে সেরূপ বাহবা পাইবার যোগ্যই নয়।

এতক্ষণ সমালোচক ও তাঁহার দায়িত্ব সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিলাম। এইবার সমালোচনা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কিন্তু তাহা করিতে হইলে কাব্য কি এবং কাব্য-সমালোচনার আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে আমাদিগকে সজাগ হইতে হইবে। নিতান্ত দুঃখের সঙ্গেই বলিতে হইতেছে যে, আমাদের কাব্য-সমালোচকদের অনেকেই এ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ রূপে সজাগ আছেন বলিয়া মনে হয় না। কাব্য সম্বন্ধে তাঁহাদের যে-ধারণা তাহা অনেক স্থলেই ভ্রান্ত। এতদ্ব্যতীত একদেশদর্শিতা ও পক্ষপাত দোষ-দুষ্ট

www.pathagar.com

হওয়ায় তাঁহাদের সমালোচনা নিতান্তই অপাঠ্য হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহাদের লেখায় 'বিশ্ব সাহিত্য" "সৌন্দর্য-তত্ত্ব" "যুগপ্রবর্ত্তক প্রতিভা" "সত্য-শিব-সুন্দর" প্রভৃতি বহু বড় বড় কথার চটক থাকে বটে, কিন্তু উহার ভিতরে সারবত্তা নাই।

কাব্য কি? আমাদের সমালোচকদের মতে "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং" অর্থাৎ যে বাক্যের মধ্যে রস বা আনন্দ আছে তাহাই কাব্য। কাব্য সম্বন্ধে ইহাই তাঁহাদের ধারণা। আনন্দ এবং সৌন্দর্যকে মাপকাঠি করিয়াই তাঁহারা কাব্যযাচাই করেন। এইখানেই করা হয় প্রথম ভুল। প্রকৃত কাব্যে আনন্দ রস বা সৌন্দর্য যে থাকিবে তাহাতে কোন সন্দেহই নাই, কিন্তু তাই বলিয়া যাহাই আনন্দ দান করিবে তাহাই হইবে কাব্য—ইহা অতি মারাত্মক ভুল।

কয়েকটি কারণে শুধু আনন্দ (pleasure) কাব্যবিচারের মানদণ্ড হইতে পারেনা। প্রথমতঃ কাহার আনন্দকে মাপকাঠি ধরিয়া বিচার করিতে হইবে? সমালোচকের? না লেখকের? না পাঠকের? না জাতির?–না অন্য কাহারো? আর সে আনন্দ কোন শ্রেণীরই বা আনন্দ? ইন্দ্রিয়ের আনন্দ (Sensual pleasure) না নীতি বা জ্ঞানের আনন্দ (moral or intellectual satisfaction)? আনন্দ দ্বারা কাব্যবিচার করিতে গেলে কাব্যের কোন standand বা আদর্শ থাকে কি? এক জন বলিবেন,–' এটা কোন কবিতাই হয় নাই, কারণ ইহার মধ্যে আনন্দের সন্ধান পাইলাম না।" আর একজন বলিলেন,—"কবিতাটি চমৎকার হইয়াছে, আমার খুব ভাল লাগিয়াছে।" এ ক্ষেত্রে কাহার সমালোচনা ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিব? কাজেই দেখা যাইতেছে—শুধু আনন্দ বা রস কাব্য-বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হইতে পারে না।

সুখের বিষয়, পাশ্চাত্য মনীষী ও সমালোচকবৃন্দ কবি ও কাব্য সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন ঃ

Plato কবিকে "Interpreter of Divinity" এবং কাব্যকে "Divine phantoms and shadows of Reality" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

Aristotle কাব্যকে "Authentic tidings of invisible things" বলিয়াছেন এবং যদিও আনন্দদানই কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তবুও যে-সে আনন্দের কথা তিনি বলেন নাই'; নৈতিক আনন্দের (Moral satisfaction) কথাই বলিয়াছেন।

Kant বলেন, "True poetry must strive to present virtue and intellectual truth in sensible form.'

Collins বলেন, "The chief office of poetry is not merely to give amusement........but that, if it includes this mission. it includes also a mission far higher–the revelation. namely of ideal truth."

বস্তুত বিশ্বের সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই এই কথা বলিবেন। শুধু আনন্দ (pleasure) বা বাহিরের সৌন্দর্যকে কেহই বড় করিয়া দেখেন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকাল এক শ্রেণীর সাহিত্যিক সাহিত্যে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতেছেন। তাহাদের মত এই যে, "আর্ট

www.pathagar.com

ধর্মের নির্দেশ, সমাজের বিধি-নিষেধ বা সভ্যতার ক্রম-বিকাশের কোন তোয়াক্কা রাখে না।" এই শ্রেণীর কবি ও সমালোচক আর্টকে যে রঙীন মূর্তিতে দেখিয়া থাকেন, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আর্ট তাহা নহে। আর্ট যে ধর্ম এবং নীতিজ্ঞান বর্জিত আনন্দ-বিলাসের সামগ্রী, কোন মনীষীই সে কথা বলেন নাই। মাইকেল এঞ্জেলো (Michael Angelo) র‍্যাফেল (Raphel) প্রভৃতি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণ ও তাঁহাদের আর্টের সীমানা হইতে নীতি ও ধর্মকে বাহির করিয়া দেন নাই। Ruskin, Tolstoy প্রভৃতি আর্টের শ্রেষ্ঠ সমালোচকগণও সেরূপ মত প্রকাশ করেন নাই।

সমালোচনা চারি প্রকার ঃ-(১) Inductive Criticism অর্থাৎ কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বিষদভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া; (২) Speculative Criticims অর্থাৎ কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহাকেই ভিত্তি করিয়া নানা দার্শনিক তত্ত্বের দ্বারা সেই ভাবটিকে পরিবর্দ্ধন করিয়া বলা; (৩) Judicial Criticism অর্থাৎ সে সব বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুন আছে, তদনুসারে কবিদের উপর এবং তাহাদের কাব্যের উপর রায় প্রকাশ করা এবং (৪) Subjective criticism অর্থাৎ স্বাধীন সমালোচনা। কবি এবং কাব্যকে কেন্দ্র করিয়া এই সমালোচনা নিজেই একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য-সৃষ্টি।

দুঃখের বিষয়, আমাদের অধিকাংশ সমালোচনাই তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ Judicial criticism-এর অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর সমালোচনা খুব নিকৃষ্ট ধরনের। উহাতে কোন উন্নত চিন্তাশীলতার পরিচয় থাকে না। কোন্ কবি ভাল বা মন্দ এবং কোন্ কবির কি করা উচিত ছিল, এই সব কথা নিজের যুক্তিতর্ক দিয়া বুঝাইয়া দেওয়াই উক্ত সমালোচনার প্রধান কাজ। বিচারকের মন যেমন জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতাসারেই হউক, একপক্ষে না একপক্ষে ঝুঁকিয়া পড়ে, এই শ্রেণীর সমালোচকের মনও বিচার করিতে বসিয়া সেইরূপ কাহারও প্রতি না কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিয়া বসে; কাজেই তাঁহার সমালোচনায় প্রকৃত কাব্যের আলোচনা ও বিশ্লেষণ যতটা থাকুক বা না থাকুক, তাহার নিজের মানসিকতার আলোচনা বেশ ভাল করিয়াই ফুটিয়া উঠে। তাই এই শ্রেণীর সমালোচনা পড়িলে লেখককে রাখিয়া সমালোচকের সম্বন্ধে বেশী ওয়াকিফহাল হওয়া যায়। কোন বিখ্যাত ইংরাজ সমালোচক সত্যই বলিয়াছেন–

"Judicial criticism is a revelation of the critic much more than of the literature"

অর্থাৎ ঃ বিচার-মূলক সমালোচনায় কবি বা তাঁর কাব্যের পরিচয় অপেক্ষা সমালোচকের নিজের পরিচয়ই বেশি থাকে।

এই শ্রেণীর সমালোচনা দ্বারা সাহিত্যের কোন উন্নতি সাধিত হয় না; বরং অনেক সময় ক্ষতিই হইয়া থাকে। তাহার কারণ সমালোচক তাঁহার ব্যক্তিগত রুচি এবং মতের অনুযায়ী করিয়া কবিকে গড়িতে চান; কবির সৃষ্টির সহিত নিজের বা পাঠকের মনের যোগ স্থাপনা করেন না। নিজের রুচিকে বড় করিয়া তোলেন বলিয়া কবির সৃষ্টি আড়ালে পড়িয়া যায়। কবির প্রতিভার প্রতি এ এক নিষ্ঠুর আঘাত। ইংরাজ কবি Keats এই ধরনের সমালোচনা সহ্য করিতে না পারিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন; অথচ বর্তমান যুগে

www.pathagar.com

তিনি শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত। এরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা যদি বাহির না হইত, তবে হয়ত Keats আরওকত সুন্দর সৃষ্টি জগতকে উপহার দিয়া যাইতে পারিতেন।

যাহারা সমালোচনা করিতে বলিয়া লেখনীকে তরবারিতে পরিণত করেন, তাহার Keats-এর এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া লজ্জিত হইবেন। কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামতের যে কতটুকু মূল্য Keats জগতের সম্মুখে স্পষ্টরূপে তাহা দেখাইবার জন্যই যেন এমনভাবে আত্মদান করিয়া গিয়াছেন।

যাক্, আমাদের কথা হইতেছে Judicial criticism সম্বন্ধে। অবশ্য সমালোচনায় যে ভাল-মন্দের বিচার মোটেই থাকিতে পারিবে না, তাহা নহে; কিন্তু সেই বিচার করিতে হইলেও Inductive criticism-এর উপরেই তাহার ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে; অর্থাৎ লেখক কি বলিতে চাহিয়াছেন, অগ্রে তাহাই সুস্পষ্ট করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের সমালোচকেরা তাহার আবশ্যকতা মোটেই অনুভব করেন না।

প্রত্যেক কবিতারই দুইটি করিয়া অঙ্গ আছে; এক তাহার বহিরঙ্গ আর এক তাহার অন্তরঙ্গ বা প্রাণবস্তু। কবিতার ছন্দ এবং মাধুর্য অপরিহার্য বটে, কিন্তু উহাই কবিতার প্রাণ নহে। যে-সমস্ত বিশ্বকবি জগতে অমর হইয়া আছেন, তাঁহার শুধু ছন্দের জন্য নয়-বাণী বা message-এর জন্যই আছেন। বাণীর আপন মাধুর্যে ছন্দের শোভা নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। বিখ্যাত ইংরাজ সমালোচক Symond ঠিকই বলিয়াছেন–

"Though style is an indispensable condition of success in poetry, it is by matter and not by form that a poet has to take his final rank."

অর্থাৎ ঃ স্টাইল যদিও কাব্যের অপরিহার্য অঙ্গ, তবু শেষ পর্যন্ত বিষয়বস্তু দিয়াই কবির বিচার হইয়া থাকে।

কবি এবং সমালোচকদের একথা মনে রাখা দরকার।

ইসলাম দর্শণ

১৯২৭

www.pathagar.com

শক্তি-পরীক্ষায় মুসলমান

শক্তি-পরীক্ষায় মুসলমান জাতি যে-অপূর্ব নিপুণতা দেখাইয়াছে, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। বর্তমান যুগের যুদ্ধ-প্রণালীর কথা বলিতেছি না, কারণ এ যুগে বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্র এবং ছল-চাতুরীর উপরেই যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ভর করে। প্রকৃত বীরত্বের স্থান আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে নাই বলিলেই চলে। কিন্তু অতীত কালে যে সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহে সত্যিকার শক্তি-পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, সেখানে মুসলমানেরা অমানুষিক শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করিয়াছে। কেবলমাত্র সংখ্যাধিক্যের মধ্যেই যে শক্তি নিহিত থাকে না, শক্তি যে অন্তরের জীবনের, আর এই অন্তরের শক্তি লইয়া অতি অল্প-সংখ্যক হইয়াও যে বিপক্ষ দলের বহুগুণ সেনাকে অবলীলাক্রমে পরাস্ত করা যায়, মুসলমান জাতিই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল।

মুসলমান জাতির দিগ্বিজয়ের ইতিহাস পাঠ করিলে এই কথাই সর্বাপেক্ষা বড় হইয়া মনে জাগে যে, সত্য যদি শক্তির ভিত্তি হয় আর ভিতর হইতে যদি প্রেরণা জাগে, তবে পৃথিবীর কোন শক্তিই সে শক্তির সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না। দুর্নিবার স্রোতের মুখে তৃণস্তূপের মতো তাহা কোথায় ভাসিয়া যায়। মহাপুরুষ হজরত মুহম্মাদের জীবন-সাধনার প্রতি লক্ষ্য করিলে এ কথার সত্যতা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। একটা মানুষের পদতলে সমগ্র বিশ্বের সমবেত শক্তি কেমন করিয়া মাথা নোয়াইল? কোন্ ভয়ে কোন্ অস্ত্রঘাতে শত্রুপক্ষ অমনভাবে হার মানিল? শত চেষ্টা সত্ত্বেও কেন তাহারা হজরতের গতিপথে বাধা দিতে সমর্থ হইল না? কোথায় ছিল হজরতের তরবারি, কোথায় ছিল তার সেনাবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র বা রসদপত্র? একান্তরূপে একা–নিঃসহায়, দুর্বল অস্ত্রহীন শত্রুপরিবেষ্টিত একটি মানুষ জগত জোড়া মিথ্যার বিরুদ্ধে অভিযান করিতেছে। শত প্রকারের অত্যাচার চলিতেছে, প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র চলিতেছে, ভ্রুক্ষেপ নাই; মহাপুরুষ তবুও আপন লক্ষ্যে অবিচল। তিনি যে সত্য-সাধক, সত্য যে জয়যুক্ত হইবেই, মিথ্যা যে কিছুতেই জয়ী হইতে পারিবে না—এই দৃঢ় আত্মবিশ্বাস শত নিরাশার মধ্যেও তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিতেছে।

হজরতের যে সাধনা, প্রকৃত মুসলমানেরও সেই সাধনা। তাই দেখিতে পাই, হজরতের অনুসরণে বহু মুসলিম বীর জীবনে বহু সফলতা অর্জন করিয়া গিয়াছে। জগতের ইতিহাসে মুষ্টিমেয় আরব সেনা এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকার মত তিনটি মহাদেশে যুদ্ধ করিয়া সর্বত্র বিজয় লাভ করিতেছে, এ দৃশ্য দেখিবার মত। একদিকে তিনটি মহাদেশের লক্ষ লক্ষ সুশিক্ষিত সেনা-বাহিনী, এবং বিপুল রণ-সম্ভার, অপর দিকে নগণ্য মুষ্টিমেয় আরব সন্তান! অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এই নগণ্য মুসলিম বীরদলই প্রায় সমভাবে বিজয়ী। এ কোন্ শক্তি, যাহা সংখ্যার মধ্যে, অস্ত্রের মধ্যে বা দুর্গপ্রাকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ঈমানের দুর্জয় শক্তি এ! এর কাছে অন্য সব শক্তিই নতশির।

নিম্নে আমরা কতিপয় ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা এই কথা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইব। মুসলিম বীরপুরুষগণ যে কিরূপ অসম অনুপাতে যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, অথচ তাঁহাদের বিজয়-লাভের অনুপাত যে সেই তুলনায় কত বেশী, পাঠক তাহা লক্ষ্য করিবেনঃ

www.pathagar.com

বদর যুদ্ধ

বদর যুদ্ধই বিধর্মীদিগের সহিত ইসলামের সর্বপ্রথম যুদ্ধ। হজরত মুহাম্মদ স্বয়ং এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। এই যুদ্ধে কোরেশ সেনার সংখ্যা ছিল সহস্রাদিক; তাহাদের সকলেই নানা অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। পক্ষান্তরে নবদীক্ষিত মুসলিম সৈন্যের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। তাহাদের বেশভূষা ও অস্ত্রপাতিও বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু এই যুদ্ধে কোরেশরাই ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে এবং অনেকে মুসলমানদের হস্তে বন্দী হয়। কোরেশদের নিহত সংখ্যা ৭০ আর মুসলিমদের মাত্র ১৬।

খৃষ্টানদিগের সহিত যুদ্ধ

দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া মুসলমানদিগকে যে সমস্ত ভীষণ যুদ্ধের সম্মুখীন হইতে হয়, তাহার মধ্যে এয়ারমুকের যুদ্ধ অন্যতম। এই যুদ্ধে রোমক সৈন্যের সংখ্যা ২,৪০,০০০ এবং মুসলিম সৈন্যের সংখ্যা মাত্র ৪০,০০০। কিন্তু এই ভীষণ যুদ্ধে রোমানগণই সম্পূর্ণরূপ পরাজিত হয়। তাহাদের নিহতদের সংখ্যা ১,৪০,০০০, অথচ মুসলমানদের নিহতদের সংখ্যা মাত্র ৩০০০।-(History of the Saracens)

কিন্তু গীবন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ-"Decline and Fall of the Roman Empire" নামক গ্রন্থে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার খৃষ্টান সৈন্যের হিসাব দেওয়া হইয়াছে। আবার Ockly লিখিয়াছেন ঃ-

"সেনাপতি আবু ওবায়দা খলিফা ওমরের নিকট যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—আমরা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার খৃষ্টান সৈন্য নিহত করি এবং চল্লিশ হাজার বন্দী করি।

আজনাদিনের যুদ্ধে রোমক শাসনকর্তা ওয়ার্দানের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৭০,০০০ এবং মুসলানদিগের সংখ্যা ছিল ৪৫,০০০। এই যুদ্ধেও রোমকগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। প্রায় ৫০,০০০ খৃষ্টান সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হয়। কিন্তু মুসলমানদিগের নিহতের সংখ্যা মাত্র ৪৭০ জন। (Gibon : Decline and Fall of the Roman Empire)

মিঃ আমীর আলি এই যুদ্ধ সম্বন্ধে বলেন-"Their (Roman) army was entirely destroyed; only a few escaped with their chief" অর্থাৎ রোমান সৈন্যদল প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ধ্বংস হইয়াছিল; তাহাদের সেনাপতি সহ অল্পসংখ্যকই রক্ষা পাইয়াছিল"।

হজরত ওসমানের শাসনকালে মিসরের শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ ৪০,০০০ আরব সেনাকে উত্তর আফ্রিকাকার মরুভূমির মধ্যে পরিচালিত করেন। যথা -ত্রিপলি যুদ্ধ সময় রোমান শাসনকর্তা গ্রেগরিয়াস্ ১,২০,০০০ হাজার সৈন্য লইয়া বাধা প্রদান করিতে আসেন। ত্রিপলির যুদ্ধে রোমকগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। (Decline and Fall of the Roman Empire)। খলিফা প্রথম অলিদের সময় শাসনকর্তার অনুমতি লইয়া মহাবীর তারেক মাত্র ৭০০০ সৈন্য লইয়া জিব্রাল্টারে অবতরণ করেন। শত্রুগণ বাধা

www.pathagar.com

প্রদান করিতে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। অতঃপর তারেক টলেডো অভিমুখে অগ্রসর হন। স্পেন-সম্রাট রডারিক ১,০০,০০০ লক্ষ সৈন্য লইয়া বাধা দান করেন। মেডিনা সিডোনিয়ার যুদ্ধে গথগণ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয় এবং রডারিক পলায়ন করিতে যাইয়া গোয়াডেলেট নদীগর্ভে নিমজ্জিত হন। **স্পেন বিজয়**

রোমান সম্রাট ডাইওজেনিস্ দুই লক্ষ সৈন্য লইয়া এশিয়া আক্রমণ করিতে আসিতেছেন শুনিয়া তুর্ক সুলতান আল্‌প আরসলান মাত্র চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত সীমান্ত অভিমুখে ধাবিত হন। এই যুদ্ধে ডাইওজেনিস সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া কতিপয় অপমানজক সর্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হন। (ইসলামের ইতিহাস)। **তুর্ক-সীমান্ত যুদ্ধ**

পারসিকদিগের সহিত যুদ্ধ

কাদেসিয়ার চিরস্মরণীয় যুদ্ধে পারসিক সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার এবং আরব সৈন্যের সংখ্যা ছিল ১২ হইতে ৩০ হাজারের মধ্যে। এই যুদ্ধে পারসিকগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। ত্রিশ হাজার পারসিক নিহত হয়, পক্ষান্তরে মুসলমানদিগের নিহতের সংখ্যা মাত্র সাত হাজার। **কাদেসিয়ার যুদ্ধ**

–Historians' History of the World. also Decline and Fall of the Roman Empire.

ভারতবাসীর সহিত যুদ্ধ

ভারতের সর্বপ্রথম মুসলমান আক্রমণকারী মহাবীর মোহাম্মদ বিন কাসিম বস্‌রার শাসনকর্তা হাজ্জাজের অনুমতিক্রমে মাত্র ৬০০০ সৈন্য লইয়া সিন্ধু-প্রদেশে আক্রমণ করেন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ২০ বৎসর মাত্র। সিন্ধুরাজ দাহিরের সহিত 'আলোরে' বিন-কাসিমের সাক্ষাৎ হয়, দাহিরের সৈন্য-সংখ্যা ছিল ৫০,০০০। কিন্তু যুদ্ধে দাহির সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন। (Elphinstone's History of India)

মুহাম্মদ ঘোরীর সহিত যখন দ্বিতীয়বার পৃথ্বিরাজের যুদ্ধ হয়, তখন পৃথ্বিরাজের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩,০০,০০০ অশ্বারোহী, ৩০০০ হস্তী সৈন্য এবং অসংখ্য পদাতিক। অথচ মুহম্মদ ঘোরীর সৈন্য সংখ্যা সর্বশুদ্ধ ১,২০,০০০ মাত্র। এই যুদ্ধে ভারতের হিন্দু-কুল-সূর্য শেষবারের মত অস্তমিত হয়। ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইহাই সূত্রপাত। **পৃথ্বিরাজের সহিত যুদ্ধ**

–Ferista, English Translation by John Briggs.

১১৯৮ খৃষ্টাব্দে বীরকেশরী মুহাম্মদ বখতিয়ার খিল্‌জী যেরূপভাবে বঙ্গবিজয় করেন, জগতের ইতিহাসে তাহা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। মাত্র ১৭ জন সৈন্য লইয়া কোন বীর কোন কালে কোন দেশ জয় করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।*

সম্রাট আকবর মাত্র ৫০০০ সৈন্য লইয়া চিতোর অবরোধ করেন। চিতোরের রাণা ৮০০০ সৈন্য চিতোর দূর্গে নিয়োজিত রাখিয়া সপরিবারে অন্যএকটি সুরক্ষিত স্থানে আশ্রয়

www.pathagar.com

গ্রহণ করেন। একদিন রাত্রিযোগে দুর্গাধিপতি জয়মলকে আকবর কৌশল পূর্বক গুলি করিয়া নিহত করেন। ইহাতেই রাজপুতগণ ভীত হইয়া 'জহর ব্রত' পালন করে। আকবর তাহা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ দুর্গ আক্রমণ করেন। সমস্ত রাজপুত সৈন্য নিহত হয়, অথচ মোগল সৈন্য মাত্র একজন মারা যায়। এইরূপে মাত্র একজন সৈন্যের প্রাণের বিনিময়ে' চিতোর বিজিত হয়।–Ferista. **চিত্যের বিজয়**

দাক্ষিণাত্যের সুলতান মোহাম্মদ শাহ্ মাত্র ৯০০০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বিজয়নগরের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যান। তিনি এত ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্রসর হন যে, রাজা ভয় পাইয়া পালাইয়া যান। মোহাম্মদ শাহ্ পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ৭০,০০০ হাজার হিন্দু সৈন্যকে নিহত করেন এবং বহু হস্তী ও রত্নসম্ভার লাভ করেন।–Ferista.

* বখতিয়ারের বিহার-বিজয়ও এইরূপ বিকস্ময়কর ছিল ঃ–

"It is siad by credible persons that he (Bakhtier) went to the gate of the fort of Behar with only two hundred horses and began the war by taking the enemy unawares." —Eliot.

পানি পথের যুদ্ধ

চিরস্মরণীয় পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আহমদ শাহ্ আবদালীর সৈন্য সংখ্যা ছিল মোট ৫৩,০০০। পক্ষান্তরে মারাঠাদিগের সৈন্য সংখ্যার পরিমাণ–৩,০০,০০০ লক্ষেরও অধিক।

পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধ

এই যুদ্ধে মারাঠা জাতির যে শোচনীয় পরিণাম সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা ভারতের ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। এই যুদ্ধক্ষেত্রে মারাঠাদিগের ২,০০,০০০ সৈন্য নিহত হয়। –Elphinstone's History of India.

উপরে যে সমস্ত যুদ্ধের বিবরণ দেওয়া হইল, তাহাদের সবগুলিই গুরুতর ও ভাগ্য-নিয়ামক। এতদ্বতীত ছোট-খাটো কত যে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছে, তাহার ত ইয়ত্তাই নাই। এই সমস্ত যুদ্ধের কেবল মাত্র ফলাফলের মধ্যেই যে মুসলমানদিগের জাতীয় গৌরব নিহিত রহিয়াছে, তাহা নহে; প্রত্যেক যুদ্ধক্ষেত্রেই মুসলমানগণ যে অপূর্ব বীরমনোভাবের ও আত্মনির্ভরতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাও নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয়। এইখানেই মুসলিম জাতির শৌর্য-বীর্যের মূল উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়।

মাসিক মোহাম্মদী

১৯২৮

www.pathagar.com

ইকবালের বাণী

আজকার দিনে সে সকল মনীষীকে লইয়া আমরা গৌরব করিয়া থাকি, তাঁহাদের মধ্যে বিশ্ব-বিশ্রুত কবি ডাঃ শেখ মোহাম্মদ ইকবাল, বি-এ (ক্যান্টাব), এম-এ (পাঞ্জাব), পি, এইচ্, ডি, (মিউনিক) অন্যতম। পাশ্চাত্য শিক্ষার এমন সুশিক্ষিত পণ্ডিত-কবি প্রাচ্য জগতে আর দ্বিতীয়টি নাই। কবি ও দার্শনিকের এমন অপূর্ব্ব সমন্বয় বড় একটা দেখা যায় না। দার্শনিক তত্ত্বের অভিনবত্ব ও নূতন দৃষ্টির জন্য তাঁহার কবিতা যেমন সম্পদশালিনী, অনুভূতি আবেগ ও কাব্য-রসের দিক দিয়াও তাহা তেমনই মর্মস্পর্শী পেলব ও সুন্দর। মুসলিমের এই জাতীয় অধঃপতনের দিনে তিনি তাহাদের সুপ্তপ্রাণে যে বিপুল স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছেন, মরণ-অন্ধকারে যে জীবনের সন্ধান দিয়াছেন, চক্ষে যে সত্য দৃষ্টি দান করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিতে গেলে ইকবালকে সত্যই "Messiah" বলিয়া আমাদের মনে হয়।

কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, ইকবালকে আমরা খুব কম লোকই চিনি। যিনি তাঁহার বাঁশীর সুরে সাহানার করুণ মূর্চ্ছনা না জাগাইয়া দীপক-রাগে জাতির মুক্তির গান গাহিয়া ফিরিতেছেন, যিনি জাতিকে এক অপূর্ব মহিমা দান করিয়া যাইতেছেন, তাঁহাকে আমরা সমাদর করিতে শিখিলাম না! এই বেদনা কবির প্রাণেও আঘাত দিয়াছে; তাই অভিমানের সুরে নিজেই বলিতেছেনঃ –

"I have no need of the ear of to-day.

I am the voice of the poet of to-morrow."

হয়ত তাই! যে সুরে তিনি তাঁহার বীণা বাজাইয়া গেলেন, যে আকুল আহ্বান আকাশে বাতাসে রাখিয়া গেলেন, তাহা শুনিবার মত কান এবং বুঝিবার মত প্রাণ হয়ত আজ আমাদের মধ্যে নাই। তাই অনাগত দিনের প্রতীক্ষায় তিনি বসিয়া আছেন।

ইকবাল সত্য সত্যই আমাদের জন্য এক 'জ্যোতির্ময়ী বাণী' বহন করিয়া আনিয়াছেন। সে বাণীর হইতেছে—"Back to the Quran" অর্থাৎ কোরআনের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন। কোরানকে অবলম্বন না করিলে আমাদের মুক্তি নাই, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি তাঁহার মানস-চক্ষে এক বিরাট জগদ্ব্যাপী অখণ্ড ইসলামী রাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়াছেন–যেখানে দেশ ও জাতির বাধা-বন্ধন নাই, সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তার বালাই নাই,—মানবতার সহজ অধিকারে সকলেই সেখানে সমান। "Pan-Islam" বা বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ এবং তিনি জাতিকে সেই দিকেই অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়াছেন।

ইকবালের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক কাব্য-গ্রন্থ "আসরারে খুদী"র অনুবাদক Dr. Nicholson-ও তাঁহার ভূমিকায় এই কথাই বলিয়াছেন ঃ–

"The cry 'Back to the Koran, Back to Muhammad" has been heard before; and the responses have hitherto been

www.pathagar.com

somewhat discouraging. But on this occasion it is allied with the revolutionary force of western philosophy, which. Iqbal hopes and believes, will vitalise the movement and ensure its triumph."

অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

"He is a religious enthusiast, inspired by the vision of a New Mecca, a worldwide, theocratic Utopan State in which all Moslems, no loger divided by the barriers of race and country shall be one. A free and independent Moslem fraternity having the Kaba as its centre and knit together by the love of Allah and devotion to the prophet–such is Iqbal's ideal."

কিন্তু এ শুধু কবি ইকবালের সোনালী স্বপ্ন নয়। এ স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য দার্শনিক ইকবাল তাঁহার নূতন দৃষ্টি ও নূতন যুক্তিবাদ লইয়া পিছনে উপস্থিত। তিনি বলেন–আত্ম-প্রতিষ্ঠা (self-affirmation) ও আত্ম-উন্নয়ন (self-improvement) দ্বারাই আমরা ইসলামের এই বিশ্বব্যাপী গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারি।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইকবালের বাণী প্রকৃতপক্ষে আত্ম-গঠনেরই বাণী। তিনি বলিতে চান উন্নতি-অবনতি আমাদের নিজেদেরই আয়ত্তাধীন। আমরা যতখানি নিজদিগকে গঠন করিতে পারিব ততখানি জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিব। উন্নতির মূলীভূত কারণ বা উপাদান বাহিরে নাই, অন্তরেই ইহা লুকাইয়া আছে। তাই আমাদের বিক্ষিপ্ত দৃষ্টিকে বাহির হইতে ফিরাইয়া নিজের প্রতি নিবদ্ধ করিতে হইবে; নিজের মধ্যে আমাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হইবে। হৃদয়ের এই নিভৃত কক্ষে বসিয়াই আমাদের জীবন-শিল্প রচনা করিতে হইবে।

সর্ববিধ উন্নতির জন্য ব্যক্তিত্বের বা 'খুদীর' (self) উপর ইকবাল যে এতখানি জোর দিয়াছেন, তাহার যথেষ্ট দার্শনিক কারণ আছে। তিনি বলেন–ব্যক্তিত্বই বিশ্ব-জগতের সর্বাপেক্ষা বড় কথা; ব্যক্তিত্বের উপরেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দাঁড়াইয়া আছে। নিখিল সৃষ্টি এই ব্যক্তিত্বেরই সমষ্টি। জগতে এই যে ছোট-বড়র বৈষম্য, ইহা ব্যতিত্বেরই তারতম্যের ফল। যাহার ব্যক্তিত্ব যত বড় সে ততই শক্তিশালী এবং ততই টিকিয়া থাকিবার অধিকারী। সূর্যের ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত প্রবল বলিয়া সে এই জড়জগৎ ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহকে তাহার অধীন করিয়া রাখিয়াছে। পর্বতের ব্যক্তিত্ব বেশী বলিয়া সে বিপুল দর্পে গম্ভীর হইয়া জগতের বুকের উপর দাঁড়াইয়া আছে। ব্যক্তিত্ব না থাকিলে সে ধূলা হইয়া মাটিতে মিশিয়া যাইত–

"When the mountain loses its self,
it turns into sands
And complains that the sea
surges over it."

www.pathagar.com

"পর্বত যখন নিজের ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলে তখন সে ধূলা হইয়া যায় এবং অনুযোগ করিয়া বলে যে, সাগর তাহার বুকের উপর দিয়া যাইতেছে।"

আবার জীবন-নদী যখন ব্যক্তিত্বের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠে, তখন তাহা প্রসারিত হইয়া সাগরে পরিণত হয়–

"When life gathers strength from the self

The river of life expands into an ocean."

ব্যক্তিত্বের এই যে বিপুল শক্তি, ইহার মূল উৎস হইতেছে–স্বয়ং খোদাতালা। তিনিও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ একক ও অনন্য (unique); আল্লার ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ (perfect) বলিয়া তিনি সর্বাপেক্ষা শক্তিমান। খোদাতালা হইতে যে যত দূরে, তাহার ব্যক্তিত্ব তত দুর্বল। পক্ষান্তরে যে খোদার যত নিকটবর্ত্তী, সে তত ব্যক্তিত্ব ও শক্তি-সম্পন্ন। সুতরাং শক্তি সঞ্চয় করিতে হইলে আমাদিগকে আমাদের ব্যক্তিত্বকে সবল করিয়া তুলিতে হইবে, আর ব্যক্তিত্বকে সবল করিতে হইলেই আমাদিগকে খোদাতালার নৈকট্য লাভ করিতে হইবে, অর্থাৎ খোদাতালার মধ্যে যে সমস্ত গুণাবলী নিহিত আছে, তাহাই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হইবে। হজরত মুহম্মদ (দঃ) এই কথাই বলিয়াছেন–"তাখাল্লাকু বি আখলাক্ আল্লা" "অর্থাৎ তোমরা নিজেদের মধ্যে খোদাতালার গুণাবলী সৃষ্টি কর।"

এইখানে ইকবাল একটা নূতন কথা বলিয়াছেন। শক্তি-সঞ্চয় করিবার জন্য আমাদিগকে খোদাতালার নিকটবর্ত্তী হইতে হইবে বটে; কিন্তু তাই বলিয়া সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহার মধ্যে নিজেকে বিলীন করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইলে চলিবেনা। খোদা তালাকে জীবনের মধ্যে শোষন (absorb) করিয়া লইয়া, অর্থাৎ তাঁহার গুণাবলীকে আপন জীবনে আয়ত্ত করিয়া নিজের ব্যক্তিত্বকে বলিষ্ঠ করিতে হইবে এবং খোদাতালার ক্রমবিকাশমান সৃজন-লীলার সহায়ক হইতে হইবে। হজরত মুহাম্মদ যেমন 'শবে মেরাজে' খোদাতালার নেকট্য লাভ করিয়াও পুনরায় জগতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, খোদার নিকট হইতে শক্তি লাভ করিয়া আমাদিগকেও তেমনই জগতের দিকে মুখ ফিরাইতে হইবে।

ইকবাল বলিতেছেন–

"Abandon self and flee to God.

Strengthened by God, return to thyself".

"নিজেকে ছাড়িয়া খোদার নিকট ছুটিয়া যাও এবং তাঁহা শক্তিতে শক্তিমান হইয়া পুনরায় নিজের মধ্যে ফিরিয়া আইস।"

এই স্থলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ইকবাল হাফিজের সুরে তাঁহার বীণা বাঁধেন নাই। হাফিজের মধ্যে একটা অলস করুণ তান আছে, সেখানে শুধুই বিরহের ক্রন্দন আর মিলনের ব্যাকুলতা। জীবনের উদ্দাম গতিভঙ্গি ও অশ্রান্ত চঞ্চলতা তাঁহার মধ্যে নাই। নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিবার জন্যই তিনি ব্যাকুল। ইকবাল কিন্তু এই সুফী ভাবকে

www.pathagar.com

জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তিনি মওলানা রুমীর আদর্শে অনুপ্রাণিত। জীবনকে তিনি গঠন করিয়া উপভোগ করিবার পক্ষপাতী, মৃত্যু অপেক্ষা জীবনকেই তিনি মূল্যবান মনে করেন। তিনি বলেন, এহেন আত্ম-বিলোপ (self-annihilation) মানুষের স্বভাব-ধর্ম নহে, কারণ সে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবারই অভিলাষী। নিস্ক্রিয় উদাসীন হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার নাম জীবন নহে, উহা মৃত্যুরই নামান্তর মাত্র। মানুষ এরূপ নিস্পন্দ মৃত জীবন যাপন করিবার জন্য দুনিয়ায় আসে নাই। তাহার জীবনের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। খোদাতালার প্রতিনিধি বা খলিফা রূপেই মানুষ এই দুনিয়ায় আসিয়াছে। সুতরাং এই নিখিল বিশ্বে খোদার প্রতিনিধিত্ব করাই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। সসাগর। পৃথিবীর বুকের উপরে আমরা বাঁচিয়া থাকিব, স্থলে জলে ব্যোমপথে বিচরণ করিব,আর সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় সৃষ্ট জীবের ও প্রকৃতির উপর শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিব। যত দুঃখ যত বিপদ যত বাধা যত বিঘ্নই আসুক না কেন, আমরা হেলায় তাহাদিগকে জয় করিয়া তাহাদের ঊর্ধ্বে উঠিব। কোন পার্থিব শক্তিই আমাদের শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবেনা, কারণ আমরা স্বয়ং খোদাতালার প্রতিনিধি। শয়তান বল, ফেরেশতা বল, দেব-দেবী বল, দৈত্য-দানব বল–আমরা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সকলেই সম্ভ্রমে আমাদের পায়ে প্রণতি জানাইবে। ইকবাল তাই উৎফুল্ল হইয়া বলিতেছেন–

"It is sweet to be God's vicegerent in the world,
And exercise away over th elements."

কিন্তু কেবল মাত্র পূর্ণ-বিকশিত মানবাত্মাই খোদার প্রতিনিধি হইবার যোগ্য পাত্র। সহজে নিজেকে এই গৌরবান্বিত অবস্থায় উন্নীত করা যায় না। ইহার জন্য সাধনা চাই। এ অবস্থায় পৌছিতে হইলে নিয়মানুবর্তিতা ও আত্ম-সংযমের মধ্য দিয়া আমাদিগকে যাইতে হইবে। আইন ভাঙিয়া বিদ্রোহী সাজিয়া খোদার প্রতিনিধিত্ব করা যায় না। এত বড় মুক্তির আনন্দ উপভোগ করিতে হইলে নিজেকে বন্ধনের মধ্যে ধরা দিতে হইবে। ইকবাল তাই এই নিয়মানুবর্তিতার উপর বেশী রকম জোর দিয়াছেন।

তিনি বলিতেছেন–

"Endeavour to obey, O heedless one!
Liberty is the fruit of compulsion."

* * *

Whoso would master the sun and stars
Let him make himself a prisoner of Law!
The wind is enthralled by the fragrant rose
The perfume is confined in the navel of the musk-deer,
The star moves towards its goal
With head bowed in surrender to a law.

* * *

O thou that art emancipated from old custom

www.pathagar.com

Adorn thy feet once more with the same silver chain.
Do not complain of the hardness of the Law
Do not transgress the stautes of Mohammad!"

"ওগো অমনোযোগী, বাধ্য হইতে শিখ। মুক্তি বাধ্যতারই ফল।

"যে কেহ সূর্য তারকার উপর প্রভুত্ব করিতে চায়, তাহাকে নিয়ম-নিগড়ে বন্দী হইতে বল! সুরভি পবন গোলাপের পাগড়ির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে, কস্তুরীগন্ধ মৃগের নাভি-কন্দরে বন্ধ হইয়া আছে। তারকারাজি তাহাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে চলিয়াছে বটে, কিন্তু নিয়মের অধীন হইয়া মাথা নত করিয়া চলিয়াছে।

"ওগো অতীতের সংস্কারমুক্ত। আবার সেই অতীতের রূপালী শৃঙ্খলে তোমার পদদ্বয় আবদ্ধ কর! আইন কঠোর বলিয়া অনুযোগ করিওনা, হজরত মুহাম্মদের বিধি-নিষেধকে লঙ্ঘন করিও না।"

ইহাই ইকবালের মতে ব্যক্তিত্বের শিক্ষা ও সাধনা। তিনি মনে করেন, হজরত মুহাম্মদ জীবনে যে আদর্শ আমাদিগের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন, যে পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন এবং যে সমাজ-বিধি প্রবর্তিত করিয়াছেন তাহাই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে একথা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে—ইকবাল জীবনের কবি। জীবন-শতদলের পরিপূর্ণ বিকশিত মূর্তিই তিনি দেখিতে চান। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি জড়জীবনের গান গাহেন নাই। সুফী মতবাদ জড় জীবনের দিকে মানুষকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে,—অন্য দিকে পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞান মানুষকে জড়বাদী করিয়া তুলিয়াছে। ইকবাল এই দুই বিভিন্নমুখীন ভাবধারাকে অতি সুন্দরভাবে কাব্যরসের মধ্যে আনিয়া একত্র মিলাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ঘটিয়াছে। সেই মিলনের—সেই সমন্বয়ের বাণী এতই কবিত্বপূর্ণ যে, তাহা মস্তকে পৌছিবার পূর্বেই হৃদয় জয় করিয়া লয়।

ইকবালের বাণী সত্যসত্যই আশার বাণী। সে বাণী শ্রবণ করিলে অসাড় প্রাণেও পুলক-কম্পন লাগে, হতাশ জীবনেও বাঁচিবার সাধ জাগে। জীবনের এমন অব্যর্থ সন্ধান আর কোন কবিই আমাদিগকে দিতে পারেন নাই। নিরাশার অন্ধকারে দিশাহারা হইয়া আমরা প্রতিদিন মরণের পথে চলিয়াছি। আমাদের প্রাণে আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নাই, বাঁচিবার আগ্রহ (will to live) নাই, অভাবের তীব্র অনুভূতি নাই; আমরা যেন একটা উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপন করিয়া চলিয়াছি। ইকবাল ইহা বুঝিতে পারিয়াই উদাত্ত স্বরে গাহিয়া উঠিয়াছেন ঃ

"Life is preserved by purpose.
Because of the goal its caravan bell tinkles
Life is latent in seeking
Its origin is hidden in Desire

www.pathagar.com

Keep Desire alive in thy heart

Lest thy little dust become a tomb".

"উদ্দেশ্যই জীবনকে বাঁচাইয়া রাখে। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবার জন্যই সরাইখানা যাত্রীদলের ঘন্টাধ্বনি শুনা যায়! অনুধাবন বা অনুসন্ধানের মধ্যেই জীবন নিহিত। জীবনের মূলমন্ত্র আকাঙ্ক্ষার মধ্যে লুক্কায়িত। হৃদয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জাগাইয়া রাখ, নতুবা তোমার ওই মাটির দেহ একটা কবরে পরিণত হইবে।"

. সত্যই ত তাই! যাহাদের জীবনে কোন আশা নাই, সাধ নাই নির্জীব জড়পিণ্ডের ন্যায় যাহারা দিন অতিবাহিত করিয়া চলে, তাহাদের দেহ বাস্তবিকই ত তাহাদের আত্মার সমাধি! তাহারা ত সত্যই মরিয়া বাঁচিয়া আছে! ইকবাল তাই পরিষ্কার করিয়া তাহাদিগকে শুনাইয়া দিতেছেন–

"Negation of desire is death to the living"

বাস্তবিকই তাই। আশা-আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির নামই ত মরণ! আশা আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে কিসের জীবন? আর জীবন না থাকিলে কিসের ধর্ম? কিসের লক্ষ্য? কিসের আদর্শ? জীবনকে বাদ দিলে সকলই যে ব্যর্থ! তাই ইকবাল জীবনের দিকে আমাদের দৃষ্টি এমন করিয়া আকর্ষণ করিয়াছেন।

এইখানে স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত–কবি নিছক আনন্দবাদীও নন। "Eat, drink and be merry"–'খাও দাও, স্ফূর্তি কর'–এই অর্থে তিনি জীবনকে ব্যাখ্যা করেন নাই। জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে,—সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্যই তিনি জীবনকে চান। সে জীবন পরিপূর্ণ, সুন্দর ও সতেজ। সাহিত্য, আর্ট, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানবের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ এই জীবন-বিকাশের জন্যই নিয়োজিত হওয়া উচিত। জীবন-বিকাশই ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার করিবার একমাত্র মাপকাঠি। যে-সাহিত্য, যে-আর্ট, যে-বিজ্ঞান এই জীবন-বিকাশের যতখানি সহায়ক, তাহা ততখানি সুন্দর। আর যাহা এই উদ্দেশ্য সাধনে যতখানি বিঘ্নউৎপাদক তাহা ততখানি মন্দ।

এ সম্বন্ধে ইকবাল একস্থানে বলিয়াছেন ঃ

"The ultimate end of all human activity is life–glorious, powerful, exuberent. All human art must be subordinated to this final purpose, and the value of everyting must be determined in reference to its life-yielding capacity. The highest art is that which awakens our dormant will-force and nerves us to face trials of life manfully. All that brings drowsiness and makes us shut our eyes to Reality around, on the mystery of which alone life depends, is a message of decay and death. There should be no opium-eating in Art. The dogma of 'Art for the sake of Art' is a clever invention of decadence to cheat us out of life and power."

www.pathagar.com

অর্থাৎ —"মানবের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের চরম লক্ষ্য হইতেছে—সুন্দর স্বাস্থ্যপূর্ণ গৌরবোজ্জ্বল জীবনের বিকাশ। মানুষের সমস্ত শিল্পকে এই চরম উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হওয়া উচিত এবং কোনটি কতখানি জীবন প্রদায়িনী শক্তি রাখে তাহাই দেখিয়া সমস্ত বিষয়ের ভালমন্দ বিচার করা উচিত। সেই আর্টই শ্রেষ্ঠ—যাহা জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য আমাদের মধ্যে আমাদের সুপ্ত ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করিয়া দেয়। যাহা জীবনের মধ্যে অবসাদ আনে এবং বাহিরের বাস্তব সত্যের প্রতি আমাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখে—তাহা ধ্বংস এবং মৃত্যুরই বাণী। আর্টে আফিম-খাওয়া বা নেশা-উৎপাদনের স্থান নাই। আর্টের খাতিরে আর্ট—এই যে নীতি—ইহা আমাদিগকে জীবন এবং শক্তি হইতে বঞ্চিত করিবারই একটা সুন্দর কৌশল মাত্র।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা আশা করি একথা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, ব্যক্তিত্বের শক্তি ও বিকাশের উপরেই আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে। ব্যক্তিত্বকে সবল করিয়া তুলিতে হইবে, তাহা হইলেই আমরা জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিব।

মাসিক মোহাম্মদী
১৯২৯

খুলনার স্মৃতি

বন্ধুগণ,

আপনাদের সাদর নিমন্ত্রণের জন্য আমার সশ্রদ্ধ আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। খুলনা আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়। আজ এখানে দাঁড়িয়ে সুদীর্ঘ ১৫/১৬ বছরকার পূর্বস্মৃতি আমার মনে পড়ছে। ১৯১৪-১৬ খৃষ্টাব্দে দৌলতপুর কলেজে আমি আই-এ পড়ি। তখন আমার খুলনাবাসী বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অনেকবার আমি খুলনায় এসেছি। খুলনার আকাশে বাতাসে অতীত দিনের সেই স্মৃতির খোশবু আজও যেন ভেসে বেড়াচ্ছে, আজও যেন তার রেশ আমি অন্তর তলে অনুভব করছি।

কিন্তু এই পরিচয়ের চেয়েও আর একটা নিবিড়তর মধুরতর ও সত্যতর পরিচয় আমার সাথে তাঁর আছে। সে হচ্ছে এই ঃ যশোর যখন আমার মাতৃভূমি তখন খুলনাকে অনায়াসে অমার খালার বাড়ি বলা যায়। কোন্ আদিকাল হ'তে দুটি পাশাপাশি গ্রামে যেন এই দুই বোনের বিয়ে হয়েছিল, সেই থেকে দুইবোন সন্তান-সন্তুতি নিয়ে এখানে চিরদিন বাস করে আসছে। কী অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধন এদের! পরস্পরের প্রতি কত দরদ। যশোরে যখন খেজুর রস ও পাটালি গুড় হয়, তখন সে তার বোনের বাড়িতে কিছুকিছু পাঠিয়ে দেয়। আবার খুলনার মাঠে যখন সরুসরু ধান হয়, গাছে গাছে রাশি রাশি নারিকেল ফলে, তখন খুলনাও তার আপাকে কিছুকিছু উপহার পাঠায়। শুধু ধানচাল নারিকেলই পাঠায় না, পান-সুপারিও পাঠায়। এমনি করে সুখে দুঃখে দু'বোনের দিন কাটে। যখন এপথ দিয়ে ঝড় বা সাইক্লোন বয়ে যায়, তখন দু'বোনেরই বাড়িঘর ও গাছপালা আহত হয়, দুজনেই

www.pathagar.com

কেঁদে উঠে নিজেদের সন্তান-সন্ততির অমঙ্গল আশঙ্কায়। আবার যখন নীল আকাশে চাঁদ ওঠে, তারা ফোটে, বনে বনে কোয়েল পাপিয়া ডাকে, তখন দুবোনের অন্তরই আনন্দে নেচে ওঠে। যশোরের খেজুর গাছ, খুলনার নারিকেল সুপারির গাছ—এরা যেন Wireless telegraph-এর post! এদের সাহায্যেই দুই বোনে গোপনে গোপনে মনের কথা আদান-প্রদান করে। গভীর নিশীথে কান পেতে আমি সেই মৌন সংকেত-বাণী শুনতে পাই।

বন্ধুগণ,

আপনারা যে আজ Muslim Literary Club ও Library-র একটা বার্ষিক অধিবেশন করতে পেরেছেন, এ অত্যন্ত আনন্দের কথা। আজকার উৎসব দেখে মনে হচ্ছে আপনারা জীবন্ত। জীবন সার্থক ও সুন্দর হয় তখনই—যখন আমরা আমাদের পরিপার্শ্বের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজেকে উপলব্ধি করতে পারি। পারিপার্শ্বিকতার বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে ফুটিয়ে তুলতে পারলেই সেই জীবন সার্থক ও সুন্দর হয়ে ওঠে। নতুবা সবাইকে অস্বীকার করে একা একা ঘরের কোণে বেঁচে থাকার মধ্যে কোন গৌরবও নাই—চমৎকারিত্বও নাই। আপনারা নিজদিগকে এই আলোকে দেখতে শিখেছেন দেখে খুবই উৎসাহিত হলাম। এ হেন আত্মদর্শনের প্রয়োজন আছে। প্রতিদিনের যে পরিচয়, তাতে তৃপ্তি আসে না। সে পরিচয় বিক্ষিপ্ত ও পরিব্যাপ্ত। এক একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য তাই এক একটা বিশেষ দিনকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে হয়। ঈদের দিনে বড় হয়ে জাগে শুধু ভ্রাতৃপ্রেম ও মিলন-মধুর্য। মহররমের দিনে জাগে শুধু সত্য ও আদর্শের জন্য ত্যাগ ও আত্মদানের মহিমা। লাইব্রেরী, ক্লাব বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য তেমনি এক একটা বিশেষ দিন নির্দিষ্ট করে উৎসব করলে তাতে কল্যাণ হয়। বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়; আমাদের বিক্ষিপ্ত দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয়। আপনাদের ক্লাব ও লাইব্রেরীরও আজ সেইরূপ একটা দিন। বিক্ষিপ্ত সূর্যরশ্মি যখন কেন্দ্রীভূত হয়ে আতশী কাঁচের মধ্যে দিয়ে কোন দাহ্য পদার্থের উপর গিয়ে পড়ে, তখন তাতে আগুন ধরে যায়। আপনারাও আজ তেমনি করে আপনাদের ক্লাব ও লাইব্রেরীটিকে দেখবার সুযোগ পাচ্ছেন। আশা করি আপনারা আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানকে আজ সত্য করে চিনবেন এবং এর উৎকর্ষ সাধনের জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে আত্মনিয়োগ করবেন।

খুলনা
১৯৩১

www.pathagar.com

‘মোল্লা’ ও ‘তরুণ’

কিছুদিন হইতে আমাদের সমাজে প্রবীণ ও তরুণের মধ্যে বেশ একটা দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে। সমগ্র মুসলিম সমাজ মোটামুটি ভাবে দুই দলে বিভক্ত। একদল প্রাচীনপন্থী, আর একদল নূতন বা প্রগতিপন্থী। অন্য কথায় ঃ একদল ‘মোল্লা’, আর একদল ‘তরুণ’। মোল্লাদল তরুণ-দলকে দেখিতে পারেনা। তরুণ-দলও মোল্লা-দলকে দেখিতে পারেনা। উভয়ের মধ্যে যেন আদায়-কাঁচকলায় সম্বন্ধ!

বস্তুত দুইটি বিভিন্ন মানসিকতা বর্তমান মুসলিম সমাজে ক্রিয়া করিতেছে। প্রগতিশীল তরুণ দল বলিতেছে–ইসলামের কিছু কিছু সংস্কারের প্রয়োজন, নতুবা বর্তমান যুগধর্মের সহিত পা মিলাইয়া চলা অসম্ভব। তাই তাহারা একটা “New Islam”-কে গড়িয়া তুলিতে চায়। পক্ষান্তরে মোল্লাদল বলিতেছে–ইসলাম সনাতন; তাহার বাণী সর্বযুগে ও সর্বদেশে শাশ্বত ও চিরন্তন, তাহার কোন পরিবর্তন নাই!

ইহাই বোধ হয় বর্তমান মুসলিম সমাজ-মনের দুই বিশিষ্ট রূপ। দুই দলের দুই মত ও দুই পথ। কোনটি সত্য?

আমার মনে হয়, কারো মতই অভ্রান্ত নয়। দুই দিকেই সত্য আছে; দুই দিকেই গলৎ আছে। প্রাচীন দল যখন তরুণ-দলের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করিয়া বসে এবং দিকে দিকে তাহাদের নব নব অভিযানের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়, তখন তাহারা যেমন ভুল করে, তরুণ দলও যখন তাহাদের মূল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপন পথে চলিতে চায়, তখনও ঠিক তেমনি ভুল করে। তরুণ দলের মতকে সহ্য করিতে না পারা যদি গোঁড়ামি হয়, পুরাতন দলের মতকেও সহ্য করিতে না পারা ঠিক তেমনি গোঁড়ামি। বস্তুত দুই দল দুই বিপরীত দিকের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া পরস্পর পরস্পরকে গোঁড়া বলিয়া গালাগালি দিতেছে। পুরাতন দল নব যুগের নব আলোককে কিছুতেই ইসলামের ত্রিসীমানায় ঢুকিতে দিবেনা, আবার নূতন দল পশ্চিম হইতে যাহাই-কিছু আমদানি হইবে, তাহাই নির্বিচারে গ্রহণ করিবে। এই কোন-কিছুকে গ্রহণ-না-করা আর যাহা-কিছু-সবকেই গ্রহণ করা-দুই-ই কিন্তু সমান অপরাধ। কোনোটির মধ্যেই মুক্ত মনের পরিচয় নাই। কাজেই দুই দলের মধ্যে কাহাকেও গোঁড়া বলিয়া গালাগালি দিবার কোন অধিকার কাহারও আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।

আমার ধারণা—দুই দলের এই বিরোধের প্রধান কারণ দুইটি ঃ তার একটি মোল্লাদের মধ্যে নিহিত, আর একটি তরুণদের মধ্যে। মোল্লাদের দোষ এই—তাহারা নূতনের বিরোধী; তরুণ দলের দোষ এই—তাহারা পুরাতনের বিরোধী। মোল্লাদল ভাবে ঃ নূতন যাহা সমস্তই অনৈসলামিক। তাহাদের বিশ্বাস ঃ নূতন-কিছু আসিলেই ইসলামকে কিছু না-কিছু ক্ষতি না করিয়াই যাইবে না! এই উৎকট সজাগ বুদ্ধি তাহাদের মনের এক মস্তবড়

www.pathagar.com

দুর্বলতা। উদ্দেশ্য সাধু ও মহৎ হইতে পারে, কিন্তু এর মধ্যে একটা কাপুরুষতা লুকাইয়া আছে। ইসলামকে এরূপ ভাবে দুর্গপ্রাকারের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিলে নূতনের অভিযানকেই অধিকতর শক্তিমান বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। বাহিরের আবর্জনার ভয় পুষ্করিণীরই থাকে,সমুদ্রের থাকেনা। পুষ্করিণীকে তাই পাড় দিয়া ঘিরিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু সমুদ্র?–সে চিরমুক্ত চির অবারিত। আপন শক্তিতে সে চিরদিনই আস্থাবান। নদনদীর সহস্র ধারাকে সে মুক্তি দিয়াছে ঃ ঘোষণা করিয়া দিয়াছে ঃ কে কত আবর্জনা আনিবে আন, কলুষতা আনিবে আন; সকলকেই আমি গ্রাস করিব; সকল গ্লানি, সকল মলিনতাকে আমি শোধন করিব। কোন অপবিত্রতাই সমুদ্রকে তাই স্পর্শ করিতে পারে না; বরং সমুদ্রের স্পর্শে নিজেই পবিত্র ও সুন্দর হইয়া উঠে। ইসলামও ঠিক এমনি এক মহাসমুদ্র; সকলকে সে গ্রাস করিতে জানে, কিন্তু নিজে কাহারও কাছে মাথা নত করেনা। তার হাতে আছে এক 'পরশমণি'; তাই দিয়ে সে যাহাকেই স্পর্শ করে, তাহাই সোনা হইয়া যায়। কাজেই তাহার জন্য আমাদের এত কী ভয়! কোন কালে বা কোন স্থানে যদিই কোন গ্লানি দেখা দেয়, তবে সে নিতান্তই সাময়িক; তাহাকে কোন গুরুত্ব না দেওয়াই সমীচীন। কালো মেঘে ত অনেক সময় আকাশ ছাইয়া যায়; কিন্তু অসীম আকাশের চিরন্তন নীলিমার কতটুকু ক্ষতি হয় তাহাতে? একটুও তার অপচয় ঘটে কি? ইসলামও ঐ নীল আকাশের মতই চির-মুক্ত, চির-উদার–চির-নির্মল। প্রকৃতির মত তার রূপ। কে তাহাকে কলুষিত করিবে?

দুঃখের বিষয় আমাদের মোল্লাদল ইসলামকে এই আলোকে দেখিতে শিখে নাই। তাহারা ভুলিয়া যায় যে, ইসলামের রক্ষক শুধু মোল্লা নয়–আল্লাহও! নূতনের কাছে ইসলাম যে হারিবার পাত্র নয়, নূতনকে সে যে নিজের কোলে টানিয়া লইয়া আপন করিয়া লইতে জানে, এ বিশ্বাস মোল্লা দলের খুব কম। ইসলামের স্বরূপকে তাই তাহারা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। যুগে যুগে ইসলাম যে এমনি করিয়া নূতনকে জয় করিয়া চলিয়াছে, এ কথা হয়ত তাহারা জানে না। ইসলামের সুদীর্ঘ জ্ঞান-সাধনার ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহারা বুঝিতে পারিত নূতনকে জয় করিবার কী তার দুর্জয় কৌতূহল! Helenic culture, Persian culture, Hindu culture–সকলের মধ্যেই সে প্রবেশ করিয়াছে এবং যাহা কিছু সুন্দর ও নূতন দেখিয়াছে তাহাকেই অম্লান বদনে গ্রাস করিয়াছে! নূতনকে এমন করিয়া গ্রাস করা সেও এক নুতনত্ব–সেও এক নূতন সৃষ্টি।

কত নুতনকেই না ইসলাম এমনি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। এই যে রূপে-রসে জ্ঞানে-বিজ্ঞানের সমুজ্জ্বল Modern Europe, এর জন্মদাতাই ত মুসলমান! কেন তবে নূতনকে দেখিয়া আজ এই ভীতি ও সঙ্কোচ? আমাদের জানা উচিত—নূতনকে ভয় না করিয়া, 'জয়' করাই হইতেছে ইসলামের স্বভাব।

তরুণ-দলের দোষ এই—তাহারাও ইসলামকে সত্য করিয়া চিনিতে পারে নাই; ইসলামের মর্মবাণীর সহিত তাহাদের নিবিড় পরিচয় ঘটে নাই। ইসলামের বিশ্বজয়ী রূপে তাহাদের আস্থা নাই, তাই তাহারা নূতনকে এত বড় করিয়া দেখে।

www.pathagar.com

নূতনের প্রতি এই উৎকট মোহই ইসলামের প্রতি তাহাদিগকে ভীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। বাহিরের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া যাহারা আপন ঘরের সমস্ত সম্পদকে নির্বিচারে এক মুহূর্তে বর্জন করিতে পারে, তাহারা পুরাতনকেও যেমন ভালবাসেনা, নূতনকেও তেমনি ভালবাসেনা, কেননা আর একটি নূতনতর নূতনকে দেখিলেই তাহারা যে তৎক্ষণাৎ সেই পুরাতন-নূতনকেও বর্জন করিবে, একথা অনায়াসেই বলা যায়। ইসলামের সহিত বাহিরের জিনিষের কোন আপাতবৈষম্য দেখিলেই অতটা অধীর হইয়া পড়া চঞ্চলমতিত্ব ও অদূরর্শিতারই পরিচায়ক। নূতন প্রবাহের সহিত এমন করিয়া ভাসিয়া বেড়াইলে চলিবেনা। নূতনেরও তারতম্য আছে। সব নূতনই কালের বুকে দাগ কাটিয়া বসেনা, মেঘের মত ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়া ক্ষণিকেই উড়িয়া যায়। যুগধর্মের সহিত আমাদিগকে পা মিলাইয়া চলিতে হইবে, কিন্তু তাহার নিকট অমন করিয়া আত্মসমর্পণ করিলে চলিবেনা। আমাদের বুঝিতে হইবে—যাহাকে আমরা যুগধর্ম বলি, তাহার অনেকখানিই হুজুগ-ধর্ম। এই হুজুগ-ধর্মের তাড়নায় ভাসিয়া না গিয়া তাহাকে রোধ করিতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল। যাহারা চিন্তাশীল, যাহারা মহাপুরুষ, তাঁহারা আপন চিন্তা পৌরুষ ও মহিমা দ্বারা যুগ-প্রবাহকে ফিরাইয়া দেন—যুগধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাঁহারা যুদ্ধ করেন; আর যাহারা দুর্বল ও অপরিণামদর্শী, তাহারাই নূতনের প্রথম আঘাতেই পরাজয় স্বীকার করে।

অতএব দেখা যাইতেছে তরুণ-দলের এই উৎকট নূতন-প্রীতি সর্বদা সমর্থনযোগ্য নয়। একটা শোচনীয় Inferiority Complex তাহাদের মনে ক্রিয়া করিতেছে। আজ পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে পড়িয়া মুসলিম তরুণ ভাবিতে শিখিয়াছে-তাহারা অপরের চেয়েহীন ও দুর্বল। ইসলামের সহিত বহির্জগতে যেখানেই তাহারা বৈষম্য দেখিতেছে, যেখানেই ইসলামকেই ইহার জন্য দায়ী করিতেছে। বিশ্বের সম্মুখে উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে আজ তাহারা কুণ্ঠিত—সঙ্কুচিত। সমগ্র জগত জুড়িয়া আজ ইসলামের নব জাগরণ সূচিত হইতেছে, কিন্তু বাংলার মুসলমান আজ তাহার খবর রাখে না। জগতের চিন্তাধারা আজ ইসলাম-মুখীন। ইসলামের আদর্শেই আজ সারা বিশ্ব অনুপ্রাণিত; অথচ বাংলার মুসলিম তরুণ পরের দ্বারে আদর্শ খুঁজিয়া ফিরিতেছে। যে যুগে Bernard Shaw'র মত বিশ্ব-মনীষী বলিতেছেন; "Within one century the western countires in general and England in particular will have to embrace Islam or any other religion similar to Islam."-সে যুগে বাংলার মুসলমান আত্ম-অবিশ্বাসে মুহ্যমান।

প্রতিভা ও মনীষার দিক দিয়া দেখিতে গেলেই বা আমরা কম কিসে? এই অধঃপতনের যুগেও কামাল পাশা, রেজা শাহ্ পেহ্লবী, এবনে সৌদ, আব্দুল করিম প্রভৃতি ক্ষণজন্মা পুরুষদের জন্ম হইয়াছে। মহাকবি ইকবালের কাব্য-প্রতিভায় আজ বিশ্ব-জগৎ মুগ্ধ। সঙ্গীত-জগতে আব্দুল করিম খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, বাদল খাঁ, জমীর উদ্দীন খাঁ, এনায়েত খাঁ প্রভৃতি মুসলিম শিল্পীরা আমাদের এক একটি উজ্জ্বল রত্ন। ক্রীড়া জগতে "মহামেডান

www.pathagar.com

স্পোর্টিং"-এর তুলনা নাই। বস্তুতঃ কোন বিষয়েই মুসলমান কাহারও নিকট হারিবার পাত্র নহে। অথচ এক শ্রেণীর অদূরদর্শী লেখক প্রতিনিয়ত শুধু ইসলামের "ব্যর্থতার" বাণীই শুনাইয়া আসিতেছে। এই আত্ম-অবিশ্বাস ও নিজের ঘরের প্রতি সমত্ববোধের অভাবই হইতেছে তরুণ-দলের এক মস্তবড় দুর্বলতা।

অতএব দেখা যাইতেছে, ইসলামের প্রতি তরুণ দলের যেসব অভিযোগ তাহা অনেক ক্ষেত্রেই অমূলক। প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে স্থিতিশীলতারও প্রয়োজন আছে। যে জিনিষ আজ মন্দ বা অচল বলিয়া মনে হইতেছে অথচ কালই তাহা ভাল বা সচল হইয়া যাইতেছে, তাহাকে ক্ষণিক উত্তেজনায় বিসর্জন দেওয়া সুবুদ্ধির পরিচয় নহে। মূল্যবোধেরই এ বিকৃতির লক্ষণ।

তরুণ ও পুরাতনের মধ্যে দ্বন্দ্বই বা কোথায়? কে তরুণ? কে পুরাতন? তরুণ-পুরাতনের definition কী? কোথায় উহাদের সীমা-রেখা? কোথায় উহাদের line of demarkation? তরুণ-পুরাতনের শ্রেণী-বিভাগ করিবার মাপকাঠিই বা কি? সে মাপকাঠি কি শুধু বয়সের? আমি জানিনা, বুঝিনা ইহাদের ভেদাভেদ। নির্ঝরিণী যখন কুলুকুলু নাদে বহিয়া যায়,তখন তার মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন ধারবাহিকতা থাকে। যে জলধারা চলিয়া গিয়াছে, যেটুকু যাইতেছে আর যেটুকু আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে কোন গণ্ডী কাটা নাই। কালস্রোতও সেইরূপ। একটা অখণ্ড প্রবাহ যুগ যুগ ধরিয়া বহিয়া চলিয়াছে; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তাহার বাহিরের রূপ, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে অবিভাজ্য রূপে এক; সেখানে কোন ভুত-ভবিষ্যৎ নাই; সেখানে সমস্তই চিরবর্তমান। কাজেই এই কাল-প্রবাহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিতে যাওয়া আমাদের মস্তবড় ভুল। কেহ যে একটি যায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া নূতনের স্বরূপ দেখিয়া লইবে, সে সাধ্য নাই। হেরাক্লিটাস বলিয়াছেন ঃ "I cannot bathe in the same river twice." অর্থাৎ এক-নদীতে আমি দুইবার স্নান করিতে পারি না। কথাটি খুবই ঠিক, কেননা যে-মুহূর্তে একটি লোক কোন-নদীতে ডুব দিল, তার পরমুহূর্তে সেই লোক সেই লোকও নয়, সেই নদী সেই নদীও নয়। মুহূর্তে জীবন ও জগতের এমনই বিচিত্র পরিবর্তন! এই একটানা জীবন-স্রোতের কোন খানিকে আধুনিক, আর কোন খানিকে প্রাচীন বলিব? এই মুহূর্তে যে নূতন, পরমুহূর্তেই সে যখন পুরাতন, তখন পুরাতনকে গালাগালি দেওয়া কি নূতনের শোভা পায়? নূতন যদি আজ তাহার পূর্ববর্তীদিগকে 'পচা', 'বাসি' বলিয়া গালাগালি দেয় বা নাক সিটকায়, তবে অনাগত নবীনদের হাতে সেই গালাগালি তাহাদের জন্যও সঞ্চিত হইয়া আছে, ইহা যেন তাহারা ভুলিয়া না যায়! প্রবাদ আছে ঃ 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে'। গোবরও যে দুদিন পরে ঘুঁটে হইয়া এমনি করিয়া পুড়িবে, সে কথা যেন গোবরের মনে থাকে।

বস্তুতঃ মানব-সভ্যতার কোন স্বতন্ত্র স্তর নাই। এক অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্রে গাঁথা এই সভ্যতা; এর কোন নূতন-পুরাতন নাই; প্রত্যেকের দানেই এ মহাসভ্যতা পরিপুষ্ট;

www.pathagar.com

সুতরাং ইহার কোন অংশকেই ঘৃণা করিয়া প্রত্যাখ্যান করিবার উপায় নাই। গাছে যখন ফুল ফোটে, সে তখন পুরাতন সঞ্চয়কে অস্বীকার করে না; করিলে আর সে নাই। প্রতি দিন প্রতি আলোক-কণিকায়, প্রতি রস-ধারায়, প্রতি বর্ণে প্রতি গন্ধে পুরাতন বৃক্ষটি ফুলের জীবনকে রচনা করিয়াছে; ফুল তাহার কোন টুকুকে অস্বীকার করিবে? বস্তুতঃ তরুণ পুরাতনেরই সৃষ্টি। আগা আকাশে উঠিয়া যতই আস্ফালন করুক না কেন, গোড়াকে সে কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারে না।

বিশ্ব-প্রকৃতির দিকে তাকাইলেও তরুণ-পুরাতনের এই অদ্ভুত দ্বন্দ্বের কোন সমর্থন পাইনা। একই চন্দ্র-সূর্য প্রতিদিন নব মাধুর্যে হাসিয়া উঠিতেছে; একই ঋতুচক্র তালে তালে নৃত্য করিয়া প্রতিবারে নূতন হইয়া দেখা দিতেছে; একই পুরাতন বৃক্ষে নয় নব নবপুষ্প শোভা পাইতেছে; পুরাতন পৃথিবীর বুকের উপরে এমনি করিয়া নূতনের অভিনয় চলিয়াছে। এমন কি সেই অতি পুরাতন আল্লাহ্— যিনি সমস্ত বৈচিত্র্য ও নূতনত্বের মূলধার, তিনিও সেই মামুলী চন্দ্র-সূর্য ও আকাশ-পৃথিবী লইয়া সৃষ্টি-লীলা চালাইতেছেন! এই সব পুরাতন যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করিতে সর্বশক্তিমান আল্লার কিন্তু কোন লজ্জা হয় না; অথচ প্রাচীনদের সাথে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে বা তাহাদের দানকে স্বীকার করিয়া লইতে তরুণদের ভারী লজ্জা। এ এক উপভোগ্য ব্যাপার বটে!

অতএব হে তরুণ, হে পুরাতন! এস, আজ একসঙ্গে মিলিত হও। সমস্ত গ্লানি ভোল; সমস্ত বিরোধ ভোল। আজ উভয়েই মনে-প্রাণে উপলব্ধি কর তোমরা এক; তোমাদের লক্ষ্য এক, তোমাদের উদ্দেশ্য এক। এই যে নিখিল জগৎ শত বর্ণে, শত সুষমায় প্রকাশ পাইতেছে; এই বৈচিত্র্যের মূলে যেমন কোন বিরোধ নাই—এক গভীর ঐক্যসূত্রে যেমন ইহারা পরস্পর আবদ্ধ এবং সকলেই যেমন তাহাদের স্রষ্টাকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তন করে, তোমরাও তেমনি একই লক্ষ্যে একই কেন্দ্রে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আপন বৈচিত্র্যে বিকশিত হও। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যেমন Unity in diversity-র সন্ধান পাওয়া যায়, তোমাদের বৈচিত্র্যের মধ্যে তেমনি একটা গভীর যোগ-সূত্র থাক্। আজ কেহই বিচ্ছিন্ন হইওনা, মিলিত হও। আজকার দিনে তোমাদের সংহতি ও মিলনের নিতান্ত প্রয়োজন।

ওগো পুরাতন, ওগো 'মোল্লা', এস' তোমাকে আজ আলিঙ্গন করি। তুমি ঘৃণ্য নও, তুচ্ছ নও; শ্রদ্ধাবনত মস্তকে তোমার দানকে আজ আমরা স্বীকার করি। জাতির জীবন-যুদ্ধে তুমিও একজন বীর মুজাহিদ। তোমার প্রয়োজন ছিল, এখনও আছে। এস, আজ হাতে হাত মিলাও। কাহাকে তুমি 'তরুণ' বলিয়া দূরে ঠেলিয়া দিতেছ? সে যে তোমার নিতান্ত আপন। একটু উদার হও, মনকে একটু সহজ ও সরল কর—তরুণকে স্নেহ-আশীর্বাদ দাও। ওরা তরুণ, ওদের যৌবন-ধর্মকে আঘাত করিও না; কল্যাণের পথে এই শক্তিকে নিয়োজিত কর। তরুণদের দোষ থাকিতে পারে; কিন্তু এমন গুণও ত অনেক আছে—যা তোমাদের মধ্যে নাই। সেগুলিকে কেন স্বীকার কর না? এই যে 'মহামেডান

www.pathagar.com

স্পোর্টিং' আজ মুসলমান জাতির জন্য নবগৌরব ও নব মহিমা বহন করিয়া আনিল, সমগ্র জাতির শিরায় শিরায় এক অপূর্ব উন্মাদনা ও কর্মপ্রেরণা জাগাইয়া দিল, সে কাহারা? সে ঐ তরুণ দল। কেন তবে তরুণকে ঘৃণা করিবে?

আর তরুণ! এই কি তোমার তারুণ্য! প্রাচীনকে অবজ্ঞা করা কি তোমার শোভা পায়? তরুণের ধর্মই হইতেছে প্রাচীনের বুকের উপরে দাঁড়াইয়া সে তার বিজয়-নিশান উড়াইবে। পুরাতনের সকল দৈন্য ও অক্ষমতাকে স্বীকার করিয়াই তরুণকে আসিতে হইবে। আছে–এত সম্পদ আছে যে, প্রাচীনের দৈন্য ঘুচাইয়াও তার হাতে ঢের প্রাণ তরুণের এত প্রাণ অবশিষ্ট থাকে। এই জন্যই ত তার জয়। তোমরা তরুণ, তোমাদের সেই অফুরন্ত প্রাণ-প্রাচুর্য্য কই? তোমরা কি রিক্তহস্তে আসিয়াছ? তোমরা কি তবে শক্তিহীন? যে তরুণ পুরাতনের সহিত নিজকে খাপ খাওয়াতে পারে না, সে তরুণ জঈফ্–দুর্বল। পুরাতনকে অস্বীকার করাই হইতেছে পুরাতনকে স্বীকার করা। এই পরাজয়ের গ্লানি কি তোমরা বহন করিবে? না। তাহাদিগকে জয় কর। তাহাদের আস্থা অর্জন কর। তোমরা ফুলের মত তরুণ হও। ফুল যখন ফুটে, তখন তাহারা পুরাতন কাণ্ডকে নীরব ভাষায় এই আশ্বাসই দেয় যে, তোমার কোন ভয় নাই; আমার দক্ষিণ সমীরণে আসিয়া খেলিয়া নাচিয়া গাহিয়া ঝরিয়া যাইব বটে; কিন্তু যাবার বেলায় রাখিয়া যাইব তোমার শাখায় শাখায় অজস্র ফলের বিপুল সম্ভাবনাকে আর বাড়াইয়া যাইব তোমার দেহের পরিপুষ্টি ও রূপশ্রীকে।

হে তরুণ! মনে রাখিও—দূরন্ত চপলতা তোমার বাহিরের প্রকৃতি, কিন্তু তাপসের কৃচ্ছ্র সাধনা তোমার অন্তরের মূর্তি। তোমার পথ কুসুমাস্তৃত নহে, সে পথ অতি বন্ধুর। কঠোর ত্যাগ, সাধনা ও সংযমের পথ দিয়া তোমাকে চলিতে হইবে। যে পথ দিয়া অষ্টাদশ বর্ষীয় তরুণ যুবক মোহাম্মদ-বিন-কাসেম মরুদরী পার হইয়া সিন্ধু-বিজয়ে আসিয়াছিল, যে পথ দিয়া কিশোর বাবর ভারত জয় করিয়াছিল, যে পথ দিয়া আজিও বিশ্বের তরুণ কাফেলা এভারেস্ট-বিজয়ে চলিয়াছে, সে-ই তোমাদের চলার পথ। সুন্দর স্বাস্থ্যপূর্ণ, গৌরবোজ্জ্বল জীবনের বিকাশই হইবে তরুণের পরম সাধনা।

সত্যবার্তা

১৯৩৮

www.pathagar.com

লুৎফর রহমান

মরহুম ডাঃ লুৎফর রহমান সাহেবের সহিত আমার প্রথম পরিচয় ঘটে সম্ভবত ১৯১৬। ১৭ সালে—যখন তিনি কলিকাতায় টেলার হোস্টেলে থাকিয়া আই-এ পড়িতেন। আমিও সেই সময় টেলার হোস্টেলে ভর্তি হইবার জন্য আসি। তখন হোস্টেলের সুপারিন্টেনডেন্ট ছিলেন তাহারই স্বগ্রাম (হাজিপুর) নিবাসী মৌলভী সিরাজুল ইসলাম এম-এ। তাঁহারই মধ্যস্থতায় আমরা উভয়ে উভয়ের সহিত প্রথম পরিচিত হই। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। আমার বেশ মনে পড়ে—আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহারি মুখে তাঁহারি রচিত একটি কবিতা শুনিতেছিলাম। বলা বাহুল্য— প্রথম জীবনে তিনি কবিতাই লিখিতেন; এবং সে কবিতাগুলির মধ্যে নবচিন্তা ও নবভাবের সমাবেশ থাকিত। তাঁহার কয়েকটি কবিতা বোধ হয় "আল্-এসলাম"-এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯২২/২৩ সালে পুনরায় কলিকাতায় তাঁহার সহিত সংস্পর্শ ঘটে। একদিন হঠাৎ তিনি আমার বাসায় আসিয়া জানান—তিনি 'নারীতীর্থ' খুলিয়াছেন, সে জন্য আমাদের সাহায্য ও সহানুভূতি চান। দুস্থ মানবতার জন্য মুখে তখন তাঁহার কী অপরিসীম বেদনা! 'নারীতীর্থে'র উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি কি হইবে, জিজ্ঞাসা করায় তিনি ব্যাখ্যা করিলেন—"পতিতা নারীদিগকে লইয়াই প্রথম আমি কাজ আরম্ভ করিব।—পাপের পথ হইতে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিব এবং তাহারা যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিত পারে, তজ্জন্য একটা নারীশিল্প-শিক্ষালয় খুলিব।" দেখিলাম একটা সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া তিনি এসব কথা বলিতেছেন না; লাঞ্ছিতা নারী-জাতির জন্য সত্য সত্যই তিনি বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের মুক্তির জন্য সত্যই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি ৫১ নং মির্জাপুর স্ট্রীটে একটি নারীশিল্পবিদ্যালয় খুলিলেন এবং সেখানে চরকায় সূতাকাটা ও বই-বাঁধাই প্রভৃতি কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ৭/৮ জন পতিতা ও দুস্থা নারী নিয়মিতভাবে সেখানে আসিয়া কাজ শিক্ষা করিতে লাগিল। কলিকাতার ও মফস্বলের অনেক কাগজেও এই নব আন্দোলনের কথা প্রচারিত হইল এবং হিন্দু-মুসলমান সকলেই ডাক্তার সাহেবের এই প্রচেষ্টার প্রতি আর্থিক ও নৈতিক সহযোগিতা দেখাইতে লাগিলেন।

একদিনকার একটি ঘটনার কথা বলি। ডাক্তার সাহেব আসিয়া আমাকে বলিলেন ঃ 'চলুন, আজ আপনাদিগকে 'হাড়কাটা' গলির একটা বাড়িতে লইয়া যাইব; সেখানে আমার কয়েকজন শিষ্য আছে!" আমাদেরও খুব কৌতূহল জন্মিল। আমরা ২/৩ জন ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে চলিলাম। জীবনে এ এক নব অভিজ্ঞতা! অতি সংকোচের সহিত আমরা 'হাড়কাটার' একটা বাড়ীতে ঢুকিলাম। একটি বেশ্যা লুৎফর রহমান সাহেবকে দেখিয়াই অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত আসিয়া গড় হইয়া তাঁহাকে 'প্রণাম' করিল। তারপর একে একে আরও ৩/৪ জন মেয়ে সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাঃ সাহেব তখন তাহাদিগকে বহু উপদেশ দিতে লাগিলেন। সে উপদেশ যে মেয়েরা প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিল, তাহা বেশ বুঝা গেল।

ক্ষণকাল পরে একটি স্ত্রীলোক কয়েকটি পান সাজিয়া আনিয়া আমাদের সম্মুখে রাখিল। ডাক্তার সাহেব এবং আমার বন্ধুরা সে পান গ্রহণ করিলেন, কিন্তু আমি খাইলাম না। তাহা দেখিয়া ডাঃ সাহেব বলিলেন, "খান না? কোন দোষ নাই। উহারা যখন পাপ-পথ ছেড়ে দিয়ে পুণ্যের পথে আসছে, তখন ওদেরে ঘৃণা করবেন না। পথহারাদের পথে ফিরে

www.pathagar.com

আসতে সাহায্য করুন।" আমি একটি পান মুখে দিলাম বটে, কিন্তু সংস্কারের বশে গা ঘিন্‌ঘিন্ করিতে লাগিল।

এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ সাহেব 'নারীশক্তি' নামক একটি পত্রিকাও প্রকাশ করিতে থাকেন। সে কাগজে প্রধানতঃ নারী-জাতির অভাব-অভিযোগের কথাই আলোচিত হইত। আমিও মাঝেমাঝে ঐ কাগজে কবিতা লিখিতাম।

কিন্তু মানুষ সব সময়েই অবস্থার দাস। অন্তরে প্রেরণা জাগিলে কী হয়! অনুকূল অবস্থা ও সুযোগ না জুটিলে বহু সৎপ্রতিষ্ঠানও ধ্বংস হইয়া যায়। ডাঃ লুৎফুর রহমানের এই অভিনব প্রচেষ্টাও এই কারণে বেশীদিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। একে ত দেশবাসী আশানুরূপ সাহায্য করে নাই, তার উপর তিনি দৈন্য ও অভাবের তাড়নায় দিশেহারা হইয়া পড়িলেন। ইহার উপরে তিনি আবার মারাত্মক ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইলেন। স্ত্রী ও পুত্রকন্যা লইয়া কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

অবস্থার চাপে পড়িয়া বাধ্য হইয়া তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া দেশে গেলেন। দুর্ভাগ্য বতশঃ তাঁহার পিতার সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিলনা। পুত্রের সব অদ্ভুত খেয়াল হয়ত পিতার ভাল লাগে নাই; তাই তিনি লুৎফর সাহেবকে কোনরূপ সাহায্য করেন নাই। ডাঃ সাহেবও ত্যাজ্য পুত্রের মত পিতার কোনো সাহায্য না লইয়াই স্বাধীন ভাবে জীবন্ কাটাইয়া গিয়াছেন। ডাঃ লুৎফর রহমানের চরিত্রের এও একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁহাদের বাড়ীতে মস্ত বড় দালান; তাঁহার পিতার অবস্থা খুবই ভাল; জমাজমি, টাকাকড়ি যথেষ্টই তাঁহাদের ছিল; কিন্তু নিজের principle- কে বিসর্জন দিয়া তিনি ঐ অগাধ সম্পত্তি ভোগ করিবার জন্য লালায়িত ছিলেন না। তিনি পিতাকে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু স্বীয় মত ও পথকে ত্যাগ করিলেন না। স্বগ্রাম হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্তী মাগুরায় আসিয়া তিনি এক কুটীর বাঁধিলেন এবং কতিপয় পেটেন্ট ঔষধ আবিষ্কার করিয়া—তাহারি উপর নির্ভর করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। এই অবস্থায় একদিন আমি তাঁহার মাগুরার বাসায় গিয়াছিলাম। তখন তিনি রোগে শয্যাগত। তাঁহার স্ত্রীর এবং ছেলে মেয়ের তখন কী কষ্ট! অথচ লুৎফর রহমান সাহেব তখনও অচল অটল!

ডাঃ লুৎফর রহমানের জীবন ছিল একটা ত্যাগ ও সংগ্রামের জীবন। সত্যের সন্ধানে তাঁহার ব্যথিত আত্মা সারাজীবন সংগ্রাম করিয়া ফিরিয়াছে। হয়ত তাঁহার মত ও পথ সর্বদাই অভ্রান্ত হয় নাই; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার সাধনার মধ্যে কোনরূপ কৃত্রিমতা ছিল না। তিনি যাহা বলিতেন,তাহা অন্তর দিয়ে অনুভব করিতেন। সত্যদৃষ্টি ও গভীর অনুভূতি না থাকিলে তাঁহার বাণী কখনও আমাদের প্রাণে এমন করিয়া দাগ কাটিয়া বসিত না।

একটা সত্যকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কতখানি ত্যাগ ও সাধনা করিতে হয় এবং কিরূপ ভাবে প্রতিনিয়ত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হয়, ডাঃ লুৎফর রহমান তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত! এই সুমহান ত্যাগ, এই একনিষ্ঠ সাধনা এবং এই গভীর সত্যানুভূতিই ডাঃ সাহেবের চরিত্রের বিশেষত্ব। এই দিক দিয়া তিনি বাংলার মুসলিম সাহিত্যিকদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। এতবড় সাধক-সাহিত্যিক আমাদের মধ্যে বোধ হয় আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই।

তাঁহার এই ত্যাগ,এই সত্য-সাধনা ব্যথিত নিপীড়িত মানবতার প্রতি তাঁহার পুণ্যস্মৃতি আমাদের জীবনে চির-জাগ্রত থাকুক, তাই প্রার্থনা করি।

মোয়াজ্জিন

১৯১৮

www.pathagar.com

ইসলাম ও সঙ্গীত

বন্ধুগণ,

সুরের পিয়ালা হাতে নিয়ে সুরসাকী আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আপনরাও সেই সুর-শারাবের রঙিন নেশায় আজ মশগুল্। কাজেই উভয়ের মাঝখানে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমি রসভঙ্গ করতে চাইনা। শুধু একটি প্রশ্ন আমি করতে চাই ঃ সঙ্গীত মুসলমানদের জন্য যায়েজ ত?

এই বিতর্ক-মূলক সমস্যার আমি কোন সুদীর্ঘ আলোচনা করতে ইচ্ছুক নই। আমি প্রথমেই স্বীকার করে নিচ্ছি যে, এ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে দুইটি বিশিষ্ট মত আছে। একদল সঙ্গীতকে স্বীকার করেন, অন্যদল করেন না। উভয়েরই স্বপক্ষে-বিপক্ষে অনেক যুক্তিতর্ক আছে। তবে এই সংঘর্ষের মধ্য থেকে একটা অবিসম্বাদিত সত্য এই বেরিয়ে এসেছে যে, আলেম-সমাজ সঙ্গীতের উপর ১৪৪ ধারা জারী করা সত্ত্বে যুগে যুগে দেশে দেশে মুসলমানেরাই কিন্তু সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ সাধক রূপে পরিগণিত হয়ে আসছে।

হজরত মুহাম্মদ পূর্ববর্তী পয়গাম্বরদিগের সময় থেকেই সঙ্গীতের ধারা ব'য়ে আসছে—একটানা স্রোতে। হজরত দাউদ তাঁর সুললিত কণ্ঠসঙ্গীতের জন্য (লেহান দাউদী) চিরপ্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। হজরত মূসা যখন বনি-ইসরাইলদিগকে নিয়ে নীল নদ পার হয়ে যান, তখন বনি-ইসরাইল রমণীরা আনন্দে অধীর হয়ে দফ্ বাজিয়ে গান করতে থাকে। হজরত মুহাম্মদের সময়েও আরব দেশে সঙ্গীতের অবাধ প্রচলন ছিল। নির্দোষ ও পবিত্র সঙ্গীতে আমাদের প্রিয় নবীর যে কোনই আপত্তি ছিল না, কয়েকটি হাদিস থেকে তা আমরা জানতে পারি। বস্তুতঃ পবিত্র কুরআর এবং হাদিসে এমন কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ নাই যে সঙ্গীত মুসলমানদের জন্য বিলকুল হারাম। তা যদি থাকত, তবে হজরতের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই খলিফাশ্রেষ্ঠ হজরত ওমর নিজেই সঙ্গীত রচনা করতেন না। তিনি সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ইবনে-সুরঈদের' উৎসাহদাতা ছিলেন। খলিফা হজরত আলী ও হজরত মাবিয়া উভয়েই সঙ্গীতের আলোচনা করেছেন। খলিয়া অলিদ একজন প্রসিদ্ধ বীণাবাদক ছিলেন। খলিফা আবু আব্বাস এবং মনসুর সঙ্গীত ও অন্যান্য ললিত-কলার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। খলিফা হারুন-আল-রশিদের নাম না করলেও চলে। বস্তুতঃ খলিফাদের সময়ে বাগদাদ, পারশ্য, কর্ডোভা ও গ্রানাডাতে সঙ্গীতের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। ইতিহাসে তার সাক্ষী।

অন্য পরের ত কথাই নাই, স্বয়ং খলিফাতুল-মু'মিনিনদিগের সম্বন্ধেই এই কথা!

তারপর ভারতবর্ষ। সুদীর্ঘ মুসলিম শাসনে ভারতীয় সঙ্গীত মুসলমানদিগের হাতে এক নবজীবন লাভ করেছে। ভারতীয় সঙ্গীতের চারটি বড় বিভাগ আছে ঃ (১) ধ্রুপদ, (২) খেয়াল, (৩) টপ্পা, (৪) ঠুংরি। আপনারা শুনে হয়ত বিস্মিত হবেন যে, একমাত্র ধ্রুপদ ছাড়া অন্য তিনটি বিভাগই মুসলমানদিগের সৃষ্টি। হিন্দু-সাধকেরা সঙ্গীতকে ধ্রুপদের কারা-প্রাচীরে বদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন। মুসলমান এসে তাকে মুক্তি দিয়েছে; অন্তহীন সম্ভাবনার

www.pathagar.com

আলোকে এনে তাকে দাঁড় করিয়েছে। প্রবাদ আছে যে, সম্রাট আলাউদ্দীনের সভাকবি ও সভাগায়ক আমির খসরুই খেয়াল গানের স্রষ্টা। খেয়াল গানের উৎকর্ষ যখন চরমে পৌঁছায়, তখন পাঞ্জাবের শোরী মিঞা টপ্পা গানের প্রচলন করেন। কিছুকাল পরে লাক্ষ্ণৌ-এর সনদ ও কদরের প্রতিভায় ঠুংরি গানের জন্ম হয়।

মুসলমান আমলে আমির খসরু, তানসেন, ধোধি খাঁ, সুরয খাঁ, চাঁদ খাঁ শোভন খাঁ, শোরী, হমদম, মৌলাদাদ, ইলিয়াস, গোলাম নবী, সনদ, কদর, সদারঙ্গ, অদারঙ্গ, খুশাল খাঁ, নবাব ওয়াজেদ আলি প্রভৃতি অসংখ্য ক্ষণজন্মা সঙ্গীত-প্রতিভা জন্মলাভ করেছে। ভারতীয় মুসলমানদের এই অধঃপতনের যুগেও আর-কিছুতে না হোক—অন্ততঃ সঙ্গীতে মুসলমান সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। আলাবন্দে খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, নাসিরুদ্দীন খাঁ, আবদুল করিম খাঁ, হাফিজ আলী খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ, এনায়েৎ খাঁ, জমিরুদ্দীন খাঁ প্রভৃতি অসংখ্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুরশিল্পীর নাম এখনও আমরা সগৌরবে করতে পারি।

শুধু গায়ক হিসাবে নয়,—রাগ-রাগিণীর দিক দিয়েও সঙ্গীতে মুসলমানের দান অপরিসীম। বহু নূতন রাগ-রাগিণী মুসলমান সুরশিল্পীরা সৃষ্টি করে গেছেন। আড়ানা, মিয়াঁ-মল্লার, মিঁয়া সারঙ্গ, মিয়াঁকি জয়জয়ন্তী, হোসেনী কানাড়া, দরবাড়ী কানাড়া, দরবারী তোড়ী, বাহার ইত্যাদি বহু রাগ-রাগিণী মুসলমানদের দান।

এইবার সাধারণ ভাবে একটু আলোচনা করা যাক। সঙ্গীত মানুষের এত প্রিয় কেন? হাজার হাজার ফতোয়াও মানুষকে সঙ্গীত থেকে বিরত রাখতে পারে না কেন? তার কারণ—সঙ্গীতের সঙ্গে মানব-মনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। এই নিখিল সৃষ্টির মূলে আমি শুধু দুইটি উপাদানই লক্ষ্য করি ঃ এক হচ্ছে সুর, আর হচ্ছে নূর। সুর আর নূরের ভিতরেই সৃষ্টি ডুবে আছে। আকাশে তাকাও, পাতালে তাকাও—সর্বত্র রূপের লীলাখেলা। পথে-প্রান্তরে অন্তরে-বাহিরে—যেদিকে যখনি কান দাও,—সর্বত্র সুরের লীলা-তরঙ্গ। বিশ্ব-বীণার তারে তারে নিশিদিন অবিশ্রান্ত সুর ধ্বনিত হচ্ছে। কান পাতলেই তা শুনা যায়।

এই সুর আর নূরের উপাদান মানুষের মনের মধ্যেও লুকিয়ে আছে। সুর আর নূরে তাই মানব-মন এমন ক'রে সাড়া দেয়। এ সম্বন্ধে একটা সুন্দর প্রবাদ-বাক্যও আছে। কথিত আছে যে, আদিমানব হজরত আদমের দেহ-সৃষ্টির পর তাঁর দেহাভ্যন্তরে (কল্‌বের মধ্যে) যখন খোদা তা'লা রুহ্ (আত্মা) প্রবিষ্টকরান, তখন রুহ্ সেখানে থাকতে চাইল না,—ছটফট করে বেরিয়ে এল। তখন খোদা তা'লা ফেরেশতাদিগকে সেই কলবের কুঠরিতে আলো দিতে বললেন। অপূর্ব রূপচ্ছটায় কল্‌ব আলোকিত হয়ে গেল। তখন রুহকে পুনঃপ্রবিষ্ট করান হ'ল। এবারও রুহ্ থাকতে চাইল না। তখন খোদাতালার হুকুম হ'ল—কলবের চারিদিকে সুমধুর বাদ্যধ্বনি কর। এইবার রুহ শান্ত হয়ে আদমের দেহে রয়ে গেল।

এই উপাখ্যানের মূলে গভীর সত্য নিহিত আছে। বাস্তবিকই সুর আর নূরই হচ্ছে নিখিল সৃষ্টির দুই মৌলী উপাদান। এই যে বিশ্ব প্রকৃতি নিতি নব ভাবে এমন রূপ-সুষমার প্রকাশ পাচ্ছে; এই যে ফুল ফুটছে, চাঁদ হাসছে; দিকে দিকে লোকে লোকে এই যে

www.pathagar.com

সুমধুর সঙ্গীত-ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে, এ একেবারে নিরর্থক নয়। বিরাট বিশ্বের সমবেত আত্মাকে মশগুল ক'রে রাখবার জন্যই খোদাতালার এই বিপুল আয়োজন। বিশ্বের বিরহী আত্মা এই পরের ঘরে থাকতে চায়না; ছুটে যেতে চায় তার পরম প্রিয়জনের খোঁজে, তাই খোদাতালা তাঁর রূপ ও তাঁর সুরের পরশ দিয়ে তাকে শান্ত ক'রে রেখেছেন। প্রিয়জনের দেখা পায় না বটে, কিন্তু সে পায় তার একটু আভাস-একটু মৃদু-গুঞ্জন! বস্তুত সেই অজানা অচেনা প্রিয়তমকে খুঁজতে হ'লে আমাদের কাছে তাঁর শুধু এই দুইটি নিদর্শনই আছে—সুর আর নূর। যে-মানুষের অন্তর এই দু'টি পথের ইঙ্গিতকেই অস্বীকার করে, তার কোন আশা-ভরসা নাই। Shakespeare এই রকম লোক সম্বন্ধেই বলেছেন-তারা 'fit for treason and murder'.

মানুষের জীবনে ললিত-কলার প্রয়োজন আছে। যে জাতীয় উন্নতির দোহাই দিয়ে সঙ্গীত ও অন্যান্য কলাবিদ্যাকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়, সেই জাতীয় উন্নতির জন্যও এর অপরিহার্য প্রয়োজন। সুন্দরের সাধনা মানুষের মনকে সুন্দর করে, অসুন্দরকে ঘৃণা করতে শিখায়। যার মনে সৌন্দর্যবোধ জন্মেছে, সে ভিতরে বাহিরে কোন দিক দিয়েই অসুন্দরের সঙ্গে মিতালি করতে পারে না। তাজমহলের সৌন্দর্য যদি আমায় পাগল করে তুলে, তবে কুঁড়ে ঘরে নোংরা জীবন যাপন করতে আমার সাধ যায় না। একটা অভাবের তীব্র অনুভূতি আমার সারা চিত্তকে চঞ্চল করে তোলে। আজ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রতি কার্যে আমরা অসুন্দরকে নিয়ে ঘর করছি। আমাদের যা আছে, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট হ'তে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছি। আমাদের চোখের সামনে আজ কোন সুন্দরের আদর্শ নেই; অসুন্দরকে জয় করে আমরা সুন্দর হব,পূর্ণ হব-এই সাধনাও নেই। এর প্রধান কারণ-আমাদের জীবনে সৌন্দর্য ও সুর নেই-উচ্ছৃঙ্খল এলোমেলো জীবন আমরা যাপন করছি; তার মধ্যে কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা বা তাল নেই। তালকে আমরা হারাম বলে দূরে সরিয়ে রেখেছি; কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না যে, তালই হচ্ছে নিখিল সৃষ্টির গূঢ় রহস্য। বিশ্ব-প্রকৃতি ছন্দতালে পরিপূর্ণ। ঋতুচক্রের আবর্তনের নৃত্যে কোনদিন তাল কাটে না! গ্রীষ্ম বর্ষা, শীত, বসন্ত—সবাই তালে তালে নেচে যায়, কেউ কারো আগে-পাছে আসে না! গাছে গাছে ফুলে ফোটে, ফল ধরে—সবই তালে তালে। চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্র তালেতালেই আসে, তালে তালেই চলে যায়। আমাদের শিরায়-শিরায় ধমনীতে-ধমনীতে যে রক্ত-প্রবাহ বয়ে চলেছে, তার মধ্যেও রয়েছে তাল। কী সুন্দর তালে তালেই না নাড়ী আমাদের স্পন্দিত হচ্ছে! মানুষ যে স্বাভাবিক ভাবে হেঁটে যায়, তার মধ্যেও দেখা যায় তাল। একটা পা বেতালে ফেলেছে কি দড়াম করে পড়ে যাবে। বস্তুতঃ তাল কেটে গেলে সৃষ্টির সব কিছুই অচল হয়ে যায়। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, মুসলমানের চলার ছন্দে তালের কোন স্থান নেই! সুর,তাল বা রূপ আমাদের জীবনে নিষিদ্ধ।

অবশ্য একটা কথা আছে। আমাদের আলেম-সমাজ সঙ্গীতকে যে না-যায়েজ ব'লে ফতোয়া দিয়েছেন, তারও কি কোন সঙ্গত কারণ নেই? নিশ্চয়ই আছে। সঙ্গীত বলেই যে

www.pathagar.com

সঙ্গীত হারাম, তাও যেমন নয়, আবার সঙ্গীত বলেই যে সঙ্গীত হালাল, তাও তেমনি নয়। প্রত্যেক জিনিষেরই ভাল-মন্দ আছে। সঙ্গীত একটি তলোয়ার বিশেষ। যার হাতে যখন থাকে তার ইঙ্গিতেই চলে। ভাল লোকের হাতে থাকলে ভাল ফল হয়, মন্দ লোকের হাতে থাকলে মন্দ ফল হয়। এমন যে হালাল জিনিষ ভাত, তাকেও পচিয়ে খেলে হারাম হয়ে যায়। কাজেই সর্বত্র আমাদের বিচার-বুদ্ধির প্রয়োজন। সঙ্গীত মানুষকে উন্নতির দিকেও তুলে নিতে পারে, আবার ধ্বংসের মুখেও ঠেলে দিতে পারে। সঙ্গীতের আসক্তি কত জাতির পতনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এটাও অস্বীকার করবার উপায় নাই। অবশ্য এটা সঙ্গীতের দোষ নয়; ব্যবহারকারীর দোষ।

কোন্ পথে চলবে তবে? মুসলমানের সঙ্গীত সাধনা করা উচিত, না অনুচিত? অন্য কথায় আবার সেই পুরাতন প্রশ্ন ঃ ইসলামে সঙ্গীত যায়েজ, না না-যায়েজ?

আমার মতে ইসলামে সঙ্গীত যায়েজও বটে, না-যায়েজও বটে। ইসলামে সঙ্গীত নিষিদ্ধও বটে, আবার ইসলামই সঙ্গীতের প্রকৃষ্ট বিকাশ-ক্ষেত্রও বটে। কেমন ক'রে বলছিঃ

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কেমন করে তৈরী হয়, তা বোধ হয় সকলেই আপনারা জানেন। এলোপ্যাথিক ও হোমিপ্যাথিক উভয় ঔষধের উপাদান একই; তবে এলোপ্যাথিক স্থূল, আর হোমিওপ্যাথিক সূক্ষ্ম। হোমিওপ্যাথিক মতে যে ঔষধ স্থূলকে এড়িয়ে যতই উর্দ্ধে উঠে যায়, ততই তার শক্তি বেড়ে যায়।

সঙ্গীতেরও এমনি দুই রূপ। একটি এলোপ্যাথিক সঙ্গীত, আর একটি হোমিওপাথিক সঙ্গীত। যে সঙ্গীত স্থূলকে এড়িয়ে যত উর্দ্ধে উঠবে, সেই সঙ্গীত তত সুন্দর ও সার্থক হবে। এই কারণেই নারী-কণ্ঠের গান আমাদের এত ভাল লাগে। তার মধ্যে সুর অপেক্ষা সুরের ইঙ্গিতই থাকে বেশী। বলা বাহুল্য, এই ইঙ্গিতই হচ্ছে সঙ্গীতের প্রাণ। সঙ্গীতের চরম সার্থকতা সেইখানে–যেখানে সে অনির্বাচনীয়কে রূপ দিতে পারে। যে সঙ্গীত সান্তের মধ্যে অনন্তকে রূপায়িত করে তুলে—সসীমের বুকে অসীমের ছায়া ফেলতে পারে—সেই সঙ্গীতই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত। বলা বাহুল্য মুসলমানের কণ্ঠেই এই উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত বেশী ক'রে ধরা পড়ে। তার কারণ–মুসলমান অসীমের ধেয়ানী; জড়ের পূজা সে করে না, সে করে নিরাকারের উপাসনা। তাই তার কণ্ঠে ফুটে উঠে সেই অনির্বাচনীয় অব্যক্তের ইঙ্গিত, আর তাতে করেই সে হয়ে উঠে উচ্চ শ্রেণীর সুরশিল্পী। মুসলমানদের মধ্যে এত যে ওস্তাদ, তার প্রদান কারণই হচ্ছে এই।

ইসলাম এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পক্ষপাতী। যে কারণে সে পৌত্তলিকতার বিরোধী, সেই কারণে যে স্থূল সঙ্গীতেরও বিরোধী। স্থূল সঙ্গীত যেন সঙ্গীতের সাকার মূর্তি; মুসলমানেরা সে সঙ্গীতের পূজারী নয়; সে সঙ্গীত তাদের জীবনে খাপও খায় না। সে চায় অশরীরী সঙ্গীত–বেতার যন্ত্রে তার যাওয়া আসা, আর তাকে শুনতে হলে মনের গোপন গহনে বসে অন্তরের Receiver দিয়ে শুনতে হয়। যাঁরা অলী-আল্লা, সাধক বা দরবেশ, তাঁরা এই অশরীরী সঙ্গীতই শুনে থাকেন। বাণী যেখানে স্তব্ধ হয়ে যায়, সেখান থেকে তাঁরা যাত্রা শুরু করেন।

www.pathagar.com

বন্ধুগণ!

বর্তমান যুগে বাঙালী মুসলমানের সঙ্গীত-সাধনা সম্বন্ধে দু'চার কথা না বললে আমার এই আলোচনা নিতান্তই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আজ মনে পড়ে দীর্ঘ পঁচিশ বছর আগের কথা। বাংলার মুসলিম যুবকদের মধ্যে তখন সঙ্গীতের অনুরাগ জন্মেছে। ভিতরে ভিতরে তারা গান গাইবার জন্য খুবই আগ্রহান্বিত ছিলেন, কিন্তু সমাজের কঠোর শাসনের ভয়ে প্রকাশ্যে কেহই গান করতে সাহস করতেন না। সে যুগে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক কে, মল্লিক পর্যন্ত নিজের নাম প্রকাশ করতে সাহস করেন নি। তখন যারা গান গাইতেন, তাদের বাধ্য হয়ে অনৈসলামিক গানই গাইতে হ'ত; জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা বা ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সে সব গানের তেমন কোন সঙ্গতি বা সংযোগ ছিল না। পরের গান গেয়ে গেয়ে শুধু তারা সুরের নেশা মেটাতেন। এই অভাব মর্মে মর্মে অনুভব ক'রে ছিলাম বলে প্রথম থেকেই আমি জাতীয় ভাবধারার অনুসারী সঙ্গীত রচনা করে সমাজে প্রচার করতে প্রয়াস পাই। 'জাগরে সুপ্ত স্বজাতি আমার," "রুদ্ধ দ্বার আজ মুক্ত কর তোল, ওঠ্ জেগে ভাই মুসলেমিন", ইত্যাদি আমার কতিপয় জাতীয়-সঙ্গীত সেই যুগের রচিত। উর্দূ-গজল ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের চমকপ্রদ সুর বাংলা ভাষায় আমদানি করা যায় কি না, সে খেয়ালও আমার মনে জেগেছিল। সৌভাগ্যক্রমে তখন মুসলিম বাংলার খ্যাতনামা সুরস্রষ্টা 'খসরু' সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। তৎকালে তিনি কলিকাতায় এবং মফঃস্বলে একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী গায়ক রূপে খ্যাতি লাভ করেন। তাহারি ইঙ্গিতে আমি সর্বপ্রথম গজলের সুরে "যাও প্রভাত-সমীর যাও, মোর দিল্-দরদীর কাছে যাও" এই গানটি রচনা করি। এটি খসরু সাহেবের প্রিয় সঙ্গীত "আয় বাদে সবাহ কর্ না, ইত্‌নি তু খবর যা কর্" গজলেরই সুরের অনুকরণ। "কবে যে আসবে তুমি মোর আঙিনাতে" এই গজলটিও আমি ওস্তাদ জমীর উদ্দীন খানের একটি উর্দু গজলের অনুকরণে লিখি। উপরোক্ত দুইটি গজলই ১৯২০ সালের "সঙ্গীত বিজ্ঞানে" স্বরলিপিসহ প্রকাশিত হয়। ইহার কিছুদিন পরেই কবি নজরুলের "কে বিদেশী বন উদাসী" ও "আসে, বসন্ত ফুলবনে" শীর্ষক দুইটি বাংলা গজল প্রকাশিত হয়। এই দুইটি গানের অপূর্ব সুর ও গীত-ভঙ্গী তখন সারা বাংলার আকাশ-বাতাসকে আচ্ছন্ন করে ফেল্‌ল; সারা বাংলাদেশ যেন এক নূতন সম্পদ লাভ করল। ঘুমন্ত সুরসাকী বাংলায় নূতন বেশে নূতন মূর্তিতে দেখা দিল। ডি, এল, রায় ও রবীন্দ্রনাথ থেকে সম্পূর্ণ এক আলাদা খাতে তিনি যে বাংলার সঙ্গীতকে প্রবাহিত করতে পেরেছেন, এ তাঁর এক মস্ত বড় কৃতিত্ব। এখানেই নজরুলের আসল মৌলিকত্ব। নজরুল একটা বিশিষ্ট সঙ্গীত-ভঙ্গীর প্রবর্তক, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

নজরুলের আর একটি বিশিষ্ট দান—ইসলামী বাংলা গজল। আমি যখন ইসলামী গান রচনা করতাম, তখন অতি-আধুনিক কোন কোন সাহিত্যিক বন্ধু আমাকে "মিশনার কবি" বলে বিদ্রুপ করতেন। কিন্তু নজরুলের প্রথম ইসলামী গান "ও মন রজমজানের ওই রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ" যখন রেকর্ডে প্রকাশিত হ'ল তখন বন্ধুগণ নীরব হলেন।

www.pathagar.com

ইসলামী ভারধারা বজায় রেখেও যে বাংলায় সঙ্গীত রচনা করা চলে, এ বিশ্বাস তখন তাঁদের এল। সেই থেকেই বাংলায় ইসলামী গানের প্রচলন আরম্ভ হয়। মুসলিম বাংলা-সাহিত্যে নজরুলের এও এক নূতন দান।

কিন্তু নজরুলের এই দান—যা সমগ্র সমাজ আজ শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করেছে— তা হয়ত সার্থক হত না—যদি না আর একজন সুরের দুলাল তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতো—আমি সুধাকণ্ঠ আব্বাসউদ্দীনের কথাই বলছি। নজরুল ও আব্বাসের মিলনে আজ মুসলিম বঙ্গ এই অপরূপ সম্পদ ভোগ করবার সৌভাগ্য লাভ করেছে। আব্বাসের অপূর্ব কণ্ঠ মুসলিম-বঙ্গের ঘরে ঘরে, মাঠে-ঘাটে, পথে-প্রান্তরে ইসলামী ধ্যান-ধারণাকে মূর্ত করে তুলেছে। মুসলিম বাংলার জাগরণের ইতিহাসে সেইজন্যই আব্বাসের নাম অমর হ'য়ে থাকবে। জাতির জীবন-তরুর মূলে মালীর মত সে রস-ধারা সিঞ্চন ক'রেছে। নজরুলের সমসময়ে তার আবির্ভাব তাই একটা আশীর্বাদের মতই মনে হয়।

বাংলা সঙ্গীতে কবি জসীমউদ্দীনের দানও তুচ্ছ নয়। মডার্ণ ভাটিয়ালী নয়—যে ভাটিয়ালীতে বাংলার অন্তরের রূপ প্রকাশ পেয়েছে, সেই খাঁটি ভাটিয়ালী গানকে তিনিই সর্বপ্রথম জনসাধারণে প্রচার করেছেন।

এইখানে His Master's Voice গ্রামোফোন কোম্পানীকেও ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না! আজ যে মুসলিম বঙ্গের ঘরে ঘরে ইসলামী সঙ্গীতের সুর ধ্বনিত হচ্ছে—তা মোটেই সম্ভব হ'ত না, যদি না তাঁরা এই সব সঙ্গীতকে রেকর্ড করতেন।

রাজনৈতিক দৃষ্টিতেও সঙ্গীতের বিশিষ্ট মূল্য আছে। সঙ্গীত মানুষের মনকে প্রশস্ত করে—সব ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে এক প্রেম-সুন্দর আনন্দ লোকে নিয়ে যায়। বিবাদমান দুই জাতির দেশ-নেতাদের জন্য এখানে বেশ খানিক চিন্তার খোরাক মিলবে।

বন্ধুগণ!

আমার বক্তব্য শেষ হ'য়েছে। সঙ্গীত আমাদের জীবনে অনির্বচনীয়ের স্পর্শ আনুক, সমস্ত ক্ষুদ্রতার গণ্ডী কেটে ঊর্ধ্বে উঠবার শক্তি দিক; মনের দিকচক্রবালকে সম্প্রসারিত করুক, আমাদের সকল কাজে সৌন্দর্য, সঙ্গতি ও শৃঙ্খলা আনুক—সকল মলিনতাকে ধুয়ে দিয়ে সে আমাদিগকে সুন্দর, সরস ও পবিত্র করুক,—এই কামনা করি।*

*বঙ্গীয় মুসলমান সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে (কলিকাতা, ১৯৩৯) সঙ্গীত- শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়বাদ

অধিকাংশ পাঠকই বলেন ঃ রবীন্দ্রনাথকে বুঝিনা, তাঁর কাব্য দুর্বোধ্য ও হেঁয়ালিপূর্ণ। 'অত্যন্ত রাবীন্দ্রিক' বলে অনেক অনুকরণ-প্রয়াসী তরুণ কবিকে আমরা উপহাসও করি। কিন্তু আমার মতে রবীন্দ্রকাব্যের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তাঁর এই অস্পষ্টতা। অন্য কথায় যেটা তার নিন্দার সেইটেই তাঁর শ্রেষ্ঠগুণ। অন্যান্য কবিদের কাব্যে ভাবের সূক্ষ্ম অনুরণন নাই, অনির্বাচনীয়তার স্পর্শ নাই, অসীমের ইঙ্গিত নাই, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সুকুমার ব্যঞ্জনা নাই; কিন্তু রবীন্দ্র কাব্যে এই সব বৈশিষ্ট্য পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান।

এখন কথা উঠবে ঃ শ্রেষ্ঠ কাব্যের এই কি লক্ষণ? এই ভাবালুতা এই দুর্বোধ্যতা, এই অনির্বচনীয়তা–এই কি তার মাপকাঠি? তা হলে প্রাক্-রবীন্দ্র যুগের অথবা রবীন্দ্রোত্তর যুগের বস্তুবাদী কবিদের সম্বন্ধে কী বলা যাবে? হেম-নবীন-মাইকেল এবং পরবর্তী যুগের অনেক কবিই ত স্থূল এবং বস্তুতান্ত্রিক। তাঁদের কাব্য কি অপাংতেয়? ভাবের স্বচ্ছতা বা ঋজুতা কি কাব্যের ত্রুটির লক্ষণ? কোন্ কাব্য তা হলে শ্রেষ্ঠ কাব্য?

এক কথায় এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। এক একটা যুগে কাব্য শিল্প ও সাহিত্য এক একটা বিশেষ রূপে প্রকাশ পায়। কোন একটা বিশেষ রূপে প্রকাশ পায়। কোন একটা বিশেষ রূপকে তাই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। হেলেন, শকুন্তলা, ক্লিওপেট্রা, নূরজাহান বা অতি আধুনিকা যে কোন চিত্র-তারকা— প্রত্যেকের রূপসজ্জা পৃথক এবং স্বতন্ত্র, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা যে সবাই সুন্দরী, একথা কেউ অস্বীকার করবে না। কাব্যেও তাই। কাব্য-সুন্দরী নিরাভরণা হয়ে আসলেও যেমন মধুর লাগে, রতনে ভূষণে সজ্জিতা হয়ে লীলাভরে আসলেও তেমনি মধুর লাগে। আসল বস্তু রূপ। রূপের অভাব হলে সাজ-সজ্জা কোনই কাজে লাগেনা। অবশ্য রূপ ও রসের প্রকার-ভেদ আছে। সব রূপ বা সব রসই সবাইকে সমান আনন্দ দেয় না। এক এক জনের এক এক বিশেষ রূপ বা রস ভাল লাগে। খাদ্য বস্তুকে যে রুচি বোধে আমরা গ্রহণ বা বর্জন করি, কাব্য ও রসবস্তুর বিচারেও আছে সেই রুচি-বোধ। ব্যক্তিগত রুচির তারতম্যে কোন কোন বিশেষ বস্তু আমাদের হয়ত বিশেষ ক্ষণে ভাল লাগে, কিন্তু তাই বলে একথা বলা যাবেনা যে, অপরগুলি নিকৃষ্ট। একটা খাবার দোকানে গেলে এ তত্ত্বের মীমাংসা সহজ হয়। মনে করুন এমন একটা ময়রার দোকানে আমরা কয়েকজন বন্ধুবান্ধব উপস্থিত যেখানে সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতোয়া, রাজভোগ ইত্যাদি থরে থরে সাজানো আছে। এখন যদি প্রশ্ন জাগে যে কোন্ বস্তুটি সবচেয়ে সেরা, সেইটিই আমরা খাবো, তা হলে সে প্রশ্নের সুমীমাংসা কিছুতেই হবেনা। ফলে কিছু না-খেয়েই হয়ত আমাদের ফিরতে হবে, আর না হয়ত এমন জিনিস খেতে হবে যা সবাই তুল্যরূপে উপভোগ করবে না। সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে—যে যা খেতে চায় সেই মত অর্ডার দেওয়া, অথবা নির্বাচিত কয়েক প্রকারের খাবার একসঙ্গে ভাগাভাগি করে খাওয়া।

www.pathagar.com

এখানে তুলনাটা হয়ত সর্বাঙ্গসুন্দর হল না। কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, একই ময়রার দোকানে যখন বিভিন্ন মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়, তখন একই কবির রসুইখানায় কেন বিভিন্ন ধরনের কাব্য সৃষ্টি হবেনা?

তুলনাটা একটু ব্যাপক ভাবে নিলে আর এ প্রশ্নের অবসর থাকবেনা। একই ময়রার দোকানে বসে ছানার তৈরী বিভিন্ন ধরনের মিষ্টান্ন খাওয়া সম্ভব। কিন্তু এমন যদি হয় যে, গ্রাহকদের কেউ সন্দেশ, রসগোল্লা খেতে চায়, কেউ বা চায় কোর্মা-পোলাও, আবার কেউবা চপ-কাটলেট, তখন কেমন হবে? ময়রার দোকানে কোর্মা-পোলাও পাওয়া যাবেনা কোর্মা-পোলাও-এর দোকানেও সন্দেশ-রসগোল্লা পাওয়া যাবেনা। প্রত্যেক জিনিসটির জন্য তখন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দোকানে যেতে হবে।

কাব্য-বিচারেও এই নীতি মানতে হবে। একই কবির কাছে সব জিনিষ পাওয়া যাবেনা। এক একটা বিশেষ বস্তুই এক একজন দিতে পারে। পাঠকের উচিত বিশেষ বিশেষ স্থান থেকে বিশেষ বিশেষ বস্তু সংগ্রহ করা।

বিশ্ব-সৃষ্টির মূলে রয়েছে তাই রূপ-বৈচিত্র্য। একই বস্তু রূপে রসে বর্ণে গন্ধে বহু হয়ে প্রকাশ পায়। গোলাব, যুঁই, চামেলি, বকুল প্রত্যেকেই সুন্দর। আম, জাম, লিচু, আঙুর, আপেল প্রত্যেকেই সুমিষ্ট। এই বৈচিত্র্য না থাকলে কোন বস্তুই পূর্ণ হতনা। বিশ্ব-প্রকৃতিতে তাই একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকার ভেদ রয়েছে। এদের মধ্যে ফার্স্ট, সেকেণ্ড, থার্ড, ফোর্থ নেই;—এক সুন্দর মিলনধর্মী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আপন মহিমায় মধুর হয়ে আছে।

কাব্য-বিচারে তাই কার চেয়ে কে বড়, এ প্রশ্ন অচল। হাফিজ বড় না রুমী বড়, শেলী বড় না মিলটন বড়, মাইকেল বড় না রবীন্দ্রনাথ বড়, এ প্রশ্ন অগ্রাহ্য। প্রত্যেকের দানেই নতুন রূপ ও নতুন রসের আস্বাদ আছে এবং প্রত্যেকেরই প্রয়োজন আছে, মূল্য আছে। মাইকেলের গম্ভীর তেজোদৃপ্ত ভঙ্গীরও যেরূপ প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের সুকুমার অনুভূতির মৃদু গুঞ্জনও তেমনি প্রয়োজন। কাজেই এদের মধ্যে স্থান বা মান নির্ণয়ের কোনই প্রশ্ন জাগেনা। এখানে প্রকৃতপক্ষে কাব্যের প্রশ্ন নয়, আঙ্গিকের বা প্রকাশ-ভঙ্গীর প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব-সুরীরা সহজবোধ্যতা ও স্বচ্ছতাকেই কাব্যের প্রাণ বলে মেনে নিয়েছিলেন, তাই সহজ ও স্থূল মূর্তিতেই তাঁরা তাঁদের ভাবকে প্রকাশ করেছেন। ভাবের মৌলিকতা, গভীরতা, সহজবোধ্যতা, উপমার মাধুর্য, অনুপ্রাস, শব্দ-সঙ্গীত-এই সবই ছিল পূর্ববর্তী কবিদের কাব্য-বৈশিষ্ট্য। শুধু বাংলা কাব্যে নয়, ইংরাজী ফার্সী ইত্যাদি ভাষার কবিতাতেও এই সব গুণই লক্ষ্য করা গেছে। যার যা বক্তব্য প্রাঞ্জল ভাষায় তা তিনি বলেছেন। হেঁয়ালীকে তাঁরা বরং বর্জন করেছেন। সহজপ্রকাশ গুণের মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে, সেই সৌন্দর্যই ছিল তাঁদের কাব্যের প্রাণ। ভাবের অভিনবত্বে ও প্রকাশের চমৎকারিত্বে তাঁরা পাঠকের চিত্ত জয় করেছেন। কাজেই, একথা বলা যাবেনা যে, ভাবের বক্রতা, অস্বচ্ছতা বা সূক্ষ্মতা না থাকলে কাব্য হয়না। আর্টিষ্টিক হ'লে সরলতাই হয় সৌন্দর্যের বাহন। কাব্যে, সাহিত্যে বা আর্টে সরলতা (Simplicity) বা সহজবোধ্যতা (Expressiveness) তাই এক বিশেষ সৌন্দর্য-লক্ষণ।

www.pathagar.com

এই দৃষ্টিভংগীতে দেখলে রবীন্দ্র-কাব্য যে আভিজাত্যপূর্ণ, সহজবোধ্যতা বা সরলতা গুণ যে তাতে অপ্রচুর—সে কথা না বলে উপায় নেই। রবীন্দ্র কাব্য পড়তে গেলে বিশেষ এক মন, বিশেষ এক রুচি এবং বিশেষ এক ভংগী নিয়ে পড়তে হয়। অবিশ্যি তাঁর বর্ণনামূলক কবিতা সম্বন্ধে এ কথা খাটবেনা; তাঁর উচ্চাংগের দার্শনিক কবিতার কথাই বলছি। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, বলাকা, সোনার তরী, নৈবেদ্য ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে যেখানে তিনি মরমপন্থী (Mystic) সেখানে সাধারণ পাঠকের একরূপ প্রবেশ নিষেধ। সাধারণ পাঠকের নিকট রবীন্দ্রনাথ সত্যই দুর্বোধ্য।

কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যের এই বিচারই যে সঙ্গত হল, তাই বা কি করে বলা যায়। পাঁচালি বা ছড়া ত খুব সহজবোধ্য। তাই বলে কি তাকে শ্রেষ্ঠ কাব্য বলা হবে? কখনই না। কাব্য উচ্চাংগের হতে গেলে তার ভাব ভাষা ও আংগিকও মার্জিত হবে। সে কাব্য সর্বসাধারণের উপভোগ্য নাও হতে পারে। প্রকৃতি যে নিয়মে তার অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট চালাচ্ছে, কাব্যে সে নিয়মের একটুও ব্যতিক্রম হচ্ছেনা। ধরুন ধান-চাল, পোষাক-পরিচ্ছদ, ট্রেন-ষ্টীমার ইত্যাদি। কোথায় না তারতম্য আছে? চালের ভিতরে মোটা চাল, মাঝারি চাল ও সরুচাল আছে। সরু চালের ভাত ভদ্রলোকদের উপভোগ্য বটে, কিন্তু কৃষক মজুরেরা তা আদৌ পছন্দ করেনা। মিহিন ফুরফুরে রেশমী কাপড় আপ-টু-ডেট মেয়েরা পছন্দ করে, কিন্তু সাধারণ গাঁয়ের মেয়েরা তা পরতেই চাইবেনা। ট্রেনে থার্ড ক্লাশও আছে,ফার্স্ট ক্লাশও আছে। শিল্প, সাহিত্য, সমাজ–সর্বত্রই এই নীতিতে কাজ চলছে। মুড়ি-মিছরী সব একদরে বিকায় না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্র-কাব্যের দুর্বোধ্যতা যত দোষের বলে মনে হয়, আসলে তত নয়। এটা কোন একটা অস্বাভাবিক ব্যাপারও নয়। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ এক টাইপের কবি। দূর্বোধ্যতার যুক্তি দিয়ে সে টাইপকে অবজ্ঞা করা চলেনা। এ টাইপ বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধই করেছে। রবীন্দ্রকাব্য বুঝিনা–একথা বলার মধ্যে কোন বাহাদুরি নেই, বরং অগৌরব আছে। কোন কাব্যের দূর্বোধ্যতার জন্য সর্বত্র কাব্যই দোষী নয়, পাঠকেরও দোষ থাকতে পারে। অযোগ্য পাঠক কি নেই? কবির কাব্য বুঝাবার অক্ষমতার জন্য লজ্জিত না হয়ে অথবা সে অক্ষমতাকে দূর করবার কোশেশ না করে উল্টো আরো কবিকে চোখ রাঙাবো, এ এক মজার যুক্তি। তা ছাড়া সব কিছু বুঝতে চাওয়াও ত নির্বুদ্ধিতা। জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে সব কিছু বুঝা সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের অতীতে এক অব্যক্ত রহস্য লোক আছে, সে লোকের স্বরূপ জ্ঞান দিয়ে বুঝা যায়না, অতীন্দ্রিয়-অনুভূতি দিয়ে বুঝতে হয়। সে উপলব্ধি হয়ত অস্পষ্ট, কিন্তু উপায় নেই। সব জিনিষ পূর্ণভাবে পাওয়া যায়না। আভাসে ইংগিতেই তাকে বুঝে নিতে হয়। যা স্থুল তা ওজন দরে পাওয়া যায়; কিন্তু বিদ্যুৎকে ত ওজন ধরে পাওয়া যায় না। তার একটু স্পর্শই যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন ঃ

"এতটুকু ছোয়া লাগে
এতটুকু কথা শুনি
তাই দিয়ে মনে মনে
রচি মন ফালগুনী;"

www.pathagar.com

কবি যদি পাঠকের মনে 'এতটুকু ছোঁয়া দিতে পারেন, তাই যথেষ্ট। অবশ্য এই যুক্তির কদর্থ করলে অতি-আধুনিক কবিরাও রবীন্দ্রনাথের সমমর্যাদা, এমন কি তার চেয়েও উচ্চ মর্যাদা দাবী করবেন। দুর্বোধ্যতাই যদি শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ হয়, তবে অতি-আধুনিক কবিরাই শ্রেষ্ঠ কবি। কথাটির গলৎ এইখানে যে শ্রেষ্ঠকাব্য দুর্বোধ্য হতে পারে কিন্তু দুর্বোধ্য হলেই শ্রেষ্ঠকাব্য হয় না।

এই অতীন্দ্রিয়বাদ বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথই প্রবর্তন করেছেন। এটা অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মৌলিক দান নয়; হাফিজ, রুমী, ওমর খৈয়াম প্রভৃতি মরমী কবিরা এ পথের সন্ধান আগেই আমাদের দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সেই পথেরই উত্তরসাধক। মাইকেল যেমন ভার্জিল, মিলটন, দান্তে ইত্যাদি ইউরোপীয় কবিদের মহাকাব্যের ভংগী বাংলা কাব্যে প্রবর্তন করে বাংলা সাহিত্যের মর্যাদা বাড়িয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি ফার্সি কাব্যভংগীকে বাংলায় রূপ দিয়েছেন।

সূক্ষ্ম কাব্যানুভূতি শুধু যে মনের স্বপ্ন-বিলাসের জন্যই প্রয়োজন তা নয়। সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনেও এর প্রভাব প্রচুর। বস্তুধর্মী স্থূল কবিতা মানুষের মন ও চিন্তাকে জড়বাদের দিকে টেনে নামায়, জীবনের দিক-চক্রকালকে সংকীর্ণ করে আনে। আমাদের মনে বহু জড়মূর্তি ভিড় করে আছে। অসীমের দিব্য জ্যোতিকে তারা আমাদের চিত্তমুকুরে প্রতিফলিত হতে দেয় না। রবীন্দ্রনাথ তাই মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন ঃ

"মুগ্ধ ওরে স্বপ্নঘোরে যদি প্রাণের আসন কোণে
ধূলার গড়া দেবতারে লুকিয়ে রাখিস সংগোপনে
চিরদিনের প্রভু তবে তোদের প্রাণে বিফল হবে
বাহিরে সে দাঁড়িয়ে রবে কতনা যুগযুগান্তরে।"

'প্রাণের আসন' থেকে এই 'ধূলায় গড়া দেবতা' গুলিকে দূর করতে হলে অশরীরী ভাবের কাব্য পাঠ যথেষ্ট সহায়তা করে। অসীমের স্পর্শ দিয়ে ইংগিত দিয়ে সংগীত দিয়ে—মনকে সে উর্ধ্বলোকে টেনে নেয়। ফলে মানুষ জড়জীবনের পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হয়ে এক উদার দ্বন্দ্বাতীত সাম্যলোকে উন্নীত হয়। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, ছোট-বড়র প্রভেদ তখন সে ভুলে যায়। তার চোখে ঘনায় মহামানবতার স্বপ্ন; অন্তরে জাগে বিশ্বনিখিলের প্রতি আত্মীয়তার মনোভাব। কাজেই আজকার যুগে রবীন্দ্র-কাব্য মানব-কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে। এই সংঘাত ও দ্বন্দ্বমুখর জীবন ও জগতে আমাদের মন ও চিন্তাকে কিছুটা মুক্তি দেওয়া দরকার। রবীন্দ্রকাব্য এ কাজের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে।

বাঁকুড়া
১৯৪৩

www.pathagar.com

পাকিস্তানের পরে

পাকিস্তান

১৪ই আগস্ট। ১৯৪৭ সাল।

মধ্যরাত্রির শূন্যমুহূর্তে শুনতে পেলাম মুহুর্মুহু কামান-গর্জন। সঙ্গে সঙ্গে নিখিলে নিখিলে ধ্বনিত হল 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'।

গগনে গগনে উড়ল হিলালী চাঁদের নিশান। রাজপথে আজ অগণিত মানুষের কলকোলাহল। মিছিল করে গান গেয়ে এগিয়ে যায় তারা। তরুণ-তরুণী, ছাত্র-ছাত্রী, বালক-বৃদ্ধ—সবাই আজ নূতন আনন্দে বিভোর।

আজ আমাদের আনন্দের দিন। জাতীয় মুক্তির দিন। দীর্ঘদিনের গোলামীর পর আজ আমরা আবার স্বাধীন জাতির মর্যাদা পেয়েছি; এই আনন্দে সবাই আজ আত্মহারা। আজাদীর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও যেন আজ মুক্তি পেল। বাধাবন্ধনহীন এমন উচ্ছল আনন্দ বহুদিন ভোগ করিনি। এ যেন এক তিস্‌রা কোন্ ঈদ এল আমাদের জাতির জীবনে। ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় আজ শুরু হল। নূতন আশার নূতন আকাঙ্ক্ষার নূতন সম্ভাবনার দুয়ার আজ খুলে গেল।

নূতন শপথ নিয়ে আজ আমরা পথে এসে দাঁড়ালাম। আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করব। ঈমান দিয়ে শৃঙ্খলা দিয়ে ত্যাগ দিয়ে অধ্যাবসায় দিয়ে আমরা পাকিস্তান গড়ে তুলব। অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য নিয়ে নূতন ভবিষ্যৎ রচনা করব।

পাকিস্তানের জন্মমুহূর্তে তাই জানাই তাকে আমাদের লক্ষ কণ্ঠের খুশ-আমদিদ ও মুবারকবাদ।

ফরিদপুর

১৯৪৭

২৫শে ডিসেম্বরের বাণী

২৫শে ডিসেম্বর জগতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই দিনে যিশুখৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন। আশ্চর্যের বিষয়, এই দিনটি আমাদের প্রিয় নেতা কায়েদে-আযমেরও জন্মদিন। কায়েদে-আযমের জন্মদিন যিশুখৃষ্টের জন্মদিনের সঙ্গে এমন চমৎকার সংগতি রক্ষা করিল কেন, ভাবিবার কথা। প্রবাদ আছে যে, যিশুখৃষ্ট বিনাপিতায় কুমারী মেরীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক নিয়মের ইহা একটা বিরাট ব্যতিক্রম সন্দেহ নাই।

www.pathagar.com

প্রত্যেক কার্যেরই পশ্চাতে থাকে তার একটা কিছু কারণ। কার্য-কারণ সম্বন্ধ দ্বারাই জগতের সব ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু এই কার্য-কারণ সম্বন্ধ এক জায়গায় গিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়ায়। সেখানে আর কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; সেখান হইতে বিনা কারণেই সৃষ্টি-প্রবাহ উৎসারিত হয়। কার্য-কারণ পরম্পরার উৎসমূলে আছে তাই একটা আবেগ—সৃজনী শক্তির শুধু মাত্র একটা দুর্জয় কৌতূহল। সৃষ্টি-প্রবাহের অন্তিমেও আছে এমনই একটা আকস্মিক স্তব্ধতা, যেখানে কোন কারণ নাই, যুক্তি নাই–আছে শুধু অদৃশ্য শক্তির মাত্র একটা খাম-খেয়াল। সৃষ্টির আদি ও অন্তে তাই কারণ খুঁজিতে পাওয়া বাতুলতা মাত্র। মানুষের সৃষ্টির কার্য-কারণ সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু আল্লার সৃষ্টিতে তার কোন প্রয়োজন হয় না। সেখানে শুধুই 'কুন্'–'ফায়াকুন'। অর্থাৎ আল্লাহ যদি কোন কিছুকে বলেন "হও", অমনি তাহা হইয়া যায়। এই মহাসত্যই পূর্ণ-প্রকটিত হইয়াছে আদমের জন্ম রহস্যের মধ্যে। তাঁহার জন্মের কোন বাহ্য কারণ নাই, আল্লার অনুগ্রহেই তিনি অস্তিত্বের মর্যাদা পাইয়াছেন। এই জন্যই আল্লাহ'তালা কুরআন-শরীফে যিশুখৃষ্টের জন্মের তুলনা দিয়াছেন হযরত আদমের জন্মের সঙ্গে। আল্লাহ বলিতেছেন "নিশ্চয়ই আল্লার নিকট ঈসার জন্ম আদমের জন্মের মতো। তিনি তাহাকে (আদমকে) মাটি হইতে পয়দা করিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন 'হও', অমনি সে হইয়া গিয়াছিল।"–(৩ঃ ৫৮)

অতএব দেখা যাইতেছে, পিতা ছাড়া (অর্থাৎ কারণ ছাড়া) কোন কিছুই হইতে পারে না—এ ধারণা আমাদের ভুল। আল্লার কুদরতে এবং তাঁর সর্বময় ক্ষমতায় মানুষ যাহাতে বিশ্বাস না হারায় এবং অদৃশ্য শক্তিতে যাহাতে সে ঈমান রাখে, তারই জন্য যিশুর জন্মকে তিনি এরূপ অলৌকিক করিয়াছেন। সৃষ্টির ইতিহাসে যিশুখৃষ্ট তাই এক মুর্তিমান বিস্ময়।

পাকিস্তানও এমনই একটা বিস্ময়কর সৃষ্টি। প্রচলিত সমস্ত রাজনৈতিক দর্শন ও মতবাদের এ একটা বিরাট ব্যতিক্রম। এর জন্ম তাই খানিকটা অলৌকিক। হিন্দুস্থানের বুকের তলায় যে পাকিস্তান ঘুমাইয়া ছিল, কে তাহা জানিত? বারো তের শত মাইল দূরবর্তী দুইটি প্রদেশ লইয়া যে একটি রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে, তাহাই বা কে আগে বিশ্বাস করিত? কাজেই পাকিস্তানের সৃষ্টির সঙ্গে একটা গভীর বিস্ময় জড়াইয়া আছে। তা যদি হয়, তবে সেই পাকিস্তানের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা কায়েদে-আযমের জন্মের সঙ্গেও কিছুটা বিস্ময় জড়িত থাকা স্বাভাবিক। হযরত ঈসার জন্ম হইয়াছিল ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে। কায়েদ-আযমের মধ্যেও যে কিছুটা অতিমানবিক উপাদান থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? কায়েদে-আযম ছিলেন সত্যই একজন অতিমানব। ইসলামের পরিভাষায় এরূপ মানবকেই বলা হয় 'মরদ্-ই-মুমিন' অথবা 'ইনসান্-ই-কামিল। মরদ্-ই-মুমিনের জন্ম আছে, মৃত্যু নাই। অসাধ্য সাধনের জন্যেই তাঁরা দুনিয়ায় আসেন। এই অসাধ্য সাধনের সম্ভাবনাই ২৫শে ডিসেম্বরের বৈশিষ্ট্য। বিশ্ব-প্রকৃতিতে এই দিনে সত্যই বিপ্লব আসে। 'ছোট দিন' 'বড় দিন' হইতে শুরু করে। জড়প্রকৃতিতেও এই দিনটি ঋতুচক্রের মোড় ঘুরাইয়া দেয়। এই দিন হইতে নব বসন্তের সূচনা হয়। শীতের তুহিন-শীতল। মৃত্যুস্পর্শ স্তব্ধ হয়; ঘুমন্ত প্রকৃতির শিরায় শিরায় আবার নবজীবনের পুলক-স্পন্দন অনুভূত হয়। এই দিন হইতেই সে আবার পুনর্জীবিত হইতে থাকে। কোথায় যেন অলক্ষ্যে প্রচণ্ড একটা যুদ্ধ সংঘটিত হইয়া যায়। সমস্ত প্রকৃতি আড়ষ্ট, জরাগ্রস্ত, নিষ্প্রভ, মলিন। উত্তরী বাতাসে

www.pathagar.com

থরথর কম্পিত তার দেহ স্তিমিত তার জীবন-প্রদীপ; বনে বনে শুধু ঝরা পাতার ঝরঝরানি গান, খসে যাবার ঝরে যাবার হাহাকার। এই চরম দুর্দিনে কে যেন অজানা বীরের সাজে দূরদেশ থেকে আসে এই বনে। জরামৃত্যুর সমস্ত সৈন্যকে সে করে পরাজিত; ফিরাইয়া দেয় সে হাওয়ার গতি, শুষ্ক তরুর শাখায় শাখায় সে আনে নবপল্লব নবমুকুলের সমরোহ,সে আনে নিরাশার মাঝে আশার বাণী, সে শোনায় মৃত্যুর দুয়ারে নবজীবনের আহ্বান। কায়েদ-আযমের জীবনেও ছিল নাকি এই বৈশিষ্ট্য? ১৯৩৪ সালের কথা স্মরণ করুন। ভারতীয় মুসলমানের তখন চরম দুর্দিন। তার জাতীয় জীবন সম্পূর্ণ আড়ষ্ট ও জরাগ্রস্ত। তরুণ ব্যারিষ্টার মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ তখন ইংল্যান্ডে। এমন সময় মুসলিম লীগের তরফ হইতে দুস্থ জাতির মৃত্যু-কাতর আহ্বান গেল তাঁর কাছে। মুসলিম লীগের অবস্থা তখন শোচনীয়। না ছিল তার শৃঙ্খলা, না ছিল তার সংহতি। তবু লিয়াকত আলী খান জাতির প্রয়োজনের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া জিন্নাকে ভারতে ফিরিয়া আসিবার আহ্বান করিলেন। সে ডাকে জিন্নাহ সাড়া না দিয়া পারিলেন না। সকল অভিমান ভুলিয়া গিয়া তিনি পুনরায় ভারতে ফিরিয়া আসিয়া মুসলিম লীগের কর্ণধার হইলেন। বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সংঘবদ্ধ করিয়া মুসলিম লীগের অন্তরে তিনি করিলেন নবজীবনের সঞ্চার। তার পর মাত্র ১৩ বৎসরের সাধনাতেই তিনি আনিলেন মুসলিম জাতির আজাদী। ১৯৪৭ সালে হিন্দুস্থানের বুকে জন্মলাভ করিল পাকিস্তান। বালক-বীরের বেশে নব-বসন্ত যেমন করিয়া আনে জড়-প্রকৃতিতে বিপ্লব ও নবসৃষ্টির উল্লাস, মুসলমানের জাতীয় জীবনে তরুণ বীর জিন্নাও আনিলেন তেমনি এক বিস্ময়কর বিপ্লব, তেমনি এক অভূতপূর্ব নূতন সৃষ্টির উন্মাদনা।

২৫শে ডিসেম্বর তাই নবজীবন লাভের দিন, তরুণের জয়যাত্রার দিন,সমস্ত জড়ত্ব ও অবসাদকে জয় করিয়া জীবনের বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশের দিন, ছোট থেকে বড় হবার দুর্জয় সাধনার দিন।

কায়েদে-আযমের জন্মদিন হইতে আমাদের তরুণদের তাই নৈতিক পাঠ গ্রহণের যথেষ্ট উপাদান আছে। অনস্তিত্বের মধ্য হইতে নূতন কিছু বাস্তব সৃষ্টি করিবার প্রেরণায় এই দিনটি সমুজ্জ্বল। তরুণ জিন্নাহ্ যেমন মুসলিম লীগের জড়ত্ব স্থবিরত্ব ও পংগুতাকে স্বীকার করিয়া লইয়া ইহার পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, অফুরন্ত প্রাণের প্রাচুর্য দিয়া যেমন জাতির সমস্ত অভাব, দৈন্য ও মলিনতাকে দূর করিবার দুর্জয় সাধনা করিয়াছিলেন, আমাদের তরুণরাও আজকার দিনে আত্মপ্রতিষ্ঠার সেই শপথ গ্রহণ করুন—ইহাই আমি কামনা করি।

ফরিদপুর।
১৯৪৭

www.pathagar.com

পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-সম্মেলন

খুশ্-আমদিদ্!

পূর্ব-পাকিস্তানের নব-জাগ্রত হে তরুণ কাফেলা, আজিকার এই সুন্দর প্রভাতে তোমাদিগকে অভিনন্দন করি। উষার-মিনারে ওই শোন নয়া ফযরের আযান, ওই শোন নূতন পৃথিবীর আহ্বান। আজ বেরিয়েছ তোমরা জয়যাত্রার; তোমাদের চোখে আজ কাঞ্চনজংঘার সোনালী স্বপন, অন্তরে অন্তরে আজ আবেহায়াতের মরুতৃষ্ণা। তোমরা আজ দূর পথের মুসাফির। বন্ধুর পথ বেয়ে দিগন্ত পেরিয়ে যেতে হবে তোমাদের মকসেদ মঞ্জিলে। সেই জয়যাত্রার শুভমুহূর্তে তোমাদিগকে দেই আমার অকুণ্ঠ অভিনন্দন ও আন্তরিক মুবারকবাদ।

বন্ধুগণ,

আযাদ পাকিস্তানের এই হ'ল প্রথম সাহিত্য-সম্মেলন। এর গুরুত্ব পূর্ববর্তী অন্যান্য সম্মেলনের চেয়ে খুব বেশি। আজ আমরা লাভ করেছি আযাদী, টুটেছে আমাদের গোলামীর জিঞ্জির; মুক্ত নীল আকাশের তলে স্বাধীন মানুষের মর্যাদা ও গৌরব লাভ করেছি আমরা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাথায় চেপেছে এক গুরু দায়িত্ব। কোন দেশ জয় করার আগের দিন সহজ; কিন্তু পরের দিন অপেক্ষাকৃত কঠিন। আযাদী লাভ করার চেয়ে কঠিন কাজ হল আযাদীকে রক্ষা করা। মুক্তি-সংগ্রামের সাথে সাথে জড়িয়ে থাকে খানিকটা ক্ষয়ক্ষতি ধ্বংস ও অপচয়। জয়ের পরে সেগুলোর দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। নূতন সৃষ্টির আগে তাই আমাদের সেই সব ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান নিতে হয়; আপন ঘরে কি কি আছে, কি কি নাই; আর কি কি আমাদের চাই—তার হিসেব নিতে হয়; তারপর নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হয় সুমুখের পানে। আমাদেরও আজ সেই কাজ করতে হবে।

কায়েদ-ই-আযম বলে গেছেন ঃ পাকিস্তান এনে দিলাম আমি, এখন একে গড়ে তুলবার ভার তোমাদের। সত্যি তাই। আমাদের এখন করতে হবে সেই গড়ে তুলবার সাধনা।

আমাদের পাকিস্তান-সংগ্রামের মূলে ছিল প্রধানতঃ আইডিওলজীর দ্বন্দ্ব। আমরা চেয়েছিলাম স্বতন্ত্র জাতিরূপে জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে এবং আমাদের তাহজিব-তমদ্দুনকে রূপ দিতে। এই স্বাতন্ত্র্য সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আত্মপ্রকাশের অভিলাষ নয়, শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যেরই এ একটা বলিষ্ঠ ইংগিত। কিছু নূতন দিতে হলেই জনস্রোতের মধ্য হ'তে সরে দাঁড়াতে হয়; গড্ডড-লিকা স্রোতে ভেসে গেলে কিছুই দেওয়া যায় না। স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই থাকে নব সৃষ্টির প্রেরণা। কায়েদ-ই-আযম যে বলেছেন, আমরা একটা স্বতন্ত্র জাতি এবং আমাদের তাহজিব-তমদ্দুন স্বতন্ত্র, সে কথার গুঢ় তাৎপর্য এই। নূতন দানে, নূতন সৃষ্টিতে আমাদের স্বকীয়তা ফুটিয়ে তুলতে হবে, এবং তারই গৌরবে আমরা বিশ্ব-সভায় বিশিষ্ট আসন পাব—এই আমাদের স্বাতন্ত্র্যের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

পাকিস্তান মূলত একটি ইসলামী রাষ্ট্র। কাজেই তার রাজনীতি সমাজ-নীতি—সবকিছুতেই আমাদের জাতীয় ধ্যান-ধারণা ও ঐতিহ্যের ছাপ থাকবেই। এ একটা স্বাভাবিক ব্যাপার, এর থেকে মুক্তি নেই। জগতের অন্যান্য জাতি সম্বন্ধেও এ কথা সত্য। এতে ভয় করবার কিছু নেই। ইসলামী রাষ্ট্র হলেই যে একটা Theocratic State

www.pathagar.com

হতে হবে, তার কোন মানে নেই। ইসলামের মধ্যে যে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা ও সমন্বয়ের সুর আছে,—মানুষে-মানুষে যে সহজ প্রেম আছে, বিশ্বমানবতার যে আবেদন আছে, সত্য সুন্দর ও কল্যাণের সেই সব চিরন্তন আদর্শই পাকিস্তানে রূপ পাবে।

আমাদের শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধেও একই কথা থাকবে। আমাদের সাহিত্যে থাকবে একটা বিশ্বজনীন উদার মনোভংগী, থাকবে একটা পরিব্যাপ্ত বিশ্ববোধ। "গজৎ জুড়ে উদার সুরে" যে "আনন্দ গান" বাজছে, আমাদের সাহিত্যেও ঝংকৃত তবে তার প্রতিধ্বনি। ইসলামের এই সুন্দর ও কল্যাণ-রূপকে আমাদের সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হবে। এখানে হীনমন্যতা দেখালে চলবে না। আমরা সবার সাথে হাত মিলাবো, সন্দেহ নেই, কিন্তু নিজেকে পরের হাতে ধরা দিব না। স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই আমরা মিলব; তাতেই আসবে কল্যাণ, তাতেই দিতে পারব আমরা নব-নব অবদান। নব সৃষ্টির জন্য স্বাতন্ত্র্য তাই অনেক সময় কাম্য। স্বাতন্ত্রবোধ বলিষ্ঠ জীবনেরই লক্ষণ। যার এ বোধ নেই, সে বেশীদিন টিকে না।

এখানে একটা প্রশ্ন জাগবে ঃ পাকিস্তানের সাহিত্যে যদি ইসলামের প্রভাব পড়ে, তাহলে এখানকার হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য অমুসলমানদের সাহিত্য কেমন হবে?

এ প্রশ্নের জবাব অতি সহজ। ইসলামী আদর্শই তাদের রক্ষা-কবচ হবে। যুগে যুগে ইসলাম প্রত্যেককে আত্মনিয়োগের অধিকার স্বীকার ক'রে আসছে। 'ধর্মে বল প্রয়োগ নেই', 'যার-যার ধর্ম তার তার কাছে'—এই হল ইসলামের কথা। হিন্দু বৌদ্ধ বা অন্য যে কেউ তার শিল্প-সংস্কৃতি ও সাহিত্যে নিজেদের আদর্শকে রূপ দিবে, এতে কারো কিছু কথা বলবার নেই। একটা পরিমার্জিত সহনশীলতা ও নীতিবোধের মধ্যে বৈচিত্র্য আনলে তা বরং আমাদের আনন্দেরই কারণ হবে। অতীত যুগে এই বাংলা দেশেই এ-কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। বাংলার মুসলিম সুলতানেরা শিল্পে, সাহিত্যে ও ললিত কলায় কী উদার মনোভাবই না দেখিয়ে গিয়েছেন। রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ তাঁরাই করিয়েছিলেন। মুসলিম শাসিত দেশে এ নীতির কোনদিন ব্যতিক্রম ঘটেও নি, ঘটবেও না। ভারতে, ইরানে, স্পেনে—সর্বত্র মুসলমানেরা এই নীতির অনুসরণ করেছে। কৃষ্টি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অনুপ্রবেশ তাই অশেষ কল্যাণের কারণ হয়ে উঠেছে।

পাকিস্তানী কবি-সাহিত্যিকদিগের ভবিষ্যৎ তাই অতি উজ্জ্বল। অতীতের উত্তরাধিকার আমাদের যে নেই, তা ত নয়! আমাদের পুঁথি-সাহিত্য এক বিরাট প্রেরণার উৎস-মূল। তার মধ্যে আমরা বহু উপকরণ পেতে পারি। পুঁথি-সাহিত্যের প্রত্যাবর্তন হয়ত আর সম্ভব হবে না, এই উন্নত আলোকের যুগে তা বাঞ্ছনীয়ও নয়; কিন্তু সে সব মালমশলা দিয়ে নবনব সৃষ্টি তা সম্ভব হতে পারে। এখন চাই আমাদের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা। প্রতিভার যাদুস্পর্শ ছাড়া কোন নূতন সৃষ্টি সম্ভব নয়।

এস কবিরা, এস শিল্পীরা, তোমাদের কাজ এখনো ফুরায়নি; কোনদিনই ফুরাবে না। যেখানে আঘাত আছে বেদনা আছে, দৈন্য আছে অভাব আছে, সেখানে হবে তোমাদের কর্মক্ষেত্র। সব মলিনতাকে দূর করে দিয়ে এস আমরা পাকিস্তানকে সত্যিকার পাকভূমি করে গড়ে তুলি। গতি দিয়ে, শক্তি দিয়ে, ছন্দ দিয়ে, সুর দিয়ে এস তাকে শক্তিময়ী ছন্দময়ী ও মহিমাময়ী করে তুলি।*

১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে ঢাকায় কার্জন হলে ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লার সভাপতিত্বে পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে লেখকের উদ্বোধনী ভাষণ।

www.pathagar.com

আমাদের কওমী নিশান

"উড়াও উড়াও আজি কওমী নিশান।

চাঁদ তারা সাদা আর সবুজ নিশান

আমাদের কওমী নিশান।"

আমাদের কওমী নিশান। কত সুন্দর। কত মধুর। অপরূপ এর ভঙ্গিমা। অদ্ভুত এর ব্যঞ্জনা! কত নিশানই ত আকাশে উড়ে। কিন্তু এমন পরিচ্ছন্ন রূপ ও স্বপ্নশ্রী আর কোন নিশানেই ত দেখি না।

পাকিস্তানের অন্তর্মূর্তি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, ধ্যান-ধারণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা-সমস্তই অলক্ষ্যে ছায়া ফেলেছে এই নিশানের বুকে। নিশান নয়, এ যেন পাকিস্তানের মর্ম-মুকুর। নিশানের দিকে চাইলেই তাই পাকিস্তানের সত্যিকার রূপ এতে দেখা যায়। যে-আদর্শ, লক্ষ্য ও স্বপ্নসাধ পাকিস্তানের বুকে জেগে আছে, আমাদের নিশানে তা প্রতিবিম্বিত হয়েছে। নিশানের ব্যাখ্যা করলে তাই এই নব রাষ্ট্রের লক্ষ্য, আদর্শ ও ধ্যান-ধারণার ব্যাখ্যাই করা হয়। চাঁদ তারা সবুজ ও সাদা—এই চারিটি বস্তুই আমাদের নিশানের উপাদান। এদের প্রত্যেকটির বুকে আছে এক একটি পয়গাম-এক একটি ইঙ্গিত। আমি আজ তাদের পরিচয় দিব।

সবুজ-সে জীবনের প্রতীক। যেখানেই সবুজ, সেখানেই জীবন। বিশ্বপ্রকৃতিতে তাই এত সবুজের প্রাচুর্য। তরুলতায় তৃণ-শয্যে-সর্বত্র শ্যামল রূপের সমারোহ। প্রকৃতি যেখানে ধূসর বা পাণ্ডুর, সেখানে প্রাণ নেই, গতি নেই, ছন্দ নেই, সুর নেই; আছে শুধু বৈরাগ্যের বাণী, অবসানের বাণী। কিন্তু সবুজের মধ্যে দেখি জীবনের নৃত্যচঞ্চল রূপ—শুনি তার বলিষ্ঠ কল-সঙ্গীত। বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরতলে যে গোপন সঞ্জীবনী-সুধা আছে, সবুজ যেন তারি প্রাণোচ্ছল স্নিগ্ধ কান্তি। মাটির বুকের ঐশ্বর্যের ও যেন বহির্বিকাশ। সবুজই ত সৃষ্টির জীবন-রসায়ন।

আমাদের কওমী নিশানে তাই আমরা বেছে নিয়েছি সবুজকে—আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতীক-চিহ্ন রূপে। আমরা পাকিস্তানকে চির-সবুজ, চির-শ্যামল করে রাখব—কিছুতেই একে গৈরিক হতে দিব না। এই জড়-পৃথিবীর বুকে—আকাশে সাগরে যেখানে যে সম্পদ আছে, ঐশ্বর্য আছে, সব আমরা আহরণ করব, সবুজ ধানে সবুজ পাটে মাঠ ছেয়ে দিব। ঐশ্বর্যের দীপ্তিতে পাকিস্তান লাভ করবে এক যৌবনদীপ্ত স্নিগ্ধ শ্যামল রূপ।

কিন্তু তুব জড়-সম্পদই ত আর আমাদের কাম্য নয়। দেহ ও আত্মা, জড় ও চৈতন্য, ইহকাল ও পরকাল—দুই নিয়েই আমাদের কারবার। দেহের ক্ষুধার তৃপ্তিও যেমন আমাদের কাম্য, আত্মার ক্ষুধার তৃপ্তিও ঠিক তেমনি কাম্য। দীন ও দুনিয়া—দুয়ের সম্পদই আমরা চাই। জড়-জীবনে চাই আমরা তাই রুহানি আলোর পরশ। সে আলো জোগায় আমাদের আসমানের ঐ বাঁকা চাঁদ। দ্বিতীয়ার চাঁদ তাই আমাদের নিশানের অন্যতম প্রতীক। এর মধ্যে রূপ ধরেছে আসমান-যমীনের মিলন— জড়-চৈতন্যের সমন্বয়।

www.pathagar.com

পাকিস্তান তাই শুধু পূর্ব-পশ্চিমেই সীমাবদ্ধ নয়—আকাশও এর আর এক সীমান্ত। পাকিস্তানের তাই কোন ভৌগোলিক সীমারেখা নেই—মাটির মায়ায় মন আমাদের শান্ত হয় না; নিঃসীম নভোনিলীমায় সে ঘুরে বেড়ায়। এই ব্যাপ্তি এই বিশ্ববোধ পাক-নিশানের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর পানে চাইলেই আমাদের মনের দিকচক্রবাল সম্প্রসারিত হয়ে যায়; ভৌগোলিক পাকিস্তানের মৃন্ময়ী রূপ মিলিয়ে যায় এক জ্যোতির্ময়ী প্যান-পাকিস্তানের স্বপ্নমূর্তির মধ্যে, যেখানে অনুভব করি-কোটি কোটি চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহ-তারকার নীরবপ্রীতি ও সহযোগিতার ইংগিত। উর্ধ্ব জ্যোতির্লোকের সঙ্গে এই সহযোগ-পাকিস্তানকে 'সেকিউলার' রাষ্ট্র হতে মুক্তি দিয়েছে। বিশ্ব-বিধানের চিরন্তন সংস্থার মধ্যেই সে স্থান পেয়েছে।

বাঁকা চাঁদ তাই আমাদের যুগে যুগে দিয়েছে প্রেরণা—যুগে যুগে দিয়েছে শাশ্বত চিরন্তনের স্পর্শ আর স্থিতিশীলতার প্রত্যয়। চির-সুন্দরের প্রতীক এই চাঁদ। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান, সবাই একে ভালোবাসে। কবি সত্যই বলেছেন ঃ

"এমন চাঁদের আলো
মরি যদি সেও ভালো,
সে মরণ স্বরগ সমান।"

শুধু চাঁদকেই যে সবাই ভালোবাসে, তা নয়; চাঁদও সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসে, সমানভাবে অলো দেয়। রাজা-বাদশা, উজির-নাজির, মোল্লা-পুরোহিত-কারো বশে নেই সে; সবার উর্ধ্বে তাঁর স্থান। কেউ তাকে প্রভাবিত করতে পারে না। মানুষের হাতের নাগালের মধ্যে থাকলে হয়ত কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি ওর আলো-বিতরণে স্বজনপ্রীতি দেখাবার সুযোগ পেত। অন্তর্যামী আল্লাহ্ তাই আগে থেকেই ওকে রেখে দিয়েছেন মানুষের নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে। সেখান থেকে তার আলো আসে পৃথিবীর বুকে। সমদর্শিতা ও সমপ্রীতির আদর্শে তাই সে এত সুন্দর—এত মনোরম।

পাকিস্তানের নীতিও হবে চাঁদের মত উদার ও সমদর্শী। আমাদের আলো সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে—এই কথাটি চাঁদ আমাদের বলে।

দ্বিতীয়ার চাঁদের মধ্যে আছে অগ্রসরের বাণী! দ্বিতীয়ার চাঁদ প্রতিদিনই এগিয়ে চলেছে পূর্ণচাঁদের দিকে। পূর্ণিমার চাঁদে না পৌঁছা পর্যন্ত তার সফর থামবে না।

এই এগিয়ে চলার প্রেরণাই হচ্ছে হিলালী চাঁদের পয়গাম।

কিন্তু শুধু পূর্ণচাঁদও পাকিস্তানের লক্ষ্য নয়। আকাশের মৌন মূক অগণিত তারার কথাও সে ভেবেছে। তাই তাদের কাছ থেকেও সে নিয়েছে একজন প্রতিনিধি। আর তাকে আসন দেওয়া হয়েছে কোথায়? নিশানের পশ্চাদ্ভূমিতে নয়, অথবা কোন এক অবজ্ঞাত অন্ধকার কোণেও নয়—একদম চাঁদের বুকে। এমনি সুন্দরভাবে সে ঘটিয়েছে চাঁদ-তারার মিলন। ইসলাম শান্তির ধর্ম। দুই বিপরীতের মাঝখান দিয়ে সে পথ কেটে চলে।

এই 'মধ্যপথ'ই ত শ্রেষ্ঠ পথ। যে আকাশে শুধু চাঁদ আছে, তারা নেই, সে আকাশের শোভা নেই। আবার যে আকাশে তারাই আছে, চাঁদ নেই, তার শোভাও সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

নয়। চাঁদ আছে, তারা আছে, তাই ত রাতের আকাশ এমন শান্ত, স্নিগ্ধ ও মনোরম। এই আপোস–এই সমন্বয়ই ত প্রকৃতির ধর্ম। পুঁজিবাদ (Capitalism) বা সমূহবাদ (Communism) একা কেউই জগতে শান্তি আনতে পারবে না। উভয়ের মধ্যে চাই একটা মিলন বা synthesis. সেই আদর্শই হ'ল ইসলামের, সেই আদর্শই হল পাকিস্তানের। পাকিস্তানের জাতীয় নিশানে তাই ঘটেছে চাঁদ-তারার মিলন। এরই মধ্যে রয়েছে জগতের ভবিষ্যৎ পথের ইঙ্গিত।

আদর্শ সমাজ, আদর্শ রাষ্ট্র (Ideal State) গড়ে তোলাই হচ্ছে জগতের চিরন্তন স্বপ্ন। একমাত্র সহনশীলতার উপরেই এ সমাজ বা এ রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে। তুমিও থাকো, আমিও থাকি—এই নীতিতেই সমাজ বা রাষ্ট্র রচনা করতে হবে। সাদা-কালো, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন–সবাইকে স্বীকার করলে তবেই মহামানবতার ভিত্তি-ভূমি রচিত হয়। এই সমন্বয় ও সহযোগিতার পয়গামকে বলিষ্ঠভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে আমাদের জাতীয় নিশানে। নিশানের যে অংশ সাদা, তারই মধ্যে আছে এই মহামিলনের বাণী। সাদার রাসায়নিক ব্যাখ্যা কি? রাসায়নিক ব্যাখ্যা হল এই যে, যে সাতটি রং আছে, তার সবগুলি এক সাথে মিললে তবেই তা সাদা হয়ে যায়, নইলে হয় না। অন্য কথায় ঃ সাদার বুকে আছে সব রঙের একত্র সমাবেশ। কাজেই বলা হয়েছে ঃ সাদার বুকেতে আছে বাদল ধনু, সাত রঙে গড়া তার শুভ্র তনু।" পাকিস্তান সব রঙকে মিলাবে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, পারিয়া—সকল জাতির সকল ধর্মের রঙই এখানে বিকাশের সুযোগ পাবে। সবার রঙে রঙ মিশাতে গিয়েই নিশানের এক অংশ আমাদের সাদা হয়ে গিয়েছে। সব মানুষ এক জাতি—এই উদার বিশ্বমানবতার বাণী এখানে যেন শুভ্র বেশে রূপ ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

এমনই সুন্দর মহিমান্বিত আমাদের কওমী নিশান।

প্রথম রচনা

১৯৪৮

www.pathagar.com

যশোর সমিতি

(১)

যশোরের সমবেত ভদ্র মহিলা ও ভদ্রমেহোদয়গণ–

যশোর সমিতির আজ তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন। গত ১৯৪৮ সালে এই সমিতি ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। যশোরবাসীদের ধর্ম্ম শিক্ষা সাহিত্য সমাজ ও তাহজিব-তমদ্দুন বিষয়ে সর্ব প্রকার উন্নতি সাধনই এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য।

আমাদের এই সংকীর্ণ গণ্ডীগত রূপ দেখে অনেকেই হয়ত ক্ষুণ্ন হবেন। কিন্তু গণ্ডীরও প্রয়োজন আছে। বিক্ষিপ্ত সূর্য-রশ্মিকে অধিকতর শক্তিশালী করতে হলে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করতে হয়। ব্যক্তি ও সমষ্টি এ দুটো হল আপেক্ষিক শব্দ। একটা ছাড়া অন্যটার কোন অর্থ নেই। ব্যক্তি ছাড়া সমাজ নয়, সমাজ ছাড়াও ব্যক্তি নয়। একটি অপরের পরিপূরক। জাতীয়তা ছাড়া যেমন আন্তর্জ্জাতীয়তা দাঁড়াতে পারে না, আন্তর্জ্জাতীয়তা ছাড়া জাতীয়তারও ঠিক তেমনি কোন অর্থ হয় না। যশোর সমিতির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের এই হল ব্যাখ্যা। আজ যদি যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা রাজশাহী ইত্যাদি সব জেলাগুলি স্বতন্ত্রভাবে জেগে উঠে, তবে সে জাগরণ গোটা পাকিস্তানেরই। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে যশোর সমিতির স্বতন্ত্র ও বিশেষরূপ ধরা পড়লেও তার ভিতরে আছে একটা পরিব্যাপ্ত উদাররূপ– যা সমগ্র পাকিস্তান বা বৃহত্তর মানব-সমাজের সঙ্গে অন্তর্বিজড়িত। সীমার মাঝেই অসীমের সুর শোনা যায়; যশোরের মাঝেও তেমনি ধ্বনিত হবে বিশ্বজগতের সুর----মহামানবতার সুর।

আমাদের সমিতি তিন বৎসরের শিশু। কিন্তু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই একে হতে হয়েছে স্বাবলম্বী। সমিতি কি কি কাজ করেছে তার বিস্তৃত পরিচয় আপনারা পাবেন সমিতির সেক্রেটারীর কার্য-বিবরণীতে। এদিক দিয়ে আমি কিছু বলবো না। সমিতির সৃষ্টি থেকেই আমি এর সঙ্গে জড়িত। যশোর বাসীর মনের কথা আমি কিছুটা জানি। সেই দিক দিয়েই দু-চারটা কথা আজ বলব।

যশোরের যুবশক্তির আজ চাই নূতন জাগরণ, জিন্দাদিল্ একদল নওজোয়ান আমাদের একান্ত প্রয়োজন। সেরূপ যুবক যে আমাদের মধ্যে নেই তা বলছি না, তবে সংগঠন অভাবে সে শক্তির সম্যক পরিস্ফুরণ হতে পারছে না। রসুলুল্লাহর আদর্শে একটা নূতন 'হিল্‌ফ্‌উল্‌-ফজুল' বা সেবা-সমিতি আমরা গড়তে চাই---যারা অন্ধকারের বিরুদ্ধে করবে আলোকের অভিযান, আর্ত পীড়িত ও ব্যথিতের করবে সেবা, অত্যাচার ও অনাচারকে করবে প্রতিরোধ, মজলুমকে করবে রক্ষা আর কওম ও পাকিস্তারেন জন্য করবে জান কোরবান।

পাকিস্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নব নব সম্ভাবনার দুয়ার আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়েছে। পাকিস্তান আদর্শ মুসলিম রাষ্ট্র হবে, ইসলামের বিশ্বজনীন যাবতীয় ধ্যান-ধারণাকে আমরা আবার নূতন করে রূপদান করবো, এই হল আমাদের স্বপ্ন। কিন্তু এ সমস্ত নূতন

www.pathagar.com

ধ্যান-ধারণার বাস্তব রূপায়ণ কি হঠাৎ একদিন আকাশ থেকে নামবে? নিশ্চয়ই না। এর জন্য চাই একনিষ্ঠ সাধনা, চাই প্রস্তুতি। ছাত্র সমাজ, আলেম সমাজ, পুরুষ-সমাজ, নারী-সমাজ-প্রত্যেক স্তরেই আজ আনতে হবে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি, নূতন জিজ্ঞাসা, নূতন অন্বেষা। যশোরের ছেলেরা হবে আদর্শ ছেলে, মেয়েরা হবে আদর্শ মেয়ে। শুধু তাই নয়, শিল্পী ব্যবসায়ী কৃষক মজদুর---সবারই ভিতরে আনতে হবে আজ নূতন প্রাণ-চাঞ্চল্য। আনতে হবে আজ বাঁচবার দুর্নিবার আকাংখা। যশোর সমিতির মধ্য দিয়ে আজ আমরা সবাইকে জানাই সেই আহ্বান-সবাইকে শুনাই সেই এগিয়ে চলার পয়গাম।

যশোরের কবি-সাহিত্যিকদেরকে আজ ডাক দেই। যে নূতন ভবিষ্যৎ তাদের হাতছানি দিচ্ছে, অনাগত উজ্জ্বল দিনের যে ইঙ্গিত আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে, তা যেন তাদের দুয়ার হতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে না যায়। সাহিত্য ক্ষেত্রে নূতন পথ দেখাবার অথবা এর গতিপথের মোড় ফিরাবার যোগ্যতা তাদের আছে। তারা যেন গতানুগতিক পথ অনুসরণ না করে। জানি এপথ অতি বন্ধুর কিন্তু না-চলা পথে চলার ভেতরেই ত গৌরব। এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, ভৌগোলিক পাকিস্তানেরই আমরা শুধু সীমান্ত রক্ষী নই, তমদ্দুনিক পাকিস্তানেরও সীমান্ত আমরা রক্ষা করবো।

হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির দিক দিয়েও যশোর অগ্রণী। কোন বড় রকমের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যশোরে কোনোদিন ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। যশোর সমিতি সেদিকেও দৃষ্টি রেখেছে। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে একটা সুন্দর সুস্থ মিলনের আবহাওয়া তারা বজায় রাখতে চেষ্টা করবে। উপসংহারের আরও দু একটি কথা না বললে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকবে। সমিতির জন্ম থেকেই আমি এর সঙ্গে জড়িত আছি। সমিতির সাধারণ মেম্বর এবং কর্ম-পরিষদের মেম্বরদের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। আমি এদের উৎসাহ, উদ্দীপনা, সেবাপ্রবৃত্তি সংহতি ও শৃঙ্খলার মনোভাব দেখে মুগ্ধ হয়েছি। অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ত এদের ঘটেছে, কিন্তু সকল ছেপে জেগে আছে এদের আন্তরিকতা।

যশোরবাসীর মনে জাগুক আজ নূতন অনুরাগ, চোখে জাগুক আজ নূতন খোয়াব, বুকে জাগুক আজ নবদৃপ্ত উদ্যম। আপন যোগ্যতা দিয়ে সব বিষয়েই তারা সামনের কাতারে এগিয়ে আসুক---রহমানুর রহিম আল্লাহ্ তা'য়ালার দরগায় এই মুনাজাত।

(২)

যশোরের প্রিয় ভাই-ভগিনীরা,

তসলিম ও মুবারকবাদ! যশোর-সমিতি আজ তার চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করলো। অনেক ঝড়ের রাত্রি পেরিয়ে, অনেক ঢেউএর দোলায় দোল খেয়ে আমাদের এই ক্ষুদ্র সোনার তরী এসে পৌঁছালো নূতন আর একটি বন্দরে। চারটি বছর আগে যাত্রা হয়েছিল তার শুরু, ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে চলছিল সে সুমুখ পানে; বুকে ছিল তার নূতন আশা, চোখে ছিল তার নতুন খোয়াব। নূতন প্রেরণায় নতুন চেতনায় যাত্রীরা হয়ে উঠেছিল অশান্ত ও চঞ্চল। দুঃসাহসী নওজোয়ানের দল, জানেনা কোথায় যাবে, তবু চলে! চলায় চলায় পায়ের তলায় তাদের পথ জাগে। বাধাকে মানেনা, বিপদকে মানেনা, এগিয়ে যায় তারা।

www.pathagar.com

ঘাটে ঘাটে নামে; কিছু দেয় কিছু নেয়। দৃষ্টি আকর্ষণ করে সব্বার। "কারা এই তরুণ দল?— আলোকের গান গেয়ে নেচে নেচে চলেছে?" কণ্ঠে কণ্ঠে জবাব শুনা যায় : জাননা? ওরা যশোর সমিতি। সুদূরের যাত্রী ওরা, নূতন ভোরে নূতন আলোকে জয়যাত্রা করেছে অসীম দিগন্তের পানে। ধ্বনি ওঠে, 'যশোর সমিতি জিন্দাবাদ!'

চার বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় যশোর-সমিতি আজ একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। পূর্ব-পাকিস্তানে গঠন-মূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আজ তার নাম সুপরিচিত। আমাদের অন্য কোন বল নাই, আছে মনোবল। সেই মনোবল নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি বৃহত্তর কল্যাণের পথে। একদল মুষ্টিমেয় তরুণ শুধু আমাদের সঙ্গে আছে; আমাদের আদর্শকে তারাই দিচ্ছে রূপ। সেই তরুণ দলকে জানাই আজ অকুণ্ঠ অভিনন্দন।

গত চার বছরে যশোর-সমিতি অনেক কাজ করেছে। কাজ এখনো ফুরায়নি, সামনে আরও অনেক বড় কাজ করবার আছে। কিন্তু একটা জিনিসের গৌরব আমরা করি। আমাদের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা দিয়ে আমরা এক নূতন যশোর রচনা করেছি। যশোরের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ তাই ছিন্ন হয়নি। তার হাসিতে আমরা হাসি, তার কান্নায় আমরা কাঁদি– তাকে আমরা স্বপ্নে দেখি। এই নবসৃষ্টির গৌরব একান্তরূপে যশোর সমিতির। সমিতি যেন একটা আরশি। এই আরশিতে সমগ্র যশোরের জনমনের অন্তর্মূর্তি আমরা দেখতে পাই। সবার মুখ একসঙ্গে ভিড় জমিয়েছে আমাদের এই মনোমুকুরে। সবার হাসি-কান্না এক সঙ্গে আজ শুনতে পাচ্ছি। বিচ্ছিন্ন একটা বিরাট পরিবারকে আমরা যেন একত্র করেছি, আমাদের স্ত্রী-পুত্র মা ভাই-বোন ও প্রতিবেশীকে আজ আমরা একখানে মিলিয়েছি। 'আমি' নই– 'আমরা'– অনুভূতি আজ প্রত্যেক যশোরবাসীর মনে সুস্পষ্ট।

ব্যষ্টি যখন সমষ্টির মধ্যে নিজকে অনুভব করতে শিখে, তখনই হয় সত্যিকার জাতীয় জীবনের জাগরণ। সদর, নড়াইল, ঝিনাইদা, মাগুরার সীমা-প্রাচীর আজ ভেঙ্গে গেছে; যশোর সমিতির চোখে আজ শুধু একটা মূর্তিই বড় হয়ে আছে— সে হচ্ছে যশোর।

কিন্তু শুধু যশোরকেই আমরা একান্ত করে দেখিনি। যশোরের কথা ভাবতে গিয়ে আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের কথাও ভেবেছি। যশোর শুধু একা তার কথা নিয়ে থাকতে পারে না। খুলনা, কুষ্টিয়া, পাবনা প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিও তার পর নয়! জীবনের দিকচক্রবাল এমনি করে দিন দিন আমাদের বড় হয়ে যায়। আমরা তাই বৃহত্তর মানবতারও প্রতিষ্ঠা করেছি। জেলা ছেড়ে আমরা ডিভিশনের সুখ-দুঃখের কথাও ভাবছি। রাজশাহী ডিভিশন্যাল এসোসিয়েশনও আমরা গঠন করেছি। আজ রাজশাহী পাবনা রংপুর দিনাজপুর বগুড়া কুষ্টিয়া খুলনা ও যশোর সবাই হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলেছে সুমুখ পানে। আমরা জানি, সাধনা করলে আমরা এক একটা করে আরও সিঁড়ি অতিক্রম করবো এবং পাকিস্তান ও মুসলিম জাহানের সীমানা পেরিয়ে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ চিন্তা করবো। যশোর সমিতির সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে বিশ্ব-কল্যাণ-সমিতি।

যশোর সমিতির তাই প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক জেলা-সমিতি যদি সুগঠিত না হয় এবং মজবুত ভিত্তির উপর না দাঁড়াতে পারে, তবে গোটা প্রদেশের সংহতিও সুদৃঢ় হয় না।

www.pathagar.com

যশোর-সমিতির এই সাধারণ সভায় দাঁড়িয়ে আজ তাই আমার সহানুভূতি ও আবেদন অন্যান্য জেলাবাসী ভাইদের প্রাণের দুয়ারেও পৌঁছে দিচ্ছি। আজকের এই দিনে যারা বাইরে আছেন, তাদেরও জানাচ্ছি আমাদের সালাম আর আন্তরিক শুভেচ্ছা।

যশোর সমিতি আর একটা গৌরবের অধিকারী। বৃহত্তর গোষ্ঠি গঠন চিন্তায় তারা অগ্রণী। আপনারা জানেন, পাকিস্তানের জন্মের অব্যবহিত পরেই আমাদের এই যশোর সমিতি গঠিত হয়। সবই তখন নূতন; রাজধানী নূতন, আপন স্বার্থ-চিন্তায় মানুষ তখন ব্যাকুল। এমন সময় এই চঞ্চল আবহাওয়ার মধ্যে একমাত্র ঢাকাস্থ যশোরের মুষ্টিমেয় তরুণদের মধ্যেই জেগে উঠেছিল তাদের সমগ্র রূপের কথা; ভেবেছিল তারা সারাটি জেলার সুখ-দুঃখ ও অভাব-অভিযোগের কথা। সেবা ও সংগঠন কার্যে যশোরের এই অগ্রবর্তিতা তাই উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেখাদেখিই পরে অন্যান্য জেলাগুলিতেও জেলা-সমিতি গঠিত হয়েছে।

যশোর যে সংগঠন-কার্যে শুধু পাকিস্তানেই অগ্রণী হয়েছে, তাও নয়; মিলিত বঙ্গের আমলেও যশোর লাভ করেছিল পেশ-কদমের গৌরব। মনের পড়ে ১৯০৭ বা তার কাছাকাছি সময়ে কলিকাতায় এইরূপই একটা যশোর সমিতি গঠিত হয়। যশোরের অন্যতম কৃতিসন্তান মরহুম মৌঃ সিরাজুল ইসলাম এম-এ, বি-এল ছিলেন তখন সেই প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট। যশোরের দেখাদেখি পরে অন্যান্য জেলাতেও অনুরূপ জেলা-সমিতি গঠিত হয়। সুতরাং যশোর তখনও ছিল না-চলা পথের অগ্রপথিক। লাখো শুকরিয়া খোদার দরগায় যে, আজ সীমান্ত পেরিয়ে এসে নূতন রাজধানীতেও যশোর সেই নকীবের ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হয়েছে। এইখানেই আমাদের কৃতিত্ব। অনাগত ভবিষ্যৎ যে আমাদের চোখে ছায়া ফেলে, সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি নিয়ে আমরা যে পথ চিনে লই, এইটুকুই আমাদের বিশেষত্ব। যশোরবাসীর মুখ অনাহারে বেদনা-মলিন, কিন্তু বুদ্ধিদীপ্তিতে তার অন্তর উজ্জ্বল। যশোর আজই শুধু তার খেজুর রস ও পাটালি গুড়ের জন্য বিখ্যাত নয়, বহু পূর্ব থেকেই সে এই রসের বেসাতি করে আসছে। পাঠান, মোগল ও বৃটিশ আমলেও সে সরবরাহ করেছে চিনি ও গুড়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, কোট চাঁদপুরে বিরাট চিনির কারখানা ছিল। সেখান থেকে লাখ লাখ টাকার চিনি ইউরোপে রপ্তানি হত। আর সে চিনি ছিল যশোরের মুসলমানদের তৈরি।

এ থেকেই মনে হয়, যশোরের মাটির তলে আছে এক অক্ষয় রসধারার উৎস-মুখ। খেজুর গাছগুলো যেন সেই রস-ধারার এক একটা পাইপ বা চোঙ। যশোরের মাটিতে ফলে তাই এত কাব্য, এত গান, এত ছন্দ, এত প্রাণ! যুগে যুগে যশোরে জন্মেছে কবি-সাহিত্যিক, নৃতশিল্পী, বাগ্মী, জন্মেছে ভাববাদী সাধক-দরবেশ ও অলি-আল্লাহ্। মাইকেল মধুসূদন, উদয় শঙ্কর, শিশির কুমারও যেমন জন্মেছে, তেমনি জন্মেছে ক্ষণজন্মা বাগ্মীপুরুষ মুনশী মেহের উল্লাহ্, গরীব শাহ্ ফকির, লালন শাহ্, ও পাগলা কানাই। মুন্শী মেহের উল্লাকে আমরা এখনো সম্যকরূপে চিনিনি, চিনলেও তাঁর যোগ্য সমাদর আমরা করিনি ; কিন্তু দিন যেদিন আসবে, সেদিন দেখা যাবে তাঁর নাম লেখা হয়েছে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

নকীবের রূপে। আঁধার যুগে তিনিই ছিলেন আমাদের নও-বেলাল! তিনিই ডাক দিয়েছিলেন আমাদের আঁধার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে জীবনে! জেলায় জেলায় মেহের উল্লার জন্ম-বার্ষিকী আজ উদ্‌যাপিত হওয়া উচিত। যশোর সমিতি এই কর্তব্য যথাযোগ্যভাবে পালন করবে।

আধুনিক যুগেও যশোর কারো পশ্চাতে পড়ে নেই। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে যশোরের কবি-সাহিত্যিকেরা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।

শিল্প ও জ্ঞানের ক্ষেত্রেও যশোর গৌরবের অধিকারী। পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রিন্টিং প্রেস 'প্যারামাউন্ট প্রেস' যশোরের প্রতিষ্ঠান। একমাত্র বাঙালী মুসলিম চিত্র-তারকা বনানী চৌধুরীও যশোরের মেয়ে। শিল্প-সাহিত্য ও চিন্তার ক্ষেত্রে যশোরের দান তাই অনস্বীকার্য।

এই আগে চলার নেশা ভয়ঙ্করের পথেও যশোরকে করেছে অগ্রণী। এশিয়াটিক কলেরা এবং ম্যালেরিয়া জ্বর সর্বপ্রথম যশোরেরই দেখা দেয়।

নিতান্ত দুঃখের বিষয়, রাজনীতির ক্ষেত্রে যশোর তার যোগ্য আসন এখনও লাভ করতে পারে নাই। যশোরের রাষ্ট্রীয় ও ভৌগোলিক গুরুত্ব অন্যান্য জেলা অপেক্ষা অনেক বেশি। পূর্ব-পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা করছে যশোরবাসীরা। যশোরবাসীকে তাই তুলনা করা যেতে পারে পাঠান ও আফ্রিদিদের সঙ্গে। এক কঠিন ভূমিকায় তারা অবতীর্ণ হয়েছে।

যশোরের নওযোয়ান দল। তোমাদের সামনে এসেছে এক নূতন প্রতিযোগিতার যুগ। তোমাদের ঘুমন্ত শক্তি আজ জাগাও। বহির্বিশ্বের পানে তাকাও। আপন শক্তি বলে আজ তোমাদিগকে দাঁড়াতে হবে। যোগ্যতা অর্জন না করলে আজ কেউ তোমাদিগকে খাতির করবেনা। আজ তোমাদিগের ভৈরব ও কপোতাক্ষী গতি হারিয়েছে; তোমাদিগের মনের ভৈরব ও কপোতাক্ষীও কি আজ কচুরীপানায় আচ্ছন্ন নয়? এই মনের নদীর সংস্কার না হ'লে বাইরের নদী চালু হবেনা। যশোর সমিতির হে তরুণ কর্মীরা, এস আজ সেই নদীর বাঁধ আমরা কেটে দেই। জোয়ার আসুক আবার আমাদের জীবনে। দেখবে সেই নূতন স্রোতে আমাদের মনের বদ্ধ আবর্জনা সব ভেসে যাবে; আমাদের নদী-নালা সব আবার বেগবতী হয়ে উঠবে, যশোর আবার ফুলে ফলে নবগৌরবে জাগবে।

www.pathagar.com

মাঠের কবি

দেশের মাটিই হচ্ছে প্রত্যেক জাতির **Real state** বা সত্যিকার রাষ্ট্র। কাজেই আমাদের কৃষক ভায়েরাই হচ্ছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সত্যিকার নাগরিক। মাটির সঙ্গে এদেরই রয়েছে রক্ত-মাংসের সম্বন্ধ।

সাহিত্য প্রত্যেক জাতির মনোমুকুর। সাহিত্যের আর্শিতেই জাতির অন্তমূর্তি প্রতিফলিত হয়। আমাদের সাহিত্যেও তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিবিম্বিত হবে আমাদের কৃষক-জীবনের ছবি। শতকরা ৯০ জনকে বাদ দিয়ে কোন সাহিত্য রচিত হতে পারেনা; হলেও তা হবে বুর্জোয়া সাহিত্য বা কুলিন সাহিত্য। আমরা যে ভাষায় লিখি, তাতে আছে সেই আভিজাত্যের গন্ধ। এ ভাষা মাঠের মাটিতে নামতে জানেনা, শুধু জানে আকাশে উড়তে। সাহিত্যের এই ব্রাহ্মণ্যরূপ এখন আমাদের যথাসাধ্য বর্জন করতে হবে; নামতে হবে আমাদের ধরার ধূলায়, শুনতে হবে মাটির বুকের কান্না-হাসি, গাইতে হবে মাটির মানুষের গান। এদের জীবনেও রহস্য আছে,রোমাঞ্চ আছে, প্রেম আছে, বিরহ আছে। কাব্য ও সাহিত্যের প্রচুর উপকরণ এখানে আছে। Bitter Rice এর মত তিক্ত ধান এদেশেও জন্মে; Silviana-র মত মেয়ে এ দেশেও অনেক পাওয়া যায়। সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার গুণে ইটালিতে তা নিয়ে রচিত হয় অমর কাব্য-কাহিনী আর এখানে কিছুই হয়না। আমাদের দৃষ্টিকোণের ও মূল্যজ্ঞানের পরিবর্তন হওয়া তাই একান্ত প্রয়োজন। এদের প্রতি এখন আমাদের চোখ ফিরাতে হবে। দরদী শিল্পীর ছোঁওয়া লাগলে এই সব উপকরণই অপরূপ কাব্যশ্রীতে মণ্ডিত হতে পারে। দুঃখের বিষয়, আমাদের কবি সাহিত্যিকেরা এদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন; এদের জীবনের চমৎকারিত্ব ও মাধূর্য তাই এরা ধরতে পারেন না। আজ তাই নূতন করে সম্বন্ধ পাতাতে হবে এদের সাথে; কলকাতা বা কৃষ্ণনগরী ভাষার মোহ আমাদের ভুলতে হবে। আর ভাষার রূপ বদলালেই সাহিত্যের মূল্য ও মান কমে যাবে, তাই বা কে বলছে। ওটা একটা সংস্কার মাত্র। কলকাতার ভাষাই যে আদর্শ ভাষা, তা ত নাও হতে পারে। সৃষ্টি করতে জানলে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা দিয়েও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য রচনা করা যায়। লালন ফকিরের গান বা ময়মনসিংহ-গীতিকা তার জলন্ত প্রমাণ। কৃষকদের নিয়ে সৃষ্টি করতে হবে এক নূতন সাহিত্য—পোষাকী সাহিত্য হতে যা' হবে স্বতন্ত্র। বর্তমান পণ্ডিতী ভাষায় সে সাহিত্য রচনা সম্ভব হবেনা; তার জন্য খুঁজতে হবে আমাদের নূতন টেক্‌নিক—নূতন শব্দ-সম্পদ।

আমাদের কবি সাহিত্যিকেরা খানিকটা অকৃতজ্ঞ বৈ কি! 'দেওয়া-নেওয়া' (Give and take) নীতির উপরেই সমাজ গড়ে উঠেছে। তোমার যা অভাব, আমি পূরণ করবো; আমার যা অভাব, তুমি পূরণ করবে—সমাজ-বিজ্ঞানের গোড়ার কথাই হল এই। সমাজ জীবন এমন করেই গড়ে উঠেছিল প্রথমে। কিন্তু এই চুক্তি ভঙ্গ করেছে স্বার্থবাদীরা, তাই সমাজের স্তরে স্তরে দেখা দিয়েছে এত অশান্তি–এত সংঘাত। অন্য যে যা-ই করুক, অন্ততঃ কবি-সাহিত্যিকদের দৃষ্টি ওদের পানে উদার ও সহানুভূতিশীল হওয়া দরকার। টলষ্টয় বড় সুন্দর কথাই বলে গেছেন যে, কৃষকেরা যা উৎপন্ন করে, তা যদি

www.pathagar.com

কবি-সাহিত্যিক বা শিল্পীরা অসঙ্কোচে গ্রহণ করতে পারে, তবে তাদেরও উচিত এমন সাহিত্য উৎপন্ন করা—যা কৃষক-মজদুরেরাও খানিকটা উপভোগ করতে পারে। দুঃখের বিষয় আমরা শুধু নিতেই জানি, দিতে জানিনা। ওদের ধান, ওদের শস্য, শাক-সব্জি, তরী-তরকারী দিব্বি আমরা খেয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আমরা বসে বসে এমনি দিল্লীকা লাড্ডু বা অশ্বডিম্ব তৈয়ার করছি—যা ওরা মোটেই গ্রহণ করতে পারেনা, করলেও স্বাদ পায়না। আমাদের সৃষ্টির পানে ওরা তাই অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। ওরাও শিল্পী—আমরাও শিল্পী, কিন্তু ওদের আর্ট হচ্ছে Art for man's sake, আর আমাদের সৃষ্টি Art for Art's sake–এই হচ্ছে পার্থক্য। ওদের কাব্য-সৃষ্টির প্রতি-বছরেই নূতন সংস্করণ বেরোয়, কিন্তু আমাদের কাব্যের এক একটা সংস্করণ বেরুতে কত বছর লাগে?

সমস্ত কাব্য-শিল্পই সৃষ্টিধর্মী। যেখানে আছে সৃষ্টি ও সৌন্দর্যের বিকাশ, সেখানেই প্রকাশ পেয়েছে কাব্য ও আর্ট। কথা দিয়ে যারা মালা গাঁথে তারাই শুধু কবি নয়, রংএর তুলি দিয়ে যে ছবি আঁকলো, কণ্ঠ দিয়ে যে সুর সৃষ্টি করলো, শ্বেত-মর্মরে যে 'তাজমহল' গড়লো—সেও কবি। এই হিসাবে আমাদের কৃষক ভায়েরাও কবি। তারা সৃষ্টি করে ধানের মঞ্জরী, মাঠে মাঠে ফলায় সোনার ফসল, ফুটায় তারা ফুল ও ফল। এক-একখানি আল-বাঁধা ক্ষেত যেন তাদের বিরাট কাব্যের এক একখানি পৃষ্ঠা; অথবা এক একখানি ফ্রেমেআ'টা ছবি। ওদের লাঙল, কাস্তে, নিড়ানি—এগুলো সব তুলি। এক এক সময় এক একটা দিয়ে সরু মোটা কাজ করতে হয়। এমনি করে দিনে দিনে ফুটে ওঠে ওদের অনেক স্বপ্ন বাস্তব রূপ নিয়ে। ওদের সোনার তুলির ছোঁওয়া লেগে জেগে ওঠে কত বর্ণ, কত গন্ধ, কত গান, কত ছন্দ! বর্ষা-শরতে, শীত-বসন্তে, ওদের মাঠে মাঠে বসে ফসলের উৎসব। প্রথম আষাঢ়ে দাওয়াত পাঠায় ওরা মেঘে মেঘে গগনে গগনে। বাজে মাদল, বাজে মৃদঙ্গ, সাথে সাথে নেচে যায় বাদলা-পরীরা—রুম্‌ঝুম্‌ নূপুর পায়ে। হেমন্তে আসে ভোজের উৎসব। মাঠ ভরা সোনালী ধান—কে কত নেবে নাও; কে কত খাবে খাও! আসে দোয়েল কোয়েল, আসে বুলবুল, আসে আরো নাম-না-জানা কত পাখী! ঘাটে ঘাটে ভিড় করে কত পণ্য-তরণী, গঞ্জে গঞ্জে বসে কত হাট-বাজার। মাঠের কাব্যের কল-সঙ্গীতে সারা দেশ ওঠে মেতে! শীতের শেষে ওরা করে আনন্দোৎসব। কত মটর-কুমারী ও শর্ষে-বালা নেচে নেচে গান গায় নানা রঙের ওড়না তাদের গা'য়ে। রূপ আর সুরভিতে ভরে ওঠে সারামাঠ। কী বিচিত্র এদের কাব্য-বোধ!

এই অনাদি কালের স্বভাব-কবিদের থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছি আমরা। এদের বাণী, এদের সুর, এদের ছন্দ আমাদের বুঝতে হবে।

পূর্ব-পাকিস্তানের কবি-সাহিত্যিকেরা এই পথে এগিয়ে আসুন।

কৃষিকথা

১৯৫৩

www.pathagar.com

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

হে কবি,

শতাব্দীর আড়াল থেকে তোমারই দেশের আর এক নগণ্য কবি জানায় তোমাকে সশ্রদ্ধ তসলিম। এই শ্রদ্ধা নিবেদন শুধু একটা মামুলি শিষ্টাচার নয়। অন্তরে অন্তরে তোমার সাথে আমার যে নিবিড় যোগ রয়েছে, তারই এ স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। যে মাটির বুকে, যে আকাশের তলে, যে আলো-বাতাসে একদিন তুমি লালিত হয়েছিলে, সেই মাটি সেই আকাশ—সেই আলো-বাতাস আমারও জীবনকে করেছে পরিপুষ্ট। তোমার জন্মভূমি আমারও জন্মভূমি—এইত আমার এক বড় পরিচয়। আজ এই সাগরদাঁড়িতে এসে আমার মনেও দোলা লেগেছে। এই সাগরদাঁড়িতে দাঁড়িয়েই ত তুমি শুনেছিলে মহাসাগরের আহ্বান—পেঁয়েছিলে অসীমের ইংগিত। তাই ত দিয়েছিলে ভাসিয়ে আনন্তের পানে তোমার গানের তরী। আজ এসেছি তোমার সেই জয়যাত্রার বেলাভূমি পুণ্যস্মৃতি সাগরদাঁড়িতে। আশা আছে এই বন্দর থেকে আমিও ভাসাব আমার স্বপ্নের তরী—নীল সাগরের বুকে। হে কাব্যলোকের দুঃসাহসী কলম্বস, আমার চলার পথে তুমি রেখাপাত করে গেছ। শুনে খুশী হবে ঃ এই খণ্ডকাব্য ও তরল ভাববিলাসের যুগে আমিও তোমার পদানুসরণ করে লিখেছি একখানি মহাকাব্য। সে-কাব্যের কিছুটা আজ তোমাকে শুনিয়ে যাবো। জানিনা আমার এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে কিনা এবং আমার দেশবাসী একে গ্রহণ করবে কিনা। যদি করে, তবে সে-কৃতিত্বের উপর তোমার দাবী থাকবে অনেকখানি, আর থাকবে মহাকাব্যের দেশ এই যশোরের আলো-বাতাস আর মাটির।

তুমি শুধু যশোরের নও—পাকিস্তানের। জানি কবিরা সর্ব দেশের, সর্ব কালের। তবু যদি দৃষ্টিকোণকে খর্ব করে জাতীয়তা বা প্রাদেশিকতার আলোকেও তোমাকে দেখি, তা হলেও তোমাকে নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। পূর্ব-পাকিস্তান আজ এমন একজন কবিকে পেয়েছে যিনি বাংলা ভাষার অন্যতম মহাকবি। এই গৌরব গোটা পাকিস্তানের।

কাব্য হচ্ছে সত্য ও সুন্দরের প্রকাশ। তার আবেদন কোন দিন সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনা, আকাশের আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে সে ভুবনে ভুবনে। কাব্য সাহিত্য ও শিল্প তাই ত বিশ্ববাসীর সাধারণ সম্পত্তি। কবি-শিল্পীরা গোটা মানব জাতির প্রতিনিধিত্ব করে। সব কাব্য সব সাহিত্য হচ্ছে জীবনেরই রূপচ্ছবি-জীবনেরই রসমূর্তি। সে জীবন কার, সে প্রশ্ন অবান্তর। কবি হিন্দু না মুসলমান না খৃষ্টান—সে প্রশ্ন কেউ করেনা। সত্য ও সুন্দর এমনি করে ব্যক্তি সমাজ ও দেশের গণ্ডী পেরিয়ে গিয়ে বিশ্বজনীন হয়। তাজমহল আজ আর শাহ্‌জাহানের নয়—সারা জাহানের। ব্যক্তির চিন্তা বা শিল্পসৃষ্টি এমনি করে বিশ্ব-মানুষের মনের প্রতিনিধিত্ব করে। সেই জন্যই ত হোমার, ভার্জিল, বাল্মিকী, সাদী, হাফিজ, রুমী, দান্তে মিলটন, শেকস্‌পিয়ার, রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল—সবাই আজ বিশ্বকবি।

মধুসূদনের কাব্যে ঝংকৃত হয়েছে সেই চিরন্তনের সুর। তাই আজ তাঁর আবেদন আমাদের সকলের কাছেই সমান। তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে তার স্বদেশবাসীর কাছে হয়ত খানিকটা ছোট হয়েছেন, কিন্তু মূলত তিনি তাঁর নিজ ধর্মে নিজ দেশে এবং নিজ সমাজেই

www.pathagar.com

আছেন। সেখানে তাঁর সমাজ বা ধর্মচ্যুতি ঘটে নাই। ধর্মচ্যুতি বা সমাজচ্যুতি যে ঘটেনি, তাঁর প্রমাণ আজ এখানেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। মধুসূদন ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দুঘরের ছেলে। তিনি হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করলেন, সমাজ পরিত্যাগ করলেন, স্বদেশ পরিত্যাগ করলেন। হিন্দুধর্ম ও সমাজের প্রতি এটা একটা প্রচণ্ড আঘাত সন্দেহ নাই; কিন্তু বিরাট মানব সমাজ ত তাতে কিছু হারায়নি! হিন্দুসমাজ ছেড়ে তিনি বৃহত্তর মানব-সমাজে এসেছেন। মাইকেল এখন মানুষের কবি—মানবতার কবি। বাংলা ভাষার চিরাচরিত রীতি-পদ্ধতি ছেড়ে অমিত্রচ্ছন্দে তিনি কাব্য রচনা করলেন, 'মেঘনাদবধ কাব্যে' হিন্দুর পরমারাধ্য আদর্শ পুরুষ রাম ও লক্ষ্মণকে করলেন তিনি খাটো, আর তার পাশে উঁচু করে ধরলেন রাবণ মেঘনাদ ও প্রমীলাকে, রাক্ষস-জাতীয় অনার্য ও অসভ্য লঙ্কাবাসীদিগকে দিলেন তিনি মানুষের পদমর্যাদা ও গৌরবাধিকার। এতবড় প্রচণ্ড আঘাত ও বিদ্রোহের পরও আজ দেখতে পাচ্ছি হিন্দু-সমাজ মাইকেলের গৌরবে গৌরবান্বিত। এ নিশ্চয় হিন্দু-সমাজের উদারতা, উন্নত কাব্যরসানুভূতি ও বিশ্বমানবতাবোধেরই পরিচায়ক। তবু তাই নয়, মধুসূদনের সমসময়েও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও মধুসূদনকে অবজ্ঞা করেন নি; বরং দুর্দিনে তাঁরা তাঁকে সাহায্যই করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কালজয়ী প্রতিভা গণ্ডীসংকীর্ণতা অতিক্রম করে শাশ্বত মহিমার আসন লাভ করে। মধুসূদনের যুবমনে সৃষ্টির বেদনা ও কৌতূহল অতিমাত্রায় প্রবল হয়ে উঠেছিল; একটা দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বৃহত্তর জীবন ও বিশ্ববোধই তাঁকে এই গণ্ডী-ভাঙার প্রেরণা দিয়েছিল। এটা ঠিক যে, হিন্দুসমাজে থেকে যদি তিনি কোন মৌলিক দান দিতেন, তা হলেও তিনি বিশ্ববরণ্যে হতে পারতেন—যেমন হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বস্তুত জাতি ধর্ম বা দেশের প্রশ্ন সাহিত্যে বড় কথা নয়। বড় এখানে সৃষ্টির প্রশ্ন।

তবে একথাও সত্যি যে, মাইকেলী যুগে বাংলার হিন্দু-সমাজে যে রক্ষণশীলতা ও প্রতিকূল পরিবেশ ছিল, তাতে দেশ ও ধর্ম ত্যাগ না করে তাঁর উপায় ছিল না। যে অমূল্য সম্পদ তিনি তাঁর দেশবাসীকে উপহার দিয়ে গেছেন, আপন দেশে আপন সমাজ ও ধর্মের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকলে হয়ত তা তিনি দিতে পারতেন না। নূতন সৃষ্টির তাগিদেই তাঁকে বিদ্রোহী হতে হয়েছিল। যে-বিদ্রোহের পশ্চাতে থাকে নবসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা, যে-বিদ্রোহ অপরাধ নয়। সৃষ্টির গৌরবে সে বিদ্রোহকে ক্ষমা করা যায়।

মধুসূদনের স্বধর্ম ও স্বদেশ বর্জন নানা কারণে সার্থক হয়েছে। বাংলা ভাষার মুক্তি ও কল্যাণের জন্য একজন ভক্তের রক্তদানের প্রয়োজন ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনেকে বাংলা-ভাষার জন্মদাতা বলে মনে করেন। তাঁর দান অনস্বীকার্য, সন্দেহ নাই, তবু বলতে হবে বাংলা ভাষার সত্যিকার মুক্তি এসেছে মাইকেলের হাতে। মধুসূদনই বাংলা-ভাষাকে গণ্ডী-সংকীর্ণতার হাত থেকে উদ্ধার করেছেন। আজ যে বাংলা-ভাষার এত বৈচিত্র্য, এত সমৃদ্ধি, তার মূলে রয়েছে মধুসূদনের যাদুস্পর্শ। সংস্কৃত ব্যাকরণ, রচনা পদ্ধতি, ছন্দ-প্রকরণ এবং পয়ার-ত্রিপদীর একঘেঁয়ে সুর (jingling monotony) বাংলা ভাষাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। ছন্দের লৌহ-প্রাচীরের মধ্যে কাব্যস্রোত রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মধুসূদন বুঝেছিলেন : এই বন্দিনী বাংলা-ভাষার মুক্তি সাধন করতে হলে একে

www.pathagar.com

দিতে হবে পাশ্চাত্যের স্পর্শ। কে হবে কালাপানি পার? কে শিখবে ম্লেচ্ছদের ভাষা, ভাব ও আংগিক? কে করবে বাংলা-ভাষাকে নব রূপদান? ভাষা-জননীর আহ্বান ফিরে গেল সবার দুয়ার থেকে। কেউ সাড়া দিল না। অবশেষে যশোরের এক নিভৃত পল্লী থেকে এক তরুণ কিশোর এগিয়ে এলো আত্মদান করতে। স্বধর্ম ছাড়লো সে, স্বদেশ ছাড়লো সে। গেল বিদেশে, শিখলো নানা ভাষা, নানা ছন্দ, নানা সুর। তারপর লিখলো এসে নূতন ভংগীতে এক নূতন মহাকাব্য, রচনা করলো সনেট; রচনা করলো নাটক। বাংলা ভাষার প্রগতির পথ থেকে সরে গেল যেন একখানা প্রকাণ্ড জগদ্দল পাথর! অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে এল যেন নূতন আলো-বাতাসের মুক্ত প্রবাহ। বদ্ধ পুষ্করিণীর পাড় ভেঙে এল যেন সমুদ্রের উদ্যাম প্রাণবন্যা। কে করল এই যুগপ্রবর্তন? কে আনলো এই বিপ্লব? কেউ নয়—যশোরের এই সাগরদাঁড়িরই দুঃসাহসী তরুণ বীর মধুসূদন। সারা বাংলা দেশের মধ্যে বন্দিনী ভাষা-জননীর ক্রন্দনে যেখানে কেউ সাড়া দেয়নি, যশোর সেখানে এগিয়ে এসেছে। এ গৌরব একান্তরূপে যশোরের। সত্যি, ভাবলে অবাক হতে হয়,–মাত্র উনিশ বছরের এক তরুণ যুবকের অন্তরে কি করে জাগল এমন একটা কল্যাণ-জিজ্ঞাসা—এত বড় ধ্রুবের অন্বেষা! ধর্মান্তর গ্রহণ করা, বিলেত যাওয়া বা সনাতন রীতি-নীতিকে অস্বীকার করে কোন একটা নূতন পথে চলা এখনকার দিনে সহজ, কিন্তু মাইকেলের যুগে তা কত কঠিন ছিল, তা সকলেই জানেন। একে ত না-চলা বন্ধুর পথ, তাতে আবার একলা পথিক। কতখানি মনোবল ও গভীর আত্মপ্রত্যয় থাকলে একটা যুবক এই বিপদ-সংকুল অচিন্ পথে পা বাড়াতে সাহস করে! এইখানে মাইকেলকে দেখতে পাই শুধু স্রষ্টারূপেই নয়, দ্রষ্টারূপেও। তাঁর চোখে ছিল পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি। দেখতে পেয়েছিলেন তিনি অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্নচ্ছবি, শুনতে পেয়েছিলেন এক না-আসা যুগের গোপন পদধ্বনি। কবিরা তো যুগের আগে আগেই চলেন।

মাইকেলের যে অনন্যসাধারণ প্রতিভা ছিল, গোড়া থেকেই তার পরিচয় মিলেছিল। উনিশ বৎসর বয়সে যেদিন তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন, সেদিন তিনি যে ইংরাজী কবিতাটি লিখেছিলেন, অনুভূতির আন্তরিকতায় তা একেবারে অনবদ্য। সে কবিতাটি এই ঃ

I

Long sunk in superstion's night
By Sin and Satan driven,
I saw not, cared not, for the light
That leads the blind to Heavn.

II

I sat in darkness, Reason's eye
Was shut, was closed in me,
I hastened to Eternity
Over error's dreadful sea.

III

But now, at length, Thy grace, O Lord,
Bids all around me shine,

www.pathagar.com

I drink Thy sweet, Thy precious word
I kneel before Thy shrine.

IV

I have broke affection's tenderest ties
For my blest Saviour's sake,
All, all I love beneath the skies
Lord, I for Thee forsake!"

এইখানে মধুসূদনের ধর্মান্তর গ্রহণের অনেকখানি কারণ পাওয়া যায়। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের সন্ধানে একটা দ্বন্দ্ব চলেছিল তাঁর মনে। কোন বিদেশিনীর প্রেম নয়, প্রলোভন নয়, সত্য ও সুন্দরের পরম তৃষ্ণাই তাঁকে করে তুলেছিল অস্থির চঞ্চল। এই জন্যই তিনি সমস্ত স্নেহের বন্ধনে কাটতে পেরেছিলেন, এই জন্যই তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব বর্জন করতে পেরেছিলেন।

কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করেও তাঁর মন শান্ত হলনা। চলে গেলেন তিনি মাদ্রাজ। তারপর বিলেত। একটা অশান্ত ঈগল পাখী ধরার ধূলায় কোথাও যেন বাসা বাঁধতে চায়না, অনন্ত আকাশে পাখা মেলে শুধু উড়তেই চায়। এইখানে আমাদের তরুণ কবিরা মাইকেলের কাছ থেকে অনেকখানি পাঠ গ্রহণ করতে পারেন। অনেকে মনে করেন কবি হলে আর লেখাপড়া শিখতে হয়না, স্বভাব বা প্রকৃতিই তাকে চালিয়ে নেয়। মাইকেলের কঠোর জ্ঞান-সাধনার কথা ভেবে দেখলে তাদের এ ভুল ভাঙবে। মাদ্রাজে থাকা কালীন তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাককে মাইকেল যে পত্র লিখেছিলেন, তাতে তিনি তাঁর দৈনন্দিন কর্মজীবনের একটা তালিকা দিয়েছিলেন। সেই পত্রের এক স্থানে লিখেছিলেন ঃ

"Perhaps you do not know that I devote several hours daily to Tamil. My life is more busy than that of a school boy. Here is my routine; 6–8 Hebrew, 8—12 School, 12—2 Greek, 2—5 Telegu and Sanskrit, 5—7 Latin. 7—10 English.

এদিকে দেশে থাকা কালীন ছাত্রাবস্থায় তিনি মৌলবীর কাছে ফার্সি ভাষাও শিখেছিলেন। আবার বিলেত গিয়েও তিনি বসে ছিলেন না। সেখানেও ল্যাটিন, জার্মান এবং ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। ফরাসী ভাষায় তিনি সুন্দর কবিতা রচনা করতেন। তা হলে দেখা যাচ্ছে ঃ মাইকেল বাংলা ইংরাজী সংস্কৃত ফার্সি তামিল তেলেগু গ্রীক ল্যাটিন হীব্রু ফরাসী প্রভৃতি ১০/১২টি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ইউরোপের সমস্ত কাব্য ও নাট্য-সাহিত্য তিনি পড়েছিলেন। এ কি সহজ কথা! অনন্য সাধারণ কবি প্রতিভার অধিকারী হয়েও তিনি গভীর ভাবে অধ্যয়ন করতেন। এর দ্বারাই বুঝতে হবে—শুধু প্রতিভা থাকলেই চলেনা, প্রতিভাকে জ্ঞান দ্বারা মার্জিত ও তীক্ষ্ণ করে নিতে হয়, অন্যথায় কোন বড় দান দেওয়া যায় না। কোন একজন সুরসিক লোক ঠিকই বলেছিলেন,

'Genius is 10% inspiration and 90% perspiration.'

www.pathagar.com

অমিত্রাক্ষর ছন্দ

মাইকেলের সব চেয়ে বড় অবদান হল বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন। আমাদের দেখতে হবে কেন তিনি এই নূতন পথে চললেন। মাইকেলের সময় পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রচলিত ছিল শুধু পয়ার আর ত্রিপদী। ভারতচন্দ্রই প্রাক-মাইকেল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কাব্যে ছিল ভাব-লালিত্য ও রস-মাধুর্য যথেষ্ট, কিন্তু ছিলনা কোন গাম্ভীর্য বা বীর-রস। পয়ার ও ত্রিপদীর দোষ হল—বেশীক্ষণ এ-ছন্দ চালাতে গেলেই একঘেঁয়েমি এসে পড়ে। কোন গম্ভীর বিষয়বস্তু ধারণ করবার পক্ষে পয়ার বা ত্রিপদী উপযুক্ত বাহনও নয়। ইউরোপের যত মহাকাব্য, তার অধিকাংশই মুক্তছন্দে লেখা। হোমার, ভার্জিল, মিলটন, শেকস্‌পিয়ার এরা সকলেই মুক্তছন্দ ব্যবহার করেছেন। এ সম্বন্ধে ইউরোপীয় সাহিত্যে অবশ্য দুটো দল আছে, এক দলের মতে ছন্দ ছাড়া কোন কাব্যই চলেনা; আর এক দলের মতে কাব্যের সহজ প্রকাশের পথে ছন্দ একটা মস্ত বড় বন্ধন বিশেষ। মিলটন তাঁর 'PARADISE LOST'-এর ছন্দ সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

"The measure is English Heroic verse without Rime, as that of Homer in Greek and of Vergil in Latin, rime being no necessary adjunct or true ornament of poem or good verse, in larger works especially."

মহাকবি গ্যেটে কিন্তু এর বিপরীত মত পোষণ করতেন। তিনি বলেন ঃ "All that is poetic in character should be rhythmically treated."

দুই তরফেই কিছু বলবার আছে। তবে আমার মনে হয় ঃ মহাকাব্যের পক্ষে অমিত্রাক্ষর ছন্দই অধিক উপযোগী। ইচ্ছামত যতিভঙের দ্বারা মুক্তচ্ছন্দে বৈচিত্র্য আনা যায়, একঘেঁয়েমি দোষ দূর হয়। মাইকেল ছিলেন এই মতাবলম্বী। মিলটনের "Paradise Lost" তাঁকে দিয়েছে বিপুল প্রেরণা। একই অনুকরণে তিনি লিখেছিলেন 'মেঘনাদবধ কাব্য'। কিন্তু ইংরাজী ভাষার দিক দিয়ে মেঘনাদবধ কাব্য অনুকরণ হলেও বাংলা-সাহিত্যে এ এক সম্পূর্ণ মৌলিক দান। অনস্তিত্বের ভিতর থেকে কিছু একটা সৃষ্টি করা সহজ কথা নয়। সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা ছাড়া এ-কাজ কেউ করতে পারে না। বাংলা ভাষায় নাটক এবং সনেটও মাইকেলের নবসৃষ্টি। এই বিপুল সৃষ্টির উল্লাসেই মাইকেল বিদ্রোহী, হয়েছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সার্থকতায় আজ তাঁর বিদ্রোহও সার্থক হয়েছে। বাংলা ভাষার তিনি ত্রাণকর্তা বা 'Saviour'। এই বিদ্রোহই ত সুন্দর। সৃষ্টির জন্য যাঁরা ধ্বংস করেন তাঁরা যুগমানব।

মাইকেলের কাব্য-সমালোচনার স্থান এ নয়। তাঁর কাব্যের বিরুদ্ধে যে কিছুই বলবার নেই—সে কথা আমি বলছি না। প্রত্যেক কবিরই কিছু-না-কিছু দোষত্রুটি থাকেই। ভাল কাব্যের (poesia) সঙ্গে কিছু-কিছু অকাব্যও (non-poesia) থাকে। মাইকেলেও আছে। তা ছাড়া যুগে যুগে মানুষের রুচি-জ্ঞানও পরিবর্তিত হয়। তাই এ-যুগের মানুষ যদি মাইকেল-কাব্যের কোন বিরুদ্ধ সমালোচনা করেই, তাতেও কোন দোষ হয়না।

www.pathagar.com

অমন সুন্দর যে চাঁদ, তারও বুকে আছে কলঙ্ক। কবিরাই বা কেন বাদ যাবেন! যে মিলটন Paradise Lost লিখে বিশ্ববরেণ্য হয়েছিলেন, এ-যুগের দৃষ্টিতে তিনিও আজ রেহাই পাচ্ছেন না। এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও কাব্যসমালোচক T. S. Eliot মিলটনকে অত্যন্ত কঠোর ভাবে সমালোচনা করেছেন। তাঁর ভাষাকে তিনি বলেছেন "artificial and conventional," "Milton writes English like a dead language." এই হল এলিয়েটের অভিযোগ। এর দুর্বোধ্য ভাষা ও অহেতুক শব্দাড়ম্বর কাব্যের অন্তর্নির্হিত ভাবগ্রহণে মস্তবড় বাধার সৃষ্টি করে—এই জন্য এলিয়ট উপদেশ দিয়েছেন 'Paradise Lost' কাব্যখানি দুইবার দুই ভঙ্গিতে পড়বার। একবার পড়তে হবে এর শুধু শব্দ-ঝংকারের সৌন্দর্য উপলব্ধি করবার জন্য, আর একবার পড়তে হবে এর অন্তর্নিহিত ভাব গ্রহণের জন্য। এটা অবশ্য তীক্ষ্ণ শ্লেষ, কারণ কাব্য কেউ এমন করে পড়েনা। পঠন ও রসগ্রহণ একই সঙ্গে চলবে—এই হল নিয়ম।

মাইকেলের কাব্য-বিচারের সময়েও সমালোকেরা হয়ত এইসব কথা বলবেন। তাঁর ভাষার দুর্বোধ্যতা এক মস্তবড় অভিযোগ। কিন্তু কোন সৃষ্টিই ত নিখুঁৎ নয়। দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত যে একমাত্র সার্থক মহাকাব্য, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

কবির ভাগ্য

মাইকেলের শেষ জীবনে বড় দুঃখের এত বড় একজন প্রতিভাশীল কবিকে মরতে হল নিদারুণ অভাবের মধ্যে দাতব্য চিকিৎসালয়ে। এই সময় তাঁর স্ত্রী হেনরিয়েটাও ছিলেন গুরুতর পীড়িতা। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জুন মাসের ২৫ তারিখে হেনরিয়েটার মৃত্যু হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর মাত্র চারদিন পরে শোক-বিহ্বল কবিও ইহলোক ত্যাগ করেন। সেদিন ছিল রবিবার। ২৯শে জুন, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

বিরাট বাংলা দেশের মুখ এখানে ছোট হয়ে গেছে। এমনকি খৃষ্টান জগতও তাঁদের কর্তব্য পালন করেন নি। মাইকেলের একটা জীবিকার্জনের সুব্যবস্থা তাঁরা অনায়াসেই করতে পারতেন। এতবড় একজন প্রতিভাবান ব্যক্তিও খৃষ্টাসমাজের কাছে মর্যাদা পান নি। নেটিভ বলেই হয়ত তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল এই লাঞ্ছনা ও অবজ্ঞা।

একটা সান্ত্বনাই শুধু এখানে আছে, সেটা হচ্ছে—এই ভাগ্য-বিড়ম্বনা শুধু যে মাইকেলই একা ভোগ করে গেছেন, তা নয়। যুগে যুগে দেশে দেশে কবিদের ভাগ্য এমনি করেই বিড়ম্বিত হয়েছে।

মাইকেলের জন্মোৎসব কিছুটা যেন একঘেঁযে হয়ে উঠেছে। সেটা কিছুতেই হতে দেওয়া হবে না। প্রতি বছর তার জন্মবার্ষিকী উদযাপন করেই আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করছি। তাতে সত্যিকারের কোন কল্যাণ হচ্ছেনা। তার চেয়ে তাঁকে কেন্দ্র করে যশোর একটা মাইকেল পাঠাগার বা মাইকেল-পুরস্কার পরিষদ গঠন করলে ভাল হয়। তাতে সাহিত্য-সৃষ্টির পথকে সুগম করা হয়, সাহিত্যিকেরাও উৎসাহ পায়। শুধু স্মৃতি-বার্ষিকী পালন করেই আমাদের ক্ষান্ত থাকা উচিত নয়। মাইকেলের আদর্শকে যথাসম্ভব

www.pathagar.com

আমাদিগকে গ্রহণ করতে হবে, তবেই তাঁর স্মৃতি-উদযাপন সার্থক হবে। তাঁর মত সবাইকে ধর্মান্তর গ্রহণ করতে হবে, তার কোন মানে নেই। তাঁর মধ্যে অন্যান্য আরও যেসব মহৎগণ ছিল, ততা থেকে সকলে আমরা প্রেরণা নিতে পারি। তাঁর মত ছাত্র কই? তাঁর মত তরুণ কই? সেই অটল দৃঢ় বিশ্বাস, সেই নির্ভীক মনোবল, সেই গভীর সাধনা কই? কোথায় আমাদের মধ্যে সেই নবসৃষ্টির অদম্য কৌতূহল? আদর্শের জন্য কোথায় সেই আত্মত্যাগ? কোথায় সেই নূতন পথে চলবার দুর্জয় পণ, উদ্যম ও দুঃসাহস? শুধু ভাষা নয়, আমাদের জীবন-ধারাও আজ পয়ারের শ্লথগতিতে একটানা ভাবে বয়ে চলেছে। কোন্ তরুণ এই একঘেঁয়েমি ভেঙে দিয়ে আনবে আমাদের জীবনে মুক্তচ্ছন্দের উচ্ছল গতিবেগ? সেই তরুণ এস, মাইকেলের স্মৃতিস্তম্ভে আজ মালা দাও।

সাগরদাঁড়ি

১৯৫৬

পদ্মা

পদ্মা। পূর্ব-পাকিস্তানের আদুরী সলিল-কন্যা পদ্মা। আমি তোমায় ভালবাসি। অনন্ত-যৌবনা চিরকৌতুকময়ী এ কোন্ দূরন্ত মেয়ে তুমি। বিচিত্র তোমার রূপ, অদ্ভুত তোমার প্রকৃতি! কখনো শান্ত, কখনো চঞ্চল, কখনো হাস্যময়ী, কখনো অশ্রুময়ী; কখনো সরল, কখনো অভিমানিনী; কখনো বা কল্যাণমী, কখনো বা ভয়ংকরী। ঋতু চক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় তোমার-মন, বদলে যায় তোমার রূপ! আমি দেখেছি তোমার শান্তশ্রী, দেখেছি পল্লীবধূর মত স্নিগ্ধ মমতাময়ী তোমার রূপ। সোনার ধানে, সোনার পাটে ভরে দাও তুমি তোমার ভাইবোনদের গৃহের আঙিনা, ঘরে ঘরে বিলাও তোমার নবান্ন ও শিরণি-পায়েশ। ঘাটে ঘাটে চলে পণ্য-তরুণী, চলে জাহাজ, চলে খেয়াতরী। হাটে হাটে, গনজে গনজে, বন্দরে বন্দরে চলে সমারোহ, চলে লক্ষ মানুষের আনাগোনা। এমনি করে গড়ে ওঠে নগর, গড়ে ওঠে নব নব সভ্যতা কৃষ্টি ও সমাজ।

শীত-গ্রীষ্ম বর্ষা-হেমন্ত নানা ঋতুতে নানা বেশে দেখেছি তোমায়। শীতে তুমি হও সংকুচিতা, সংযত হয় তোমার উদ্দাম গতিবেগ। কুয়াশার স্বপ্ন-চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমাও তুমি সারা রাত। সূর্যোদয়ের অনেক পরে ভাঙে তোমার ঘুম, শুভ্র কুয়াশার আড়াল থেকে চাও তুমি বাহির পানে। তখন তোমার তাপসী মূর্তি। বর্ষার দুরন্ত আবেগে হাত বাড়িয়ে যা তুমি নিয়েছ, হিম-শীর্ণা পৌষে তা তুমি ফিরিয়ে দাও।

আসে নববসন্ত। ডাকে কোকিল। শাখায় শাখায় দোল দিয়ে যায় দখিন হাওয়া। নব কিশলয়ে পল্লবিত হয়ে ওঠে তরুলতা। তখন তোমারও মনে লাগে রং চোখে জাগে রঙিন খোয়াব। দুই তীরের বনভূমিতে চৈতালি ঘূর্ণি-হাওয়ার অশান্ত গতিবেগে তোমারও মন হয় উড়ুউড়ু চঞ্চল।

দৃপ্ত তেজে আসে বৈশাখ। আসে কাল-বৈশাখী দুরন্ত জলদস্যুর বেশে। সেদিন তুমিও হয়ে ওঠো ক্ষিপ্তা–তোমারও দেখি রণরঙ্গিনী বেশ। বৈশাখী ঝন্‌ঝা প্রচণ্ড বেগে এসে পড়ে যখন তোমার বুকে, নির্মম হস্তে ভাঙতে থাকে তোমার দুই তীরের তাল-নারিকেল ও

www.pathagar.com

আম-কাঁঠালের বাগিচা, সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে যখন চলন্ত নৌকার মাঝিরা, তখন তুমিও হয়ে ওঠ দারুণ ক্রুদ্ধ। জেগে ওঠে তোমার ঘুমন্ত সেনাদল। বিপুল গর্জনে সময়-রঙ্গে তরঙ্গে-তরঙ্গে ধেয়ে চলে তারা সম্মুখের পানে। শুরু হয় মহাযুদ্ধ। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাড়িয়ে দাও তুমি তাকে তোমার দিক-সীমানা থেকে। কিন্তু সেই যুদ্ধে ভেঙে যায় কত ঘরবাড়ি, ভেঙে যায় কত তরুলতা, ডুবে যায় কত নৌকা, জাহাজ, মরে যায় কত লোক। তারপর প্রকৃতি যখন শান্ত হয়, তখন নিহত ও আহতদের প্রতি জানাও তুমি গভীর সমবেদনা, শান্ত হয় তোমার ক্রন্দন।

বর্ষায় হয়ে ওঠো তুমি পরিপূর্ণ-যৌবনা। সে-ই তোমার সাচ্চা চেহারা! ঊর্ধ্বে আকাশ-জোড়া কাজল মেঘের মায়া, দিনরজনী অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার ঝরঝরানি গান; উত্তরে পর্বতমালার পঙ্কিল গৈরিক নিস্রাব, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে জোয়ার-ভাটার টান, মাঝখানে দুরন্ত পূবালি বাতাসের শন্‌শন্‌ শব্দ, সবার সঙ্গে যোগ দিয়ে সৃষ্টি কর তুমি এক অপরূপ দৃশ্য। তখন শুনতে পাও তুমি যেন কোন্‌ এক অসীমের আহ্বান। পৌষে দেখেছিলাম তোমার যে তাপসীর রূপ, শুনেছিলাম যে ত্যাগের বাউল সুর, আজ আর তা নেই। আজ শুনি তোমার কণ্ঠে মেঘমল্লারের রাগ; আকাশে বাতাসে বাজে মাদল, বাজে বাঁশি। দিকে দিকে সে কী বিপুল সমারোহ! কী ব্যাকুল চঞ্চলতা! বাংলার বুকে বসাও তখন তুমি তোমার মহোৎসব। মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, সবাইকে দাও তুমি দাওয়াত। সব জায়গাই কর তুমি দখল। বালুচরে যারা বেঁধেছিল কুটীর, তীরে তীরে বেঁধেছিল যারা ঘর, মাঠে যারা বুনেছিল ধান-পাট, সবাইকে জানিয়ে দাও তোমার প্রয়োজনের তাগিদ, হুঁশিয়ার করে দাও সবাইকে সরে যেতে। তারপর শুরু হয় মাটি পানি ও হাওয়ার খেলা। কোথা থেকে দলে দলে আসে মেঘ, ঢালে বারিধারা, পর্বত পাঠায় তার এতদিনকার সঞ্চিত জলরাশি—সমুদ্রও পাঠায় তার জোয়ারের পানি। এতসব সম্মানিত অতিথিদের জায়গা দেবে তুমি কোথা থেকে? তোমার বিশাল বুক তাদের জন্য অতি ক্ষুদ্র। অধিকার করে নাও তাই তুমি দুই পাশের যত আছে খালবিল ও মাঠ মানুষকেও বল-ওগো মানুষ, তোমাদেরও রইল দাওয়াত। প্রস্তুত হও, ঘাটে ঘাটে বাঁধো তরী, বাঁধো পাল; রচনা কর ভাটিয়ালী গান, বাঁধো দোতারা; আসছে দিন; অস্তরবির রাঙা আভায়, জোছনা রাতের স্নিগ্ধ মায়ায় টানতে হবে দাঁড়, ধরতে হবে হাল, তুলতে হবে পাল, আর গাইতে হবে ভাটিয়াল সুরের গান।

শুরু হয় আয়োজন। এতদিন যে বিশাল দিগন্ত-বিস্তৃত চর ছেড়ে দিয়েছিলে, আবার তা করে নাও তুমি জবর-দখল। পাড় ভাঙতে থাকো ঝুপঝুপ দুমদুম শব্দে। এক একবার প্রয়োজন তোমার এত বেশী হয় যে, বহুদিনের গ্রাম ও শহর-গঞ্জও ভেঙে দিয়ে বাড়াও তোমার পরিসর। গাছ-পালা ঘরবাড়ি দালান-কোঠা কিছুই তুমি মানো না। অনিবার্য তোমার প্রয়োজনে-মানুষ-গরু, তরু-লতার সুখ-দুঃখের কথা আর বড় হয়ে জাগে না। দু'চার খানা নৌকা, কয়েকখানা ঘরবাড়ি যদিই বা ভেসে যায়, ক্ষতি কি। বৃহত্তর কল্যাণের জন্য ছোটখাটো ক্ষয়-ক্ষতি মেনে নিতে হয়, এই যেন তোমার যুক্তি।

এমনি মহিমময়ীর বেশে আমি তোমায় দেখি। তুমি আমাদের পূর্ব-পাকিস্তানের অন্যতম গৌরব। পর্বত পাইনি, সাগর পাইনি, দুঃখ নাই; পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলী—ইত্যাদি নদীসম্পদ লাভ করেছি, এও আমাদের কম সৌভাগ্য নয়। আমাদের

www.pathagar.com

বুকে বাজে যে উদার শান্তির বাণী, যে ভাঙা-গড়া, হাসি-কান্নার সুর, যে সংগ্রাম ও সমন্বয়ের মনোভাব, তোমার মধ্যেও দেখি সেই সুর ও সেই মনোভঙ্গী। পাকিস্তানের আদর্শের সঙ্গে তোমার আছে চমৎকার মিল। ভাঙার দুর্জয় উন্মাদনা দিয়ে, নব সৃষ্টির উল্লাস দিয়ে, গতির ক্ষিপ্রতা দিয়ে, আবেগ দিয়ে, ছন্দ দিয়ে, সুর দিয়ে, অনুপ্রাণিত করেছ তুমি পাকিস্তানের বীর সেনাবাহিনীকে। তুমি বুঝেছিলে–আমাদের মনের সঙ্গেই মিলবে তোমার সুর। আমরা মাটির বুকে বাসা বাঁধতে জানি। কঠিন মাটি চাষ করে সোনার ফসল ফলাতে জানি, জলপথে নৌকা ও বড় বড় জাহাজ চালাতে জানি; ধরণীর সাথেও রাখি সংযোগ, আকাশের সাথেও করি মিতালি। এমনি দুঃসাহসী পূর্ণ মানুষই হতে হবে পদ্মার দুই তীরের অধিবাসীদের। বোধ হয় এই কারণেই তোমাকে ধরতে হয়েছিল কীর্তিনাশার রূপ। কর্মবিমুখ ধনবিলাসী যারা বাঁধতে চেয়েছিল তোমার তীরে সুখের নীড়, তাদের তুমি তাই বুঝি পছন্দ করনি, তাদের জায়গায় দেখছি আজ দুঃসাহসী কর্মঠ ও বলিষ্ঠ আর এক জাতির অধিকার। পদ্মার দুই তীরের এই অধিবাসীরা পদ্মাকে ভয় করেনা; পদ্মার ভাঙন ও তরঙ্গ-গর্জনকে অবহেলা করে তারা বাস করে তার দুই তীরে। ভেঙে যায় তাদের সাজানো ঘরবাড়ি, দুঃখ নাই। নূতন চরে গিয়ে নূতন করে বাঁধে তারা ঘর। দূর দেশান্তরে চলে যায় তারা নৌকা বেয়ে, তরঙ্গের মাথায় মাথায় দোলে তাদের শিশু-সন্তান। কখনো বা প্রকৃতির সঙ্গে মিলে মিশে, কখনো বা প্রকৃতিকে জয় ক'রে টিকে থাকে তারা।

অনাদিকালের বিশ্বসৃষ্টির ভাঙাগড়ার জীবন স্মৃতি পদ্মা! আমি তোমায় ভালবাসি। ভাঙা ও গড়ার, সৃষ্টি ও ধ্বংসের তুমি এক সুন্দর প্রতীক। তোমার পানিতে পাই সৃষ্টির আদিম দিনের গন্ধ ও স্বাদ। জলের মধ্যে স্থলের জাগরণ এবং ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে নবনব দেশ-রচনার খেয়াল ও কৌতূহল আজও জেগে আছে তোমার সফেন ঢেউয়ের বুকে। বর্ষে বর্ষে তাই বুঝি তুমি এককূল ভাঙো, আর-এককূল গড়ো, আর জাগিয়ে তোল নূতন নূতন চর। সৃষ্টির এই রহস্য ও প্রেরণা তোমার মধ্যে আছে বলেই তোমায় যদি আর সব নদীর চেয়ে বেশী করে ভালবাসি। শান্ত নদী চাই না; যে নদী ভাঙতেও জানে গড়তেও জানে, যার গতি, আছে, ছন্দ আছে, সুর আছে, গান আছে—সমুদ্রের সাথে আকাশের সাথে মেঘের সাথে বাতাসের সাথে আছে যার চিরদিনের যোগ—আমরা চাই সেই নদী।

পদ্মা! তুমি আমাদের সেই নদী। দজলা ফোরাত ও নীলনদীর মত তুমি আমাদের জাতীয় জীবনে চিরদিন জেগে থাকো–এই আমাদের কামনা।

নদী-পরিক্রমা

১৯৫৬

www.pathagar.com

মহাশ্মশান কাব্য

'মহাশ্মশান কাব্য' কবি কায়কোবাদের শ্রেষ্ঠ রচনা। এত বড় দীর্ঘ কাব্য বাংলা সাহিত্যে আর নাই। ৭৯০ পৃষ্ঠায় এই বিরাট গ্রন্থ শেষ হয়েছে। আগাগোড়া অমিত্রাক্ষর পয়ার ছন্দে লেখা। মাঝে মাঝে সঙ্গীত ও নৃত্য-দোদুল ছন্দের দু'একটি হালকা রচনার দ্বারা এর একঘেঁয়েমি নষ্ট করার প্রয়াস রয়েছে। বাংলা ১৩১১ সালে এই কাব্যখানি প্রথম রচিত হয়।

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ভাবধারা কেমন ক'রে বিবর্তিত হল, আর আমরা কোথা থেকে কোথায় এলাম, সে সম্বন্ধে জানতে হলে 'মহাশ্মশান' কাব্য আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করবে। আমাদের জাতীয় জীবনে কাব্যখানি বিশেষ কোন প্রেরণা যোগাতে না পারলেও, অথবা আজকের যুগমনে এর তেমন কোন আবেদন না থাকলেও, এর একটা সাহিত্যমূল্য নিশ্চয়ই আছে। বিগত যুগে যেসব বাঙালী মুসলমান কবি-সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে টিকে থাকবার মতো কিছু মৌলিক দান দিয়ে গেছেন, তাঁদের মধ্যে কায়কোবাদ নিঃসন্দেহে অন্যতম। এ যুগের মুসলিম সাহিত্য-কর্ষণায় একমাত্র মীর মশার্‌রফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' এবং কবি কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান কাব্যই' উল্লেখযোগ্য সঞ্চয়। সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার স্পর্শ একমাত্র এই দুইখানি গ্রন্থেই আমরা দেখতে পাই। অবশ্য অন্যান্য আরও অনেক কবি ও সাহিত্যিকই অল্পবিস্তর কিছু দান করেছেন, কিন্তু তাঁদের সৃষ্টি কালজয়ী হয়নি ব'লেই আমার বিশ্বাস।

'মহাশ্মশান' কাব্যখানি হাতে নিলেই সর্বপ্রথম যে বিস্ময় ও কৌতূহল মনে জাগে তা হচ্ছে এই ঃ এত বড় একটা মহাকাব্য লিখবার হতে বিরাট মন যে কবির ছিল সে তো সাধারণ নয়। কবি যে তাঁর এই স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে পেরেছিলেন এটাই ত তাঁর প্রতিভার এক বড় পরিচয়। সৃষ্টির গভীর উল্লাস না থাকলে এত বড় কাব্যরচনা সম্ভব হতো না। তরল হাসি-কান্না ও আলো-ছায়া মাখান লিরিক কাব্যের যুগে একজন মুসলিম কবি যে নীরব রাত্রে একটা মহাকাব্য রচনার স্বপ্ন দেখেছিলেন, এ আমাদের পক্ষে সত্যিই এক গৌরবের কথা। এ-যুগের কবিরা কায়কোবাদের কাছে এইখানে প্রেরণা নিতে পারেন। কবির দানের বিচার যদি নাও করি, তবু তিনি যে একটা 'নূতন কিছু' দান করে গেছেন, এটাই তাঁর পক্ষে এক মহাসার্থকতা। সাহিত্যক্ষেত্রে 'মহাশ্মশান কাব্য' তাই বাংলার মুসলমানদের হাতের দেওয়া এক বিরাট অবদান।

কাব্যখানির আভ্যন্তরীণ সম্পদ সম্বন্ধে এইবার কিছু আলোচনা করা যাক।

মহাকাব্যের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকা চাই। আখ্যানবস্তুর চমৎকারিত্ব, ভাষার লালিত্য ও গাম্ভীর্য ভাবের গভীরতা ও মৌলিকতা, মানব-জীবনের বিচিত্র রহস্য ও অনুভূতির প্রকাশ, উচ্চাঙ্গের কাব্যরসবোধ, সত্য ও সুন্দরের প্রকাশ এবং অতিমানবিক কোন চরিত্রের অলৌকিক মহিমা—এ সবই হ'ল মহাকাব্যের লক্ষণ।

এই আলোকে বিচার করলে দেখা যাবে, 'মহাশ্মশান কাব্য' দোষ-ত্রুটি বর্জিত নয়। এমন কি একে মহাকাব্যের পর্যায়ভুক্ত করা যায় কিনা তাই সংশয়ের বিষয়। কেননা

www.pathagar.com

'অতিমানবিক' (Superhuman) উপাদান এই কাব্যে অনুপস্থিত। কাজেই, আমার মতে মহাশ্মশানকে 'মহাকাব্য' না বলে 'বৃহৎ কাব্য' বলা সঙ্গত। মহাকাব্যের গোড়া থেকেই তার মূল প্লটটি অগ্রসর হবে। সেই সঙ্গে চারিদিক থেকে স্বপ্নের জাল বুনে কবি তাঁর আখ্যান বস্তুটিকে নিয়ে আসবেন একটা শেষ পরিণতির দিকে। এমনি করেই রসঘন হয়ে উঠবে তাঁর কাব্য-কাহিনী। এই কাব্য প্লটের সে মধুর্য ও চমৎকারিত্ব নাই। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধকে আশ্রয় ক'রেই কবি তাঁর এই কাব্যখানি রচনা করেছেন। কিন্তু এই যুদ্ধের পটভূমিতে তেমন কোন ঐতিহাসিক রোমাঞ্চকর প্রেম-কাহিনী নেই। শুধু এক গভীর সৌন্দর্য এই আছে যে, আহমদ শাহ্ আবদালী এসে শেষ বারের মতো ভারতের হিন্দুশক্তিকে চুরমার করে দিয়ে গেলেন। একদিকে ৫০,০০০ হাজার মুসলিম সৈন্য, অপর দিকে ৩,০০,০০০ মারাঠা সৈন্য; কিন্তু ফলাফল হলো উল্টো। দুই লক্ষ মারাঠা সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হ'ল। বাদ বাকি বন্দী হ'ল অথবা পালিয়ে গেল। এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে কাব্যের অন্তর্ভুক্ত ক'রে রসমূর্তিতে দাঁড় করাতে হলে যে কল্পনা-বিলাসের প্রয়োজন কায়কোবাদ ততটা আকাশচারী ছিলেন না। কায়কোবাদ যে কাহিনী সাজিয়েছেন তা তেমন সুসংহত ও সুসম্বন্ধও নয়। কেন্দ্রীয় আখ্যান-বস্তুর সঙ্গে তার মিল অল্প। এই জন্যেই এতবড় কাব্যের প্রধান চরিত্র অথবা প্রধান নায়িকা যে কে, তা আমরা খুঁজে পাই না। পুরুষদের মধ্যে কোনই প্রধান চরিত্র নেই। নারী চরিত্রের ভিতর একমাত্র জোহরার নাম করা যায়, যার মধ্যে একটা আদর্শ, ঔজ্জ্বল্য ও কাব্য-সৌন্দর্য্য আছে। জোহরার স্বামী ইব্রাহীম প্রধান চরিত্র হতে পারেনা। কারণ তাকে নিয়ে মূলকাহিনী রচিত হয়নি। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহীম মুসলিম পক্ষ পরিত্যাগ ক'রে মারাঠা পক্ষে যোগ দেয় এবং তাদের পক্ষে যুদ্ধ ক'রে বহু মুসলিম সৈন্যের প্রাণহানি ঘটায়। জোহরা ইব্রাহীমকে মারাঠা পক্ষে যোগ না দিতে বার বার অনুরোধ করে; কিন্তু ইব্রাহীম সে কথায় আদৌ কর্ণপাত না ক'রে বিপক্ষ দলে যোগ দেয়। সেই থেকে জোহরাও পণ করে যে, স্বামীকে সে ফিরিয়ে আনবেই। ইব্রাহীমের একমাত্র যুক্তি ঃ সে মারাঠাদের অধীনে চাকরী করে, তাই নিমক খেয়ে সে নিমকহারামী করতে পারে না। এই নীতির উপর নির্ভর ক'রেই সে মারাঠাদের স্বপক্ষে প্রাণপণে যুদ্ধ করে এবং পরে মুসলিম হস্তে আহত অবস্থায় বন্দী হয়। জোহরাও পুরুষের ছদ্মবেশে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল এবং স্বামীর যাতে কোনো অমঙ্গল না হয় সেই চেষ্টা করছিল। অবশেষে উভয়ের সাক্ষাৎ হয় এবং স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জোহরাও তার পাশে প্রাণত্যাগ করে।

তা হ'লে ইব্রাহীমের চরিত্রের বিশেষত্ব কি? মারাঠা মনিবের প্রতি বিশ্বস্ততা তাঁর চরিত্রের একটা উজ্জ্বল দিক সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্যদিক দিয়ে দেখলে দেখা যাবে স্বধর্ম ও স্বজাতিদ্রোহিতা দোষে সে চরিত্র নিতান্তই মসীমলিন। কোন মহৎ আদর্শ দ্বারাও এই স্বজাতিদ্রোহিতা সমর্থিত হয় না; কাজেই এমন চরিত্র কোনো কাব্যের আদর্শ নায়ক হতে পারে না। মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে ইব্রাহীমের অথবা জোহরার তেমন কোনো সম্বন্ধও নেই। এরা বড়জোর দুটো পার্শ্ব-চরিত্র হতে পারে।

আশ্চর্যের বিষয়, পানিপথের রণাঙ্গনে যে দুইজনকে আমরা প্রধান ভূমিকায় দেখতে পাই, সেই আহমদ শাহ্ আবদালী ও সদাশিবরাওকে কবি আদৌ কোনো প্রাধান্য, দেননি।

www.pathagar.com

এমন কি, যে পানিপথের যুদ্ধই হ'ল এই কাব্যের বিষয়বস্তু, সেই পানিপথের প্রসঙ্গে কাব্যের প্রথম তিরিশ সর্গের ভিতরে কচিৎ দেখা যায়। হিরণ ও আগা খাঁর চরিত্রেও তেমন কোনো দীপ্তি নাই। তবে হিরণের চরিত্রের পবিত্রতা ও তেজস্বিতা উপভোগ্য, সন্দেহ নাই।

'মহাশ্মশান' কাব্য সম্বন্ধে কবির বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ—কোনো মুসলিম চরিত্রকেই তিনি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তোলেন নি। এই অভিযোগ মানি আর নাই মানি, অস্বীকার করা যায় না যে, কবির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার। তিনি কা'কেও ছোট বা কা'কেও বড় ক'রে আঁকতে চাননি। এ সম্বন্ধে একটা কৈফিয়ত দিতে গিয়ে ভূমিকায় তিনি বলেছেন— "হিন্দুদিকে কাপুরুষ সাজাইয়া ভীরুতার বর্ণে রঞ্জিত করিয়া মুসলমানদিগের কি লাভ? তাই হিন্দুদিগের বীরত্ব প্রদর্শন করিতে আমি কৃপণতা করি নাই। কম কে? উভয় জতির বীরত্বই প্রশংসার্হ।" কবির এই উদার মনোভঙ্গী লক্ষ্যণীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু কথাটার অন্য দিকও ত আছে। হিন্দু-চরিত্র পাছে খাটো হয়ে যায়, এই ভয়ে কোন মুসলিম চরিত্রকে বড় না করাও ত এক চরম হীনমান্যতা। উভয়ের চরিত্রই উজ্জ্বল করতে বাধা কি ছিল?

এই কাব্যের ভালো দিকও আছে। সহজ প্রকাশ গুণ কাব্যখানির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঝরঝরে সাধু ভাষা সাবলীল গতিতে একটানা ব'য়ে চলেছে, তার-মধ্যে কোথাও আড়ষ্টতা নেই। কাব্যখানি বাহুল্য-বর্জিত হলে আরও সুখপাঠ্য হ'ত। ইংরেজীতে একটা কথা আছে ঃ "Art lies not so much in retention as in rejection"- অর্থাৎ ধ'রে রাখার ভিতরে আর্ট নেই, বর্জনের ভিতরেই আর্ট। কতটুকু ছাঁটাই করতে হবে তা জানাই হলো শিল্পজ্ঞানের পরিচয়।

এসব সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান কাব্য' আমাদের সাহিত্যের একটি মূল্যবান সম্পদ।

এলান

১৯৫৬

www.pathagar.com

আমি কেন লিখি?

আমি কেন লিখি?

প্রশ্নটার জবাব দেওয়া কঠিন। সেই ১৯১৩ সালে আমি যখন Class X-এ পড়ি—তখন থেকে এ-তক (হিসেব করে দেখুন কত বছর হবে) লিখেই চলেছি! কিন্তু একদিনের তরেও প্রশ্নটা কেউ তো কোনদিন করেনি, অথবা নিজেও ভাবিনি যে আমি কেন লিখি! পরিণত বয়সে এই প্রশ্নটা তাই আত্মদর্শনের সুযোগ দিল। জীবনের অতল গহনে তলিয়ে গিয়ে আজ এ প্রশ্নের জবাব আমাকে দিতে হবে।

একজন বিখ্যাত লেখককে এই প্রশ্নটাই করা হয়েছিল। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ "I write for myself" (অর্থাৎ আমি আমার নিজের জন্যই লিখি।) কথাগুলির মধ্যে গভীর সত্য নিহিত রয়েছে। আমারও এই উত্তর—আমি আমার নিজের জন্য লিখি। সমাজ বা পাঠক আমার লেখা থেকে কতটুকু আনন্দ পাবেন বা উপকৃত হবেন সে কথা ভেবে লিখি না, না লিখে থাকতে পারি না তাই লিখি। লেখার ভিতরে একটা সৃষ্টির উল্লাস আছে এবং আত্ম-প্রকাশের তাকিদ আছে। লিখলে আমি আনন্দ পাই এবং আমার কল্যাণ হয়—এইটেই হল আমার লেখার মূল প্রেরণা। দেহের ক্ষুধার জন্য যেমন খাই, আত্মার ক্ষুধা ও বিলাসের জন্য তেমনি লিখি। কোন কিছু লেখার পূর্বে আমি যা থাকি, লেখার পরে আমি তার চেয়ে উন্নততর হই, অধিকতর জ্ঞানী হই; সুমুখের পানে, অজানার সন্ধানে এক কদম এগিয়ে যাই। লেখার আগে আমার দৃষ্টিতে আমার ধ্যান-ধারণায় যা অস্পষ্ট থাকে, লেখার পরে তা মার্জিত ও পরিচ্ছন্ন হয়। কোথা হতে যেন একটা নূতন আলো এসে আমার অর্ন্তলোককে উদভাসিত করে দিয়ে যায়। আমার সব লেখাই তাই আত্মকেন্দ্রিক। আমাকে কেন্দ্র করেই নানা শাখা-প্রশাখায় আমার লেখা পল্লবিত হয়ে আছে। অন্য কথায়, আমিই নানা ছন্দে নানা গানে বিকশিত হই। আমার আত্মা–আমার খুদীই হ'ল তাই আমার লেখার উৎস-মূল। আমার লেখার উদ্দেশ্য তাই যতটা না সত্য-প্রকাশ ততটা আত্ম-প্রকাশ। আমার লেখায় তাই আমি প্রকাশিত হব, নানা বৈচিত্র্যে নানা রসে নানা ছন্দে নানা গানে আমি স্পন্দিত হব, নিখিল মনে আমাকে নিয়ে জাগবে বিস্ময়, জাগবে কৌতূহল, জাগবে নব নব জিজ্ঞাসা—এই বিপুল আত্মচেতনা ও অহমিকা, থেকেই আমার সব লেখা উৎসারিত হয়।

দেহের প্রয়োজনে ভাত খাই, আত্মার প্রয়োজনে লিখি।

নিজের জন্য প্রত্যেকেই লেখে। বড় বড় কবি দার্শনিকেরা নিজেকেই ত প্রকাশ করে গেছেন। শিল্প-সাহিত্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মূল্যই বেশি। বিশ্বমনের সমীকরণের মধ্যে কোন চমৎকারিত্ব নাই। ব্যক্তিগতভাবে কে কেমন করে জীবন ও জগতকে দেখেছেন, সেইটে জানাই বড় কথা। কবি হাফিজের মনে কী রং লেগেছিল, চোখে কী স্বপ্ন নেমেছিল, মিলন ও বিরহকে কিভাবে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, সেই কথা জানতেই ত আনন্দ। তাঁর 'দিওয়ান'ত সেই জনাই আমাদের ভাল লাগে। শেখ সাদী, ওমর খৈয়াম,

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল প্রত্যেকের বেলাই এ-কথা খাটে। বস্তুতঃ বিশ্বসাহিত্য কেউ জোর করে লিখতে পারেনা। আত্ম-সাহিত্যই সত্য হলে বিশ্বসাহিত্যে রূপান্তরিত হয়।

কথাটা নিতান্ত স্বার্থপরের মতই শোনাচ্ছে, না? কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, যত খারাপ মনে হচ্ছে তত নয়।

মানুষ সামাজিক জীব। তার দুটো জীবন ঃ ব্যক্তি-জীবন আর সমাজ-জীবন। ঘরের কোণে তাকে যখন দেখি, তখন মনে হয় সে একা; কিন্তু অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যাবে বিশ্ব-মানুষেরই সে একজন। কবির জীবন তাই ব্যক্তি-জীবনও বটে, সমষ্টি-জীবনও বটে। আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হওয়া চাই, আমাদের ভিতরকার ঘুমিয়ে থাকা সেই বৃহত্তর সত্ত্বাকে জাগিয়ে দেওয়া। কবি-সাহিত্যিকেরা ব্যক্তিকে অতিক্রম করে সমষ্টির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হন। সমগ্র মানব-সমাজ তার মধ্য দিয়ে কথা কয়, তার চোখ দিয়ে দেখে, তার মন দিয়ে ভাবে। অন্য কথায় কবি-শিল্পীরা সমাজ-মনের প্রতিনিধিত্ব করে। এক কবির লেখা পড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ আনন্দ পায়, তার অর্থ কি? তার অর্থ হল ঃ কবির কাব্যে নিখিল মনের ছায়া পড়ে—নিখিলের স্বপ্ন তাঁর চোখে ঘনিয়ে আসে।

কবি-সাহিত্যিকেরা যে নিজের লেখা জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করে, তার উদ্দেশ্য শুধু চিত্ত-বিনোদন বা প্রশংসা-অর্জন নয়। মানুষ যে-কোন মূল্যবান সম্পদ তার কোন নিরাপদ স্থানে সঞ্চয় করে রাখতে চায়। কবি যে-সম্পদ তার মানস-গহন থেকে উদ্ধার করে আনে, তা সে রাখবে কোথায়? নিজের মধ্যে ধরে রাখা সে নিরাপদ মনে করে না। জীবন শেষ হলে তার সম্পদও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাই সে খোঁজে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কোন স্থান বা স্থায়ী আশ্রয়। সেই আশ্রয় হচ্ছে মানব-সমাজ। তার লেখা জনসাধারণে প্রকাশ করে তাই সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

লেখকের সঙ্গে তাই সমাজের নিবিড় সম্বন্ধ আছে। সমাজের কথা তাকে ভাবতে হয়। লেখকের ভাব ও চিন্তাধারা যদি সমাজ-মনে সংক্রমিত না হয়, বা নিখিল বিশ্বে তার ঠাঁই না মিলে, তবে সেও মরে যায়, তার সৃষ্টিও মরে যায়। এই জন্যই তাকে সমাজ-সচেতন হতে হয়।

আমার লেখায় এই নীতিই আমি অনুসরণ করি। ব্যক্তি-সত্তাকে বর্জন করিনা, সমাজ-সত্ত্বাকেও অস্বীকার করিনা। ব্যক্তি-সত্ত্বাকে ভালবাসি বলেই সমাজ-সত্ত্বাকে ভালবাসি। কারণ সমাজ-চেতনা আত্ম-চেতনারই ব্যাপক রূপ।

এলান

১৯৫৬

www.pathagar.com

ইসলামী সাহিত্য

বন্ধুগণ,

আমাকে ডাকা হয়েছে 'ইসলামী সাহিত্য' সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্যে। ইসলামী সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলতে হ'লে গোড়াতেই একথা খোলাসা হওয়া দরকার ঃ ইসলামী সাহিত্যের সংজ্ঞা কী, প্রকৃতি কী এবং এর পরিসর কতদূর।

অনেকেই বলেন ঃ ইসলামী সাহিত্য হলো সেই সাহিত্য—যাতে আল্লাহ্-রসুল, রোজা-নামাজ, মাছলা-মাছায়েল বা ইবাদৎ-বন্দিগীর কথা থাকবে, কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা থাকবে না বা প্রেমের কথাও থাকবে না (থাকলেও আগে নিকাহ্ পড়িয়ে দিতে হবে)! এ সাহিত্যের ভাষা ও আঙ্গিকও হবে ইসলামী কায়দায়। তবেই হবে সে ইসলামী সাহিত্য। এক কথায় ঃ ইসলামী সাহিত্যকে হতে হবে রূপরসবর্জিত নিছক puritan-মার্কা সাহিত্য—মিলন-বিরোধী এবং বাহিরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও অপাংক্তেয়।

কিন্তু আমি যদি বলি ঃ ইসলামী সাহিত্য ঠিক এর উল্টা? অর্থাৎ বাইরের সাহিত্যেই রয়েছে সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা ও একদেশদর্শিতা, আর ইসলামী সাহিত্যেই রয়েছে, বিশ্বজনীন উদারতা ও মানবতার আবেদন? ইসলাম নিজেই যখন মিলন ও সমন্বয়-প্রয়াসী, তখন ইসলামী সাহিত্য কেন হবে সংকীর্ণ ও অনুদার? ইসলামী কোন নিজিসই ত সংকীর্ণ বা অনুদার নয়। দেশই হোক, জাতিই হোক, ধর্মই হোক, সংস্কৃতিই হোক, সমাজই হোক, শিল্পই হোক—ইসলাম সর্বত্রই মিলেছে ও মিলিয়েছে। খণ্ডতা ও ক্ষুদ্রতার স্বপ্ন যেখানেই ভিড় জমিয়েছে, সেখানেই প্রয়োজন হয়েছে ইসলামের। সকলের জন্য স্থান-সংকুলান করাই ত ইসলামের কাজ! নিজেও থাকবে, অপরকেও থাকতে দেবে, এই co-existence-ই হল, তার নীতি। ইসলামের সহনশীলতা অনন্যসাধারণ। পূর্ববর্তী 'কিতাব' সমূহকে সে স্বীকার করে, ভিন্নধর্মের পয়গাম্বরদিগকে সে মানে। ইসলামের ধাতুগত অর্থই হল আপোষ বা মিলন। দ্বন্দ্ব ও বৈষম্যের মধ্যে সে শোনায় মিলন বা সমন্বয়ের সুর। শুধু ধর্মে-ধর্মে নয়, ধর্ম ও কর্মের মধ্যেও সে ঘটিয়েছে অপূর্ব মিলন। ইসলামে জাতিভেদ নেই। সাদাকালা, বাদশা-ফকীর, কাফ্রী-ইরানী, আফগান-তুরানী, আরবী-হিন্দুস্থানী—সব এক করে দিয়ে বৃহত্তর মানব-গোষ্ঠী সে রচনা করেছে। বিশ্বমানবতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন রয়েছে তার চোখে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তার একই মনোভাব। ইসলামী কালচার শুধু আরবী কালচার নয়; সেমিটিক ও হেলেনিক কালচারের এ এক অপূর্ব সমন্বয়। অন্য কোথায় ঃ সব কালচারের সঙ্গে ইসলাম করেছে মিতালি। প্রাচীন গ্রীক কালচার ধ্বংস হয়ে যেত। ইসলামই তাকে বাঁচিয়েছে। ইসলাম যেপথ দিয়ে যেখানে গিয়েছে, সেখানেই সে স্থানীয় কৃষ্টি ও সভ্যতাকে আপন করে নিয়েছে। গেল সে স্পেনে, সেখানে সে রচনা করল মূর-সভ্যতা। এল সে পারস্যে; নিল সে দুহাত ভরে যাকিছু তার দরকার। এল সে ভারতে। আর্য-সভ্যতার থেকেও সে বেছে নিল তার উপকরণ। গেল সে আফ্রিকায়; সেখানেও সে কাফ্রীদের হাতে হাত মিলালো। এমনি করে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে সে ঘটাল অদ্ভুত এক সংযোগ ও সমন্বয়।

www.pathagar.com

ইসলামের এই উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও মিলনের মনোবৃত্তি সবচেয়ে প্রকাশ পেয়েছে জ্ঞান-কর্ষণার ক্ষেত্রে! গ্রীকের প্লেটো ইসলামের আফলাতুন তার সক্রেটিস আমাদের বোখরাত, অগ্নি-উপাসক ইরানবাসীর পেহ্লবী ভাষা এখন ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। মওলানা রুমীর মসনবীকে বলা হয় 'পেহলবী ভাষার কুরআন!'

'মসনবী-এ মানবী-এ মৌলভী
হাস্ত্ কুর আঁ দর জবানে পেহ্ লবী"!

এই ভাষাতেই লেখা হল "শাহনামা"—জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। কর্ডোভা, গ্রাণাডা, বাগদাদ, দিল্লী, আগরা, সর্বত্রই একই সুরঃ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান, বৈষম্যের মধ্যে মিলনের আহ্বান। ইসলামের কোথায় তবে সংকীর্ণ রূপ?

সঙ্গীতে ও শিল্পে দেখুন! পাক-ভারতের সঙ্গীতের কথাই ধরা যাক। ধ্রুপদের অচলায়তনে সে যখন ঢুকলো, তখন ধ্রুপদকে সে উচ্ছেদ করল না; তার সঙ্গে মিতালি করে সে সৃষ্টি করল আরও তিনটি শাখা ঃ খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী। বর্তমানে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী–এই চারটি মিলেই পাক-ভারতের ক্লাসিকাল সঙ্গীত। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এখন এগুলোকে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষা করে!

ইসলামের হাতেই সৃষ্টি হল উর্দু ভাষা—যার উপকরণ লওয়া হল সব ভাষা থেকে আর যার দুয়ার রইল সকলের জন্য খোলা।

স্থাপত্য-শিল্পেও 'তাজমহল' এই সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক।

দর্শনের দিক দিয়ে দেখলেও ইসলামকে দেখবেন মিলনধর্মী! দীন ও দুনিয়াকে, জড় ও চৈতন্যকে সে মিলিয়েছে। শুধু দর্শন নয়। রাষ্ট্র-দর্শনেও তার একই রূপ। বারো তের শত মাইল দূরবর্তী দুইটি ভূভাগ মিলিয়ে একটি রাষ্ট্র-রচনা করার নজির ইসলামেই আছে।

ইসলামে পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ নাই। ইসলামের কোন frontier বা সীমানা-প্রাচীর নাই। তার supra-geographical বা supra-national রূপ। ইংরাজ কবি যেখানে বলেছেন ঃ

"The West is West, the East is East
The twain shall never meet."

ইসলামের কবি সেখানে গেয়েছেন ঃ

"চীন ও আরব হামারা হিন্দুস্তান হামারা
মুসলিম হাঁয় হাম ওতান হায়, সারা জাঁহা হামারা।"

এত যায়গায় ইসলাম উদার হতে পারল, পারল না কি তবে শুধু বাংলা সাহিত্যের বেলায়? 'ইসলামী সাহিত্য' বললেই কি সেখানে বুঝতে হবে অন্যরূপ? এই বাংলা ভাষাকে ত ইসলামই দিয়েছে মর্যাদার আসন। শব্দ দিয়ে, ভাব দিয়ে, গঠন দিয়ে এ ভাষার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাই ত করেছে ইসলাম। বাংলা ভাষাকে কে আগে চিনত? কে আগে স্বীকার করতো? সে ত অপাংক্তেয় হয়েই ছিল। ব্রাহ্মণেরা এ ভাষাকে অনার্য ভাষা বলে দস্তুর মত ঘৃণা করেছেন। শুধু তাই নয়। যারা এ ভাষার চর্চ্চা করবে, তাদের জন্য 'রৌরব' নামক

www.pathagar.com

নরকেরও ব্যবস্থা তাঁরা করেছিলেন। সেই অনাদৃত বাংলা ভাষাকে রূপ দিয়েছে ইসলাম। ইসলামকে বাদ দিলে বাংলা ভাষা নেই। হিন্দু কবি-সাহিত্যিকদের সৃষ্টিতে বাংলা ভাষায় কোন মানবীয় উপাদান ছিল না; শুধু দেবদেবীর মাহাত্ম্য ও লীলা-কীর্তনই ছিল এ ভাষার বিষয়-বস্তু। মুসলমানেরাই একে মানবধর্মী করেছে। মানুষের ব্যথা-বেদনা সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না দিয়ে দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে সহজবোধ্য করে এ ভাষাকে তারাই গড়ে তুলেছে। পাঠান ও মোগল আমলে ইসলামী বাংলা-ভাষা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলন ঘটিয়েছে। ভারতচন্দ্র রায়ের ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গি দেখলেই তা আপনারা বুঝতে পারবেন। শুধু তাই নয়। হিন্দু কবিরাও ইসলামী বিষয়বস্তু নিয়ে ইসলাম কায়দায় পুঁথি লেখা আরম্ভ করেছিলেন। উমাচরণ মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের 'গোলে বকাঅলি' ও রাধাচরণ গোপের 'ঙনামা' তার জলন্ত প্রমাণ।

বাংলা গদ্য-সাহিত্যও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলন-সেতু রচনা করেছে। নিম্নে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা দুই খানা পত্রের সকল উদ্ধৃত করছি। তা থেকেই বুঝবেন ভাষা তখন কিরূপ ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা (১৬৭২)

"শ্রীজসোমাধব ঠাকুর কুমড়াল গ্রামে দেবালয়ত আছিলা। রামসর্মা ও গয়রহ সেবকেরা আপনার ২ ওয়াদা মাফিক সেবা করিতেছিল। রাত্রদিন চৌকী দিতেছিল। শ্রী রামজীবন মৌলিক সেবার সরবরাহ পুরুষানুক্রমে করিতেছেন। ইহার মধ্যে পরগণা পরগণাতে দেওতা ও মুরুত তোড়িবার আহাদে..... থাকিয়া আর আর পরগণাতে দেওতা ও মুরুত তোড়িতে আসিল........ তাহার পর ২৭ মহরম মাহে ২৮ জৈষ্ঠ ঠাকুর দেখিবার প্রাতেঃকালে সকল লোক গেল..।

–শ্রীমনোমোহন ঘোষের 'বাংলা গদ্যের চার যুগ' (১১ পৃঃ)

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা (১৭৮৬)

"শ্রীযুক্ত ওলন্দেজ কোম্পানীতে আড়ঙ্গ বিরভূমের গঞ্জে খরিদের দাদনী আমি লইয়া ঢাকা আড়ঙ্গ চালানী করিয়াছি আপরেল মাহাতে এবং মোকাম মজকুরের গোমস্তা কাপড় খরিদ করিতেছিল এবং কাপড় কথক ২ আমদানী হইয়াছে এবং হইতেছিল দাস্ত কথক ২ তৈয়ার হইয়াছে এবং মবলক কাপড় ধোবার হাতে দাশতর কারণ রহিয়াছে তাহাতে সংপ্রীতি মেঃ গেল সাহেবের তরফ পেয়াদা আসিয়া খামখা জবরদস্তী ও মারপিট করিয়া ঘাট হইতে ধোবা লোককে ধরিয়া লইয়া গেল আমার তরফ হইতে গোমস্তা পেয়াদা যাইয়া সাহেব মজকুরকে হাজির করিলো তাহা সাহেব গৌর না করিয়া আমার লোককে হাকাইয়া দিলেক এবং কহিলেক তোমরা আইয়াছ সাজাই দিব আমার কমবেষ ৪০০০ চারি হাজার যান কাপড় ধোবার ঘাটে দাস্ত বেগর পচিতে লাগিল বহা সেওয়ায় কোরা কাপড় কাচীতে তইয়ার অতএব আরজ ইহার তদারক মেহেরবাণী করিয়া করিতে হুকুম হয়.....।"

www.pathagar.com

পত্রখানি ওলন্দাজ কোম্পানীর ডিরেক্টরের কাছে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে লেখা হরিমোহন বর্মার আরজি থেকে গৃহীত।

কিন্তু এর পরে বৃটিশ আমলের প্রারম্ভে শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে মিশে যে কাণ্ডটি করলেন, তাতেই ত দেখা দিল সংকীর্ণত ও অনুদার মনোভাব। বাংলা ভাষা সেখানেই ত দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গেল। আরবী-ফার্সী শব্দ বর্জন করে তারা যে ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টি করলেন, তা হ'ল একদম সংস্কৃত-ঘেঁষা, সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক। ইসলামের হাতে যতদিন ছিল, ততদিন ত বাংলা ভাষায় সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি গজায় নি। কিন্তু অনৈসলামিক যেই হল, অমনি এল বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির অভিশাপ। 'দুর্গেশ-নন্দিনী' 'আনন্দ-মঠ' ইত্যাদি ধরনের পুস্তকে নিশ্চয়ই মুসলমানেরা লেখেনি বা ইসলামী আমলেও লেখা হয় নি। এই ভিন্ন-গোঠ রচনা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন তাঁর 'ইসলামী বাংলা সাহিত্যে' বলছেন ঃ

"১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ থেকে বাংলা দেশে শাসন কার্যে ফারসীর স্থান নিল বাংলা। সেই থেকে আরবী-ফারর্সী শব্দের আমদানি ত বন্ধ হলই, উপরন্তু সল্প-পরিচিত আরবী-ফারসী শব্দের রপ্তানিও শুরু হল। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হল, সংস্কৃত শিক্ষিতদের দ্বারা। এদিকে ফারর্সী-উর্দু জানা মুসলমান লেখকেরা পুরানো রাস্তা ধরেই চললেন। তার ফলে ইসলামী বাংলা সাধারণ সাহিত্যের ভাষা থেকে যেন সরে গেল।"

ঠিক তা নয়। একান্নভুক্ত ভাষা থেকে পণ্ডিতী ভাষাই জুদা হয়ে গেল।

এই পণ্ডিতদের সম্বন্ধেই ভাষাতত্ত্ববিদ গ্রীয়ারসন (Grierson) বলেছেন ঃ

"Literary Bengali, as now known, is the product of the present (19th) century. Its direct cultivators were Calcutta Pandits who, however well-meaning, have ruined the language by their learning."

ঠিকই ত! পণ্ডিতী বাংলাই ত বাংলাভাষাকে ধ্বংস করেছে!

এই পণ্ডিতী ভাষা গণমানুষের কাছ থেকে এখন কত দূরে সরে গেছে, তা আপনারা জানেন। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের লেখ্য ভাষার সঙ্গে কথা ভাষার মিল নেই। এর ব্যাকরণও নিজস্ব নয়, সংস্কৃত ব্যাকরণ এর ঘাড়ে চাপান হয়েছে। আধুনিক বাংলা ভাষাকে তাই বলা যেতে পারে আভিজাত্যপূর্ণ বুর্জোয় ভাষা। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এর নাড়ীর যোগ নেই। ইসলাম-নিরপেক্ষ বাংলা-সাহিত্যের এই পরিণতি!

তা হলে দেখা যাচ্ছে ঃ 'ইসলামী বাংলা-সাহিত্য' বললে সাধারণত যে গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতার ভার মনে জাগে, আসলে তা মোটেই নয়। বরং তার উল্টা! মিলন, সমন্বয় ও ব্যাপকতা বুঝাতেই কোনকিছুর পূর্বে 'ইসলামী' বিশেষণ লাগানো যেতে পারে–সংকীর্ণতার জন্য নয়।

কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় ইসলাম এত উদার হওয়া সত্ত্বেও আমাদের অনেক কবি সাহিত্যিক ইসলামের নাম শুনলেই আঁতকে ওঠেন। হাইড্রোফোবিয়া রোগের কথা আপনারা জানেন–যাকে বলে জলাতঙ্ক রোগ। সেই রকম আরেকটা রোগ আছে। তার

www.pathagar.com

নাম হচ্ছে “logophoboea” অর্থাৎ শব্দাতঙ্করোগ। সেই শব্দটা হচ্ছে ‘ইসলাম’। ‘ইসলামের’ নাম শুনলেই একদল লোক ক্ষেপে যান। কিন্তু প্রকৃতির প্রতিশোধ তাঁরা এড়াবেন কি করে? ইসলাম অলক্ষ্যে এসে তাঁদের ঘাড়ে চাপে। দেখা যাচ্ছে অতি-আধুনিক কবিরা তাঁদের কবিতায় আজকাল প্রায়ই ‘এবং’ শব্দ ব্যবহার করছেন। সুধীন দত্ত এই পথ দেখিয়ে গেছেন। এর উৎস-মূল কোথায়? উৎস-মূল হচ্ছে কুরআন। কুরআনেই এই অভিনব কাব্য-ভঙ্গী বিদ্যমান।

বর্তমান মুক্তছন্দই বা কবিরা কোথা থেকে পেলেন? কুরআনই ত পথ দেখিয়েছে।

তারপর দুই দাঁড়ি (।।)। বাংলা কাব্যে, হেডিং-এ, নামে, যত্রতত্র আজকাল দুই দাঁড়ির ভীষণ বাড়াবাড়ি! এটা কোথা থেকে এল? এটাও ত ইসলামি! যে কোন পুঁথির কিতাব খুললেই আপনার তা দেখতে পাবেন।

বস্তুত ইসলামী সাহিত্য অনুদারও নয়, সাম্প্রদায়িকও নয়। কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান—সর্বক্ষেত্রেই ইসলাম তার আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে। ইসলামের জন্য খাস করে ত কোন বিষয়বস্তু মার্কা-মারা নেই। দুহাত প্রসারিত করে রেখেছে, ইসলাম। সবাইকে সে তার বুকে স্থান দিতে পারে আর তার সোনার কাঠির যাদুস্পর্শ পেলেই যে-কোন বস্তু সুন্দর হয়ে সহজ হয়ে বৃহত্তর কল্যাণ রূপে দেখা দেয়। একদিকে তার যেমন কুরআন-হাদিস, রয়েছে অপর দিকে তেমনি আছে আলিফ্-লায়লা, শাহনামা, মসনবী, দিওয়ান, রুবাইয়াৎ, মুতাজেলা দর্শন, আবু সিনা, আল-ফারাবী, আল-জাবের ইত্যাদির বিজ্ঞান-সাধনা, ইবনে খলদুনের ইতিহাস, ইবনে বতুতার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, নিজামীর রস-রচনা ইত্যাদি ইত্যাদি। বস্তুত ধর্ম, নীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য, উপন্যাস, ভ্রমণ-কাহিনী, ইতিহাস, লোকসঙ্গীত, পুঁথি-সাহিত্য,–সব্যত্রই রয়েছে ইসলামের অবাধ গতি ও অধিকার। বাকী ছিল আধুনিক বিজ্ঞান (space science) সেখানেও দেখা যাচ্ছেঃ চৌদ্দশ বছর আগেই সবার অলক্ষ্যে সে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে গ্রহ তারার দেশে।

দায়ী কে?

এখন কথা হচ্ছে ঃ ইসলামী সাহিত্যের এই বিকৃত অর্থও সংকীর্ণ ধারণার জন্য দায়ী কে? দায়ী প্রকৃতপক্ষে মুসলমানেরাই। মুসলমানেরা ইসলামকে সংকীর্ণ করে রেখেছে। এর উদার পরমাশ্চর্য রূপ তাদের অনেকে নিজেরাও দেখেনি, অপরকেও দেখাতে পারেনি। বাইরের প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়ে ঘরের কোণায় এসে তারা মুখ লুকাচ্ছে। বিধর্মীরা আজ কুরআন থেকে ইংগিত ও প্রেরণা পেয়ে নব নব সৃষ্টি দিয়ে জগতকে স্তম্ভিত করে দিচ্ছে, অথচ মুসলমানেরা সেই মান্ধাতার আমলের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কুরআন পাঠ করছে। আমরা মিরাজকে শুধু আমাদের বিশ্বাসের বস্তু করেই রেখেছি, আমাদের কবিরা একে নিছক ‘ইসলামী-সাহিত্য’ বলে স্পর্শ করে নি, অথচ এই মিরাজের কাব্যরূপে মুগ্ধ হয়েই ইতালির মহাকবি দান্তে ‘Divine Comedy’ লিখে জগতে অমর হয়ে রইলেন। কাজেই আমাদের এই নির্বুদ্ধিতার জন্য অন্য কেউ দায়ী নয়—আমরাই দায়ী।

www.pathagar.com

আমাদের জানতে হবে ঃ শুধু কুরআন-কিতাব বা পুঁথিপত্রই ইসলামী-সাহিত্য নয়। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, ভাবধারা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে-সাহিত্য রচিত হবে, তাই হবে ইসলামী সাহিত্য।

অনেকে বলেন ঃ সাহিত্য সাহিত্য। যেখানে আবার ইসলামী সাহিত্য বলে স্বতন্ত্র গণ্ডী-কাটা কেন? কথাটা একদিক দিয়ে ঠিক। কিন্তু তাদের এই জিজ্ঞাসাই 'ইসলামী সাহিত্যের' স্বপক্ষের যুক্তি। আজ বাংলা সাহিত্যে কেন ইসলামী বিভাগ খুলতে হয়? ইসলামী সাহিত্যের অভাব আছে বলেই ত এর প্রয়োজন? পশ্চিম-বঙ্গের বাংলা-সাহিত্যে 'হিন্দু বাংলা বিভাগের' নাম ত শুনি না। উর্দু-সাহিত্যের 'ইসলামী উর্দু' বলে কোন শাখা নেই। নেই এই জন্যে যে তাদের প্রয়োজন নেই। মাতৃভাষার কাজ হল জাতির ধ্যান-ধারণা ও আশা-আকাংখাকে রূপ দেওয়া। পশ্চিম বঙ্গের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-কৃষ্টির পূর্ণ রূপায়ণ ঘটেছে। উর্দু সাহিত্যও ইসলামী আদর্শে ও ধ্যান-ধারণায় ভরপুর। কাজেই তাদের বেলায় স্বতন্ত্র শাখার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলা ভাষা সম্বন্ধে সেকথা বলা যাবেনা। পাকিস্তান লাভ করা সত্ত্বেও পশ্চিম বঙ্গের শক্তিশালী সাহিত্যের আওতায় আমরা এখনও আড়ষ্ট। নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত শক্তি আমরা এখনও অর্জন করি নি। খবরের কাগজে পূর্ব-পাকিস্তানের সে কোন স্থানের 'সংস্কৃতি-সংবাদ, পড়লেই আপনারা একথার সত্যতা উপলব্ধি করবেন। পূর্ব-পাকিস্তানে পশ্চিম বঙ্গের পুস্তকের চাহিদাও একথার সাক্ষ্য দেবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রুচি-বিকৃতিও ঘটেছে, তাও বুঝা যাবে। এই কারণেই 'ইসলামী সাহিত্যের' দাবী এখনও আমাদের স্বীকার করতে হচ্ছে। সাহিত্যে একটা স্বতন্ত্র গণ্ডী কেটে রাখা নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষে অক্ষমতা ও অগৌরবের পরিচয়। কিন্তু 'ইসলামী সাহিত্যের' লেবেল তুলে দিলেই এ অগৌরব ঘুচবে না। ইসলামী সাহিত্যের প্রাচুর্য দিয়েই ইসলামী সাহিত্যের দাবী মিটাতে হবে! অন্য কথায় ঃ ইসলামী সাহিত্যকে তুলতে হলে আরও বেশি করে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে।

ইসলামী সাহিত্যের রূপ

ইসলামী সাহিত্যের রূপ কেমন হবে, সে সম্বন্ধেও কিছুটা ধারণা আমাদের থাকা উচিত। এ সম্বন্ধে চিরদিন মতবিরোধ থাকবেই, আর আমার মতে থাকাই উচিত। কেউ বলবেন ঃ ইসলামী বাংলা হতে হলেই তার পোষাকও ইসলামী হবে, অর্থাৎ আরবী-ফার্সি শব্দে তা ভরপুর থাকবে। কেউ বলবেন ঃ আরবী-ফার্সি শব্দ থাকলেই কি ইসলামী হয়? আসল বস্তু হল ভাব বা spirit-বিশুদ্ধ বাংলা ভাষাতেও ইসলামী সাহিত্য রচিত হতে পারে। কেউ বা আবার প্রশ্ন তুলবেন ঃ যে-সাহিত্য সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের বাণী আছে, তা কি ইসলামী সাহিত্য নয়? গয়ের-ইসলামী বলে সে সাহিত্য কি আমরা বর্জন করব প্রকৃতির রূপ-বর্ণনা, মানব-মনের সুখ-দুঃখের চিরন্তন চিত্র—এ সব কোন্ পর্যায়ে পড়বে? এই ধরনের বহু ইসু উত্থাপন করা যেতে পারে।

এই সমস্যাগুলির চূড়ান্ত জবাব কোনদিনই কোন সমালোচক যুক্তিতর্ক দ্বারা দিতে পারবেন না। সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাই এর জবাব দেবে। কোন বস্তুকে যে কি ভাবে কাজে

www.pathagar.com

লাগানো যায়, বাইরে থেকে তা কেউ বলে দিতে পারে না। কলাকৌশলী শিল্পীর মন তা উদ্ভাবন করে। "ও মন, রমজানের ওই রোজার শেষে, এলো খুশির ঈদ"—এই গানের পূর্বে কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে বাংলা ভাষার 'ইসলামী গান' সার্থকভাবে রচিত হ'তে পারে। কাজেই এ সম্বন্ধে কোন নির্দেশ না দেওয়াই ভাল।

পক্ষান্তরে এমন অনেক কাব্য গান বা বিষয়বস্তু আছে যা noneommittal অর্থাৎ তা ইসলামী কি নন-ইসলামী বুঝা যাবে না। এ সব ক্ষেত্রে এই নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে যে, ইসলামের মূল নীতি বা আদর্শের বিরোধী না হওয়া পর্যন্ত সব-কিছুই আমরা ইসলামের গণ্ডীর ভিতরে ধরে নেব। এতটা ব্যাপক বাউণ্ডারীর মধ্যেও কি সৃষ্টি সম্ভব হবে না?

বরিশাল সাহিত্য সম্মেলন

১৯৫৭

পাক-বাংলার কাব্য-সাহিত্য

বন্ধুগণ,

চট্টগ্রামের এই সাহিত্য-সম্মেলন পূর্ব-পাকিস্তানের তমদ্দুনিক সংগঠনের ইতিহাসের স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাইরের আকাশে বাতাসে যখন বিভ্রান্তি ও ব্যর্থতার সুর ধ্বনিত হচ্ছে, রাষ্ট্রে সমাজে সাহিত্যে শিল্পে নীতি ও আদর্শ যখন ম্লান হয়ে আসছে, সেই সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে আহ্বান এল এই সম্মেলনের। অন্য কোনখান থেকে নয়—চট্টগ্রাম থেকে। এর একটা তাৎপর্য আমি খুঁজে পেয়েছি। আমার মনে হয়, এইবার আমরা আমাদের তাহজিব-তমদ্দুনের উৎস-মূলে এসে পৌঁছেছি। এখন এই নগরী 'চট্টগ্রাম' নামে অভিহিত হচ্ছে বটে; কিন্তু এর আসল নাম চট্টগ্রাম নয়; আসল নাম হচ্ছে 'শাতিল্-গঙ্গ'-যেমন আমরা পেয়েছি 'শাতিল্-আরব'। আরবদের দেওয়া এই নাম। আরবীতে 'শাৎ' মানে হচ্ছে Delta. শাতিল্-গঙ্গ বা শাতেঙ্গ মানে তাই Delta of the Ganges. খৃষ্টের জন্মের অনেক পূর্ব থেকেই আরবেরা বাংলা দেশে বাণিজ্য করতে আসে। শাতেগঙ্গই ছিল তখন তাদের প্রধান বাণিজ্য-বন্দর। বলা বাহুল্য 'গঙ্গ' শব্দটি আর্য শব্দ নয়, অনার্য শব্দ। শাতিল্‌গঙ্গ যে আরবদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা Chittagong District Gazetteer-এও উল্লিখিত হয়েছে। কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করছি ঃ

"Here I may also quote the note of Bernavilli on the origin of the word, Chittagong. He derives the name from the Arabic 'Shat' or delta (which he translates as the end or extremity and Ganga, the Ganges, explaining that it was a name given by the Arabs meaning the city at the mouth of the Ganges."

www.pathagar.com

এই শান্তিল্-গঙ্-ই ধীরে ধীরে শাতেগঙ্, চাটিগঙ্গ, চাট্গাঁ এবং ইউরোপীয়ানদের হাতে Chittagong-এ রূপান্তরিত হয়েছে। বস্তুতঃ খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্ব থেকেই আরব সওদাগরেরা বাণিজ্যর খাতিরে চট্টগ্রাম বন্দরে যাওয়া-আসা করত। ঢাকার সোনার-গাঁ পর্যন্তও তারা আসত। সোনার-গাঁর মসলিন তারা ইয়ামনের বাজারে নিয়ে বিক্রি করত। সেখান থেকে ইউরোপীয় বণিকগণ রোম ও অন্যান্য স্থানে সেগুলি চালান দিত। এই আরবেরা যে সেমিটিক গোত্রের লোক এবং খৃষ্টের জন্মের ৪০০০ বৎসর পূর্বে তারা যে ব্যাবিলন ও তার পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বিরাট সভ্যতা গড়ে তুলেছিল এবং তাদেরই এক শাখা যে পরবর্তীকালে বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়ে পাঞ্জাব সিন্ধু এবং বাংলা দেশে এসে বসতি স্থাপন করেছিল, ঐতিহাসিক গবেষণা ও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে সে কথা এখন সুস্পষ্ট হয়েছে। সম্ভবতঃ এরা ছিল দ্রাবিড় জাতি আর তাদের ভাষাই ছিল বাংলা ভাষার আদিম রূপ। ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় প্রমুখ আর্যভাবাপন্ন লেখকেরাও এ-কথা প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন। আধুনিক বাংলা-ভাষাতেও এমন অনেক শব্দ ও ক্রিয়ারীতি আমরা পাচ্ছি, যা না সংস্কৃত, না আরবী, না ফার্সী, না হিন্দী। সেই সব শব্দ ও বাক্যভঙ্গী আজও প্রাচীন দ্রাবিড়-ভাষার স্বাক্ষর বহন করছে। কড়া, ক্রান্তি, গণ্ডা, পণ, কুড়ি, হাঁড়িকুঁড়ি, খোকা-খুকি, মাছ-টাছ ইত্যাদি ধরনের শব্দ ও বাচনভঙ্গী দ্রাবিড় জাতীয়। বাংলা দেশের অধিকাংশ গ্রাম বা স্থানের নাম দ্রাবিড়দের দেওয়া। দামুকদিয়া, বিজুলিয়া, ঝিনাইদহ, শৈলকুপা, নাগিরাট, নোয়াখালী, কুমিল্লা, পাবনা, খোকসা, কুষ্টিয়া, খুলনা যসর ইত্যাদি ধরনের অসংখ্য দ্রাবিড় নাম আজ পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। অবশ্য এই সব দ্রাবিড় শব্দকে পরে বিকৃত করে সংস্কৃত রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। ডক্টর সুনীতি কুমার তা স্বীকার করেছেন। তাঁর উক্তি এখানে উদ্ধারযোগ্য ঃ

"But it is a pity that generally there was an attempt to give these names a Sanskrit look..... In the formation of these we find some words which are distinctly Dravidian. An investigation of place-names in Bengal, as in other parts of Aryan India, is sure to reveal the presence of non-Aryan speaker, mostly Dravidian, all over the land before the establishment of the Aryan tongue."

(quoted from Dr. Nihar Ranjan's 'Bangalir Itihas'. p, 62)

শুধু দ্রাবিড় নয়, বহু আরবী ফার্সী নামও বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। যেমনঃ–যসর থেকে যশোহর, নওগাঁ থেকে নবগ্রাম বশিরহাট থেকে বসুর হাট, ইব্রাহিমপুর থেকে ব্রাহ্মপুর, মনোয়ারপুর, থেকে মনোহরপুর–ইত্যাদি।

যাই হোক। আমি এখানে কোন ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করছি না। আমি শুধু এইটুকুই আপনাদিগকে দেখাতে চাই যে, বাংলা ভাষার বুনিয়াদ সম্বন্ধে এতদিন আমাদের মনে যে ধারণা ছিল, তা এখন উল্টে যাচ্ছে। বাংলা ভাষা গোড়াতে যে আর্যভাষা ছিল না এই কথাই আমার প্রতিপাদ্য। আর এ-কথা শুধু আমিই বলছি না, বড় বড় ঐতিহাসিকদের এই মত। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ঐতিহাসিক মার্শম্যান তাঁর "বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত" গ্রন্থে লিখে গেছেন ঃ

"অতি পুরাতন কালে বঙ্গদেশের কি অবস্থা ছিল তাহা নিশ্চয় করা অতি দুষ্কর; বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম কোন সময় চলিত হইতে লাগিল, তাহা জানা যায় না। যে মনুষ্যেরা প্রথমে এদেশে বাস করিয়াছিল, তাহারা হিন্দু ছিল না, কিন্তু পশ্চিম সীমায় পার্ব্বতীয়

www.pathagar.com

লোকদের তুল্য এক জাতি ছিল। .... আর যে-বঙ্গভাষা এখন চলিত আছে, তাহা কোন্ সময়ে উৎপন্ন হইল, ইহাও নিশ্চয় করা আমাদের অসাধ্য। সংস্কৃত ও আরবী ও ফার্সী শব্দ ভিন্নও অন্য অন্য অনেক শব্দ সেই ভাষাতেই চলিত আছে, তাহাতে অনুমান হয় অতি পূর্বকালে বঙ্গদেশ নির্বাসি লোকেরা যে ভাষা ব্যবহার করিত, তাহার সংস্কৃতাদি ভাষার সহিত কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু সেই পুরাতন ভাষা এখন নষ্ট হইয়াছে।"

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন; "দ্রাবিড় জাতি বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাদের ভাষা অনার্য।.... বাঙ্গালার বর্ত্তমান অধিবাসিগণের সহিত দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড় ভাষাভাষী অধিবাসীগণের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ইহার প্রমাণ দ্রাবিড়-সাহিত্যে পাওয়া যায়।"—বাঙ্গালার ইতিহাস, ২০ পৃঃ

পূর্ব-পাকিস্তানের কাব্য-আলোচনার গোড়াতেই আমাদের তাই এই উপলব্ধি হওয়া বিশেষ প্রয়োজন যে, বাংলা ভাষা মূলতঃ দ্রাবিড় ভাষা, এবং যে হেতু দ্রাবিড়, সেই হেতু–সেমিটিক, কাজেই মুসলমানদের ধ্যান-ধারণা ও আদর্শ এ-ভাষার সঙ্গে কিছুটা অন্তর্বিজড়িত। বাংলা-লিপি ব্রাহ্মী-লিপি থেকে গৃহীত। আর এই ব্রাহ্মী-লিপি অশোকের পূর্বেই দক্ষিণ আরব থেকে ভারতে এসেছিল। ব্রাহ্মী লিপি (ইব্রাহিমী লিপি?) আদিতে দক্ষিণ হতে বাম দিকে লেখা হত। কালে কালে সেই লিপিই বঙ্গলিপিতে রূপান্তরিত হয়েছে ঃ

"The Brahmi script, the parent script of India, was borrowed from Semitic sources probably about the seventh century B.C—(Rawlinson)

বাংলা ভাষা যে মূলতঃ সেমিটিক গোষ্ঠীর ভাষা—এই উপলব্ধি আমাদের ভাষাগত বহু সমস্যা ও বিতণ্ডার অবসান ঘটাতে পারে। এই মত সুপ্রতিষ্ঠিত হলে বাংলা ভাষায় কেন এত আরবী শব্দ, কেন বাংলা দেশে এত মুসলমান, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালির বাচন-ভঙ্গি কেন অত আরবী-ঘেঁষা ইত্যাদি বহু কথারই সদুত্তর পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষাকে ব্রাহুই, পাঞ্জাবী, পশ্‌তু ও সিন্ধীর ন্যায় আমাদেরই স্বগোত্রীয় ভাষা বলে নিঃসঙ্কোচে আমরা গ্রহণ করতে পারি। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে 'চর্যাপদ' আবিষ্কার করে নিয়ে এলেন; সেগুলোকে যদি বাংলা ভাষার আদিম রূপ বলে ধরা হয়, তবে এর থেকেই বুঝা যায়, বাংলা ভাষার চর্চা আদিতে কারা করত। অনেকের মতে বৌদ্ধরা আর্য ছিল না, তারা ছিল অনার্য (Sakyans) এবং হয়ত বা সেমিটিক গোত্র সম্ভূত কোন মিশ্রজাতি। এই কারণেই তারা সেমিটিক বর্ণমালা (Alphabet) অনায়াসে গ্রহণ করতে পেরেছিল। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" পুস্তকের ভূমিকাতে লিখেছেন ঃ "বৌদ্ধযুগে পালবংশীয় রাজাদিগের সময় হইতেই বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রচার আরম্ভ হয়।" বস্তুতঃ ভাষার লেখন ও প্রচার ব্যাপারে বৌদ্ধরা তাদের ভাষা ও বর্ণ জ্ঞান নিয়ে সিংহল আরাকান প্রভৃতি দেশে পালিয়ে যায়। সম্ভবতঃ তাদের একাংশ নেপালে গিয়েও আশ্রয় নিয়ে থাকবে। শুধু নেপাল নয়, তিব্বতেও আরবী ভাষায় বহু প্রাচীন হস্তলিপি পাওয়া গিয়েছে ঃ

"Paper scraps with Arabic writing are occasionally found among old Tibetan & Sakyan rubish"–(North India Antiquity)

www.pathagar.com

এই সব ব্যাপার থেকেই বুঝা যায়—সেমিটিক সভ্যতার ধারা কি ভাবে কোন্ খাতে প্রবাহিত হয়েছে। আরাকানে কেন বা বাংলা ভাষার এত চর্চা হল, কেন বা বহু মুসলমান কবি রোসাং রাজদরবারে আশ্রয় নিল, পার্শ্ববর্তী চট্টগ্রামেই কেন বা এত বাঙালী মুসলিম কবির আবির্ভাব হল, এ-সব কথা নূতন ভাবে বিচার করতে হবে।

বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শন যা পাওয়া যায়, তার মধ্যেও ভূরিভূরি আরবী শব্দের প্রচলন রয়েছে। সে কথা অন্যত্র বলেছি।

বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের বলিষ্ঠ রূপ গদ্য অপেক্ষা পদ্যেই বেশী প্রকাশ পেয়েছে। বাংলার মুসলিম সুলতানদের সময় থেকে আরম্ভ করে ইংরেজ আমলের প্রারম্ভ পর্যন্ত মুসলমান কবিরা নানাভাবে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলা ভাষাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নেওয়া এবং এই ভাষার মাধ্যমে নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্য, ধ্যান-ধারণা ও আশা-আকাংখাকে রূপ দেওয়াই ছিল মুসলমানদিগের প্রধান লক্ষ্য। হিন্দু পণ্ডিতদের প্রভাবে বাংলাভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব পড়েছে বটে, কিন্তু তাতে মুলমানগণ বিশেষ বিভ্রান্ত হন নি। যে যে বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁরা কাব্য রচনা করে গেছেন তার একটা ফিরিস্তি নিলেই তা বুঝা যাবে। কাসাসুল আম্বিয়া, য়ুসুফ জোলেখা, আমির হামজা, জঙ্গনামা, শহীদে কারবালা, সয়ফুল,-মুলুক বদিউজজামাল, ফতুহশ্বাম, ফতুহল মিছর, ফতুহল ইরাক, খোলাসাতুল আম্বিয়া, রসুল-বিজয়, সায়াৎ-নামা, গাজী-বিজয়, গাজী-কালু সোনাভান, নসিহৎ-নামা, আয়ুব নবীর কথা, কেয়ামত-নামা খায়রল হাসার, গোলেবকাওলি, জয়নোলের চৌতিশা, তাজকিরাত-উল্-আওলিয়া, শাহনামা, সেকেন্দরনামা, ফাতিমার সুরতনামা, শরীয়ৎনামা, হাজার মসায়েল, হানিফা ও কয়রাপরী, হানিফার লড়াই, আলি ও বীর-হনুমানের লড়াই ইত্যাদি অসংখ্য পুঁথি মুসলমানেরা লিখেছেন। বিখ্যাত বিখ্যাত আরবী ফারসী গ্রন্থের অনুবাদও তাঁরা বাংলাভাষায় করেছেন। ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকীর মতে মুসলমানদের পুঁথির সংখ্যা আনুমানিক ৫০,০০০ হাজার। এদের আরবী-ফারসী-মিশানো ভাষা দেখলে অবাক হতে হয়। এ এক নূতন সৃষ্টি। আর কিছুর জন্য না হোক, বাংলা ভাষাকে চমৎকার ইসলামী রূপ যে তাঁরা দিতে পেরেছেন, এই কীর্তি তাঁদের অক্ষয় হয়ে থাকবে। আজ সংস্কৃত-মখুর বাংলা ভাষার শব্দঝঙ্কার ও বাক্য-বিন্যাস আমাদিগককে সম্মোহিত করে রেখেছে, নৈলে অন্য চোখ দিয়ে অন্য মন দিয়ে অন্য কান দিয়ে অন্য অনুভূতি দিয়ে দেখলে আমরা নিশ্চয়ই এদের ভাষার সহজপ্রকাশগুণ লালিত্যের প্রশংসা না করে থাকতে পারতাম না। দুএকটা নমুনা দেখুন ঃ –

“মেছের সহর হৈতে বাহির হইয়া
মকদ্দস পানে নবি জান নেকালিয়া
সামের সহর বিচে ফলগুন গ্রাম
তথা উতরিল যদি নবী নেক কাম
জিবরিল আসিয়া কহে শোন সমাচার
দেখ হেথা জমিনেতে কেমন বাহার॥”

–কাছাছোল আম্বিয়া।

“পহেলা ফকির সেই বিবির খাতির
ছালাম করিয়া হাল করেন জাহির।
শুন বিবি আঁখি মোর গেল কি কারণে

www.pathagar.com

সে বয়ান করি আমি তোমার ছামনে।
কি কারণ ফকিরের ভেস 'হৈল মোর
শুন বিবি কহি কিছু সে সব খবর॥"

–আলেফ লায়লা।

"উজিরের পানে বাদসা আঁখি ঘুমাইল
দেলেতে হইল গোশ্বা কিছু না কহিল
উজির কহিল বাদসা আমি সব জানি
আমিরের বেটা এই ওম্মর ইউনানি।
নওসেরওয়া বলে ঝুঁট হবে এই বাত
আমির কারার করে সাহাজাদি সাত।"

–আমির হামজা।

"শুন যত বেরাদার, কহি কিছু সমাচার,
শুন সবে আগামি কালাম।
রুমের সহর বিচে কুস্তনতুনিয়া দেশে
এস্তাম্বুল বলে যার নাম॥"

–চাহার দরবেশ।

"কহে এই লাড়কা যবে হইবে সিয়ানা
দেখিয়া পরীর তরে হইবে দেওয়ানা।
সেই গমে ছাএর করিবে দেশে দেশে।
দুঃখ পাবে সুখ তাতে হইবেক শেষে।"

–মোহাম্মদ খাতের, মৃগাবতী

এই ভাষাতেই মুসলমান কবিরা কাব্য লিখে গেছেন।

অবশ্য হিন্দু কবিরা বাংলা ভাষাকে একটা সংস্কৃত রূপ দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। দৌলত কাজী, আলাওল প্রমুখ অনেক মুসলমান কবিও তাঁদের অনুকরণে সাধু-বাংলায় কাব্য রচনা করেছিলেন। আলাওলের 'পদ্মাবতী, কাব্য তার চূড়ান্ত নির্দশন। কিন্তু এ কথা অনায়াসে বলা যায় যে, এটা ছিল শুধু একটা ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়। সংস্কৃত-ঘেঁষা সাধু বাংলা যে মুসলমান সমাজে কোন কালেই আদৃত হয়নি, তার প্রমাণ ছহি চাহার দরবেশ পুঁথিতে মরহুম মোহাম্মদ দানেস তাঁর কিতাবের ভূমিকাতে বলেছেন ঃ

"চলিত বাংলায় কেচ্ছা করিব তৈয়ার
সকলে বুঝিবে ভাই কারণে ইহার।
আসল বাংলা সবে বুঝিতে না পারেঃ
এ-খাতিরে না লিখিলাম শুন বেরাদারে।"

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত মুসলমানেরা এই "চলিত বাংলা" জবানেই কাব্য রচনা করে গেছেন। তাদের গতি ভীষণভাবে বাধা পেল—যখন শ্রীরামপুরের মিশনারীরা হিন্দু পণ্ডিতদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বাংলা ভাষাকে দ্বিধাবিভক্ত করে দিল। এর আগে পর্যন্ত আরবী-ফারসী-মিশানো ভাষাই ছিল সত্যিকার বাংলা ভাষা। এই চলতি ভাষা হিন্দুদের মনও জয় করতে পেরেছিল। অনেক হিন্দু কবিও মুসলমানি কায়দায় পুঁথি লিখে গেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—রাধাচরণ গোপের কথা। ইনি 'ইমামএনের কেচ্ছা' নামক একখানি পুঁথি লেখেন। পুঁথির লিপিকাল ১৮২৭। রচনার নমুনা দেখুন ঃ

"আল্লা আল্লা বল পাক পরওয়ারদিগার
আখেরে দোজখে ডালি .... যার

www.pathagar.com

দোজখ তরিতে বান্দা করহ ফিকির
জাহিরে বাতুনে লইলাম আল্লার জিকির।
আল্লার আরশ-কোর্সে কিছু মেহেরবানি চাই
ইমামএনের কেচ্ছা কিছু মিলাইয়া গাই
শ্রীযুক্ত ছাহেবের কেচ্ছা রাধাচরণ গাএ
আল্লা আল্লা বল নবী পঞ্জতনের পাত্রা।"

এর থেকেই আপনারা বুঝতে পারবেনা-বাংলা ভাষায় মুসলমানেরা কতদূর আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এমন কি বাংলা হরফকে সরিয়ে তারা আরবী হরফে বাংলা লেখা শুরু করেছিল। আরবী হরফে বাংলা পুঁথি এখনও বিদ্যমান। এই গৌরবোজ্জ্বল পরিস্থিতি থেকে মুসলমানেরা কি ভাবে স্থানচ্যুত হল, তা জানতে পারবেন আপনারা শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাশের 'বাঙ্গলা, সাহিত্যের ইতিহাস' থেকে। তিনি বলছেন ঃ

"১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হালহেড এবং পরবর্তীকালে হেনরি গিটস্ ফরষ্টার ও উইলিয়াম কেরী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান ধরিয়া আরবী পারসীর অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতি করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই তিন ইংলণ্ডীর পণ্ডিতের যত্ন ও চেষ্টার অতি অল্প দিনের মধ্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৭৮ খৃঃ এই আরবী-পারসী-নিঃসূদন-যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানির সদর মফস্বল আদালতসমূহে আরবী পারসীর পরিবর্তে বাংলা ও ইংরাজীর প্রবর্তনের এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি।"

পাদ্রীদের সঙ্গে মিলেছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাম নাথ বিদ্যাবাচস্পতি, রামরাম বসু এবং আরো অনেকে।

আমরা কী ছিলাম এবং কী হয়েছি, আশা করি এর থেকেই তা আপনারা বুঝতে পারবেন। আমরা ভবিষ্যতে কী হব বা কোথায় যাব—তার হাদিসও এর থেকেই পাওয়া যাবে। আমাদের যাবতীয় তমদ্দুনিক পুনর্গঠন এই আলোকে এই পরিপ্রেক্ষিতে করতে হবে।

এইবার কাব্য-আলোচনায় আসা যাক ঃ

কাব্যের প্রকৃতি

কাব্য সম্বন্ধে বলতে চেয়ে বিপদে পড়েছি। কাব্য বুঝি, কিন্তু বুঝাতে পারি না! একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ঠিক এই কথাই বলেছেন ঃ "If not asked I know, if you ask me I know not." রবীন্দ্রনাথও অন্য ভাবে ঠিক একই কথা বলেছেন ঃ "বোঝবার বেলায় মা-লক্ষ্মী যত সহজ, বোঝাবার বেলায় তত নয়।" বস্তুতঃ রসের কথাই এই। রসকে বোঝান যায় না। বহু মনীষী বহু ভাবে কাব্যকে বুঝাতে চেয়েছেন; কিন্তু তবু যেন কোন ব্যাখাতেই মন ভরে না। Mathew Arnold বলেছেন ঃ "Poetry is criticism of life," Edgar Alan Poe বলেন, "It is the breath and finer spirit of all knowledge'. Plato বলেন ঃ Interpreter of Divinty". Aristotle বলেছেন, কাব্য হচ্ছে "authentic tidings of invisible things," Dante বলেন ঃ "Divine phantom of reality.'

সংজ্ঞাগুলোর কোনটাই মিথ্যা নয়, অথচ একটাও পূর্ণাঙ্গ সত্য নয়। একই সত্যের বিভিন্ন দিক বিভিন্ন জন দেখেছেন-যিনি যেরূপ দেখেছেন সেই রূপই বর্ণনা করেছেন। সব চোখ মিলিয়ে দেখলে হয় ত পূর্ণ সত্য পাওয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

মুসলিম কাব্যের রূপ ও প্রকৃতি

আমরা এখন পাকিস্তান পেয়েছি। স্বতন্ত্র জাতিত্ব এবং স্বতন্ত্র তাহজিব-তমদ্দুনের দাবীই এর ভিত্তিমূল। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যে ভয় পাবার কিছু নেই।

ধর্মে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে মুসলমানেরা স্বতন্ত্র হয়েছে বলেই জগতে বহু কল্যাণের পথ খুলে গেছে। বাংলা সাহিত্যের স্বতন্ত্র পথ নিলেও অনেক নূতনত্ব ও বৈশিষ্ট্য আসবে। ইসলাম অচলায়তন সৃষ্টির বিরোধী। তার মধ্যে আছে সৃষ্টির উল্লাস, মুক্তির আনন্দ, অসীমের ইংগিত ও অনির্বাচনীয়ের ছাপ। এইখানে আমাদের কাব্য-সাহিত্যে ইসলামের প্রয়োজন রয়েছে। ইসলামের স্পর্শ পেলে প্রেম 'তাজমহলে' রূপান্তরিত হয়। জয়পুর, যোধপুর, তুরস্ক, ইরান—সব যায়গা থেকে সে উপকরণ সংগ্রহ করে বটে; কিন্তু সমস্ত মিলিয়ে যে মর্মরস্বপ্ন সৃষ্টি হয়, তার অন্তরে থাকে মমতাজ, বাইরে থাকে শাহ্‌জাহান। মানব-মনের যা-কিছু অনুভূতি, তা যখন সত্য সুন্দর ও কল্যাণলোকে পৌঁছে যায়, তখন তার গায়ে আর কোন সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ থাকেনা—তার আবেদন তখন বিশ্বজনীন হয়। আমাদের শিল্পসাহিত্যও একই নীতিতে রচিত হবে।

পাকিস্তান যুগের মুসলিম-কাব্য

উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বাংলার মুসলমানেরা একটা Superiourity Complex নিয়েই বাংলা ভাষার সেবা করে এসেছে। অথচ তাদের মধ্যে কোন অনুদারতা বা aggressiveness ছিল না। স্বকীয়তা বজায় রেখে হিন্দুদের সঙ্গে মিলেমিশেই তাঁরা সাহিত্যকর্ম করে গেছেন। এইটেই ছিল স্বাভাবিক। মুসলমানের কথা মুসলমানকেই বলতে হবে, হিন্দুর কথা হিন্দুকেই বলতে হবে। একে সাম্প্রদায়িকতা বলা অন্যায়। এতে সাহিত্য বরং পরিপুষ্টই লাভ করে। মুসলমানের নীতি হিসাবে তাই এই তমদ্দুনিক সহনশীলতা গ্রহণ করেছিল। হিন্দুর রামায়ণ, মহাভারত তাই এত সহজেই মুসলিম সুলতানদের দ্বারা অনুদিত হতে পেরেছিল।

এবার আমাদের সাধনার মূলমন্ত্র হবে পাকিস্তানবাদ। পূর্বেই বলেছিঃ এ-কোন নূতন মতবাদ নয়। সাহিত্যে আমরা আমাদের বৈশিষ্ট্য ফুটাবো—আমাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিব—এতে আবার ভাববার কি আছে? বরং বিপরীত কিছু চিন্তা করাই হবে অস্বাভাবিক। কঠিন পথে আজ আমাদের পা বাড়াতে হবে। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে—কি কাব্যে, কি দর্শনে, বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশই হচ্ছে জীবনের ধর্ম। ইকবাল ঠিকই বলেছেন ঃ

"Come, I shall tell you the difference
between a freeman and a slave
The freeman creates, the slave imitates."

www.pathagar.com

নিতান্ত দুঃখের বিষয়, আমাদের কাব্য বহুলাংশে ব্যর্থ পরানুকরণ-প্রিয়তার দ্বারা বিড়ম্বিত হচ্ছে। আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই প্রতিভাদীপ্ত; কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকেই এখনও আত্মস্থ হননি। আত্মদর্শন বা আত্ম-পরিচয় তাঁদের আজ সব চেয়ে বড় প্রয়োজন। আমি যা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তাতে এইটুকুই জেনেছি যে, সার্থক সৃষ্টি আপন ঘরেই সম্ভব। অনুভূতির বিশ্বস্ততাই (Sincerity of feeling) হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টির প্রাণ। এখানে মুনাফিকি করলে প্রকৃতি তার শোধ নেবে।

না বলে পারছি না যে পূর্ব-পাকিস্তানের বুকে দাঁড়িয়ে আমাদের অনেকেই চেয়ে আছেন পশ্চিম বঙ্গের দিকে। পদ্মাতীরের ভাষার মধ্যে তাঁরা কোন কাব্যসৌন্দর্য দেখেন না, যত সৌন্দর্য সব পুঞ্জীভূত হয়ে আছে যেন ভাগীরথীর দুই তীরে। শুধু কবি-সাহিত্যিক নয়, পাঠকদেরও এই রোগে ধরেছে। কলকাতার বই হলেই বাস্, আর কোন কথা নেই। সব ভাল। এই মনোভাবের কিছুটা যে সঙ্গত কারণ নেই, তা আমি বলছি না। উন্নত রুচিজ্ঞান ও আলোর পিয়াসা মানুষ চাপা দিয়ে রাখতে পারে না। পশ্চিম বঙ্গের অনেক পুস্তকই বিষয়-গৌরবে ও পারিপাট্যে আকর্ষণীয়। কিন্তু সেটাও যেমন সত্যি, আমাদের মনোবিকৃতিও ঠিক তেমনি সত্যি। তুলনায় ভাল না হলেও আমাদের ঘরের জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। শিল্পই হোক, সাহিত্যই হোক, সংগঠন যুগে tariff বা সংরক্ষণীয় কোন একটা আশ্রয় দিয়ে স্বদেশী শিল্পকে রক্ষা করতে হয়। জগতের সমস্ত জাতিই এমনি করে বড় হয়েছে।

পাকিস্তান-যুগের পূর্বের কথা বলব না। পরের কথাই বলব।

এখানে একাধিক প্রতিশ্রুতিপূর্ণ তরুণ কবির আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু আমি তাদের নাম ধরে ডাকব না। নীরবে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকব।

একটা বিষয়ের প্রতি আমাদের কবিদের দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করতে চাই। আমাদের সমাজ-জীবনের চিত্র তাঁরা আঁকছেন কই? তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না তাঁদের কাব্যে রূপায়িত হচ্ছে কই? শুধু ঈদের সময় এলেই আমাদের কবিরা একটা বিশেষ ইজমের তাড়নায় সর্বহারাদের দরদে ফেটে পড়েন এবং কতকগুলি কড়া কথা শুনিয়ে দেন। দুর্ভিক্ষ এলে তার করুণ মর্মন্তুদ দৃশ্য তাঁরা আঁকেন। কিন্তু এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষ যে কেমন করে মৃত্যুকে জয় করতে পারে, সামাজিক অসাম্য থাকা সত্ত্বেও বৃহত্তর মানবতার আহ্বানে কেমন সুন্দর বুকে বুকে মিলতে পারে—সে চিত্র তাঁরা আঁকেন না। পাকিস্তানের নূতন অনাবাদী জমি পড়ে ছিল, যে সব কবি এ-পাড়ে এসেছেন, তাঁরা ইচ্ছা করলে সোনার ফসল ফলাতে পারতেন। কিন্তু আত্ম-অবিশ্বাস এবং পরানুকরণের মোহে তাঁরা কিছুই করতে পারছেন না। আধুনিক কাব্যে আজ যে সুরটি ধ্বনিত হচ্ছে, সে হচ্ছে ঐতিহ্যভিত্তিক। জাতির যে সব tradition ও পৌরাণিক কাহিনী আছে, তাদের ছুঁয়ে-যাওয়া একটা স্বপ্ন বা রোমান্স সৃষ্টিই আধুনিক কাব্যের বৈশিষ্ট্য। সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ ও আরও কেউ কেউ এই আঙ্গিকে কবিতা লিখেছেন। অনেক কবিতা তাঁদের সার্থকও হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানের কবিরা বিশেষ করে জীবনানন্দ দাশের অনুকরণে তৎপর। কিন্তু তাঁদের সৃষ্টিতে এখন পর্যন্ত কোন মৌলিকতা বা বৈশিষ্ট্য

www.pathagar.com

আসেনি। জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত কবিতা 'বনলতা সেন'-এ এমন একটা অপূর্ব ব্যঞ্জনা ও কাব্যশ্রী আছে–যা মনকে স্পর্শ না করেই যায় না–

"হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটতেছি পৃথিবীর পথে
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয়-সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি, আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ-নগরে
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।
চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতি দূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা। ..... ইত্যাদি।

–(জীবনানন্দ দাশ)

প্রাচীন ঐতিহ্যকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে এসে কবি এলেন একেবারে বর্তমান নাটোরের বনলতা সেনের কাছে। পটভূমিকা স্বপ্নে ভরা। সিংহলসমুদ্র, মালয়-সাগর, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ, বিদর্ভ-নগর, শ্রাবস্তীর কারুকার্য—সবগুলো মিলে একটা রোমান্স সৃষ্টি করেছে। আমাদের কবিরা এই ধরনের কবিতা লেখেন না কেন? মুসলিম ঐতিহ্য দেখলে তাঁরা নাক সিট্‌কান। তাঁরা জীবনানন্দ দাশের এই spirit অনুকরণ করেন না, করেন দু-একটি form বা শব্দকে, যেমন 'ধানসিঁড়ি নদী'।

আমাদের অনেকে কম্যুনিষ্ট ভঙ্গীতে কবিতা লিখতে চান। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী যার যাই হোক না কেন–কবিতা ত হওয়া চাই! যা তারা লিখবেন, তার ত কাব্যমূল্য থাকা চাই। শুধু একটা অতৃপ্তি ও ব্যর্থতার সুর জুড়ে দিলেই কি কম্যুনিষ্ট-মার্কা কবিতা হয়? সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রানার', 'একটি মোরগের 'কাহিনী' বা 'সিগারেটের' মত মৌলিক ভাবসম্পন্ন কবিতা আমাদের কেউ লিখেছেন কি? মোরগ কবিতায় অতি অল্প কথায় কী চমৎকার প্রচার-কাব্যই না সৃষ্টি হয়েছে–

"খাবার! খাবার! খানিকটা খাবার!
অসহায় মোরগ খাবারের সন্ধানে
বারবার চেষ্টা করে প্রাসাদে ঢুকতে
প্রত্যেক বারেই তাড়া খেল প্রচণ্ড।
ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু করে স্বপ্ন দেখে
প্রাসাদের সত্যি সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেল,
একেবারে সোজা চলে এল
ধপ্‌ধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে,
অবশ্য খাবার খেতে নয়—খাবারের হিসেবে!"

তার 'সিগারেট' কবিতাও কত মৌলিক ঃ–

www.pathagar.com

"আমরা সিগারেট।
তোমরা আমাদের বাঁচতে দাওনা কেন?
আমাদের কেন নিঃশেষ কর পুড়িয়ে?
আর আমরা বন্দী থাকবনা
কৌটায় আর প্যাকেটে
আংগুলে আর পকেটে
আমরা বেরিয়ে পড়ব
সবাই একজোটে একত্রে
তারপর তোমাদের অসতর্ক মুহূর্তে
জলন্ত আমরা ছিট্‌কে পড়ব তোমাদের হাত থেকে
বিছানায় অথবা কাপড়ে।
নিঃশব্দে হঠাৎ জ্বলে উঠে
বাড়িশুদ্ধ পুড়িয়ে মারব তোমাদের
যেমন করে তোমরা আমাদের পুড়িয়ে মেরেছ এতকাল।"

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেনঃ উপরে যে কবিতাগুলি উদ্ধৃত করেছি তার কোথাও কোন আড়ষ্টতা নেই, দুর্বোধ্যতা নেই—প্রতিটি কথা পানির মত সহজ। ঠিক এর পাশে আমাদের আধুনিক কবিতা পড়ে দেখুন—হয়ত কিছুই বুঝবেন না। শুনতে পাই পাঠককে কোন-কিছু না বুঝতে দেওয়াই নাকি আধুনিক কবিতার লক্ষণ। তা হলে অবশ্য আর কিছুই বলার থাকে না। বলা বাহুল্য, এ আমাদের ভাবের দৈন্য এবং প্রকাশের অক্ষমতা ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের কবিরা যদি আত্মস্থ হন, তবেই তাঁরা নূতন কিছু সৃষ্টি করতে পারবেন। অনুকরণ দ্বারা তা সম্ভব হ'বে না। একটা নূতন পথ তাদের বেছে নিতেই হবে। চলাপথে চললে চলচেনা।

উপরোক্ত কথাগুলি রূঢ় শোনালেও সত্যি। আশা করি আমাদের তরুণ ভায়েরা কথাগুলি ভেবে দেখবেন।

পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যের ভাষা কী হবে, তাও এক সমস্যা। বাংলা ভাষার পূর্ব-আধুনিক রূপ আপনাদের দেখিয়েছি। আরবী-ফারসী শব্দের মিশ্রণে মুসলিম বাংলা একটা বিশিষ্ট রূপ নিয়েছিল। সেই পুঁথির ভাষার হুবহু অনুকরণ আর এখন সম্ভব নয়। তবে তার উপর ভিত্তি করে আমাদের ভাষাকে মার্জিত পাকিস্তানী রূপ দিতে হবে। এটা যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক ভঙ্গিতে করব, তা নয়, বাংলা ভাষার নিজস্ব কল্যাণে এবং নব সৃষ্টির তাগিদেই করব।

পাকিস্তানের হিন্দু ভাইদেরও এতে কোন চিন্তার কারণ নেই। তাঁদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখা আছে। তাঁদের সঙ্গে কোনরূপ বিরোধ না করেই আমরা আমাদের তমদ্দুনকে রূপ দিব।

বন্ধুগণ,

আর আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবো না। আমার ভাষণের চেয়ে বাইরের প্রকৃতিতে আপনারা বেশী করে যুগমনের প্রতিধ্বনি শুনতে পাবেন। এই চট্টগ্রামের আকাশে-বাতাসে

www.pathagar.com

আজ যে সুর ধ্বনিত হচ্ছে, তার মাঝেই আছে আমাদের পয়গাম। চট্টগ্রামের সাগর-কল্লোলে, পাহাড়ের কাজল মায়ায়, তটদেশের শস্যশ্যামল সমভূমিতে যে বৈচিত্র্য, যে রহস্য, যে প্রাণ-চাঞ্চল্য রূপে রসে বর্ণে গন্ধে লীলায়িত হয়ে ফিরছে, আমাদের সাহিত্যও হবে তেমনি বিচিত্র মধুর, ঐতিহ্যবাহী, বলিষ্ঠ ও সুন্দর। সেই ইংগিত দিয়েই আজকের মত বিদায় হই। তসলিম।"*

শিরাজীকে মনে পড়ে

মরহুম ইসমাইল হোসেন শিরাজীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় পত্র-মারফৎ। সে আজ প্রায় ৪৫ বৎসর আগের কথা। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আমার প্রথম কবিতা "আদ্রিয়ানোপল উদ্ধারে' প্রকাশিত হয় জনাব মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতে'। তখন আমি শৈলকুপা হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। সেই যুগে এই ধরনের আধুনিক কবিতা পূর্বে আর কোন মুসলিম কবির হাত দিয়া প্রকাশিত হয় নাই। একটা নূতন সুর ও নূতন ভঙ্গী দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। চারিদিক হইতে বহু প্রশংসা লাভ করিলাম। ফলে আমার উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। এর পর দুই একটি করিয়া আমার কবিতা 'মোহাম্মদীতে' প্রকাশিত হইতে লাগিল। আমি ম্যাট্রিক পাশ করিয়া আই-এ পড়িতে লাগিলাম।

জনাব মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও মৌলানা (মরহুম) মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী সাহেবদ্বয় কর্তৃক মাসিক-পত্রিকা 'আল-এসলাম' বাহির হইল। তাহাতেও আমার কবিতা ছাপা হইতে লাগিল। উদীয়মান কবি হিসাবে আমার নাম তখন ধীরে ধীরে সমাজে কিছুটা ছড়াইয়া পতিড়েছে।

ঠিক এমনি একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার বাড়ীর ঠিকানায় একখানি পত্র পাইলাম। খুলিয়া দেখিলাম, শিরাজী সাহেবের পত্র। আমার কবিতার প্রশংসা করিয়া তিনি আমাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। সে যুগে শিরাজী সাহেরেব নাম মুসলিম সমাজের ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইত। একাধারে তিনি বাগ্মী, কবি ও লেখক। কাজেই তাঁর মত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে আমি যে পত্র পাইব, এ আশা তখনও আমি করিতে পারি নাই। আনন্দে ও গৌরবে আমার বুক ভরিয়া গেল। সেই হইতে আমি শিরাজী সাহেবের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করিতে লাগিলাম।

কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হইল। স্থানীয় নেতৃবৃন্দের আগ্রহে আমি শিরাজী সাহেবকে শৈলকুপা আনিবার জন্য দাওয়াৎ দিলাম। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তিনি আমাদের দাওয়াৎ গ্রহণ করিলেন। শৈলকুপা মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে সভার আয়োজন করা হইল। হাটে হাটে কাড়া দিয়া জানাইয়া দেওয়া হইল ঃ শিরাজী সাহেব আসিতেছেন। চারিদিকে বিপুল সাড়া পড়িয়া গেল।

১৩২৩ বাংলা সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিরাট সভা। বহুলোকের সমাগম। স্কুলের অনেক হিন্দু শিক্ষক ও পার্শ্ববর্তী বহু হিন্দু ভদ্রলোকও শিরাজী সাহেবের বক্তৃতা শুনিবার জন্য যোগদান করিলেন। শিরাজী সাহেবের ভাব, ভাষা ও

* চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মেলন (১৯৫৯) কাব্য-শাখার সভাপতি অভিভাষণ

www.pathagar.com

বাগ্মিতা হিন্দু-মুসলমান সকলকেই মুগ্ধ করিল। সেই সভায় তখনকার রচিত আমার জাতীয় সঙ্গীত 'জাগোরে সুপ্ত স্বজাতি আমার, নিদ্রা-কাতর রয়োনা আর'–গানটি আমি গাহিলাম। শিরাজী সাহেবের অনুরোধে আমার ২/১টি জাতীয় কবিতাও আবৃত্তি করিলাম। বলা বাহুল্য, সেদিন দেশবাসীর নিকট হইতে আমিও কিছু প্রশংসা কুড়াইলাম।

শিরাজী সাহেব ২/৩ দিন শৈলকুপায় ছিলেন। আমার নিজবাড়ী মনোহরপুর শৈলকুপা হইতে দুই মাইল দূরে। যানবাহনের কোনই সুবিধা ছিল না। কাজেই শিরাজী সাহেবের থাকার বন্দোবস্ত আমাদের বাড়ীতে সম্ভব হইলনা। নিকটে খালের ধারেই (মরহুম) তেজারত খাঁ সাহেবের বাড়ী ছিল। সেখানেই শিরাজী সাহেবকে রাখার ব্যবস্থা করা হইল। প্রায় সারাদিনই আমি তাঁহার কাছে থাকিতাম। রাত্রে বাড়ী যাইতাম।

একদিন আসিতে একটু দেরী হইয়াছে। দেখা হইতেই শিরাজী সাহেব অনুযোগ করিয়া বলিলেন ঃ এত দেরী করিয়া আসিলে কেন? তোমাকে না দেখিয়া দেখ আমি গান লিখিয়াছি। এই বলিয়া তিনি তাঁহার খাতা হইতে এই গানটি গুণ গুণ করিয়া গাহিয়া শুনাইলেন ঃ–

"তোমার বিহনে ওগো বুলবুল।
আজি, প্রাণের কুঞ্জে ফোটে নাই ফুল॥
নাহি আজি তাই কোন সৌরভ
নাহি আজি তাই কোন গৌরব
হারায়ে চিত্ত সকল বৈভব
দুঃখে হয়েছে ধূল।
নাহি আর তার মুখের শোভা
নাহি আর তার চোখের আভা
হারায়ে শান্তি হারায়ে কান্তি
কেবলি করিছে ভুল॥
কবে বা তুমি আসিবে কুঞ্জে
ফুটিবে কুসুম পুঞ্জে পুঞ্জে
গুঞ্জিবে ভ্রমর মধুর ছন্দে
লভিব সুখ-অতুল।"

(প্রেমাঞ্জলি–২য় খণ্ড)

এই সঙ্গে আরও ২/৩টি গান তিনি আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন। গানগুলি তাঁর "প্রেমাঞ্জলি" পুস্তকে স্থান লাভ করিয়াছে। ২রা অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ তারিখে এই গানগুলি লেখা।

এরপর কলিকাতায় তাঁর সঙ্গে বহুবার আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে। তিনি তাঁর সমস্ত পুস্তকেরই একসেট আমাকে উপহার দিয়াছিলেন।

এতদিন পরেও সেই সব স্মৃতি আমার অন্তরে এখনও সবুজ রহিয়াছে।

বস্তুতঃ আমার কাব্য-জীবন যাঁহাদের স্নেহস্পর্শে লালিত হইয়াছে, শিরাজী সাহেব তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তরুণকে ডাক দিয়া কাছে টানিয়া আনা, তার চিত্ত-মুকুলের বিকাশ-পথকে উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া মহত্ত্বের পরিচয়। শিরাজী সাহেবের মধ্যে ছিল

www.pathagar.com

তেমনি একটা উদার মহৎ প্রাণ। এই মন, এই প্রাণ, এই ঔদার্য আজিকার দিনে অত্যন্ত বিরল। আজ তাই কৃতজ্ঞতায় ও শ্রদ্ধায় এপাড়ে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে জানাই আমার অন্তরের সশ্রদ্ধ সালাম।

দরবার
১৯৫৯

আমাদের হরফ-সমস্যা

সম্প্রতি আমাদের হরফ-সমস্যা আবার তীক্ষ্ণ হইয়া দেখা দিয়াছে। অনেকে বাংলা ও উর্দু ভাষাকে রোমান হরফে লিখিবার জন্য সোপারিশ করিতেছেন। এজন্য বাংলা ও উর্দু ভাষাভাষিদের মধ্যে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। অনেকেই রোমান হরফের বিরোধিতা করিতেছেন। এ সম্বন্ধে ধীরস্থির ভাবে আলোচনা করিয়া একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই সমীচীন। বাংলা হরফ কেনই বা আমরা বর্জন করিতে চাই, বর্জন করিলে তার ফলাফলই বা কী দাঁড়ায়, পক্ষান্তরে রোমান হরফ গ্রহণ করিলে তাহাতেই বা আমাদের কী ক্ষতিবৃদ্ধি হয়—সব কথাই গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাহার কি বক্তব্য আছে, এখনই বলা ভাল। আমার ব্যক্তিগত মত আমি নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

প্রথমে বাংলা হরফ সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাউক।

বাংলা হরফ

বাংলা হরফ পরিবর্তনের প্রস্তাব এবং প্রয়োজনের মধ্যে এই সত্যই স্বীকৃত হইতেছে যে, বাংলা হরফ বর্তমান যুগের চাহিদা মিটাইতে পারিতেছেনা; অন্য কথায়ঃ এ হরফের বহু দোষ-ত্রুটি আছে। বাংলা হরফ পরিবর্তন করা যদি সাব্যস্তই হয়, তখন অমরা অপর কোন্ হরফ গ্রহণ করিব—রোমান, না অন্য কোন—সে প্রশ্ন পরে বিবেচ্য।

বাংলা হরফের গুণও আছে, দোষও আছে, সন্দেহ নাই। এ হরফ বর্জন করিতে গেলে, আমাদের অনেক নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। অবশ্য জাতির বৃহত্তর কল্যাণ ও প্রয়োজনের তাকিদে যদি আমাদের হরফ পরিবর্তন অনিবার্য হইয়াই উঠে, তখন সব বাধাবিঘ্ন স্বীকার করিয়াই আমাদের পথে বাহির হইতে হইবে। পাকিস্তান নূতন রাষ্ট্র। এখন তার ভাঙ্গা-গড়ার যুগ। এ সময় কোন একটা বিশেষ বিলাস বা অনুভূতির দ্বারা চালিত হওয়া আমাদের উচিত নয়।

একথা অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রয়োজন যতই থাকুক না কেন, বাংলা হরফ বর্জন করিলে বাংলা ভাষারও রূপান্তর ঘটিবে। প্রত্যেক ভাষার মেজাজ বা প্রকৃতি অনুসারেই তার বর্ণমালা সৃষ্ট হইয়াছে। ভাবের সঙ্গে শব্দের মিল থাকে। শব্দের রূপটি দেখিলেই তার অন্তর্নিহিত ভাবটি আপনিই আমাদের মনে জাগে। 'স্ত্রী' কথাটি আমরা যেমন সংযুক্তভাবে দ্রুত উচ্চারণ করি, লিখিবার বেলাও ঠিক তেমনি লিখি। অন্য কোন প্রকারে লিখিতে গেলেই 'স্ত্রী'র আসল রূপটি নষ্ট হইয়া যায়। কেহ যদি 'স্ত্রী'কে 'Stri'

www.pathagar.com

লেখেন অথবা সহজ বানানে 'সৃতীরী' লেখেন, তবে তিনি নির্ঘাৎ তাঁর স্ত্রীকে হারাইবেন! লিখন-ভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ-ভঙ্গিও নষ্ট হইবে। কার্য, কারণ, মন, সকল, সকাল, সাঁঝ—এই শব্দ গুলিকে দি রোমান হরফে লেখা হয়, তবে শব্দগুলির চেহারা এইরূপ হইবে ঃ Karya, Karan, Man, Sakal,Sanjh. কোন্‌টির উচ্চারণ যে কী হইবে বলা তখন কঠিন হইবে। অনুলিখন (Transliteration) সর্বত্র ঠিক হইবে না। ফলে ভাবে ও ভাষায় অরাজকতা দেখা দিবে।

লিপি -পরিবর্তনের বড় সমস্যা হইল ঃ অতীত সাহিত্য-সঞ্চয়ের সহিত বর্তমানের সংযোগ সংরক্ষণ। আমরা যদি এখন রোমান হরফে বা অন্য যে-কোন হরফে বাংলা লিখি, তবে এতদিনকার পুঞ্জীভূত সাহিত্য-সম্পদের কী দশা ঘটিবে? সেগুলির সহিত আমরা যোগ রাখিব কি করিয়া? সাহিত্য দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গেলে দুই কূল বজায় রাখা আমাদের দায় হইয়া উঠিবে। বাংলা ভাষাকে হালকা করিতে গিয়া বরং আমরা তাহার বোঝাকে দ্বিগুণ করিয়া তুলিব। প্রাচীন বর্ণমালাও থাকিবে, সঙ্গে সঙ্গে নূতনটাও শিখিতে হইবে। এক ভাষায় তখন দুই লিপি হইবে। যদি বলেন, তখন পুরাতন সব-কিছুকেই নূতন ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইবে, অর্থাৎ সমস্ত পুথি-পত্রকেই রোমান হলফে পুনরায় ঝাপিয়া লইতে হইবে, তবে সে প্রলাপোক্তির মতই মনে হইবে। এত বড় অসম্ভবকে সম্ভব করা সম্ভব হইবে না।

কিন্তু এরূপ ঘটনা যে জগতের ইতিহাসে ঘটে নাই, তাহাও ত নহে। বহু ভাষাই উহার লিপি পরিবর্ত্তন করিয়াছে। ফার্সি ভাষার কথাই ধরুন। আরবদের সংস্পর্শে আসিয়া পেহ্‌লবী ভাষা ইহার লিপি হারাইল। পেহ্‌লবী লিপিকে বর্জন করিয়া যখন আরবী লিপি গ্রহণ করা হইল তখন প্রথম প্রথম নিশ্চয়ই কিছু অসুবিধা ঘটিয়াছিল; কিন্তু কালে কালে সে অসুবিধা দূর হইয়া গেল। সেইরূপ অন্যান্য ভাষারও লিপি পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পশতু, সিন্ধী ইত্যাদি অনেক ভাষাই আরবী লিপিতে লেখা হয়। এমন কি আমাদের বাংলা ভাষাও মুসলমানেরা আরবী হরফে লেখার প্রচেষ্টা করিয়াছিল। এ যাবৎ প্রায় ৪০ খানা আরবী হরফে লেখা বাংলা পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। কাজেই ব্যাপারটা শুনিতে যেরূপ উদ্ভট লাগে, কার্যতঃ তত নয়। আধুনিক যুগে কামাল আতাতুর্ক তুর্কীহরফ বর্জন করিয়া রোমান হরফের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, এ কথা সকলেই জানেন। সুতরাং প্রয়োজনের তাকিদে লিপি-পরিবর্তন খুব একটা অসম্ভব বা অস্বভাবিক ব্যাপার নয়।

এইবার বাংলা লিপির দোষের কথা বলা যাউক। কদর্যতায় (cumbrousness) বাংলা লিপি চীনা লিপির নীচেই। এ-লিপিতে হরফ বাদেও প্রায় ৪০০টি ফলা এবং কার-চিহ্নের প্রয়োজন হয়। যে কোন ছাপাখানায় গিয়া 'বাংলা-কেস্' দেখিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। চারিখানা কেস্ না হইলে বাংলা কম্পোজ চলে না। ইংরেজী বা আরবী কম্পোজ দুইখানা কেসেই চলে। বাংলা টাইপরাইটারও এই কারণে সহজসাধ্য নয়। এই লিপির দ্রুত গতিশীলতাও নাই। এ লিপির লেখনে সময়ও যেমন বেশি লাগে, স্থান (space)-ও তেমনি বেশি লাগে। অনেকে মনে করেন, ধ্বনিতত্ত্বের দিক দিয়া (phonetically) বাংলালিপি অন্য সব লিপি অপেক্ষা উন্নত। কিন্তু এ ধারণাও নির্ভুল নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা যেরূপ লিখি, সেইরূপ উচ্চারণ করি বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। বাংলা ভাষার ব্যাকরণে বলা হয় ঃ প্রত্যেক

www.pathagar.com

ব্যঞ্জন বর্ণটি অকারান্ত। কিন্তু কার্যতঃ আমরা সবসময় সেরূপ উচ্চারণ করি কি? পথ, জল, হাত, আকাশ প্রত্যেকটি শব্দের উচ্চারণ পথ্, জল্, হাত্, আকাশ্-এইরূপ হসন্ত-যুক্ত।

কাজেই বাংলা হরফ বর্জন করিয়া যাহারা রোমান হরফ গ্রহণ করিতে চান, তাহারা উত্তপ্ত তেলের কড়াই হইতে আগুনে ঝাঁপ দিবেন। রোমান বাংলা লিখিতে গেলে নানা বিভ্রাট আসিয়া দেখা দিবে। কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখুন ঃ কর, ধর, মন, ধন, জন, অত্যন্ত, এই শব্দগুলি রোমান হরফে লিখিলে এইরূপ দাঁড়াইবে ঃ

বাংলা		রোমান হরফে অনুলিখন		বিকল্প গঠন
কর	=	Kara	=	করা, কারা
ধর	=	Dhara	=	ধরা, ধারা
মন	=	Mana	=	মণ, মান, মানা
ধন	=	Dhan	=	ধান
জন	=	Jana	=	জানা
অত্যন্ত	=	Atyanta	=	অতিয়ান্ত অত্যন্ত, অত্যান্তা

সেইরূপ 'কর'কে Koro বা Karo দিয়া লিখলেও একই ফল ফলিবে। বস্তুতঃ লেখন পঠন এবং বচন—তিনটিই তখন কঠিন হইয়া পড়িবে। তখন বাংলা হরফে বাংলা শব্দের রূপ না জানা পর্যন্ত রোমান-বাংলা পড়া যাইবে না। ফলে যে বাংলা হরফকে বর্জন করিবার জন্য এত চেষ্টা, সেই বাংলা হরফ থাকিয়াই যাইবে, মাঝখান হইতে রোমান হরফ আসিয়া আমাদের ঘাড়ে চাপিবে।

রোমান হরফ গৃহীত হইলে এত কালের সঞ্চিত বাংলা পুথিপুস্তকের কী দশা হইবে, কাব্য-কবিতার রূপ ও গঠন কেমন হইবে, সে কথাও আমাদের ভাবিতে হইবে। হয়ত নূতন নূতন চিহ্ন আমদানি করিয়া বিপদটা কিছু লাঘব করিবার চেষ্টা করা হইবে; কিন্তু তাতেও ত জটিলতা বাড়িবে ছাড়া কমিবে না। যাহারা 'শহজ বাংলা' প্রবর্তন করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে এই সব কারণেই ব্যর্থ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। কাজেই ব্যাপারটা যত সহজ মনে করা হয়, কার্যতঃ তত সহজ নয়।

'কর' লিখিলে কেহ 'কর্' পড়িবে, কেহ 'করো'ও পড়িতে পারেন কেহ বা আবার 'কর' (হস্ত)-ও পড়িতে পারেন। অনেক সময় আমরা অক্ষর ব্যবহার করি একরূপ, কিন্তু উচ্চারণ করি অন্যরূপ। যেমন ঃ 'লক্ষ্মণ', 'স্মরণ', 'সূক্ষ্ম, 'স্মৃতি', 'আত্মা' ধ্বনি, স্বরূপ, কার্য্য, ব্যস্ত, দুঃখ, সত্বর, ত্বরিতৎ, রক্ষা ইত্যাদি। উপরোক্ত দৃষ্টান্ত গুলির মধ্যে স্মৃতি, আত্মা ইত্যাদিতে ম-ফলার উচ্চারণ নাই। আত্মাকে কেহ আমরা 'আতমা' বলিনা। 'সম্যক' বানানে য-ফলা রহিয়াছে, কিন্তু উচ্চারণে 'ম'টি ডবল হইয়া যাইতেছে। য-ফলার এখানে কোন কাজই নাই। 'সত্বর' কথাটিতে ব-ফলা রহিয়াছে, কিন্তু উচ্চারণের বেলায় ব-এর কোন উচ্চারণই নাই, অথচ 'ত'টি ডবল হইয়া যাইতেছে। সেইরূপ 'সাম্য' কথাটির মধ্যে য-ফলার কোন উচ্চারন নাই, অথচ অকারণে ম-টি দ্বিত্ব হইয়া যাইতেছে। ি (ই), ী (ঈ), ু (উ), এবং ূ (ঊ) এর মধ্যে কোন তারতম্যই নাই। জ-য, ন-ণ,স-শ-ষ- ইহাদের মধ্যেও কোন পার্থক্য নাই। আমরা লিখি 'এক', কিন্তু বলি 'অ্যাক'। সেইরূপ এত, এমন, এখন ইত্যাদি। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—যাহাতে বুঝা

www.pathagar.com

যাইবে যে, ধ্বনিতত্ত্বের (phonetics) দিক দিয়া বাংলা হরফ সর্বত্র বিজ্ঞানসম্মত নয়।

রোমান হরফেও এদোষ পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। একই অক্ষর অবস্থা বিশেষে বিভিন্ন রূপে উচ্চারিত হয়। B-U-T 'বাট' কিন্তু P-U-T 'পুট', M-E-N 'মেন' কিন্তু H-E-R 'হার' D-A-Y 'ডে' কিন্তু M-A-N 'ম্যান'। P-I-N পিন্, কিন্তু P-I-N-E পাইন। 'My 'মাই' কিন্তু Mystery মিস্ট্রী। Psalm, Carmichael, Lieutenant, Colonel, Wednesday,-ইত্যাদি বহু দৃষ্টান্তই দেওয়া যায়-যেখানে হরফের সঙ্গে উচ্চারণের কোন সামঞ্জস্যই নাই।

একটা সুবিধা এই হইতে যে বাংলা বা উর্দুতে রোমান হরফ ব্যবহার করিলে আধুনিক জগতের অন্যান্য আন্তর্জাতিক বর্ণমালার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লওয়া যাইত। একই লিপি দ্বারা ইংরেজী, উর্দু ও বাংলা শেখা সম্ভব হইত। ইহাতে শক্তি ও সময় অনেকখানি রক্ষা পাইত। পশ্চিম ও পূর্ব-পাকিস্তানের লোকেরা একই লিপিজ্ঞান দ্বারা বাংলা, উর্দু ও অন্যান্য ভাষা শিখিতে পারিত।

কিন্তু এ সুবিধাও অনেকটা কাল্পনিক। কার্যতঃ অনেক বাধা আসিয়া দেখা দিবে। ফলে ভাষার উভয় রূপই চালু রাখিতে হইবে এবং কোনটাই সুষ্ঠুভাবে লেখা হইবেনা। রোমান হরফে লিখিলে কোন্ শব্দটি কোন্ ধাতু হইতে কিরূপে রূপান্তরিত হইল, কিছুই বুঝা যাইবে না। উর্দুর সঙ্গে ফার্সি ও আরবীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যে সম্বন্ধ একদম নষ্ট হইয়া যাইবে। যে রসধারা ও প্রেরণা (Inspiration) আরবী, ফারসী, ও উর্দুর মধ্যে ফল্গুধারার মত গোপনে প্রবাহিত হইতেছে, সে ধারা ব্যাহত হইবে। ফলে লাভ অপেক্ষা আমাদের লোকসানই হইবে বেশি। আরবীর সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় উর্দুর একটা স্বকীয় মহিমা আছে। উর্দুকে রোমান হরফে লিখিলেই সেই মর্যাদা ও মহিমা নষ্ট হইবে। ইসলামী ভাষাগোষ্ঠির মধ্যে সে বিচ্ছিন্ন হইয়া দিন কাটাইবে। উর্দু আজ সমগ্র জগতের Lingua Franka (সাধারণ ভাষা) হইবার দাবী রাখে। শুধু পাক-ভারতে নয়; সিংগাপুর, মালয়, সিংহল, জাভা, বোর্নিও, টোকিও, বার্লিন, রাশিয়া, মিসর, আমেরিকা, সর্বত্রই উর্দু ভাষা প্রসার লাভ করিতেছে। কাল্পনিক একটা সুবিধার জন্য আমরা কেন এতবড় একটা শক্তি ও সম্ভাবনাপূর্ণ ভাষাকে নষ্ট করিব? ইসলামী-জগতের সঙ্গেই বা কেন আমরা বিচ্ছিন্ন হইব?

আরবী হরফ

এই সব কারণে আমি বাংলা হরফ বর্জন করিবার পক্ষপাতী নই। বাংলা হরফ যদি আমাদিগকে বর্জন করিতেই হয়, তবে রোমান হরফে না গিয়া বরং আরবী হরফেই আমাদের ফিরিয়া যাওয়া উচিত। আরবী হরফেও অসুবিধা আছে, তবে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যইতে পারে। ঃ-

১। আজ আমরা এক নূতন বৈজ্ঞানিক যুগের অধিবাসী। স্থান ও কাল (Space and Time)-এর হ্রাস এবং গতির (speed) বৃদ্ধি—ইহাই হইতেছে এ যুগের বৈশিষ্ট্য। আমাদের ভাষা ও হরফকেও এই যুগের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। সে হিসাবে আরবী ভাষাই অধিক কার্যকরী বলিয়া আমার বিশ্বাস। এ ভাষা 'Short hand'-এর মতই স্থান ও সময় কম লয় এবং দ্রুত গতিতে চলে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি ঃ-

www.pathagar.com

ধরুন 'বিস্‌মিল্লাহ্‌হির রাহ্‌মানির রাহীম'—এই কথাটি লিখিতে হইবে। একজন লিখিবে আরবীতে, একজন লিখিবে বাংলায়, একজন লিখিবে ইংরাজীতে। ঘড়ি ধরিয়া তিন জনকে যদি একই সময়ে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে লিখিতে বলা হয়, তবে দেখিবেন আরবী হরফের লেখাটি ৩/৪ সেকেণ্ডে শেষ হইবে, বাংলা হরফের লেখাটিতে ৮/৯ সেকেন্ড লাগিবে এবং ইংরাজী হরফের লেখাটিও ৭/৮ সেকেন্ড লইবে। নিজেরাই ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

২। আরবী লিপির সহিত বর্তমান Shorthand writing-এর নিকট সম্বন্ধ আছে। লিখিবার সময় ৩/৪টি হরফ একটানে জড়াইয়া লেখা যায়, কাজেই–স্থান এবং সময় ইহাতে কম লাগে; সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত গতিও পাওয়া যায়। এতগুলি সুবিধা অন্য লিপিতে নাই। এই নভোবিজ্ঞানের যুগে ইংগিতমুখর ভাষা ও লিপির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। শর্টহ্যান্ড লিপির একটি নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল। ইহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন আরবী হরফের সহিত ইহার কত নিকট-সম্বন্ধ ঃ

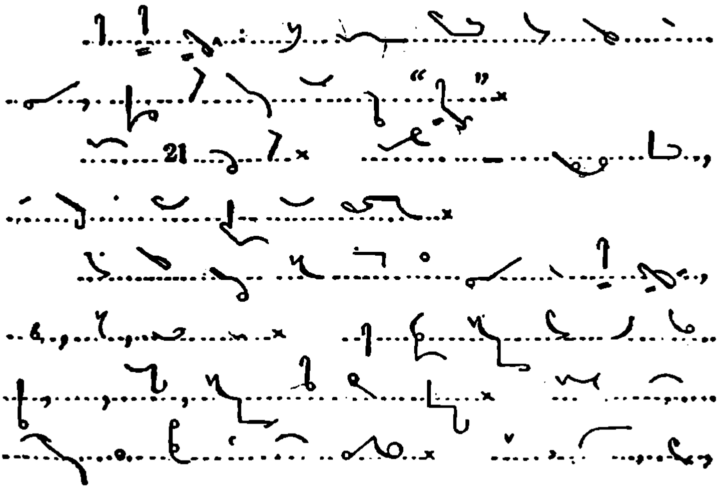

৩। সমগ্র ইসলামী জগতে আরবীই হইতেছে আমাদের কেন্দ্রীয় জাতীয় ভাষা! এই ভাষাই আমাদের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য রাখিতেছে। কাজেই এর সঙ্গে আমাদের সংযোগ অপরিহার্য। পাকিস্তানের অন্য সবগুলি ভাষাই (পশতু, পাঞ্জাবী, সিন্ধি ইত্যাদি) আরবী হরফে লেখা হয়। একমাত্র বাংলা ভাষাই ইহার ব্যতিক্রম। বাংলা ভাষা মূলতঃ আর্যভাষা না হইলেও এর লিপি Indo-European বলিয়া ধরা হয়। কাজেই পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির দিক দিয়া রোমান হরফ অপেক্ষা আরবী হরফই আমাদের অধিকতর উপযোগী।

৪। আরবী লিপির ইতিহাস, অত্যন্ত গৌরবজনক। আরবীই হইতেছে "উম্মুল্ আল্-সিনা" অর্থাৎ সকল ভাষার জননী। আরবী বর্ণমালাকে বলা হয় ঃ 'Mother Alphabet of the World" অর্থাৎ সমস্ত বর্ণমালার জননী। আজও সমগ্র জগতে আরবী একটা বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত ভাষা। জগতে বহু প্রাচীন জাতি এবং বহু প্রাচীন ভাষা ছিল। কিন্তু আজ তাহাদের একটিরও অস্তিত্ব নাই। অথচ আরবী জবান এখন পর্যন্ত পূর্ববত জীবন্ত রহিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Hitti (হিট্টি) তাই কী সুন্দরই না বলিয়াছেন ("The Babylonians, the Chaldaeans, the Hitties, the Phoenicians

www.pathagar.com

were, but are no more. The Arabs and the Arabic-speaking people were and remain."

অর্থাৎ ব্যাবিলেনিয়ান, চালদিয়ান, ফিনিসিয়ান ইত্যাদি বহু জাতি ছিল, কিন্তু এখন নাই। আরব এবং আরবী ভাষাভাষী লোকেরা ছিল এবং এখনও আছে।

ইসলাম আজ নবরূপে জাগিয়া উঠিতেছে। আরব-জাহান (Arab World)-এর দিকে আজ সারা পৃথিবী উৎসুক নয়নে চাহিয়া আছে। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সংগ্রামের কথা ভাবিয়া এবং আমরা কোন পক্ষে যোগ দিব এবং কাহাদের সঙ্গে আমাদের সংযোগ কল্যাণকর হইবে, সেই কথা ভাবিয়া আমরা যেন হরফ পরিবর্তন করি।

ঢাকা

১৯৬০

ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথ

পাক-ভারত উপমহাদেশে যে দুইজন কবি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথ! এঁদের প্রত্যেকেই বহু বিচিত্র দান রয়েছে। এঁদের প্রতিভা সৃষ্টিধর্মী ও বহুমুখীন। এঁদের কাব্য ও চিন্তাধারার সকল বৈশিষ্ট্য এক প্রবন্ধে ফুটিয়ে তোলা কঠিন। এক একটা বিশেষ দিক দিয়ে এক একবার আলোচনা করা যেতে পারে।

বর্তমান প্রবন্ধে আমি এই দুই কবির দার্শনিকতা নিয়ে আলোচনা করব। জীবন ও জগতকে এঁরা কী চোখে দেখেছেন, মানব জাতিকে এঁরা কী বাণী দান করেছেন, মানব-জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও পরিণতি সম্বন্ধে এঁদের কার কী মত—সেই সম্বন্ধেই কিছু বলব।

প্রথমেই ইকবাল সম্বন্ধে কিছু বলা যাক।

ইকবাল

ইকবাল দার্শনিক কবি। কিন্তু অনেকের কাছেই এটা তাঁর গুণের কথা নয়,—দোষের! দার্শনিক হওয়াতেই নাকি কবি ইকবাল খাটো হয়ে গেছেন। তাঁরা বলেন ঃ তত্ত্বকথাই কাব্য নয়। দর্শন এক, কাব্য এক। অন্য কথায় ঃ তাঁরা বলতে চান, রূপ রস ও আনন্দ দিয়েই কাব্যের বিচার, দার্শনিকতা দিয়ে নয়।

কথাটি আংশিক সত্য হলেও পূর্ণ সত্য নয়। দার্শনিকতা ফলালেই যে কাব্য হ'ল—এমন কোন কথা নেই। কিন্তু সত্যিকার কাব্য হ'তে হলে তাতে কিন্তু দার্শনিকতা থাকা চাই-ই। যে কবির কাব্যে কোন দর্শন নেই, সে-কবি ভাব কবি (good poet) হতে পারে, কিন্তু বড় কবি বা মহাকবি (great poet) নয়। Coleridge বলেন ঃ "No man was ever yet a great poet without being at the same time a profound philosopher." (অর্থাৎ, ঃ বড় দার্শনিক ছাড়া কেউ কখনও বড় কবি হয়নি। Browning বলেন ঃ "Philosophy first and poetry, which is its outcome, afterwards." (অর্থাৎ ঃ দর্শন আগে, তারপর তার ফলস্বরূপ আসবে কাব্য।) বিশিষ্ট কাব্যসমালোচক Landor বলেন ঃ

"We may write little things well and accumulate one upon another, but never will any be justly called a great poet, unless he has treated a great subject worthily. He may be the poet of

www.pathagar.com

the lover and the idler, he may be the poet of green fields and gay society; but whoever is this can be no more."

(অর্থাৎ ঃ আমরা ছোটখাটো জিনিস খুব ভাল করে লিখতে পারি, কিন্তু কোন গুরুতর বিষয় দক্ষতার সঙ্গে লিখতে না পারলে কেউ কখনো বড় কবি হতে পারে না। সে অলস প্রেমের কবিতা লিখতে পারে, সবুজ মাঠের বর্ণনা দিতে পারে, কিন্তু যে-কবি শুধু এইসব নিয়েই মগ্ন থাকে, যে এর চেয়ে আর বড় কিছু হতে পারে না।)

কাজেই দেখা যাচ্ছে, কবি হ'লে যে আর দার্শনিক হতে নেই, একথা ভুল। জগতের সমস্ত বড় কবিরা কোন না কোন একটা দার্শনিক মতবাদ প্রচার করে গেছেন; তাতেই তাঁদের কাব্য বেঁচে রয়েছে। দ্যান্তে, মিলটন, গ্যেটে, শেলী, বায়রণ, শেকস্‌পিয়ার, ওয়ার্ডসয়ার্থ, হাফিজ, রুমী, ওমর খৈয়াম–প্রত্যেকের কাব্যের পশ্চাদ্ভূমিতেই রয়েছে কোননা কোন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি; তাতেই তাঁদের কাব্য কালোত্তীর্ণ হয়েছে। কাজেই দার্শনিকতা কবিদের একটা প্রধান গুণ। আশ্চর্যের বিষয়, ইকবালের যেটা গুণ, সমালোচকেরা সেটাকেই তাঁর দোষ বলে প্রচার করছেন।

তা হলে ইকবাল-কাব্য পড়তে হলে তাঁর দর্শন সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানতেই হয়।

ইকবালের দর্শন

ইকবালের আবির্ভাবকালে দার্শনিক বিভ্রান্তিতে বসন্ত জগৎ আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। জগতে তিনটি প্রধান কালচারের ধারা ধরে বয়ে চলেছে ঃ (১) গ্রীক বা হেলেনিক কালচার, (২) সেমিটিক কালচার, (৩)[২] আর্য কালচার। ইউরোপ প্রধানতঃ গ্রীক কালচার দ্বারাই প্রভাবান্বিত। গ্রীক কালচারের মূলে রয়েছে প্লেটো ও এরিস্টটলের চিন্তাধারা। দর্শন, বিজ্ঞান, শিক্ষা, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রীক পণ্ডিতমণ্ডলীই সর্বপ্রথম বিধিবদ্ধ ভাবে চিন্তা করেন। এই জগৎ কে সৃষ্টি করল, কোথা হ'তে এল, কোথায়ই বা এর শেষ পরিণতি—ইত্যাদি সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে প্লেটো বলেন ঃ এই পরিদৃশ্যমান জগতের সব কিছুই অলীক (illusion); কোন কিছুরই সত্যিকার অস্তিত্ব নেই; মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বস্তুজগতের সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে; থাকবে শুধু নির্গুণ পরম সত্তা (Idea বা Absolute Idea.) বস্তুজগৎ সেই পরম সত্তারই লীলা বা মায়া; কাজেই অসার ও অনিত্য। মানুষের আত্মাও সেই পরমাত্মারই বাহ্য প্রকাশ; কাজেই যে পথ দিয়ে সে এসেছে, সেই পথ দিয়েই সে ফিরে যাবে তার উৎস-মূলে। মানুষের যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্ব আছে, মৃত্যুকে অতিক্রম করে সে যে অনন্ত জীবনের বেঁচে থাকবে, এসব কথা প্লেটো বলেননি। এক বিরাট মহামৃত্যুই যে এই সুন্দর ধরণীর পরিসমাপ্তি ঘটাবে, এই নিরাশার বাণীই তিনি জগতকে দিয়ে গেছেন।

ইকবাল নিজেই প্লেটোর দর্শন সম্বন্ধে বলছেন ঃ

"পরম ঋষি পুরুষ প্লেটো
তিনি ছিলেন প্রাচীন যুগের একটা মেষ'
অদৃষ্টের জন্য তিনি এতই পাগল ছিলেন যে,

২. আর্য-কালচারের স্বরূপ নির্ণয় করা কঠিন। 'আর্যাথীরী' প্রবন্ধ দেখুন– লেখক

www.pathagar.com

তাঁর চক্ষু, কর্ণ, হস্ত-পদকে কোন কাজেই লাগান নি।
তিনি বলে গেছেন ঃ মৃত্যুই জীবনের সার কথা!
নিভে যাওয়ার মধ্যেই বাতির গৌরব!...
মানুষের বেশে তিনি একজন মস্তবড় ভেড়া!
জীবনকে বরবাদ করাই তার জীবনের কাজ।
ক্ষতিই হল তার কাছে মহালাভ।
মৃত্যুই হল তার কাছে জীবন।

(আসরার-ই-খুদী)

গ্রীক দার্শনিকদের এই ভাবধারা ইউরোপকেও যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছে। পরবর্তী দার্শনিকেরা এই একই সুরের প্রতিধ্বনি করেছেন। বর্তমান যুগেও এ প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। ফিশার ঠিকই বলেছেন ঃ "We Europeans are children of Hellas." (অর্থাৎ আমরা গ্রীকেরই সন্তান প্লেটো ও এরিষ্টটলের পরে যত দার্শনিকই ইউরোপে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের সকলেই জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে প্রায় একই কথা বলে এসেছেন। ডেকার্ট, লেবনিজ, বার্কলে, ক্যান্ট, হেগেল, সবাই সেই মূল ধারণাকেই পরিপুষ্ট করেছেন মাত্র।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে জার্মান দার্শনিক নীট্শে এবং ফরাসী দার্শনিক বার্গোস কিছুটা নূতন কথা বললেন। নীট্শে বললেনঃ "মানুষ মৃত্যুর সঙ্গেই বিলীন হয়ে যাবে না; বারে বারে সে এখানে ফিরে আসবে ('eternal recurrence), এবং সাধারণ মানুষ রূপে না এসে অতিমানুষ বা "Superman" রূপে আসার সাধনা করাই হবে আমাদের কর্তব্য। নীটশে তাই সাধারণ মানুষকে ঘৃণার চোখেই দেখতেন। খৃষ্টান ধর্মের অনেক বিশ্বাস ও নীতিকে তিনি উড়িয়ে দিলেন ; সত্য-মিথ্যা ন্যায়-অন্যায় ও পাপ-পুণ্যের প্রচলিত ধারণাকেও তিনি প্রচণ্ড আঘাত করলেন। ঈশ্বর (God) বলে কেউ নেই, এই মানুষই সাধনার দ্বারা superman বা নব-ঈশরূপে জন্মলাভ করবে—ইত্যাদি অনেক নূতন ধরনের কথা তিনি বললেন। কিন্তু নীট্শের এই মতবাদ ইউরোপ গ্রহণ করলো না ঃ গ্রীক দার্শনিকদের অদ্বৈত-মায়াবাদই (pantheistic Idealism) ইউরোপের মন ও মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখল।

ভারতীয় দর্শনেও একই মতবাদ অভিব্যক্ত হ'ল। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের এবং জগতের সম্বন্ধ কি, তা নির্ণয় করতে গিয়ে ভারতীয় দর্শন একই মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ প্রচার করল। ভারতীয় ষড়দর্শনের প্রায় সবগুলিই নিরীশ্বরবাদের উদগাতা। সংখ্যা, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক–কোন দর্শনেই ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হয় নাই; একমাত্র উপনিষদ বা বেদান্ত-দর্শনই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছে। কিন্তু তাও গ্রীক দর্শনের অনুরূপ। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অর্থাৎ এক ছাড়া দুই নাই–এই হল বেদান্ত মত। এর নামই অদ্বৈতবাদ। এই অদ্বৈতবাদ কিন্তু তৌহীদবাদ নয়। 'এক ছাড়া দুই নাই'–এর অর্থ এ নয় যে, এক আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় (আল্লাহ্) নাই। এর অর্থ হল ঃ আল্লাহ্ ছাড়া আর কিছুই নাই। অন্য কথায় ঃ আল্লাহ্ ছাড়া দ্বিতীয় বস্তুর কোন অস্তিত্বই নাই। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পশু-পক্ষী, তৃণলতা,পাহাড়-পর্বত–সবই সেই একের প্রকাশ, অথবা সেই একেরই অংশ; অর্থাৎ কিনা স্রষ্টা ও সৃষ্টি, অভিন্ন; কোন পার্থক্য নেই তাদের মধ্যে। 'জীবনই শিব', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (এই আত্মাই ব্রহ্ম), 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমিই ব্রহ্ম), ' সোহহং' (সে-ই

www.pathagar.com

আমি)–এই হল বেদান্ত দর্শনের সারকথা। বলা বাহুল্য, এই মতবাদের ভিত্তিভূমি হল উপনিষদ বা বেদান্ত। বেদান্ত উপনিষদেরই শেষাংশ।

বৌদ্ধদিগের 'নির্বাণও একই প্রেরণা থেকে উৎসাহিত বৌদ্ধেরা ছিল জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী; তারা তাই মনে করত কর্মফলেই বারে বারে তাদের জন্মগ্রহণ করতে হয়। জন্ম এক অভিশাপ বিশেষ। জন্ম থেকে মুক্তি পেতে হ'লে তার একমাত্র পথ হচ্ছে ঃ কোনরূপ কর্মে জড়িত না হয়ে চুপচাপ জীবনটাকে কাটিয়ে দেওয়া। বৌদ্ধরা তাই ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দ্বারে দ্বারে নির্বাক আবেদন জানিয়ে জীবন ধারণ করত, জীবন-সংগ্রাম থেকে এইরূপে দূরে সরে গিয়ে 'নির্বাণে'র জন্য প্রস্তুত হ'ত! এখানেও একই জীবন-বিমুখিতা ক্রিয়া করছে। মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্ব এখানেও অস্বীকৃত হয়েছে।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে ঃ হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনেও জীব জগৎ এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে প্লেটোর অনুরূপ কথাই বলা হয়েছে। মানবাত্মার চিরমৃত্যুর বাণীই তাঁরা ঘোষণা করে গেছেন। জীবন থেকে কি করে মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করা যায়,–এই ছিল তাদের প্রধান চিন্তা। এর ফলে মানুষ নিষ্ক্রিয় উদাসীন ও সন্ন্যাসী সেজেছে, জীবন-সংগ্রামে তারা নামেনি, জীবনকে পূর্ণরূপে কেউ উপভোগ করেনি। জীবনের এই অস্বীকৃতি (negation of life) জগতের প্রগতির পথে তাই দারুণ বাধার সৃষ্টি করেছে। মানবতার এ এক অভিশাপের যুগ।

এই অভিশাপ থেকে মুক্তি দিল ইসলাম। মহানবী মুহাম্মদ আনলেন আল্লার পাক-কালাম; শুনালেন জগদ্বাসীকে; আল্লাহ ত সত্য বটেই, এ জগতও মিথ্যা নয়। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাবেনা বা আল্লাতে লয়প্রাপ্তিও মানুষের শেষ পরিণতি নয়। মৃত্যুর পরেও মানুষ অনন্ত জীবনে বেঁচে থাকবে; তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আছে, নিজস্ব স্বাধীন সত্ত্বা আছে। এই জগৎ 'মায়া' বা 'মরীচিকা' নয়; জগতও সত্য, তবে পূর্ণ সত্য নয়; ইহজগতের সঙ্গে পরজগৎ মিলালে তবেই পূর্ণসত্য পাওয়া যাবে। এ জগৎ কর্মক্ষেত্র ; বীরের মত এখানে সব বাধাবিঘ্ন জয় করে আপন লক্ষ্যের পানে অগ্রসর হ'তে হবে; এই জীবনের সুকর্ম বিফলে যাবে না; এর ফল পরকালে আমরা পাব। ইসলাম তাই ইহকাল ও পরকাল—উভয় জগতের সত্যতার কথা ঘোষণা করেছে; দুই-জগতের সম্পদই ভোগ করবার তাকিদ সে দিচ্ছে। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্, মানুষ ও জগতের এই পারস্পরিক সম্বন্ধ চিন্তা-জগতে নিয়ে এল এক দারুণ বিপ্লব। মানুষ মৃত্যু থেকে জীবন ও জগতের দিকে ফিরে তাকালো; জীবনের প্রতি অনুরাগ এল, বেঁচে থাকার আগ্রহ এল, জীবন-যুদ্ধে বীরের মত অগ্রসর হবার প্রবৃত্তি এল।

ইসলাম তাই আনল এক নূতন জীবন-দর্শন!

কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, রসুলুল্লাহ ইন্তিকালের ৩/৪ শতাব্দীর মধ্যেই মুসলমানদের জীবনেও বিভ্রান্তি দেখা দিল। অত্যাধিক গ্রীক দর্শন আলোচনার ফলে এবং পারশ্য ও ভারতের আর্য-দর্শনের সংঘাতে মুসলমানদের মধ্যেও একদল মরমপন্থীর আর্বির্ভাব হ'ল। 'জন্নুন মিছরী' 'বায়োজিদ বুস্তামী' ও অন্যান্য সাধকেরা শীঘ্রই একটা নূতন মতবাদ খাড়া করলেন। তার নাম দিলেন সূফীবাদ। সূফীবাদ মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদেরই অনুরূপ। এ জগৎ মিথ্যা, জীবন মিথ্যা, একমাত্র আল্লাই সত্য; দুনিয়াদারী বর্জন করে আল্লার সঙ্গে মিশে যাওয়াই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য–সূফীরাও এই সব কথা বললেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে স্পেন দেশীয় ইবনে আরাবী এই সূফীবাদকে একটা বিশিষ্ট দার্শনিক রূপ দান করলেন। এর নাম হ'ল 'ওয়াহাদাতুল-অজুদ্' (Sufistic Pantherism.) প্লেটোর মায়াবাদ অপেক্ষা ভারতীয় অদ্বৈতবাদের সঙ্গেই সূফীবাদের

www.pathagar.com

বেশী মিল দেখা গেল। প্লেটোর মায়াবাদ এবং বেদান্তের অদ্বৈতবাদের কিছুটা পার্থক্য আছে। নির্গুণ ব্রহ্মের একত্ব উভয় মতবাদেই স্বীকৃত; তবে দুজনের ব্যাখ্যা দু'রকম। জগতের অনিত্যতা এবং ব্রহ্মের নিত্যতা প্রমাণ করতে হলে দু'রকমে তা করা যায়। হয় জগতের সবকিছুই মায়া-মরীচিকা বলে উড়িয়া দিতে হয়; না হয়ত জগতেও ব্রহ্মময়—এই কথা বলতে হয়। বেদান্ত দর্শন শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন করে। জগতের সবকিছুই ব্রহ্মময়, অন্য কথায় সবকিছুই ঈশ্বরের অংশ, এই কথা ব'লে সে ব্রহ্মের একত্ব রক্ষা করেছে। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ নক্ষত্র, মানুষ-গরু, পশুপক্ষী, পাহাড়-পর্বত সবকিছুই সেই ব্রহ্মেরই খণ্ডরূপ, সমস্ত খণ্ডকে মিলিয়েই সেই পরম-এক—পরমব্রহ্ম। এই সর্বব্রহ্মবাদই অদ্বৈতবাদ (Unitysm)। নবম শতাব্দীর সমকালে শঙ্করাচার্য এই অদ্বৈতবাদকে একটা বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদ রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ইসলামী সুফীবাদ এই অদ্বৈতবাদেরই অনুরূপ। শঙ্করাচার্য বললেন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমিই ব্রহ্ম); মনসুর হাল্লাজও ঠিক তেমনি বললেন ঃ 'আনাল-হক্ব' (আমিই আল্লাহ্)। মোটকথা আল্লাতে লয়প্রাপ্তি বা আল্লাতে মিশে যাওয়াই হল সূফীবাদের সার কথা।

পারশ্যের অমর কবি হাফিজ তাঁর অপূর্ব কাব্য-মাধুর্যের মধ্য দিয়ে এই সুফী মতবাদকে আরও জনপ্রিয় করে তুললেন। অলস নিষ্ক্রিয় খোদাপ্রেমই হল সুফীদের প্রধান উপজীব্য।

বলা বাহুল্য, ইসলামে এখনও এই সুফী মতবাদ একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ আলফ্-সানি এসে ইবনে-আরাবীর এই মতবাদকে খণ্ডন করলেন এবং বললেন যে, আল্লার সঙ্গে একাত্মবোধ সাধনার চরম স্তর নয়! এর পরও আরও দুটি স্তর রয়েছে। শেষ স্তরে উঠলে দেখা যাবে ঃ স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক নয়। কিন্তু এ হল ধর্ম বা শরীয়তের দিক দিয়ে সংস্কার; দর্শনের দিক দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই প্যানথিজমকে খণ্ডন করার গৌরব সঞ্চিত হয়ে ছিল দার্শনিক-কবি ইকবালের জন্য।

ইকবাল যখন দর্শনের ছাত্র হয়ে ইউরোপে গেলেন, তখন মানবাত্মার এই গুরুলাঞ্ছনায় তিনি ব্যথিত হলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দর্শনের সঙ্গেই তিনি নিজকে নিবিড়ভাবে পরিচিত করলেন। তারপর ঘোষণা করলেন, শুধু যে সেই পরম সত্ত্বা (Absolute Idea)-ই সত্য আর জগৎ মিথ্যা, এ কথা মিথ্যা। এ জগতও সত্য। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোষণা করলেন আত্মার অবিনশ্বরতা ও অমরতা। ইকবালের এই দর্শনের নাম আত্মার দর্শন (egoism) বা খুদীবাদ। মানুষের আত্মা যে জলবিম্বের মত পরমাত্মায় মিলিয়ে যাবে না, তার যে ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য আছে, মৃত্যুর পরেও যে সে অনন্তকাল বেঁচে থাকবে—এই কথা ইকবাল উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ মানুষকে অসীম শক্তি ও অনন্ত সম্ভাবনা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন; সাধনা দ্বারা সেই শক্তি ও সম্ভাবনাকে পূর্ণ জাগরিত করে তুললে এই মানুষই আল্লার খলিফার গৌরবময় আসন লাভ করতে পারে। এই পূর্ণ মানুষকে ইকবাল Superman না বলে বললেন ঃ 'মরদ-ই-মুমিন' বা 'ইনসান-ই-কামিল'। ইকবালের দর্শন তাই বলিষ্ঠ জীবনের দর্শন। তাঁর "আসরার-ই-খুদী'তে তিনি এই নূতন দর্শনকে অভিনব কাব্যরূপ দিয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ 'খুদী' বা ব্যক্তিত্বের বিকাশই জীবনের সারকথা। ব্যক্তিত্বকে যে যতখানি বিকশিত বা শক্তিশালী করতে পেরেছে, সৃষ্টিতে সে ততখানি স্থিতিবান হয়েছে এবং তত পরিমাণে

www.pathagar.com

তার মূল্যমান বেড়েছে। এই ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যেও চলেছে। প্রতিটি পরমাণু শক্তির প্রার্থী। প্রত্যেকেই বলতে চায় 'আমি আছি।' ইকবাল তাই বলছেন;

"Only that truly exists which can say : 'I am.' It is the degree of the intuition of 'I-am-ness' that determines the place of a thing in the scale of being."

অর্থাৎ ঃ "সেই-ই সত্যিকারভাবে বেঁচে থাকে—যে বলতে পারে ঃ 'আমি আছি'। এই 'আমি আছি'—চেতনার কমবেশীতেই প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব পরিমিত হয়।"

পর্বত ও ধূলিকণার দৃষ্টান্ত দিয়ে ইকবাল এই সত্যকে সুন্দররূপে ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ

"পর্বত যখন ব্যক্তিত্বকে হারায়
তখন সে ধূলিতে পরিণত হয়;
এবং সাগর তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।
পৃথিবী আত্মশক্তিতে অধিষ্ঠিত,
কাজেই বন্দী চাঁদ চিরকাল তারি চারিপাশে ঘোরে।
পৃথিবীর চেয়ে সূর্য অধিকতর বলবান
তাই ত পৃথিবী সূর্যের দৃষ্টিতে সম্মোহিত!"

অন্যত্র ইকবাল কী সুন্দরই না বলেছেন ঃ

"একটা তরঙ্গ সমুদ্রের উপর দিয়ে বয়ে গেল
আর বলে গেল ঃ চললে আমি আছি,
না চললে আমি নেই!"

ইকবাল-দর্শন তাই আত্মশক্তির দর্শন; খুদীকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলবার দর্শন। তাঁর-মতে আত্মার মৃত্যু নাই। অনন্তের পথে তার জয়যাত্রা। আল্লার মধ্যে সে বিলীন হয়ে যাবেনা। পাপই করুক আর পুণ্যই করুক, মানবাত্মা অমর। যাঁরা পুণ্যবান তাঁরা ত বেহেশতে গিয়ে অনন্তকাল তথায় বাস করবেই, যারা পাপী, যারা দোজখী, তাদেরও তিনি নিশ্চিহ্ন করে পুড়িয়ে মারবেন না তারাও চিরকাল বেঁচে থাকবে। বেহশ্তীদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

"উলায়িকা আস্হাবুল জান্নাত ওয়াহুম ফিহা খালেদুন"
(বেহেশ্ত-বাসীরা তথায় চিরকাল বাস করবে।)

আবার দোজখ-বাসীদের সম্বন্ধেও তিনি বলেছেন ঃ-

"উলায়িকা আসহাবুন্-নার ওয়াহুম ফিহা খালেদুন"
(দোজখ-বাসীরা চিরদিন দোজখে বাস করবে।)

আত্মার এই অবিনশ্বরতা এবং তার পূর্ণবিকাশের কথাই ইকবাল -দর্শনের সারকথা। তিনি বলেন ঃ 'খুদী' (Self বা Ego)-ই হচ্ছে সৃষ্টির মূল। প্রত্যেক বস্তুরই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। মানুষ মরতে পারেনা। তার আত্মা অমর। আর সে আত্মা আল্লার দান।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, কোন অবস্থাতেই আল্লাহ মানুষের স্বাধীন সত্ত্বাকে নষ্ট করবেন না। মানবাত্মা আল্লার মধ্যে লয়প্রাপ্তও হবে না, বা ধ্বংসপ্রাপ্তও হবেনা, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে

www.pathagar.com

চিরদিন সে বেঁচে থাকবে এবং আধ্যাত্মিক জগতে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হবে। যারা দোজখী, তাদের আত্মার সংস্কার বা সংশোধন শেষ হলে তারাও পুণ্য-জীবনে ফিরে আসবে এবং পুণ্যবানদের মতই অমরতা লাভ করবে।

আল্লার ভিতরে লয়প্রাপ্তি (ফানা-ফিল্লাহ্) তাই ইসলামী জীবন-দর্শন নয়, আল্লার সান্নিধ্যে মানুষ চিরদিন বাস করবে (বাকা-বিল্লাহ্)—এই হল তার নিয়তি বস্তুতঃ মানুষের পরিণতি সম্বন্ধে ইসলাম সম্পূর্ণ এক নূতন বাণী দিয়েছে। আল্লাহ্ আমাদের স্রষ্টা বটে, কিন্তু একবার যেই তিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি আমাদের কাউকে মেরে ফেলতে চান না, যেমন করেই হোক সবাইকে বাঁচিয়ে রাখতে চান।

এই পরিস্থিতিতে মানব-জীবনের লক্ষ্য কী হওয়া উচিত? তার লক্ষ্য হওয়া উচিতঃ নিজের আত্মাকে তুচ্ছ মনে না করা এবং আপন খুদীকে শক্তিশালী করে আল্লার খেলাফৎ লাভ করা। আল্লাই হচ্ছেন সকল শক্তি, সকল জ্ঞান ও হিকমতের আধার; কাজেই তাঁর সঙ্গে যোগ রেখে তাঁর নির্দেশিত পথে চলে তাঁর কাছ থেকে আমাদের শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। খুদীর বিকাশ ও পরিপুষ্টি তাই আল্লার নৈকট্য ও অনুরাগ থেকেই আসবে; তাঁর থেকে দূরে থেকে নয়। যে-নদী মহাসমুদ্রের সঙ্গে যোগ রাখে, সে-ই বেগবতী হয়; যার সে সমুদ্র-সংযোগ নেই, সে শুকিয়ে যায়। এই নৈকট্য ও সংযোগ-সাধনের কথা একটি হাদিসে সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে ঃ 'তাখাল্লাকু বি-আখ্‌লাকিল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লার গুণাবলীর অনুসরণ কর। আল্লার গুণাবলীর অনুসরণের অর্থ এ নয় যে, আল্লার মধ্যে বিলীন হয়ে যাও; বরং তার উল্টো—আল্লাকেই নিজের মধ্যে শোষণ কর। অন্য কথায় ঃ আল্লার গুণে গুণান্বিত হও। ইকবাল তাই একস্থানে বলেছেন। "Instead of absorbing yourself unto God, absorb God into yourself" অর্থাৎ ঃ আল্লার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে না দিয়ে, নিজের মধ্যেই আল্লাকে শোষণ করে নাও। কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। একটি প্রবাদ রয়েছে যে, শিশু মুহাম্মদ যখন বিবি হালিমার তত্ত্বাবধানে ছিলেন, তখন একদিন তিনি হারিয়ে যান। বিবি হালিমা অধীর হয়ে নানা দিকে হযরতকে খুঁজতে থাকেন। তখন জিব্রাইল ফিরিশতা হালিমাকে দেখা দিয়ে বলেন ঃ "অধীর হয়োনা, মুহম্মদ জগতে হারিয়ে যাবে না। বরং জগতই তার মধ্যে একদিন হারিয়ে যাবে।"

এই সব উক্তির মধ্যে খুদীর স্বাতন্ত্র্য ও অপরিসীম শক্তির কথাই অভিব্যক্ত হয়েছে। আল্লার অনুগত থাকব, তাঁর সঙ্গে সংযোগ রাখব, তাঁর নির্দেশ মানব, কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্ব বা আমিত্বকে বিসর্জন দিব না। ইকবাল তাই বলেছেন ঃ

"নিজেকে ছেড়ে আল্লার কাছে ছুটে যাও
তাঁর কাছ থেকে শক্তি নিয়ে
আবার নিজের মধ্যে ফিরে এস
এবং 'লাৎ' ও 'ওজ্জার' মাথা ভাঙো"।

–(আসরার-ই-খুদী)

এখানে রসুলুল্লার মিরাজের প্রতি ইংগিত আছে। মিরাজ রাত্রে রসুলুল্লাহ্ আল্লার নৈকট্য লাভ করেও তাঁর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেননি। সেখান থেকে প্রচুর শক্তি নিয়ে তিনি আবার জগতে ফিরে এসেছিলেন এবং অধিকতর বিপুল বেগে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

www.pathagar.com

আমাদেরও ঠিক এই পথেই চলতে হবে। আল্লার সঙ্গে সহযোগিতাও করব, স্বাতন্ত্র্যও বজায় রাখব। এ স্বাতন্ত্র্য প্রেমে মধুর হবে, আনুগত্যে মহীয়ান হবে। সম্রাটের রাজপ্রতিনিধি হতে হলে তাঁর বিদ্রোহী হয়েও তা হওয়া যায় না, আবার আত্মশক্তিবর্জিত অপদার্থ 'কলের পুতুল' হয়েও তা হওয়া যায় না। শক্তিতে তাঁকে সম্রাটের কাছকাছিই থাকতে হয়, আবার সহযোগিতা ও আনুগত্যও তাঁকে রাখতে হয়। এই যে রাজ প্রতিনিধির মর্যাদা, এই মর্যাদাই বিশ্বসম্রাট আল্লাহ্ মানুষের জন্য সঞ্চিত করে রেখেছেন। ইকবাল তাই বলেছেন ঃ

'কতই মধুর এই নিখিল বিশ্বে

আল্লার খেলাফতি করা

আর যাবতীয় বস্তুর উপর প্রভুত্ব করা!'

ইকবালের দর্শন তাই মানবাত্মার জয়ঘোষণার দর্শন। উপেক্ষিত নিগৃহীত বন্দী আত্মার এ এক মহামুক্তির বাণী। এত বড় আশার বাণী আর কোন কবি এত সুন্দর ও বলিষ্ঠভাবে মানুষকে শুনায় নি। মানুষের জন্য ইকবাল এক মহা সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছেন। মানুষ তার 'খুদী'র শক্তিতে পূর্ণ-পরিস্ফুট করলে তখন আর তার তক্‌দীর আল্লার ইচ্ছাধীন থাকে না। সে নিজেই তার তক্‌দীর্ গড়ে নিতে পারে। এ সম্বন্ধে ইকবাল কী সুন্দরই না বলেছেন ঃ–

"খুদীকো কর্ বুলন্দ, এ্যায়ছা কে হর্ তকদীর-সে পহলে

খোদা বান্দেসে খোদ পুঁছে বাতা তেরি রেজা কিয়া হায়।"

অর্থাৎ, আত্মশক্তিকে এমন জাগিয়ে তোল যে, খোদা তোমার ভাগ্যলিপি লিখবার আগে নিজেই তোমাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ "বল, তোমার ভাগ্যে কী লিখব।"

এই শক্তিমান পুরুষ-সিংহকেই ইকবাল বলেছেন ঃ 'মরদে-মুমিন' বা 'ইনসান-ই-কামিল'। এই "মরদ-ই-মুমিন'দের সম্বন্ধে ইকবাল এক অদ্ভুত মর্যাদা কল্পনা করেছেন। আল্লাহ্ এঁদের গুণগরিমায় মুগ্ধ হয়ে ফিরিশতাদিগকে ডেকে যেন আক্ষেপের সুরে বলেন ঃ 'হায়, এদের কেন আমি মরণশীল মানবরূপে সৃষ্টি করেছিলাম!"

কাব্যের সাথে দর্শন কী সুন্দরই না মিশেছে!

ইকবালের এই খুদীবাদ তাঁর 'আস্‌রারে-খুদীতে' চমৎকার বিধৃত হয়েছে। অবশ্য তাঁর সম্পূর্ণ দর্শন 'আসরারে-খুদীতে' পাওয়া যাবে না; 'আসরারে-খুদীর' সঙ্গে 'রমুয-ই-বেখুদী' মিলিয়ে পড়লে তবে তাঁর এই নূতন দর্শনের পূর্ণরূপ মিলবে। আসরাবে-খুদীতে' আছে আত্ম-বিকাশের দর্শন ঃ "রমুষ-ই-বেখুদীতে" আছে আত্ম-ত্যাগের দর্শন। ইকবাল প্রতিটি আত্মার পরিস্ফুরণ চেয়েছেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর সমাজ বা মানব-কল্যাণের জন্য আত্মবিসর্জন দিতেও বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ঃ মানুষের দুটো সত্ত্বা আছে ঃ এক তার ব্যক্তি-সত্ত্বা (Individual I দুই ঃ তার সমাজ-সত্ত্বা (National I), প্রথম সত্ত্বা অর্থাৎ আমিত্বকে বলিষ্ঠ করলেই চলবে না, দ্বিতীয় আমিত্বকেও বলিষ্ঠ করতে হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ঃ আল্লাহ্, মানুষ এবং জগতের মধ্যে কার কি সম্বন্ধ এবং কার কি কর্তব্য, তা ইকবাল সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। জগতজোড়া মহামৃত্যুর ক্রন্দনের মধ্যে তিনি শুনিয়েছেন অমর জীবনের গান; নিরাশার অন্ধকারে তিনি ফুটিয়েছেন নবপ্রভাতের রক্তরাগ। এতদিন পরে মানুষ নিশ্চিত মৃত্যুর দিক থেকে মহাজীবনের দিকে ফিরে তাকালো, এই অবজ্ঞাত জীবন ও জগতের প্রতি তার মমত্ব ও আকর্ষণ এল; নূতন মূল্যবোধ নিয়ে সে বিপুল উদ্যমে সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলল।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ

এইবার রবীন্দ্রনাথের কাব্য-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ বেদান্ত-দর্শন বা উপনিষদের বাণীকেই তাঁর কাব্য ও গানে নানাভাবে রূপ দিয়েছেন। ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর সঙ্গে মিশে যাওয়াই তাঁর চিন্তার প্রধান লক্ষ্য। তাঁর স্বতন্ত্র কোন সত্ত্বা নেই; স্বাধীন ব্যক্তিত্ব নেই; পরম প্রভুর সঙ্গে মিলনের অতৃপ্ত কামনা নিয়েই তিনি ছুটে চলেছেন। বিশ্বজোড়া অনিত্যতার মধ্যে তিনি নিত্যকে খুঁজে ফিরছেন; বিশ্বপ্রকৃতির সবকিছুতে তিনি তাঁর সেই 'মানস-সুন্দরী'কেই দেখতে পাচ্ছেন এবং তার সঙ্গে মিলনের জন্যই তাঁর প্রাণ অধীর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। পারশ্য-কবি হাফিজ যেমন তাঁর সমস্ত কাব্যে আশিক-মাশুকের প্রেম ও বিরহের কথাই ব্যক্ত করেছেন, রবীন্দ্রনাথও ঠিক তেমনি করে তাঁর প্রিয়তমের প্রতি প্রেম নিবেদন করেছেন এবং তাঁর মধ্যেই নিজেকে বিলিয়ে দিতে চেয়েছেন।

যুগসঞ্চিত সংস্কার বা ধর্মবিশ্বাসকে অতিক্রম করে তিনি ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি; সেই অদ্বৈতবাদের বেড়াজালই তাঁর চিন্তা ও কল্পনা সীমিত হয়ে আছে। যে সব মৌলিক চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা দিয়ে মানবতার ইতিহাস রচিত হচ্ছে, সেখানে তিনি কোন নূতন দান দিতে পারেন নি। এক কথায় বলা যায় ঃ মায়াবাদ, সুফীবাদ এবং অদ্বৈতবাদের সুরই তাঁর কাব্যে ও সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত হয়েছে। কোন কোন স্থানে তাঁর অদ্বৈতবাদ বা প্রতীকবাদ আঁধার-যুগের প্যাগানিজমের এলাকায় গিয়ে পৌঁছেছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই পাঠক একথার সত্যতা বুঝবেন ঃ –

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ-ধূলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
নিজেরে করিতে গৌরব দান
নিজেরে কেবলি করি অপমান
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে॥
আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে
তোমারি ইচ্ছা করহে পর্ণ
আমার জীবন মাঝে।
যাচি হে তোমার চরম শান্তি
পরাণে তোমার পরম কান্তি
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়-পদ্মাদলে॥"

–(গীতাঞ্জলি)

www.pathagar.com

এখানে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ আত্মবিলুপ্তি কামনা করছেন। গীতার ভাষায় 'ভগবানে কর্মসমর্পণ' করে তিনি শুধু তাঁর হাতের ক্রীড়নক হতে চাচ্ছেন। আপন কাজের মধ্যে কিছুতেই তিনি নিজকে ধরা দিতে চান না; ভগবানের মধ্যে আত্মগোপন করতে চান। তাই তিনি বললেন ঃ আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয়-পদ্মদলে।

ভগবানের সঙ্গে সদ 'ভেদ' মিটিয়ে দিয়ে কবি 'এক' হতে চান ঃ

"আজি যেন ভেদ নাহি রয়
আপনা পরে।
আমায় যেন এক দেখি হে
বাহিরে ঘরে॥"

−(ঐ)

"আকাশ-ধরার" সব কিছুই যে ব্রহ্মময়, এই প্যানথিষ্টিক আইডিয়া নিম্নের কবিতায় বিদ্যমান ঃ

"তুমি আমার আপন
তুমি আছ আমায় কাছে
এই কথাটি বলতে দাও গো বলতে দাও।
এই নিখিল আকাশ ধরা
এযে তোমায় দিয়ে ভরা
আমায় হৃদয় হতে এই কথাটি
বলতে দাও গো বলতে দাও॥"

−(গীতাঞ্জলি)

রবীন্দ্রনাথ তাই মনে করেন মানুষের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য কিছু নাই। ভগবান যা করান তাই সে করে, মানুষের মধ্যে স্বয়ং ভগবান আসিয়াই 'লীলা' করেন ঃ

"হে মোর দেবতা, ভরিয়া এদেহ-প্রাণ।
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান॥
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান॥
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজের করিয়া দান॥"

−(ঐ)

"আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।
তাই ত আমি এসেছি এই ভবে॥
সব বাসনা যাবে আমার থেমে
মিলে গিয়ে তোমারি এক প্রেমে

www.pathagar.com

দুঃখ-সুখের বিচিত্র জীবনে
তুমি ছাড়া আর কিছু না রবে॥"

−(ঐ)

এই ভাবধারাই নিম্নের গানগুলিতে নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে ঃ
"আমার আমি ধুয়ে মুছে
তোমার মধ্যে যাবে ঘুচে
তোমার মধ্যে মরণ আমার
মরবে কবে॥"

−(ঐ)

"মনকে আমার কায়াকে।
আমি একেবারে মিলিয়ে দিতে
চাই এ কালো ছায়াকে॥
তুমি আমার অনুভাবে
কোথাও নাহি বাধা পাবে
পূর্ণ একা দেবে দেখা
সরিয়ে দিয়ে মায়াকে।
মনকে আমার কায়াকে॥"
−(গীতাঞ্জলি)
"নামটা যেদিন ঘুচাবে নাথ
বাঁচব সেদিন মুক্ত হয়ে।
আপন গড়া স্বপ্ন হ'তে
তোমার মাঝে জনম লয়ে॥
আমার এ নাম যাকনা চুকে
তোমারি নাম নেব সুখে
সবার সঙ্গে মিলব সেদিন
বিনা-নামের পরিচয়ে॥"

−(ঐ)

"আমারে নিখিল ভুবন দেখছে চেয়ে
রাত্রি দিবা।
আমি কি জানিনে এর অর্থ কিবা।
তারা যে জানে আমার চিত্তকোষে
অমৃতরূপ আছে বসে গো
তারেই প্রকাশ করি আপনি মরি
তবেই আমার দুঃখ মেটে॥"

−গীতিমাল্য)

www.pathagar.com

"তোমায়-আমায় মিলন হবে বলে
আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
ফুল্ল-শ্যামল ধরা॥
তোমায়-আমায় মিলন হবে বলে
যুগে যুগে বিশ্বভুবন তলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে
চিরস্বয়ম্বরা॥

–(গীতিমাল্য)

সন্ন্যাস বা সংগ্রাম-বিমুখতাই যে কবির কাম্য, সে কথা তিনি পরিষ্কার ভাবে বলেছেন। কর্মের অভিশাপ থেকে তিনি তাই ভগবানের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছেন ঃ

"রক্ষা কর হে।
আমার কর্ম হইতে আমায় রক্ষা কর হে॥
আপন ছায়া আতঙ্কে মারে করিছে কম্পিত হে
আপন চিন্তা গ্রাসিছে, আমার রক্ষা কর হে॥
প্রতিদিন আমি আপনি রচিয়া জড়াই মিথ্যা জালে
ছলনা-ডোর হইতে মোরে রক্ষা কর হে॥"

–(ধর্মসঙ্গীত)

নিম্নের গানটিতে রবীন্দ্রনাথের মায়াবাদ ও চিরনির্বাণের সুর শোনা যাবে ঃ

"যা হবার তাই হোক
ঘুচে যাক সর্বলোক
সর্বমরীচিকা।
নিবে যাক্ চিরদিন
পরিশ্রান্ত পরিক্ষীণ
মর্ত্তজন্মা শিখা॥
সব তর্ক হোক শেষ
সব রাগ সব দ্বেষ
সকল বালাই
বল শান্তি বল শান্তি
দেহ সাথে সব ক্লান্তি
পুড়ে হোক্ ছাই॥

–(চিত্রা)

এইসব কবিতা ও গানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন-দেবতার' মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে বিসর্জন দিতে চেয়েছেন। "আমাকে আমি যেন প্রচার না করি, আমাকে তুমি আড়াল করে দাঁড়াও, তোমাতে-আমাতে কোন যেন ভেদ আর না রয়, এই নিখিল আকাশ ধরা—

www.pathagar.com

সকলই তুমি-ময়; সকলই তোমায়-দিয়ে-ভরা, আমার মধ্যে তুমিই বসে লীলা করছ; এই লীলা শেষে আমি যখন তোমার সাথে মিলব, তখন তুমি ছাড়া আর কিছুই রবেনা; তোমার মধ্যেই আমি চিরমৃত্যু মরতে চাই; আমার এই কালো ছায়াকে তোমার কায়াতে মিশিয়ে দিতে চাই; তোমার মাঝে আমার নাম ও সত্ত্বা বিসর্জন দিয়ে চেনা-নামের পরিচয়ে আমি পরিচিত হতে চাই—এই ধরনের বৈষ্ণব সুলভ প্রেম ভাব ও অনুভূতিই রবীন্দ্র কাব্যের সারকথা।

রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা ও গানে আদিমযুগের প্রকৃতিবাদ বা প্যাগনিজমের ছাপও রয়েছে। প্রকৃতিতে তিনি দেবত্ব আরোপ করেছেন। এতে তাঁর অনুভূতি ও অন্তদৃষ্টির স্থূলতাই প্রমাণিত হয়েছে। দু' একটি দৃষ্টান্ত দেখুনঃ

শারত ঋতুকে কবি শরদ-লক্ষ্মী রূপে বন্দনা করছেন ঃ

"এস গো শারদ লক্ষ্মী তোমার
শুভ্র মেঘের রথে
এসো নির্মল নীল পথে
এসো ধৌত শ্যামল আলো ঝলমল
বনগিরিপর্বতে।

-(গীতাঞ্জলি)

শরত কালে বাংলা দেশকে তিনি 'জননী' রূপে দেখেছেন ঃ

আজিকে তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে
হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারেনা রহিতে নদী জলধার
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর
ডাকিছে দোয়েল গাহিছে কোয়েল
তোমার কানন-সভাতে।
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী
শরত কালের প্রভাতে।

-শরতে বঙ্গ

কবি আকাশে কৃষ্ণমেঘ দেখে শ্রীকৃষ্ণকে কল্পনা করছেন ঃ

ওগো সাঁওতালী ছেলে

শ্যামল সজল নব-বরষার কিশোর দূত কি এলে।
ধানের ক্ষেতের পারে শালের ছায়ার ধারে
বাঁশীর সুরেতে সুদূর দূরেতে দিয়েছ হৃদয় মেলে॥
পব-দিগন্ত দিল তব দেহে নীলিমলেখা;

www.pathagar.com

পীত ধড়াটিতে অরুণরেখা,
কেয়াফুলখানি করে তুলে আনি
দ্বারে মোর রেখে গেলে॥
আমার গানের হংসবলাকাপাতি
বাদল-দিনের তোমার মনের সাথি।
ঝড়ে চঞ্চল তমালবনের প্রাণে
তোমাতে আমাতে মিলিয়াছি একখানে,
মেঘের ছায়ায় চলিয়াছি ছায়া ফেলে॥

বর্ষা

তা হ'লে একথা আমরা অনায়াসে বলতে পারি যে, প্লেটোর মায়াবাদ বুদ্ধের নির্বাণবাদ, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ,ইবনে আরাবীর সূফীবাদ, আদিম যুগের প্যাগানবাদ বা প্রতীকবাদ—সকলেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে। বলিষ্ঠ আত্মপ্রতিষ্ঠার বাণী, গতির বাণী, মৃত্যুকে জয় করে অনন্ত জীবনে বেঁচে থাকবার বাণী, মানবাত্মার অপরিসীম শক্তি ও সম্ভাবনার বাণী, মানবের গৌরবোজ্জ্বল পরজীবনের বাণী, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে তার শ্রেষ্ঠত্বের বাণী, তার সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার বাণী—রবীন্দ্রকাব্যে বিরল। মান-অভিমান, বিনয়, বৈষ্ণব-সুলভ প্রেমনিবেদন এবং বিশ্বপ্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁর মানব-সুন্দরীর অনুভব ও লীলাদর্শ—এই সবই রবীন্দ্রকাব্যের বৈশিষ্ট্য তাঁর 'গীতাঞ্জলি' 'নৈবেদ্য', 'সোনার তরী', 'পূরবী' এবং সমস্ত ধর্মসঙ্গীতের মধ্যে মাত্র একটি বিশেষ সুরই ধ্বনিত হয়েছে, সেটি হ'ল আত্মবিসর্জনের সুর,—'খসে যাবার ঝরে যাবার সুর।' বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ গতির কবি নন—বিরতির কবি।

অতএব বলা যেতে পারে, রবীন্দ্র-কাব্যের যে প্রেরণা ও দর্শন, তা মধ্যযুগীয়; প্রগতিশীল বিশ্বমানুষের কাছে তার বিশেষ কোন আবেদন নেই। আমরা অমন করে মরে যেতে চাই না, ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চিরদিন বেঁচে থাকতে চাই; গ্রহে-গ্রহে লোকে-লোকে প্রভুত্ব করতে চাই; আল্লার খলিফা হয়ে আল্লার রাজ্য শাসন করতে চাই। যে-কারণে ইকবাল প্লেটো বা হাফিজকে আমল দেন নাই, ঠিক সেই কারণে আমরা রবীন্দ্রকাব্যেকেও আমল দিতে পারি না। রবীন্দ্রকাব্যেও আমাদের মনে এনে দেয় প্রশান্তির মনোভাব। যে নূতন নভোভ্রমণের যুগ এল, নবসৃষ্টি ও নবসম্ভাবনার যুগ এল, সেযুগের কবি রবীন্দ্রনাথ নন। সেযুগের কবি ইকবাল।

আজ পাশ্চাত্য জগৎ যে ইকবাল-কাব্যের প্রতি এত অনুরক্ত হয়ে উঠছে, তার মূল কারণ রয়েছে এইখানে। বিশ্বমানুষ ইকবালের মধ্যে আজ গতিবাদের নূতন সুর শুনতে পেয়েছে।

ঢাকা

১৯৬০

www.pathagar.com

পূর্ব-পাকিস্তানের লেখকদের প্রতি

প্রত্যেক জাতিরই এক একটা লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বা আদর্শ থাকে। সেই আদর্শ অনুসারেই তার রাষ্ট্র ও সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয়। কাব্য, সাহিত্য এবং তাহজিব-তমদ্দুনও সেই আদর্শের অনুসরণ করে। সবাইকে মূলতঃ এই আদর্শ মেনে নিতে হয়। এ সম্বন্ধে আর সবার চাইতে লেখকদের দায়িত্বই বেশী। লেখককে তাই সমাজ-সচেতন না হলে চলে না। লেখকরাই জাতিকে প্রগতির পথে নিয়ে যায়, জাতির মনে আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগায়, নূতন চিন্তা, নূতন স্বপ্ন ও নূতন ধ্যান-ধারণা দেয়।

আমরা এখন এক নূতন রাষ্ট্রের অধিকারী। এ রাষ্ট্রের একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। এই লক্ষ্য ও আদর্শের রূপায়ণই হল প্রত্যেক পাকিস্তানবাসীর কর্তব্য। আজ নূতন মন নিয়ে, নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমাদের সবকিছু বিচার করতে হবে। আগের দিনের যে-মূল্যবোধ আমাদের মনে জেগে ছিল, এখন তা কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন করতে হবে। আগে যা ভাল লেগেছে, এখনও তা ভাল কিনা ভেবে দেখতে হবে। আগে যাকে খাবার ভেবেছি, এখনও তা খাবার কিনা, তাও আমাদের ভাবতে হবে। অবস্থার পরিবর্তন এবং লক্ষ্য ও আদর্শের তাকিদে মূল্যবোধের এই পরিবর্তন আদৌ অস্বাভাবিক নয়, অসঙ্গতও নয়; বরং অনেকক্ষেত্রে অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী।

সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে একথা আরও সত্য। পূর্বপাকিস্তানের লেখকদের কথাই বলি। প্রাক-পাকিস্তান যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে-ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল, পাকিস্তান লাভের পরেও কি সেই একই ধারায় আমাদের সাহিত্য বইবে? পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যের মূল্যমান ও আদর্শ কি পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যের মূল্যমান ও আদর্শ দ্বারা নিরূপিত হবে? না। তা হতে পারে না। আমাদের মনের রং মিলিয়ে আমাদের নিজস্ব খাতে এ'কে এখন প্রবাহিত করতে হবে। স্বাধীন জাতির লক্ষণ ও বিশেষত্বই ত এই। সর্বক্ষেত্রে তার যদি কোন স্বকীয়তাই না রইল, তবে তার স্বাধীনতার মূল্য কি?

অনেকে বলবেন ঃ সাহিত্য ও শিল্পে স্বাধীনতা চাই, নইলে নবসৃষ্টি সম্ভব নয়। একথা কিছুটা সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। সম্পূর্ণ মুক্তির মধ্যে সৃষ্টি অসম্ভব। প্রত্যেক বস্তুরই একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা বা গণ্ডী আছে। তার মধ্য থেকেই সে তার গুণাবলী প্রকাশ করে। গ্রহতারকার নির্দিষ্ট পথ আছে। খেলার মাঠে নির্দিষ্ট বাউণ্ডারী লাইন আছে। তাতে ত নূতন সৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটে না। সর্বশক্তিমান আল্লাও ত একটা নৈতিক নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে থেকেই তাঁর নব নব-সৃজন–লীলা প্রকাশ করেন। লেখকদেরও যদি সেইরূপ একটা বউণ্ডারী লাইন থাকে, তাতে ক্ষতি কি? উচ্ছৃঙ্খলার নাম স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতা শৃঙ্খলার সীমাপ্রাচীরে আবদ্ধ।

এতে ক্ষুণ্ন হবার বা লজ্জা পাবার কিছু নেই। যাদের অতীত নেই, ঐতিহ্য নেই— তারাই না হয় ক্ষুণ্ন হবে। কিন্তু একজন মুসলিম লেখক সেজন্যে ভাববে কেন? তার ত

www.pathagar.com

গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে; কাব্যে, সাহিত্যে, কৃষ্টিতে তার ত স্বীকৃতি রয়েছে। কাজেই তাকে যদি অন্যের অনুকরণ না করে তার নিজস্ব পথে চলতে বলা হয়; নিজের ঘরের মাল-মসলা দিয়ে তাকে যদি নূতন সৃষ্টির তাকিদ দেওয়া হয়, তবে তার ভাববার কিছুই থাকে না। অন্ধ অনুরাগ অথবা দাসমনোভাবে তার মন নিতান্ত আচ্ছন্ন না হলে যুগের এই দাওয়াৎ সে কিছুতেই অস্বীকার করবেনা।

নিতান্ত দুঃখের বিষয় আমাদের লেখকদের অনেকের একটা হীনমন্যতা দেখা দিয়েছে। তাঁরা অন্ধভাবে অন্যদের অনুকরণে সাহিত্য সৃষ্টি করতে চান। আত্মশক্তির অভাব, আত্মপ্রত্যয়ের অভাব, পরানুকরণপ্রিয়তা এবং রুচিবিকৃতিই এর প্রধান কারণ। কোন সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার এ মানসিকতা থাকবার কথা নয়! জানি, সৃষ্টির পথ সহজ নয়; এ পথে চাই দুঃসাহস সাধনা ও সংগ্রাম। কিন্তু এই কঠিন না-চলা পথে চলাই এ বীরের ধর্ম। চলা-পথে যারা চলে তারা ভীরু। তাদের কাছ থেকে আমরা নূতন কিছু আশা করতে পারিনা।

পাকিস্তানী লেখকদেরকে আমি তাই পাকিস্তানবাদ গ্রহণ করতে আহ্বান জানাই। এ পথে গ্লানি নেই; বরং এই পথই একমাত্র গৌরবের; এই পথেই তাঁদের সাহিত্য-সাধনা সার্থক হ'তে পারে। এপাড়ে থেকে ওপাড়ের অনুকরণে যাঁরা সাহিত্য রচনা করবেন, তারা ব্যর্থ হবেন এবং দুই তীরেরই বিদ্রূপ কুড়াবেন। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে সনেট লিখলে বা গান লিখলে, সেটা হাজার ভাল হলেও অনুকরণ বলেই গণ্য হ'বে। কিন্তু পাকিস্তানের সীমানার মধ্যে আসলেই তার সেই প্রতিভা দিয়ে তিনি একটা কিছু নূতন সৃষ্টি করতে পারবেন। এটা সম্ভব হবে এইজন্যে যে, পাকিস্তানের এখন সংগঠনী যুগ। এখানে বহু শূন্যস্থান (vacuum) রয়েছে; চাহিদাও রয়েছে এবং কাজেকাজেই নব নব সৃষ্টির অবসরও আছে। এখানে কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস সব ক্ষেত্রেরই দুয়ার খোলা রয়েছে। কাজেই এখানে কৃতিত্ব অর্জন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এখানে মাল-মশাও প্রচুর। মিলিত বঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের মাল-মশলা হিন্দু-সাহিত্যিকেরা কাজে লাগাননি বলে কতই না আমরা অনুযোগ করেছি। কিন্তু আজ আর তাতে দুঃখ নেই, বরং আনন্দ আছে। পূর্ব-পাকিস্তানের লেখকগোষ্ঠী সেই সব মাল-মশলা এখন অনায়াসে কাজে লাগাতে পারবেন। কাজেই আগের যুগের অবজ্ঞা এখন আশীর্বাদে পরিণত হয়েছে। আমাদের পূর্ব-পাকিস্তানের সমাজ-জীবনে কত হাসি, কত কান্না, কত সুখ, কত দুঃখ, কত রহস্য, কত রোমান্স সঞ্চিত হয়ে আছে। অফুরন্ত রূপ ও রহস্য লুকিয়ে আছে পদ্মা, মেঘণা ও কর্ণফুলীর তীরে তীরে। সেই সব উপকরণ দিয়েই আমরা এখন নূতন সাহিত্য রচনা করব।

পূর্ব-পাকিস্তানের লেখকদিগকে তাই আজ পশ্চিম থেকে মুখ ফিরিয়ে পূর্বাচলের পানে চাইতে হবে। নবসৃষ্টি সম্ভব নয় ততক্ষণ—যতক্ষণ শিল্পী অপর কারো সৃষ্টির মায়ায় সম্মোহিত হয়ে থাকে। অভাবের বেদনা এবং প্রয়োজনের তাকিদই নবসৃষ্টির জননী।

www.pathagar.com

অভাবের বেদনাবোধ যাদের অন্তরে নেই, তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। আমার মনে হয়, মূল্যবোধের বিভ্রান্তি এবং রুচি ও রসের বিকৃতিই আমাদের মৌলিক সৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি দরদ তাই আজ নিতান্ত প্রয়োজন। আশ্চর্যের বিষয়, বাংলা ভাষায় যারা প্রথম মুসলিম কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন, তাঁদের অন্তরে প্রচুর ঐতিহ্যবোধ ছিল। 'কাসাসুল আম্বিয়া', 'আলেফ-লায়লা', 'জঙ্গনামা', 'গাজীকালু ও চম্পাবতীর কেচ্ছা', 'গোলে বকাওলী', 'শাহনামা', 'লায়লী মজনু', 'শিরী-ফরহাদ', 'ইউসুফ জোলেখা', 'হাতেম তাই', 'ছয়ফুলমুলুক', 'চাহার দরবেশ', ইত্যাদি অসংখ্য গ্রন্ত তাঁরা রচনা করেছিলেন। তাঁদের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাও ছিল! আগের জামানার সেই সব লেখকদের দানের তুলনায় আমাদের দান কত ক্ষুদ্র।

বিজাতীয় আদর্শের প্রতি আমাদের অন্ধ অনুরাগ ও সম্মোহনকে অতিক্রম করে আজ আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। বাংলা সাহিত্যের কল্যাণের জন্যই এই স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন ঘটেছে। পরের অনুকরণ বা অনুসরণ করে নতুন কিছুই আমরা দিতে পারব না। বিশেষত্ববর্জিত সৃষ্টিরও কোন মূল্য কেউ দেবে না। কাজেই সাহিত্যে যদি কেউ স্থায়ী আসন পেতেই চায়, তবে অনাবিষ্কৃত, যে রত্নখানি আমাদের আপন দেশে, আপন ইতিহাস ও আপন তাহ্‌জিব-তমদ্দুনে রয়েছে তার সন্ধান করতেই হবে। সবিশেষ হলেই তবে আমাদের সাহিত্যের মূল্য বাড়বে।

আমাদের তরুণ লেখকদের কাছে তাই আজ আমার আহ্বান–তাঁরা সুস্থ্য হউন; আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস করুন; সাধনা করলে পাকিস্তানের মাল-মশলা দিয়েই তাঁরা এমন সাহিত্য রচনা করতে পারবেন—যা বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে অনায়াসে পরিবেশন করা যাবে। আল্লার ৯৯ নাম নিয়ে Dr. Arnold যদি "Pearls of the Faith" নামক সুন্দর কাব্য রচনা করতে পারেন, Allan Poe যদি কুরআন শরীফের "আল্ আরাফ" সুরার প্রেরণা নিয়ে "Al-Araaf" কাব্য লিখতে পারেন, লায়লী মজনু, শিরী-ফরহাদ, ইউসুফ-জোলেখা, আলেফ-লায়লা নিয়ে যদি ইউরোপীয় লেখকেরা কাব্যরচনা করতে পারেন; হাফিজ, রুমি, ওমর খৈয়াম, ইকবাল–এঁরা যদি নিজস্ব রূপ, রঙ ও রস বজায় রেখে বিশ্ব-সাহিত্য রচনা করতে পারেন—তবে আমরা কেন পারব না? যে বিশ্বে আমি নেই, সে বিশ্বের মূল্য কী?

এই সমস্ত কথা বলবার অর্থ পশ্চাৎমুখিতা নয়, পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যের প্রতি অশ্রদ্ধাও নয়। পাকিস্তান প্রগতির প্রতীক। নানা দেশ থেকে নানা পাথর ও মণি-মাণিক্য কুড়িয়ে এনে শাহজাহান যেমন 'তাজমহল' সৃষ্টি করলেন, আর সে সৃষ্টি যেমন মুসলিম সৃষ্টি হয়েও জাতিবর্ণনির্বিবিশেষে বিশ্বমানুষের বিস্ময়বস্তু হয়ে রইল, আমাদের পাকিস্তানী সাহিত্যেও হবে ঠিক সেইরূপ।

আমাদের মন সংকীর্ণ গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকবে না; উপর দৃষ্টি দিয়ে আমরা অপর দেশের কাব্য-সাহিত্য নিশ্চয়ই পড়ব এবং যেখানে যেটুকু ভাল আছে, তা গ্রহণ করব।

www.pathagar.com

কিন্তু সৃষ্টি করবার বেলায় অনুকরণ করব না। আপন প্রতিভা দিয়ে নূতন সৃষ্টি করব। এই আদর্শ আমরা অতীত যুগেও নিয়েছি, এখনও নিব।

বাংলা সাহিত্যেও আমাদের এই ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করেছি বলেই যদি আমরা শান্ত হয়ে ঝিমিয়ে যাই, তবে বোকার স্বর্গেই আমাদের বাস করা হবে। নব নব সৃষ্টি দিয়ে, বৈচিত্র্য দিয়ে আমাদের এ ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে হবে। দানে যদি কিছু না থাকে, তবে শুধু ভাষা নিয়ে গৌরব করবার কোন অধিকারই আমাদের থাকবে না। আমরা যদি বলি, বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র আছেন, রবীন্দ্রনাথ আছেন, শরৎচন্দ্র আছেন, তবে তাতে আমাদের গৌরব বাড়বে না। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে, বৈচিত্র্য দিয়ে, চমৎকারিত্ব দিয়ে আমরা আপন গৌরবে অধিষ্ঠিত হতে চাই। নূতন রেকর্ড স্থাপন করার ভিতরেই ত কৃতিত্ব।

পাকিস্তানের লেখকগোষ্ঠী তাই এক কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। সম্ভাবনার দুয়ারও যেমন খুলে গেছে, তেমনি যোগ্যতায় উত্তীর্ণ হবারও আহ্বান এসেছে। এটাত খুবই ভাল কথা। যোগ্য ব্যক্তিরাই টিকে থাকার মর্যাদা পাবে, এই ত স্বাভাবিক।

আজ আমাদের তরুণ লেখকদিগকে তাই আহ্বান জানাই পাকিস্তানের সংগঠন যুগে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করে নিজেরাও গৌরব অর্জন করুন. জাতিকেও মহিমান্বিত করুন।

যুববাণী

১৯৬০

পাক-গণতন্ত্র ও লেখক-সমাজ

পাকিস্তানের বিপ্লব-দিবসে শুধু যে একটা রাষ্ট্র-বিপ্লবই ঘটে গেছে, তা নয়; সঙ্গে সঙ্গে ঘটেছে আমাদের চিন্তায় ধ্যানে ও ধারণায় একটা অভিনব অন্তর্বিপ্লব। এ বিপ্লব আজ আর পাকিস্তানের চতুঃসীমার মধ্যে সীমিত নয়, এ বিপ্লব যুগস্পর্শী। যুগমনকেও সে রাঙিয়ে দিয়েছে। Basic Democracies বা বুনিয়াদী গণতন্ত্র জগতের সামনে এক নূতন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। বাইরের বিশ্ব আজ তাই অবাক বিস্ময়ে পাকিস্তানের দিকে চেয়ে আছে। পাশ্চাত্যের বহুযুগসঞ্চারিত সর্বজনস্বীকৃত সাধের গণতন্ত্র এই প্রথম পাকিস্তানের হাতেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের যে কোথাও কোন বিকৃতি আছে, সে গণতন্ত্র যে সর্বদা সার্থক ও সফল হয়নি, সত্যিকার মানব-কল্যাণ সে যে আনতে পারেনি–সে কথা আজ অনেকেই বুঝেছেন; কিন্তু একে চ্যালেঞ্জ দিবার মত যোগ্যতা বা সৎসাহস আজ পর্যন্ত কারো হয়নি। সমস্ত দেশ অন্ধভাবে এই গণদেবতার পূজা করে চলেছে।

পরম আশ্চর্যের বিষয়, নবপ্রবর্তিত পাকিস্তান থেকেই জগতজোড়া শক্তিশালী দৃঢ়মূল এই পাশ্চাত্য শাসনতন্ত্রের প্রতি সর্বপ্রথম চ্যালেঞ্জ গেল।

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক দর্শনকে এইভাবে চ্যালেঞ্জ দিয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সত্যি এক চরম দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। আস্ফালন নয়, বিকল্প আর-একটা শাসনতন্ত্র চালু করবার যোগ্যতা ও সৎসাহস তিনি দেখিয়েছেন। রাজনীতির ইতিহাসে এতকাল রাজতন্ত্র সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র ইত্যাদি বহু তন্ত্রই পরীক্ষিত হয়েছে। এবার এল আর এক নূতন তন্ত্রের পরীক্ষার দিন–যাকে বলা যেতে পারে পাকগণতন্ত্র।

পাক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

এই নূতন গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল ঃ শাসন এবং শাসিতের সমন্বয়–রাজ কর্মচারী এবং জনসাধারণের সংযোগ। এই দ্বৈত ভাবই পাশ্চাত্য গণতন্ত্র থেকে পাকগণতন্ত্রকে পৃথক করছে। দেশের শাসনকর্তা এখন আর দেশবাসীর হর্তাকর্তাবিধাতা নন। এখন তিনি সেবক ও শাসকের মিলিত রূপ।S.D.O.-in-Council, District Magistrate-in Council, Governor-in Council'–এই রূপই এর চেহারা। এ শাসন দেশের লোকের সঙ্গে শাসন, দেশের লোকের উপর শাসন নয়। এইটেই হল পাক-জমহুরিয়াতের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বলা বাহুল্য, এই দ্বৈতভাব ইসলাম সমর্থন করে। ইসলাম চিরদিনই দুই প্রান্তকে মিলায়। তাই সে মধ্যপন্থী। দুই বিপরীতের মাখঝান দিয়ে সে তার পথ রচনা করে।

ইসলামিক শাসনতন্ত্র বা জীবন-দর্শন তাই একপ্রান্তিক নয়। ইসলাম ইহলোক ও পরলোককে বিচ্ছিন্ন করেনা, রাষ্ট্র ও ধর্মকে (State and Church) পৃথক করেনা। দুইকে নিয়েই তার কারবার। কুরআন ও তলোয়ারকে সে মিলাতে জানে! ইসলামের আমিরুল-মুমিনিন্ শুধু তাই দেশের শাসনকর্তাই নন, সিপাহ-সালারও।

পাশ্চাত্য রাষ্টবিজ্ঞানের সঙ্গে ইসলামের তাই অনেক বিষয়ে বিরোধ আছে। দুটো জনপদ সুসংলগ্ন না হলে এক-রাষ্ট্রের অধীন হতে পারেনা; এক ভাষা, এক অর্থনৈতিক কাঠামো না হলে একজাতিত্ব গড়ে উঠেনা—পূর্ব ও পশ্চিম কোনদিন মিলবে না ইত্যাদি ধরনের বহু ধ্যান-ধারণা পাশ্চাত্যের চিন্তাক্ষেত্রে বহুদিন ধরে শিকড় গেড়ে আছে। এই সমস্ত মতবাদ এতদিন পরে পাকিস্তানের হাতেই লাভ করল এক প্রচণ্ড আঘাত। পাকিস্তানই জগতকে দেখিয়ে দিল যে, পূর্ব ও পশ্চিমকে একসঙ্গে মিলানো যায়, ভাষার তারতম্য ও পার্থক্যকে স্বীকার করেও বিভিন্ন জনগোষ্ঠি এক জাতিতে সংগ্রথিত হতে পারে; ভৌগোলিক সীমারেখাকে উল্লঙ্ঘন করেও বৃহত্তম স্বদেশ রচনা করা যায়।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি থেকে পরিষ্কারই বোধগদ্য হবে যে, প্রচলিত পাশ্চাত্য রাজনীতি ও সমাজনীতির সঙ্গে ইসলামের অনেক বিষয়েই মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আমাদের নিজস্ব শাসনতন্ত্র রচনা করতে হলে তাই আমাদের অনেক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র না হয়ে উপায় নেই। কায়েদে-আজম যে বলেছিলেন, "We are a separate nation and we have got a separate culture"–এ কথার তাৎপর্য এই আলোকে বুঝা সহজ হবে।

www.pathagar.com

বলা বাহুল্য, এই যে স্বাতন্ত্র্য, এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। এ স্বাতন্ত্র্যের নাম সংকীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতা নয়; এ আমাদের আদর্শবাদিতার স্বাতন্ত্র্য, এ আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ। জগতে যত মৌলিক দান ও নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা দেখতে পাওয়া যায়, সবার মূলে আছে এই স্বাতন্ত্র্যবোধ। গড্ডালিকা স্রোতে ভেসে না গিয়ে ভিন্ন পথ বেছে নেওয়া অনেক স্থানে তাই বরণীয়। গভীর কল্যাণ-জিজ্ঞাসা না জাগলে অথবা বিশেষ যোগ্যতা না থাকলে সহজে কেউ স্বতন্ত্র পথ খোঁজে না। যত নবী, যত কবি, যত আবিষ্কারক, যত সমাজসংস্কারক সবাই প্রয়োজনবোধে ভিন্নপথ রচনা করেন। কাজেই পাকিস্তান যদি একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হতে চায়, তাতে তার অগৌরব ত নেই-ই, বরং সেইটেই হবে আমাদের পরম শ্লাঘার বিষয়। কেননা তখন স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব একবিন্দুতে না মিশে আর উপায় থাকবে না।

লেখকদের ভূমিকা

এই নূতন রাষ্ট্র-বিপ্লবের দিনে লেখকদের ভূমিকা কী হবে? তাঁরা কি গতানুতিকভাবেই লেখনী চালনা করবেনা, না নূতন পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের লক্ষ্য ও চিন্তাধারাতেও বিপ্লব আনবেন?

জগতের ইতিহাসে দেখা যায়, চিন্তাজগতে লেখকরাই সর্বপ্রথম বিপ্লব আনেন। নূতন মত ও নূতন পথের সন্ধান দেওয়া লেখকদেরই কাজ। লেখকদের প্রভাবেই রাষ্ট্র ও সমাজে বিপ্লব আসে। পক্ষান্তরে, কোন বিপ্লবের পর রাষ্ট্রের চিন্তাশীল লেখকরা নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রমতকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজেও অগ্রণী হন। তরবারি ও লেখনী তাই যুগে যুগে পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলে। প্রাচীন যুগে প্লেটো ও এরিস্টটল, মধ্যযুগে লক্, হিউম, রুশো ও ভল্টেয়ার এবং বর্তমান যুগে কার্ল মার্কস্, লেনিন ও এঙ্গেল্স্ রাষ্ট্র-বিপ্লবে সহায়তা করেছেন। এ ছাড়া আরও অনেক লেখক আছেন যাঁদের লেখার প্রভাব চিন্তা-জগতে বিপ্লব এনেছে। ইবনে বাতুতা, আল্-বেরুনী, ইবনে-খলদুন আল্-গাজ্জালী, আলতাফ হোসেন হালী, আল্লামা ইকবাল—এইরূপ অসংখ্য নাম করা যায়।

বস্তুতঃ রাজনীতি, সমাজনীতি, শাসননীতি ও অন্যান্য সমাজকল্যাণকর বিষয়ে চিন্তাশীল লেখকেরা এমন বহু গ্রন্থ লিখেছেন–যা কোন না কোন ক্ষেত্রে বিপ্লবের সহায়তা করেছে। যুগে যুগে তাঁর রাষ্ট্র-দর্শন, অর্থনীতি ও মানবীয় অধিকার নিয়ে গভীর আলোচনা করে আসছেন। আজও তাদের চিন্তাধারার বিরাম নাই। এ চিন্তা যেন একটানা স্রোতের মত যুগ হতে যুগান্তরে বয়ে চলেছে। অতি প্রাচীনকালে Plato ও Aristotle-এর মনে জেগেছিল, কি করে একটা Ideal City বা Ideal State গঠন করা যায়। সেই থেকে আজ অবধি ইউরোপ ও আমেরিকা সেই আদর্শ নগর' বা 'আদর্শ রাষ্ট্রের' সন্ধানে ঘুরে মরছে। Plato'র 'Republic', Aristotle-এর 'Politics, St. Augustine-এর The City of God', John Lock-এর 'The Two Treatises of Civil Government', Rousseau-র 'Social Contract',

Thomas More-এর 'Utopia', Machiavelli-র 'The Prince', Thomas Paine-র 'Common Sense', কার্ল মার্ক্সের 'Das Capital' এবং আরও বহু গ্রন্থের নাম করা যায়—যা শুধু রাষ্ট্রতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র নিয়ে লেখা, বলা বাহুল্য এই সব বিপ্লবী চিন্তাবিদদের চিন্তাধারা জগতের রাজনৈতিক ইতিহাসের মোড় বহুবার ঘুরিয়েছে। এক একজন লেখকের প্রভাবেই এক একটি জাতির বা দেশের রাজনৈতিক রূপ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বর্তমান যুগেও 'Human Rights' সম্বন্ধে, 'Communism' সম্বন্ধে 'Economics' সম্বন্ধে বা 'Population' সম্বন্ধে বহু বিশিষ্ট লেখক বহু থিওরী দিয়েছেন। Harold Laski, Bertrand Russel, Adam Smith, Bernard Shaw প্রভৃতি অসংখ্য লেখক এই সব বিষয়ের উপর বহু গ্রন্থ লিখেছেন।

সেই তুলনায় পাকিস্তানের লেখকেরা কী করছেন বা কে কতটুকু মৌলিক চিন্তা দিয়েছেন—সে কথা ভাবতে হবে। একমাত্র ইকবাল ছাড়া বিশেষভাবে আর কার নাম করা যায়, জানি না। রাজনৈতিক চিন্তা ও দর্শন আমাদের মধ্যে নেই বললেই চলে। পশ্চিম পাকিস্তানে তবু কারো কারো নাম করা যায়—যাঁরা Islamic Socialism সম্বন্ধে কিছু কিছু বই লিখেছেন। "Socialism', 'Islam and Interest,' 'The Social Contrct and the Islamic State', 'Islam in Modern State', 'Economic Problems of Pakistan. 'The Menifesto of Islam', 'Ideology of the Future', 'The Ideology of Pakistan and its Implementation' প্রভৃতি অনেকগুলি বইয়ের নাম করা যায়—যাতে মৌলিক চিন্তা ও গবেষণার স্বাক্ষর আছে।

ইউরোপের নব জাগরণের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে কবি-সাহিত্যিকেরাই সেখানকার মানুষের মন আগে রাঙিয়ে দিয়েছে। পরে সেই সব আইডিয়া বা থিওরীর বাস্তব রূপায়ণ ঘটেছে। পাকিস্তানের জন্মের প্রারম্ভে স্বাপ্নিক কবি ইকবাল সেই ধরনের চিন্তা এবং স্বপ্ন আমাদের মনে সঞ্চারিত করেছিলেন। কিন্তু তার পরের যুগ আমাদের শিথিলতার যুগ। যে প্রেরণায় আমরা পাকিস্তান লাভ করেছি, সেই প্রেরণা ও সেই আদর্শকে রূপে রসে বর্ণে গন্ধে পল্লবিত করার গুরু দায়িত্ব পড়েছিল আমাদেরই কবি-সাহিত্যিকদের ওপর। কিন্তু আমরা কি সে দায়িত্ব সুন্দররূপে-স্বার্থকরূপে পালন করতে পেরেছি? এই আত্মজিজ্ঞাসারই আজ আমাদের জবাব দিতে হবে।

আমার মনে হয়, আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য, লক্ষ্য ও আদর্শের প্রেরণা এখনো আমাদের মনে পূর্ণরূপে দানা বেঁধে ওঠেনি। ইসলামের ধ্যান-ধারণা ও পাকিস্তানের আদর্শবাদের নামে এখনো আমরা সরমে-সংকোচে মুখ লুকাই। আমাদের আপন শক্তি, সম্ভাবনা ও ঐতিহ্যচেতনার ওপর দাঁড়িয়ে বিশ্বে গর্বোন্নত মস্তকে এখনো আমরা কিছু বলতে সাহস করি না। আপন গৌরব ও মহিমা সম্বন্ধে এখনো আমাদের মনে একটা হীনমন্যতা জেগে আছে। তাই দেখতে পাই. পাকিস্তানের বহু দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এর

www.pathagar.com

উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে বহু ইউরোপীয় লেখক ইতিমধ্যেই বহু মূল্যবান গ্রন্থ লিখে ফেলেছেন; যে-কথা আমরা বলতে পারিনি, সেকথা তাঁরা বলেছেন। "Islam in Modern History"-এর মত বিস্তৃত গ্রন্থ লিখেছেন W. C. Smith, 'The Making of Pakistan' লিখেছেন Richard Symonds। পাকিস্তানের আদর্শবাদে তাঁরা বিশ্বাসী। অথচ এদিকে এখনো আমরা পশ্চাদ্বর্তী।

যুগে যুগে কুরআন থেকে ইউরোপীয়ান লেখকেরা বহু প্রেরণা সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু আমরা এখনও সেখান থেকে কিছু নিতে কুণ্ঠিত। Rousseau যে তাঁর 'Social Contract' বই লিখলেন, তার মূল প্রেরণা পেলেন কুরআন থেকেই। তার নূতন মতবাদের মর্মকথা হল ঃ একটা পারস্পরিক চুক্তির উপর সমাজ ও রাষ্ট্র চালিত হবে। একজন শাসক যে আর দশজন নিরীহ লোকের উপর কঠোর শাসন-দণ্ড চালাবে, এটা অসমর্থনযোগ্য। শাসন চলবে আদান-প্রদানের ভিত্তিতে। "Rule of the equals over the equals"—এই হবে শাসনের মূলনীতি। এটা একটা নৈতিক চুক্তি। এই চুক্তির কথা কুরআন শরীফে বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহ্ বহুবার বনি-ইসরাইলদের সঙ্গে চুক্তি বা Covenant সম্পন্ন করেছেন। বলেছেন, তোমরা যদি তোমাদের চুক্তি রক্ষা কর, আমিও আমার চুক্তি রক্ষা করব। কিন্তু বনি-ইসরাইলেরা বারবার আল্লার সঙ্গে তাদের সে-চুক্তি বা ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। হযরত ইব্রাহিমের সঙ্গেও আল্লাহ্ এইরূপ চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এই যে চুক্তির ভাব, এই যে পারস্পরিক নির্ভরতা এবং দেওয়া-নেওয়ার ভাব-এতদিন পরে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের নবশাসনতন্ত্রে আমরা লক্ষ্য করছি। এই নূতন রাষ্ট্রদর্শনের উপরে আমরা কি কোন বই লিখতে পারি না?

একই দিনে ভারত ও পাকিস্তান আযাদী লাভ করেছিল। কিন্তু শাসনতন্ত্র ব্যাপারে ভারত এখনও সেই বৃটিশ পদ্ধতিরই অনুসরণ করছে। রাষ্ট্র-দর্শনে সেখানে কোন বিপ্লব সূচিত হয়নি। 'ভূ্যান', 'গ্রামদান' 'সর্বোদয়া' আন্দোলন সেখানে ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু আইয়ুব প্রবর্তিত 'মৌলিক গণতন্ত্র' আজ ঐতিহাসিক সত্য। এর দোষ ক্রটি থাকতে পারে। (প্রাথমিক পর্যায়ে সব শাসনেই দোষক্রটি থাকে); তবু বিদেশী শাসনতন্ত্র বর্জন করে পাকিস্তান যে তার নিজস্ব রাষ্ট্রবিধান কায়েম করতে পেরেছে, এতে নিশ্চয়ই গৌরব আছে। লেখকদের কি এ পথ বেয়ে এখন এগিয়ে আসা উচিত নয়? বিপ্লবের আগেও যেমন তাদের প্রয়োজন, পরেও কি তেমনি প্রয়োজন নাই?

যে নূতন জীবনপদ্ধতি ও তমদ্দুনিক সংগঠন আমরা পাকিস্তানে প্রবর্তিত করতে চাই, তা নিয়ে কি আমরা নব নব কাব্য, দর্শন ও নাটক লিখতে পারি না?

আজ সমগ্র সভ্য জগৎ 'Arab Wrold' এর দিকে চেয়ে রয়েছে। হাওয়ার গতি ফিরে গেছে। বিশ্বের রাজনীতির চাবিকাঠি আজ আবার মুসলিম জাহানের হাতে এসে যাচ্ছে। মিসর, সিরিয়া, ইরাক, জর্দান, সৌদী আরব, ইয়েমেন, কুয়েত, লেবানন, বাহ্‌রাইন্, কাত্‌ার, ওমান, সুদান, এডেন, মাসকট্, তিউনিসিয়া, মরোক্কো এবং

www.pathagar.com

আলজিরিয়া–এক কথায় 'Arab World' ও ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বহু বই লিখেছেন। 'Islam Inflamed', 'Doubts and Dynamite' ইত্যাদি বহু পুস্তকের নাম করা যায়। কিন্তু আমরা তার খবরও হয়ত রাখি না, লেখা ত দূরের কথা। বস্তুতঃ আমাদের মনন-সাহিত্য এখনও অনেক দরিদ্র।

আইউব-প্রবর্তিত নবশাসনতন্ত্র রাজনীতির ইতিহাসে এক বিপ্লবধর্মী নূতন অধ্যায় খুলে দিয়েছে। এই বিপ্লব থেকে জগতের ইতিহাসে বিপ্লব আসতে পারে। এই নূতন আদর্শকে সার্থক রূপদান করবার জন্যে পাকিস্তানের লেখক গোষ্ঠীর এগিয়ে আসা উচিত।

ঢাকা

১৯৬০

www.pathagar.com

টু-নেশন থিওরী

একথা সকলেই জানেন, পাকিস্তান সংগ্রামের মূলে ছিল যে-যুক্তি ও দর্শন, তা হচ্ছে 'টু-নেশন থিওরী'। পাক-ভারতের মুসলমানদের কোন বলিষ্ঠ স্বতন্ত্র সত্ত্বা বা তীক্ষ্ণ জাতীয়তাবোধ ছিল না। গঙ্গা যেমন আপন মহিমায় প্রবাহিত হয়, আর তাঁর দু'পাশ থেকে ছোট ছোট অববাহিকা এসে তার স্রোতে মিশে যায়, পাক-ভারতের হিন্দু-মুসলমানের দশা ছিল সেইরূপ। হিন্দুই ছিল মূলধারা আর মুসলমানেরা ছিল তার উপধারা মাত্র। ভারতীয় হিন্দু নেতারা এই অর্থেই "অখণ্ড-ভারতের' কল্পনা করেছিলেন।

ঠিক এই সময় কায়েদ-ই-আযম বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ মুসলমানেরাও একটি জাতি এবং স্বতন্ত্র একটি শক্তি; কাজেই পাক-ভারতের অধিকার বা শাসনের প্রশ্নে হিন্দুর ন্যায় মুসলমানেরও দাবী আছে। মুসলিম মানসে জাতীয়তা-বোধের এই যে নবজাগরণ,–এই যে আত্ম সচেতনতা, এই হ'ল পাকিস্তান-লাভের আত্মিক প্রেরণা।

পাক-ভারতীয় সমস্যার সমাধান কল্পে কায়েদ-ই-আযমের এই থিওরী যে আদৌ অসঙ্গত ছিল না, একথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন। এই উপ-মহাদেশে প্রধানতঃ দুইটি জাতিই বাস করে ঃ হিন্দু এবং মুসলমান। কাজেই যদি বলা হয় যে, এখানে এই দুই জাতিরই পাশাপাশি থাকবার অধিকার আছে, তাহ'লে এমন কিছুই অন্যায় বলা হয় না। ভায়ে-ভায়ে পৃথক হলেও ত এমনিই ঘটে। তখন ত বাড়ি-ঘর বিষয়-আশয় ভাগ হয়ে যায়। কাজেই কায়েদ-ই-আযমের এই দ্বিজাতি-নীতির মধ্যে অন্যায় বা অশোভন কিছুই ছিল না; বরং এইটেই ছিল ন্যায়সঙ্গত বিধি এবং বাস্তব সত্যের অভিব্যক্তি। কিন্তু হিন্দু নেতাগণ আপন স্বার্থে কায়েদের এই সত্যবাণীকে সেদিন মর্যাদা দিতে পারেন নি। এক বিকৃত ঐক্যবোধের ছলনায় সেদিন হিন্দু দেশনায়াকের মুসলমানদের এই ন্যায্য দাবী মেনে নিতে চাননি। এই বাস্তববিমুখিতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপই দেখা দিল পাকিস্তান।

দ্বিজাতি-তত্ত্বের গূঢ় তাৎপর্য তাই সেদিন ধরা পড়েনি। হিন্দু নেতাগণ কায়েদ-ই-আযমের এই বাণীকে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার রঙে রাঙিয়ে দিলেন। ঐক্য ও সংহতির মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্যের দাবী যে নিতান্তই অনুদার ও ভেদবুদ্ধির পরিচায়ক—এই কথাই তাঁরা প্রচার করলেন।

কিন্তু এই 'টু-নেশন থিওরী' যে কায়েদ-ই-আযম শুধু পাক-ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধেই বলেননি, এক বৃহত্তর কল্যাণ-জিজ্ঞাসা থেকেই যে এ বাণী পূর্বেই উৎসারিত হয়েছে তা আজ আমাদের বুঝতে হবে। এটা কোন হিন্দু-মুসলমানের রেষাবেষির প্রশ্ন নয়; ইসলামের নীতি হিসাবেই একে গ্রহণ করতে হবে। ইসলামের মৌলিক নীতিই হচ্ছে 'টু-নেশন থিওরী'। এই থিওরীর উপরেই ইসলামের সমগ্র কাঠামোটি দাঁড়িয়ে আছে।

www.pathagar.com

টু-নেশন থিওরী কায়েদ-ই-আযমের নিজস্ব আবিষ্কারও নয়, শুধুমাত্র হিন্দু-মুসলমানের প্রতিও এ প্রযোজ্য নয়,—ভারতেও এর উৎপত্তি নয়। এর জন্ম-ইতিহাস খুঁজতে হবে আরো অতীতে–আরো গভীরে। ইসলামের মহা পয়গাম্বর–হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-ই হচ্ছেন এর প্রথম উদ্গাতা। স্বয়ং আল্লাহ-তালাই তাঁকে এই নীতি শিক্ষা দিয়াছেন। কুরআন শরীফে আছে ঃ

"ইন্নামাল মু'মীনূনা ইখ্ওয়াতুন"

অর্থাৎ ঃ সমগ্র বিশ্ববাসীরা একজাতি।

মুসলমানের এই এক-জাতিত্বের ভিতরেই দ্বিজাতিতত্ত্বের কথা স্বীকৃতি পেয়েছে। সমগ্র মানবমণ্ডলীর মধ্য হতে যদি 'বিশ্বাসীদিগকে' বিচ্ছিন্ন করে আনা হয়, তবে স্বতঃসিদ্ধভাবেই ত অবশিষ্ট মানবকূলকে আর-এক জাতি বলা হয়। গোটা জিনিসটা থেকে একটা অংশ স্বতন্ত্র করলেই প্রকৃতপক্ষে তা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কাজেই মুসলিমরা এক জাতি যদি হয়, তবে অ-মুসলিমরাও আর-এক জাতি, এতে আর সন্দেহ কি থাকতে পারে? দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রমাণ করবার জন্য কুরআনের এই একটি আয়াতই যথেষ্ট। তবু এর উপর আরও একটি হাদিস এসে বিষয়টাকে অধিকতর পরিস্ফুট করে দিয়েছে। রসুলুল্লাহ্ বলেছেন ঃ

'আল্-কুফরো মিল্লাতু ও ওয়াহেদোঃ"

অর্থাৎ ঃ অবিশ্বাসীরা এক জাতি।

তাহলে ইসলাম গোটা মানবজাতিকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেলছে ঃ বিশ্বাসীরা হল একজাতি, আর অবিশ্বাসীরা হল আর এক জাতি। কাজেই 'টু-নেশন থিরওী' কায়েদ-ই-আযমের কথাই নয়, ওটা ইসলামেরই কথা।

টু-নেশন থিওরীর তাৎপর্য

'টু-নেশন থিওরী' গভীর অর্থপূর্ণ। আল্লাহ্ মুসলমানদিগকে এমন এক আদর্শ জাতি রূপে কল্পনা করেছেন—যারা মানব-কল্যাণে নিজদিগকে সতত উম্মুখ করে রাখবে। পাক-কুরআন মুসলিম জাতিকে এই বেশেই দেখতে চেয়েছে। আল্লাহ বলছেন ঃ

"আমি তোমাদিগকে এক শ্রেষ্ঠ (স্বতন্ত্র) জাতিরূপে সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে তোমরা অন্যান্য সকল জাতির আদর্শ হইতে পার।"

–(২ ঃ ১৪৩)।

অন্যত্র আল্লাহ্ সুস্পষ্টভাবেই মুসলমানদিগকে "খায়রা উম্মাতিন" (শ্রেষ্ঠ জাতি) বলে পরিচয় দিচ্ছেন ঃ

"কুন্তুম্ খায়রা উম্মাতিন্ উখ্রিজাৎ লিন্না-সে তা-মুরূ'না বিল্ মা'রূপফে"–জাতিসমূহের মধ্যে তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। যা ভাল তাই তোমরা সকলকে করতে নির্দেশ দিবে, যা মন্দ তা করতে নিষেধ করবে"।

www.pathagar.com

তা হ'লে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, মুসলমানেরা যাতে একটা আদর্শ জাতিরূপে গড়ে ওঠে–আল্লাহ্ তাই চান। অন্যান্য জাতির ন্যায় মুসলমানও একটা সাধারণ জাতি হোক্— আল্লাহ্ তা চান না। মুসলমানেরা দুনিয়ার মধ্যে একটা স্বতন্ত্র জাতি হোক—পথপ্রদর্শক হোক–এই তিনি চান। মুসলমান যদি আর দশজনের মতই হয়, তা হ'লে দ্বি-জাতি কল্পনার কোন সার্থকতাই থাকে না। আমরা একটা অলাদা জাতি ব'লে কোন কিছু আস্ফালন বা দাবী করারও আমাদের কোন সঙ্গত কারণ থাকে না। 'টু-নেশন থিওরী' তাই অহেতুক একটা সংকীর্ণমনাঃ মানব-গোষ্ঠী খাড়া করবার মতলবে প্রচার করা হয় নি। এর পশ্চাতে আছে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের ইংগিত, আপন লক্ষ্যে আপন আদর্শে চলবার সৎসাহস ও মনোবল এবং নবসৃষ্টির দৃঢ় সংকল্প ও অনুরাগ। পথ অতি কঠিন, কিন্তু এই কঠিন পথে চলাতেই ত আনন্দ। স্বতন্ত্র হয়ে বিশ্বের আকর্ষণ করাই ত অধিক গৌরবের।

দ্বি-জাতি তত্ত্বকে সার্থক করে তুলতে হ'লে তাই একথা মেনে নিতেই হবে যে, মুসলমানের কালচার বা তমদ্দুনও স্বতন্ত্র। এই জন্যই ত কায়েদ-ই-আযম বলেছিলেন ঃ "We are a separate nation and we have got a separate culture," অর্থাৎ আমরা একটা স্বতন্ত্র জাতি এবং আমাদের তাহ্‌জীব-তমদ্দুন স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র জাতি হতে হ'লে আগে চাই স্বতন্ত্র কালচার। স্বতন্ত্র্য কালচার থাকলে তবেই না স্বতন্ত্র জাতি। কাজেই দ্বি-জাতিতত্ত্বে কালচারের স্বাতন্ত্র্য অনিবার্য।

এখানেই দ্বিজাতি-তত্ত্বের সত্যিকার পরিচয়। স্বতন্ত্র কালচারের কদর্থ করলে এই থিওরী পণ্ড হবে। স্বতন্ত্র কালচার অর্থে এখানে মিলন-বিরোধী কোন গোঁড়া বা ধর্মান্ধ কালচারের কথা বলা হচ্ছেনা। বরং তার উল্টা। এ হ'ল স্বাতন্ত্র্যকে ভেঙে ফেলার স্বাতন্ত্র্য, সবাইকে কোলে টেনে নেবার, সবাইকে স্বীকার করবার সবার সঙ্গে হাত-মেলাবার বৈশিষ্ট্য দিয়েই এ স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। এইখানেই এর চমৎকারিত্ব। অন্যান্য জাতিরা যা করেনা বা করতে চায় না, বা করতে পারেনা, ইসলাম তাই মুসলমানের দ্বারা সাধন করাতে চায় বলেই তাকে বাধ্য হয়ে স্বতন্ত্র হতে হয়। অন্যান্য ধর্মে যদি বলা হয় ঃ "ধর্মে কোন বলপ্রয়োগ নাই", অথবা "আমরা পয়গাম্বরাদিগের মধ্যে কোন তারতম্য করি না", তবে অন্যান্য ধর্ম থেকে ইসলাম ত স্বাভাবিকভাবেই স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। অন্যান্য ধর্ম যদি মানুষকে সমঅধিকার না দেয়, জাতিভেদ ও কৌলিন্য প্রথা দ্বারা যদি মানুষে-মানুষে ভেদাভেদের প্রাচীর গড়ে তোলে, আর ইসলাম যদি সে প্রাচীর ভেঙে দিয়ে সবার সাথে হাত মিলায়, তবে তাকে কি স্বতন্ত্র বেশে দেখায় না? অন্যান্য রাষ্ট্রে বিধর্মীদিগকে যদি তুল্যরূপে সামাজিক ও নাগরিক অধিকার না দেওয়া হয়, আর ইসলামী রাষ্ট্র যদি সবাইকে তা দেয়, তা হ'লে ইসলাম কেন না স্বতন্ত্র বলে বিবেচিত হবে? অন্যান্য ধর্মে নারীকে যদি দাসীর মত ব্যবহার করা হয় আর ইসলামে যদি তাকে দেওয়া হয় মহিমময়ীর মর্যাদা, তখন তার স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে উপায় থাকে না। বস্তুতঃ ইসলামের মহান আদর্শ ও অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিই তার স্বাতন্ত্র্যের মূল কারণ, আর শ্রেষ্ঠত্বের সাধনাই হচ্ছে এই স্বাতন্ত্র্যের লক্ষ্য।

www.pathagar.com

মানবজাতি আজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী-স্বাতন্ত্র্যে সীমিত। আমরা যে এক পৃথিবীর নাগরিক, সবাই মিলে আমরা যে এক মহাজাতি-একথা আজ আর আমাদের মনে নাই। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী-সংকীর্ণতা ভেঙে দিয়ে মহামানবতা রচনা করবার জন্যে আর-একটা স্বতন্ত্র দলের প্রয়োজন। সেই স্বতন্ত্র দলই–মুসলমান।

পাক-জমহুরিয়া

১৯৬০

www.pathagar.com

আর্য-সভ্যতা

পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে এতকাল এই কথাই শিখানো হয়েছে যে, অতি প্রাচীনকালে এইদেশে কোল-ভীল-সাঁওতাল ইত্যাদি অনার্য জাতিদের বাস ছিল। তারা বনে-জঙ্গলে বাস করত, ফলমূল ও কাঁচা মাংস ভক্ষণ করত। তারা ছিল অসভ্য বর্বর খর্বাকৃতি কৃষ্ণকায় ও কদাকার। এরপর এল দ্রাবিড় জাতি। তারাও ছিল অনার্য, তবে কোল-ভীল-সাঁওতালদের চেয়ে কিছুটা সভ্য। সর্বশেষে এল আর্য জাতি। তারা দেখতে সুশ্রী গৌরবর্ণ এবং দীর্ঘকায়। তাদের বাস ছিল মধ্য-এশিয়ায়; কারো কারো মতে কাস্‌পিয়ান্ সাগর তীরবর্তী অঞ্চলে। কালে কালে তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদল গেল ইউরোপের দিকে। এরাই হল গ্রীক রোমান জার্মান ইংরাজ প্রভৃতি জাতি সমূহের পূর্বপুরুষ! অন্যদল প্রথমে এল পারস্যে; সেখান থেকে কিছুকাল পর আবার একটা দল বেরিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের মধ্য দিয়ে এল ভারতে; তারপর দ্রাবিড়দিগকে পরাজিত করে অধিকার বিস্তার করল পাঞ্জাব সিন্ধু ও অন্যান্য প্রদেশে। আর্যরাই সর্বপ্রথম ভারতে সভ্যতার আলো জ্বালল। অন্য কথায় ভারতীয় সভ্যতা আর্যদেরই দান।

কিন্তু আর্য-সভ্যতার এই থিওরী এখন একরূপ অচল। পাঞ্জাবের 'হরপ্পা' সিন্ধুর 'ময়েনজোদারো' এবং অন্যান্য কয়েকটি স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে এখন একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ভারতীয় সভ্যতা আর্যদের দ্বারা আনীত হয়নি। বরং যাদের এতকাল অসভ্য বলে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে, সেই দ্রাবিড় জাতিই ভারতীয় সভ্যতার রচয়িতা। এ কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, এই দ্রাবিড়-সভ্যতা আর্য-সভ্যতা অপেক্ষা বহুগুণে উন্নত। এ সভ্যতার সঙ্গে আর্য-সভ্যতার কোন প্রকার সম্পর্কই ছিল না, কারণ দ্রাবিড় সভ্যতা ছিল আর্যদের আগমনের অন্ততঃ এক হাজার বৎসর অগ্রগামী।

দ্রাবিড়-সভ্যতা

ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত এই ঃ পাক-ভারতে কোনকালেই কোন আদিম অধিবাসী (aborigines) ছিল না! আর্যই হোক্, অনার্যই হোক, সবাই এসেছিল বিদেশ থেকে। Dr. R. C. Majumdar ও A. D. Pusalkar বলেন ঃ

"No kind of men originated on the soil of India; all her human inhabitants having arrived from other lands, but developing within India."

এই হিসাবে কখন কোথা থেকে কারা ভারতে এসেছিল, তার একটা কালক্রমিক তালিকাও তাঁরা দিয়েছেন। সেটি এই ঃ

(১) নেগ্রিটো ...... আফ্রিকা থেকে আরবের মধ্য দিয়ে ভারতে এসেছিল।

(২) প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড......... ভূমধ্যসাগরীয় জনগোষ্ঠীর আদিম শাখা।

www.pathagar.com

(৩) ভূমধ্যসাগরীয় অনুন্নত জাতি।

(৪) ভূমধ্যসাগরীয় উন্নত জাতি .... এরাই ভারতে দ্রাবিড় জাতি রূপে পরিচিত।

(৫) আর্মেনয়েড ...... দ্রাবিড়দিগের সঙ্গে এসেছিল।

(৬) আলপাইন .... বৈদিক আর্যদের অগ্রবর্তী।

(৭) দৈবিক আর্যজাতি ..... বৈদিক ভাষা সঙ্গে এনেছিল।

(৮) মঙ্গোলীয়ান .... অনুন্নত জাতি।

এই তালিকা দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আর্যদের পূর্বে অন্ততঃ ছয়টি জাতি এসে ভারতে বসতি স্থাপন করেছিল এবং তাদের প্রত্যেকেই নীল-নদ কিংবা টাইগ্রো-ইউফ্রেটিস উপত্যকা থেকে এসেছিল। অন্য কথায় বলা যায় ঃ 'উর্বর হেলালী চাঁদের' (Fertile Crescent) দেশই ছিল মানব-সভ্যতার আদিম লীলাভূমি।

পণ্ডিতেরা মনে করেন আর্যদের ভারতে আগমন সংঘটিত হয়েছিল খৃষ্টের জন্মের ১৫০০ বৎসর পূর্বে। তার আগে পাক-ভারতের সর্বত্রই ছিল দ্রাবিড় জাতির শাসন ও প্রভাব। সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় ঐতিহাসিক Chokolingam Pillai বলেন ঃ

"It is needless to mention that the question (Aryan Dravidian problem) was first set in motion on the day the Aryan entered India which event we shall soon see took place in the 15th century B.C. India, prior to his entry, was a Dravidian land."

বাংলা দেশেও যে দ্রাবিড়দের প্রভাব ও প্রাধান্য ছিল, সে সম্বন্ধে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ঃ

"এই প্রাচীন দ্রাবিড় জাতিই বঙ্গ-মগধের আদিম অধিবাসী। নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা আধুনিক বঙ্গবাসিগণের নাসিকা ও মস্তক পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহারা দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। মগধের ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতীয় ব্যাক্তিগণকে আর্যজাতীয় অথবা আর্য সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বঙ্গবাসিগণকে জাতিনির্বিশিষে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণের ফল বলা যাইতে পারে।"

অতএব স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আর্যদের আগমনের পূর্বে দ্রাবিড় জাতিই ছিল পাক-ভারতের সর্বপ্রধান সভ্য ও শক্তিশালী জাতি।

হরপ্পা ও মহেনজেদারো

হরপ্পা ও ময়েনজোদারোতে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্যের দ্বারা এক অনার্য জাতির সভ্যতার নিদর্শনই আবিষ্কৃত হ'য়েছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্তৃক উপরোক্ত দুইটি স্থানে খনন-কার্য আরম্ভ হয়। Sir John Marshall ছিলেন এই বিভাগের অধিনায়ক। বাংলা দেশের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও

www.pathagar.com

এই গবেষণা কার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। খনন কার্য দ্বারা উভয় স্থানেই এক উন্নত প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। বহু সুদৃশ্য ইষ্টক-নির্মিত অট্টালিকা, সুপরিকল্পিত রাজপথ, পয়ঃপ্রণালী, স্নানাগার, দুর্গ ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ এখানে বিদ্যমান। নিদর্শন সমূহের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার, নানাধরনের আসবাবপত্র, মণিমাণিক্যের হার, নানা প্রকার মৃৎপাত্র, নানা ধরনের মুদ্রা ও বহুবিধ বিলাস-দ্রব্য বিদ্যমান। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে এই যে, সেখানে লিপি-খোদিত প্রায় ৬০০ সিলমোহর পাওয়া গিয়েছে। সে লিপি সেমিটিক কায়দায় ডান দিক থেকে বাম দিকে লেখা।

নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সিন্ধু-উপত্যাকার সভ্যতা ছিল দ্রাবিড়-সভ্যতা। এ-সভ্যতার সঙ্গে আর্য-সভ্যতার কোন সম্পর্কই ছিল না। দ্রাবিড় সভ্যতা ছিল নাগরিক আর আর্য-সভ্যতা ছিল আশ্রমিক। Sir John Marshall-ও এই পার্থক্যের কথা স্বীকার করেন। হরপ্প ও ময়েনজোদারোর ধ্বংসাবেশেষ সম্বন্ধে তিনি বলেন ঃ

"They exhibit the Indus peoples of the Fourth and the third millennium B. C. in possession of a highly developed culture in which no vestige of Indo-Aryan influence is to be found."

দ্রাবিড় কারা?

এখন দেখা যাক এই দ্রাবিড় জাতি কারা, কোথায় তারা ছিল এবং কোথা থেকে তারা এল।

পূর্বেই বলা হয়েছে, আর্যই হোক আর অনার্যই হোক, ভারত-ভূমির আদিম অধিবাসী কেউ-ই ছিল না। সবাই ছিল বহিরাগত। দ্রাবিড় জাতিও বিদেশ থেকে ভারতে এসেছিল। এ সম্বন্ধে Encyclopaedia Britanica বলেন ঃ

"At a still pre-historic stage, it is believed that an inflow of what are losely called Dravidian races made its way through Baluchistan from Western Asia and slowly penetrated India to the far south."

বলা বাহুল্য "Western Asia" বলতে ব্যাবিলন বা মেসোপোটেমিয়াকেই বুঝায়। এবং ঐ অঞ্চলই ছিল সেমিটিকদের আদিম বাসভূমি।

H.J. Fleure তাঁর "The Dravidian Element in Indian Culture" নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

"Who, then, are the Dravidians? What racial affinity have they with the populations outside India? How did they come? After much controversy, it is now, I believe, generally agreed that the main racial element in the Dravidian population is a branch of the Mediterranian race. ..... The Mediterranian

www.pathagar.com

races probably came from East Africa whence some of them wandered via Arabia and South-Persia to India."

দ্রাবিড় জাতি যদি পশ্চিম-এশিয়া থেকেই এসে থাকে, তবে স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই প্রমাণিত হয় যে তারা ছিল সেমিটিক নরগোষ্ঠীরই এক শাখা। কাজেই বলা যেতে পারে সিন্ধু-সভ্যতা ছিল সেমিটিক সভ্যতারই প্রতিরূপ। উভয় সভ্যতার সাদৃশ্যের কথা অনেক ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন। H.J. Fleure বলেন ঃ

"That in so for as the Dravidian civilisation was derived from outside sources, its origin is to be traced to Egypt and Mesopotania, linked up with India by sea commerce."

বস্তুতঃ দ্রাবিড়জাতি যে সেমিটিকদিগেরই জ্ঞাতি-ভাই ('cousins') এবং তারা যে টাইগ্রো-ইউফ্রেটিস ও নীলনদের উপত্যকা থেকেই ভারতে এসেছিল, তা এখন একরূপ নিশ্চিতরূপে অবধারিত।

সেমিটিক কারা?

এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগবে ঃ দ্রাবিড় যদি সেমিটিক হয়, তবে সেমিটিক কারা? তারা কি ব্যাবিলন বা মেসোপোটেমিয়ারই আদিম বাসিন্দা, না তারাও অন্য কোন দেশ থেকে আগত?

সেমিটিক অর্থে আরব, ইহুদী, আসিরীয়, ব্যবিলনীয়, ফিনিসীয় ও মিসরীয় জনগোষ্ঠীকেই বুঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আরবেরাই হচ্ছে আদি ও অকৃত্রিম সেমিটিক, আর আরবদেশই হচ্ছে সেমিটিকদের আদিম বাসভূমি। এ সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিকই এখন একমত। কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ঐতিহাসিকের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ-

Sayce বলেন ঃ

"The Semitic traditions conclusively prove that Arabia was the primitive home of the Semites."

Schrader বলেন ঃ

"Religious anecdotes, philological researches, historical and geographical evidences prove conclusively that the original home of the Semitic races was in Arabia."

Hitti বলেন ঃ

"Arabia was the cradle-land of the Semites."

অতএব বলা যায় সিন্ধু-উপত্যকার দ্রাবিড়-সভ্যতার সঙ্গে আরব বা সেমিটিক সভ্যতার পরোক্ষ সংযোগ ছিল।*

---

* * ইহুদীরা বলে হযরত নূহের দুই পুত্র ঃ শেম ও হেম। শেমের পুত্রের ইহুদী এবং তারাই প্রকৃত সেমিটিক; আর হেমের পুত্রেরা সেমিটিক অর্থাৎ আরব। কিন্তু বর্তমানে এ মত আর গ্রাহ্য নয়। সেমিটিক ভাষাভাষী সকল নরগোষ্ঠীকেই এখন সেমিটিক বলা হয়।

www.pathagar.com

আর্য-সভ্যতা

এইবার আর্য-সভ্যতার বিভিন্ন দিকের উপর কিছুটা অলোকপাত করা যাক।

আর্য কারা? কোথায় তাদের উৎপত্তি? কোথা থেকে কেমন করে কোন্ পথ দিয়ে কোথায় তারা গেল? এসব প্রশ্নের আজ পর্যন্ত কোন সুমীমাংসা হয় নি। আরবদের জন্যে যেমন আরব দেশ, মিসরীয়দের জন্যে মিসর, ব্যবিলোনিয়ানদের জন্যে ব্যবিলন, আর্যদের জন্যে তেমন কোন ভূভাগ বিশেষভাবে চিহ্নিত করা নেই। আর্যজাতির কীর্তিমালার কোন ধ্বংসাবশেষও আজ পর্যন্ত কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি। বহু প্রাচীন জাতির সভ্যতার নিদর্শন বহু দেশে বিদ্যমান, (যেমন ব্যবিলন, মিশর, নিনেভা, হরপ্পা, ময়েনজোদারো ট্যাক্সিলা ইত্যাদি) তেমন আর্য-সভ্যতার নিদর্শন কোনখানে আছে, কেউ জানেনা। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস (এম-এ, বি-এল) মহাশয়ের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য ঃ

"The Indo-Aryans claim that they are the most ancient in India, but that claim is false. India has no ancient monuments or relies like Egypt, Babylonia or Assyria.

তিনি আরও বলেন ঃ

"The ancient monuments, hitherto discovered in India, do not go beyond the Buddhistic era, i, e, the 6th century B. C. which, compared with Babylonian, Assyrian and Egyptian monuments, are but products of yesterday. And yet strange and absurd as it could seem, the Hindus claim to be the most ancient eivilised people of the world, more ancient than even the pre-dynastic races of ancient Egypt.....Such a claim, based is it as on mere tradition, and probably kept alive by sentimental vanity and not founded on any tangible proofs, is rightly dismissed by historians as unworthy of any credence or serious consideration."

আর্য-ধর্ম

আধুনিক হিন্দুধর্মও আর্যদের দান নয়। এর অধিকাংশ রীতি-পদ্ধতিই দ্রাবিড়দের কাছ থেকে ধার-করা (যেমন ত্রিশূল, শিবলিঙ্গ ইত্যাদি।) John Marshall বলেন ঃ

"There is enough in the fragments we have recovered about the religious articles found on the sites to demonstrate that this religion of the Indus people was the lineal progenitor of Hinduism."

www.pathagar.com

সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় ঐতিহাসিক K.M. Panikkar বলেন ঃ

"One thing certain, and can no longer be contested : Civilisation did not come to India with the Aryans—not only is Indian civlisation pre-Vedic, but the essential features of the Hindu religion, as we konw it today, was perhaps present in Mohenjo-Daro... The doctrine of Aryan origin of Hindu civilisation has clearly to be grealty modified."

আর্য-লিপি (?)

মানব-সভ্যতার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হচ্ছে লিপিজ্ঞান। সেই লিপিও আর্যদের দান নয়। বৈদিক সাহিত্যের কোথাও এমন প্রমাণ নেই যার দ্বারা জানা যায় যে প্রাথমিক আর্যরা লিপিচর্চা করত। শ্রুতিও স্মৃতিই ছিল তাদের জ্ঞানচর্চার প্রধান উপকরণ। কাজেই আর্যদের কাছ থেকে। ভারতীয়েরা লিপি জ্ঞান শিখে নাই, শিখেছিল সেমিটিকদের কাছ থেকে বস্তুত লিপি-আবিষ্কার যে সেমিটিক জাতির এক অবিস্মরণীয় কীর্তি, এ কথা সর্ববাদীসম্মত। Mr. Taylor বলেন ঃ

Among the things in this world which appear to be certain,nothing is more certain than that they (the Semitic people) invented our Alphabet."

এই লিপিজ্ঞান দ্রাবিড়রাই ভারতে এনেছিল। Butler-এর মতে অশোক-লিপি দক্ষিণ-আরব থেকে নেওয়া হয়েছিল। এ সম্বন্ধে Rawlinson বলেন ঃ

"The Brahmi script, the parent script of India, was borrowed from Semitic sources, probably about the 7th century B.C."

বস্তুতঃ বৈদিক যুগে যে কোনো লিপিই ছিল না, এবং ভারতীয় লিপি যে দক্ষিণ আরব, থেকে গৃহীত হয়েছিল এ সম্বন্ধে Buhler, Weber Taylor প্রভৃতি প্রাচ্যলিপি-বিশারদগণ, এমন কি ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও একমত।

তা হলে একথা নিঃসন্দেহেই বলা, যায় যে, আর্য-সভ্যতার দাবী বহুলাংশেই অসার। চিন্তাশীল ঐতিহাসিকেরা আর্য-থিওরীর অসারতা খুব ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম করেছেন। তাই অনেকেই এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন। নিম্নের উদ্ধৃতি সমূহ থেকেই বুঝা যাবে এই থিওরীর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া কত গভীর ও ব্যাপক।

www.pathagar.com

আর্য-থিওরীর অসারতা

J. H. Fleure তাঁর "Dravidian Element in Indian Culture" নামক পুস্তকে বলেছেন ঃ

"The great obstacle to a right apprciation of the Dravidian influence in the evolution of Indian culture is the wide currency and established position of what may be called 'Aryan myth.' Indians cling to the theory that they are Aryan. The word "Aryan' is legitimate enough, provided the definite meaning is attached to it as a name for the invaders from the North-West who introduced the Sanskrit language into India. It is illegitimate enough if used to imply the theory popularised by Max Muller that an ancient Aryan race of men, superior to other races, spread from the `original Aryan Home.' somewhere in Europe,dlsplacing the previous occupants and bequething to their descendants the various languages of the Indo-Germanic family. All attempts to harmonise that theory with the facts have broken down hopelessly."

আর্য-থিওরী যে অসার, অবাস্তব এবং সেমিটিক বিদ্বেষ-প্রসূত, নিম্নের উদ্ধৃতি থেকে তা আরও সুস্পষ্ট হবে ঃ

"The antiquity of Hindu culture was formerly much over-estimated. This combining with the assumption (now considered native) that ancient linguistic and genetic relationships were complimentary produced a notion that there was a sort of parent 'Aryan race.' The word thus became a favourite in racistic literature of the period of Gobineau, hence also in the intellectual aparatus of 20th century German anti-Semitism.These racial theories, old and new, are now regarded as historical nonsense."–(Columbia Encylopaedia).

এইসব বিবেচনা করেই অনেক পণ্ডিত আর্য-থিওরীকে শুধু একটা আবেগ-প্রবণ কল্পকাহিনী বলেই মনে করেন। Fleure তাই সোজাসুজিই বলে দিয়েছেন ঃ

"In India the Aryan theory rests upon a solid basis of sentiment."

o

www.pathagar.com

আর্যরা যে খুব শান্ত-শিষ্ট ও সভ্য ছিল, অনেকে তাও বিশ্বাস করেন না। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলিই তার প্রমাণ ঃ

"If we may judge from the two cases of the Greeks and the Persians, the aryans came rather as barbarians, who conquered, but accepted the superior civilisation of their subjects"—Historians' History of the World.

"The Indo-European races are represented to be a pious flock of a highly peace-loving type. This is not only a false but perverted statement of facts..... The Aryan comes out of a race that is the adept in the art of befooling mankind and leading them into erroneous ways. And in this kind of work the Aryan is a past master....The Aryans then must be regarded as relatively barbaric invaders, provided by their horses with an immense advantage of rapid and concerted movement."–(Pillai)

পরিশেষে Pillai চরম কথা বলে দিয়েছেন ঃ

"The term Indo-European is an ignorant title coined by ignorant Europe in an ignorant mood."

আর্য-থিওরীর উৎপত্তি

এইবার আর্য-থিওরীর উৎপত্তির কথা বলা যাক্। তা হলেই এর ভিতরকার অসারতা আরও সুস্পষ্ট হবে।

প্রাচীন কালের ইতিহাসে "আর্য' নামে কোন নরগোষ্ঠীর উল্লেখ নাই। আর্য-থিওরী অতি আধুনিক কালের সৃষ্টি। এর বয়স বড়জোড় দেড়শ' বছর। এর আগে আর্য-অনার্য বলে কোন কথাই ছিলনা। এই থিওরী হিন্দুদের সৃষ্টিও নয়। এটা ইউরোপের কারসাজি—বিশেষ করে জার্মানির! ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশের তদানিন্তন চীফ্ জাষ্টিস ও এসিয়টিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট Sir William Jones সোসাইটির এক অধিবেশনে একটি মূল্যবান গবেষণামূলক ভাষণ দান করেন। তাতে তিনি সংস্কৃত ফারসী গ্রীক ল্যাটিন জার্মান ইংরাজী প্রভৃতি কয়েকটি ভাষার কতিপয় শব্দ ও ধাতুরূপের বিশ্লেষণ করে দেখান যে, ঐ সব ভাষার মূলে ঐক্য আছে। এতেই তিনি মনে করেন, ঐসব ভাষা মূলতঃ এক সাধারণ ভাষা থেকে উদ্ভূত; অর্থাৎ আদিতে ঐসব ভাষাভাষী লোকেরা এক-পরিবারভুক্ত ছিল এবং তারা এক সাধারণ ভাষার কথা বলত। কালেকালে জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ায় নানা জাতির সৃষ্টি হয় এবং সেই সঙ্গে তাদের ভাষাও পৃথক ও স্বতন্ত্র রূপ ধারণা করে।

www.pathagar.com

এই নূতন ইংগিত পেয়ে ইউরোপে (বিশেষ করে জার্মানিতে) তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের (Comparative Philology) সৃষ্টি হয়। Klaproth, Bopp, Max Muller প্রমুখ জার্মান পণ্ডিতগণ এই ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত মিসর তত্ত্ববিদ (Egyptologist) Sir Thomas Young সর্বপ্রথম 'Aryan' ও 'Indo-European' কথা দুটি ব্যবহার করেন। সংস্কৃত, ফারসী গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান, কেল্টিক এবং স্লাভনিক—এই সাতটি ভাষা-গোষ্ঠীকে তখন থেকে "family of Indo-European languages"নামে অভিহিত করা হয় এবং ঐ সব ভাষাভাষী জাতিসমূহকে "Indo-European races" নামে চিহ্নিত করা হয়।

এই সময় থেকেই আর্যজাতি এবং আর্য-সভ্যতার প্রচার আরম্ভ হয়। অতি প্রাচীন কালে 'আর্য' নামে এক সুসভ্য জতি এশিয়া বা ইউরোপের কোন একস্থানে বাস করত—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস-সাগর মন্থন করে ফিরছে এবং গোঁজামিল দিয়ে তাদের থিওরীকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

আর্য-থিওরী যে একটা দূরভিসন্ধিমূলক রাজনৈতিক চাল, সে কথা এখন ক্রমেই সুস্পষ্ট হচ্ছে। এর মূলে কোন সত্যানুসন্ধিৎসা নেই। উৎকট সেমিটিক-বিদ্বেষ এবং অন্যান্য দুর্বল জাতিদের উপর প্রভুত্ববিস্তারের অসাধু উদ্দেশ্য থেকেই এই থিওরীর জন্ম। জার্মান জাতির গোঁড়ামি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। জার্মানরা মনে করে জগতের মধ্যে তারাই সর্বাপেক্ষা কুলীন জাতি। তাদের বিশ্বাস তারা হচ্ছে "herrenvolk" (master race)–অর্থাৎ সকল জাতির উপর প্রভুত্ব করবার অধিকার একমাত্র তাদের। এই উৎকট আর্যামির ফলেই জগতে দুটি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।

অসাধুতার প্রমাণ

একটা অসাধু উদ্দেশ্য থেকেই যে আর্য-থিওরী উদ্ভূত, তার দু-একটা প্রমাণ এখানে দিচ্ছি।

গোড়াতে Dr. Young তাঁর প্রবন্ধে ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষাগোষ্ঠীর যে তালিকা দিয়েছিলেন সেই তালিকার সঙ্গে বর্তমান তালিকার মিল নেই। Young-এর তালিকায় বাস্ক, ফিনিস এবং সেমিটিক ভাষা সমূহও ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষারূপে স্থান পেয়েছিল। Cambridge History of the Wrold একথা সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ

"Examination of the article, however, shows that Dr. Young meant by Indo-European something quite different from its ordinarily accepted signification. For under the term he included not only languages now known as Indo-European, but also Basque, Finish and Semitic languages."

Young-এর তালিকা থেকে সেমিটিক ভাষাগুলিকে বাদ দিবার হেতু কী?

www.pathagar.com

ভাষার রূপ ও প্রকৃতি জাতি-নির্ণয়ের কোন নির্ভরযোগ্য মাকাঠি নয়। ভাষার ধাতরূপ বা শব্দগত ঐক্য যদি জাতিগত ঐক্যের প্রমাণ হয়, তবে আরবী ভাষার সঙ্গেও ত ইংরাজী ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষার অতি নিকটসম্বন্ধ রয়েছে। দৃষ্টান্ত দেখুন ঃ

আরবী	ইংরাজী
আরদ্ (মাটি)	Earth
কান্দিল (বাতি)	Candle
কুৎ (বিড়াল)	Cat
কাফুর (কর্পুর)	Camphor
সালাৎ (প্রণতি)	Salute
কফিন (শববস্ত্র)	Coffin

এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ল্যাটিন ও সংস্কৃতের সঙ্গেও এইরূপ মিলের অভাব নেই। বস্তুতঃ আরবী ভাষাই হ'ল পৃথিবীর আদিম ভাষা। এই জন্যই একে 'উম্মুল আল্‌সিনা' বলা হয়। কাজেই ভাষার মাধ্যমে মানব-গোষ্ঠীর সম্পর্কের ইতিহাস জানতে হ'লে আরবী ভাষাকে কিছুতেই বাদ দেওয়া চলে না। সেমিটিক ভাষার তুলনায় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠির বয়স অতি অল্প। এ সম্বন্ধে Stuart Pigott-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য ঃ

"To-day we can recognise the Indo-European group of languages as a relatively junior member of the old-world linguistic family, evolving at a time when such languages as Sumerian and those in the Hametic and Semitic group were of respectable antiquity."

বস্তুতঃ সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। Max Muller তাই বলেন যে সংস্কৃত কোন ভাষার 'জননী' নয়, 'বড় বোন' হতে পারেঃ

"If Sanskrit had been the primitive language of mankind or at least the parent of Greek, Latin and German, we might understand that it should have led to quite a new classification of these tongues. But Sanskrit does not stand to Greek, Latin the Tutonic, Celtic and Slavonic languages in the relation of Latin to French, Italics and Sanskrit, as we saw before, could not be called the 'parent', but only the 'elder sister'."

কাজেই ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ভাষার ঐক্য ও সামঞ্জস্যের উপর যে তাঁদের সাধের আর্য-থিওরী দাঁড় করিয়েছেন তা নিতান্তই ক্ষণভঙ্গুর। Fillai ঠিক বলেছেনঃ

www.pathagar.com

"So reviewing the whole work done by the phiological school, we state that their labours have ended in failure. And failure is not their only demerit. They by their bad study have prevented the world from getting at a true knowledge of the Indo-European phenomenon."

আর্য-থিওরীর অন্তরালে

উপরে যতটুকু বলা হয়েছে, আশা করি তা থেকেই সকলে আর্য-থিওরীর স্বরূপ চিনতে পেরেছেন। এখন দেখা যাক এত তোড়জোড় করে এই থিওরী প্রচার করবার হেতু কী।

পূর্বেই বলেছি, উৎকট সেমিটিক-বিদ্বেষ এবং গভীর রাজনৈতিক দূরভিসন্ধিই আর্য-থিওরীর প্রেরণা ও উৎস-মূল। সকলেই জানেন, খৃষ্টান ও ইহুদীতে অহি-নকুল সম্বন্ধ। ইহুদীরা যিশুখৃষ্টকে পয়গম্বর বলে স্বীকার করেনি, বরং তাকে ক্রুশে, বিদ্ধ করে হত্যা করবার চেষ্টা করেছে। কাজেই ইহুদীদের উপর খৃষ্টানদের এবং খৃষ্টানদের উপর ইহুদীদের চিরকাল একটা জাতক্রোধ রয়ে গেছে। ইহুদীদের কোন প্রকার স্বীকৃতি না দেওয়াই হচ্ছে খৃষ্টানদের প্রধান লক্ষ্য।

ইহুদীদের ন্যায় আরবজাতিও খৃষ্টান জগতের চিরশত্রু। খৃষ্ট ধর্মের ত্রিত্ববাদের বিরুদ্ধে একমাত্র ইসলামই প্রকাশ্য প্রতিবাদ জানিয়েছে। এইজন্যই সমগ্র খৃষ্টান জগৎ ইসলামকে তাদের পথের মস্তবড় কণ্টক মনে করে। মধ্যযুগে ক্রুসেডের ইতিহাস পড়লেই বুঝা যাবে খৃষ্ট-জগৎ কি ভাবে এক এক সময়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। ইসলামী রাষ্ট্রগুলিকে নিশ্চিহ্ন করাই ছিল তাদের পণ। কাজেই ইহুদীদের ন্যায় আরব জাতি তথা মুসলিম-জাহানও খৃষ্টান জাতির চিরশত্রু। বলা বাহুল্য, ইহুদী ও আরব—উভয়েই সেমিটিক।

মানব-সভ্যতার ইতিহাস কিন্তু বলছে—জগতে সভ্যতার আলোক জ্বেলেছিল সর্বপ্রথম এই সেমিটিক জাতি। দক্ষিণ আরব (ইয়েমেন) এবং ব্যাবিলনই ছিল সভ্যতার আদিম লীলাভূমি। সভ্যতার অন্যতম প্রধান উপকরণ যে লিপি, তাও অবিসম্বাদিতরূপে সেমিটিকদের আবিষ্কার। ইয়েমেন, ব্যাবিলন, মিসর একই সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্র। অন্যান্য ক্ষেত্রেও সেমিটিকদের দান অনস্বীকার্য।

কিন্তু এ কথা মেনে নিলে খৃষ্টান ও অন্যান্য নন-সেমিটিক জাতি সমূহের মাথা চিরদিনের মত হেঁট হয়ে যায়। চির-শত্রুদের শ্রেষ্ঠত্বই তা হলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। খৃষ্টান-জগৎ তাই উঠে পড়ে লাগল এমন একটা থিওরী দাঁড় করাতে যার দ্বারা সেমিটিক থিওরী বানচাল হয়ে যায় এবং প্রমাণ করা যায় যে, আদিম সভ্যতা সেমিটিকদের দান নয়, অন্য কোন নন-সেমিটিক জাতির। এই দূরভিসন্ধিই আর্য-থিওরীর উৎস মূল।

www.pathagar.com

পাঠক স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেনঃ উপরোক্ত তথাকথিত আর্য ভাষাগোষ্ঠি থেকে তাই প্রথমেই সেমিটিক ভাষাগুলোকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যদিও সেমিটিক ভাষা সমূহ আর্য ভাষাগোষ্ঠি থেকে বহু প্রাচীন ও মর্যাদাসম্পন্ন।

সেমিটিক সভ্যতাকেও এখন অনুরূপ কৌশলে অবজ্ঞার অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আগে ব্যাবিলনকেই মানব সভ্যতার আদিম ধাত্রীগৃহ (Cradle of Civilisation) বলা হত; কিন্তু ব্যাবিলনের সভ্যতাকে এখন আর পূর্ব-মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। ব্যাবিলনের বুকে আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। আর্য-থিওরীষ্টদের এ এক অভাবনীয় নূতন টেকনিক।

আর্য-থিওরীর নূতন রূপ

আর্য-থিওরীর নূতন সংস্করণ হচ্ছে সুমেরিয়ান থিওরী। এতদিন সবাইকে একথা স্বীকার করে নিতে হয়েছে যে, সেমিটিকেরাই ছিল ব্যাবিলন সভ্যতার জন্মদাতা আর সেই সভ্যতাই ছিল পৃথিবীর আদিম সভ্যতা। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে এক নূতন থিওরী প্রচার করা হল। বলা হল ব্যাবিলন সভ্যতা সেমিটিকদের সৃষ্টি, সন্দেহ নেই, কিন্তু সে-সভ্যতাই সর্বপ্রাচীন নয়। সেমিটিকেরা যখন ব্যাবিলনে আসে, তার আগে ব্যাবিলনের দক্ষিণাংশে 'সুমার' নামক একটি প্রদেশ ছিল; সেই প্রদেশের অধিবাসীরা সেমিটিক ছিলনা, ছিল নন-সেমিটিক। তারাও সুলভ্য ছিল। সেমিটিকরা তাদের কাছ থেকে সভ্যতার অনেক কিছু ধার করে। কাজেই বলা যায় সুমেরিয়ান সভ্যতাই ছিল সেমিটিক সভ্যতার অগ্রবর্তী।

এখানেই শেষ নয়। সুমেরিয়ানরা নন-সেমিটিক ছিল বলেই পণ্ডিতেরা ক্ষান্ত হন নি; সুমেরিয়ানরাই যে সেই হারানো আর্য জাতি (lost Aryan tribes) একথাও জোরে শোরে তারা প্রচার করলেন। এমন কি Waddel প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা উল্লাসের আতিশয্যে এ কথাও ঘোষণা করলেন যে, ইংরাজেরা সুমেরিয়ানদেরই বংশধর।

এক ঢিলে দুই পাখী মারা হল। সেমিটিকদের গর্বও খর্ব করা হল, সঙ্গে সঙ্গে আর্যদের জন্য একটা আবাস-ভূমিরও ব্যবস্থা হয়ে গেল।

সুমেরিয়ান থিওরীর আবিষ্কারকে ইতিহাস আরও চমৎকার। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে British Museum-এ নিনেভার ভূগর্ভ থেকে উত্তোলিত একখানি ইস্টক-ফলক এসে হাজির হল। বিখ্যাত Egypotologist Sir Henry Rawlinson ইস্টক-ফলকে নূতন ধরনের এক রকম লিপিকার্য খোদিত দেখতে পেলেন। পরীক্ষা করে তাঁর মনে হল ইষ্টক-ফলকটি অ্যাসিরিয়ার রাজা অসুর বানিপালের লাইব্রেরীতে সংলগ্ন ছিল। ইষ্টক-ফলকে খোদিত লেখাটি তিনি সুমেরীয় লিপি বলে অনুমান করলেন। এই লিপির আকৃতি ও প্রকৃতি সেমিটিক লিপি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এ থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত

করলেন যে সেমিটিকদের আমগনের পূর্বে দক্ষিণ-ব্যাবিলনে সুমেরিয়ান নামক এক অতি সুসভ্য জাতি বাস করত। সেমিটিকরা তাদের জয় করে বটে, কিন্তু তাদের কাছ থেকে সভ্যতার অনেক কিছু ধার করে। কাজেই সেমিটিক সভ্যতা আদি ও অকৃত্রিম নয়।

বলা বাহুল্য, এই থিওরীও আর্য-থিওরীর মতই অলীক ও অসার। এর বিরুদ্ধে কয়েকটি যুক্তি এখানে পেশ করা যেতে পারে।

প্রথম কথা হচ্ছে, যে-ভাষাগত ঐক্য আর্য-থিওরীর প্রধান অবলম্বন বা ভিত্তিমূল, সেই ঐক্যসূত্র এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সুমেরিয়ান ভাষা থেকে যে সংস্কৃত, ফারসী গ্রীক, ল্যাটিন ইত্যাদি আর্য ভাষা সমূহ উদ্ভূত হয়েছিল তার প্রমাণ কি? কোন ভাষাতত্ত্ববিদকে আজ পর্যন্ত এমন কথা বলতে শুনিনি। এমন কি যে হীব্রু ভাষাকে ইহুদীরা জগতের আদি ভাষা বলে দাবী করে, তাও প্রথম মানব-ভাষা নয়, কারণ প্রবাদ আছে যে ব্যাবিলনে যে ভাষা-বিভ্রাট (Confusion of tongues) হয়, তার ফলেই বারোটি বাষার জন্ম হয়। হীব্রু ভাষা তাদের মধ্যে অন্যতম ঃ

"Of the language of Adam we know nothing; but if Hebrew, as we know it, was one of the languages that sprang from the confussion of tongues at Babel, it could not well have been the language of Adam or of the whole earth when the whole earth was still of one speech." –(Max Muller)

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, সুমেরিয়ান ভাষা কোন মৌলিক ভাষা কিনা সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এ বিষযের অন্যতম বিশেষজ্ঞ L.W. King বলেন ঃ

"...... a theory was propounded by M. Halivy to the effect that Sumerian was not a language in the linguistic sense of the term. The contention of Mr. Halivy was that the Sumerian compositions were not written in the language of an earlier race, but represented a cabalistic method of writing,invented and empolyed by the Bablonian priesthood. In his opinion, the texts were Semitic compositions, though written according to a secret system of code and they could only have been read by a priest who had the key and had studied the jealously-guarded formula. On this hypothesis it followed that the Babylonians and Assyrians were never preceded by a non-Semitic race in Babylon and all Babylon civilisation was consequently to be traced to Semitic origin."

যদি ধরে নেওয়াও যায় যে, সুমেরিয়ানরা একটা স্বতন্ত্র জাতি ছিল, তবে এখানেও সেই একই প্রশ্ন জাগবে ঃ সুমেরিয়ানরা কোথা থেকে এল? এ প্রশ্নেরও কোন জবাব নেই। King তাই বলছেন ঃ

www.pathagar.com

"Of the original home of the Sumerians from which they came to the fertile plains of Southern Babylonia, it is impossible to speak with confidence."

অনেকে সুমেরিয়ানেদের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও এই মত পোষণ করেন যে, সমগ্র ব্যাবিলনের সভ্যতা সেমিটিক ছাড়া অন্য কিছু হওয়া অসম্ভব। Dr. H. F. Helmolt তাঁর History of the World গ্রন্থে বলেন ঃ

"The History of Babylonia itself is Semitic, that of the adjoining nations, so far as they were subject to its influence is also Semitic."

বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ Hall বলেন ঃ ব্যাবিলনে সুমেরিয়ানদের আগমনের পূর্বেও সেমিটিক জাতিরাই বাস করত–

"There were probably inhabitants in Mesopotamia before the Sumerians arrived and it is hardly probable they can have been of other than Semitic race."

Historians' History of the Wrold সুমেরিয়ানদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ করেন ঃ

"Assyriologists are not fully agreed as to the share which the non-Semitic race had in the early civilisation. It has even questioned whether these so-called Sumerians really existed at all. In any event, the Semitic Babylonians acquired full control at a very early period."

নৃতত্ত্বের দিক থেকে লেখলেও দেখা যাবে সুমেরিয়ানরা স্বতন্ত্র কোন জাতি নয়। আরবদের সঙ্গেই ছিল তাদের গঠন-সাদৃশ্য। ঐতিহাসিক Smith বলেন ঃ

"Physical anthropologists seem united in treating the extant skulls of early Sumerians as being closely akin to modern Arab type."

কাজেই, যেদিক দিয়েই দেখি না কেন, আর্য-থিওরীর সমস্ত চেষ্টা যে ব্যর্থ হয়েছে,তাতে কোনই সন্দেহ নেই। Chokallingam Pillai-এর ভাষায় বলা যায় ঃ "The whole attempt must be considered to have ended in failure."

উপসংহার

এতক্ষণ আমরা আর্য-থিওরীর নানাদিক পরীক্ষা করলাম। এই থিওরী যে অন্তঃসারশূন্য এবং গভীর দূরভিসন্ধিমূলক, আশা করি সে কথা প্রমাণিত হয়েছে। মিথ্যা অভিজাত্যবোধ এবং উৎকট জাতি-বিদ্বেষই এর প্রধান প্রেরণা। এই থিওরী মানব-

www.pathagar.com

সভ্যতার ইতিহাসকে বিকৃত ও কলুষিত করেছে এবং মানবজাতির সত্যপরিচয়কে সবার চোখের আড়াল ক'রে দেখেছে। এই থিওরী উৎকট জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করেছে, মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে রেখেছে। পাঠান ও মোগল আমলে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ছিল, কিন্তু জাতিবিদ্বেষ ছিল না। জাতিবিদ্বেষ বৃটিশ আমলের সৃষ্টি। আর এর প্রধান কারণই হচ্ছে আর্য-থিওরী। হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের যে অবনতি, তার মূলেও আছে এই থিওরীর প্রভাব। কাজেই এই থিওরী যে মানবকল্যাণ-বিরোধী, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। সমস্ত কল্যাণকামী মানুষের উচিত এই থিওরীর অবসান ঘটানো। প্রতিক্রিয়া অনেক আগেই শুরু হয়েছে। দ্রাবিড় ও অন্যান্য নন-আর্য জাতিদের মধ্যে পূর্বেই অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। বহুযুগের পুঞ্জীভূত রোষ ও অসন্তোষ গোপনে গোপনে কোথায় যেন ধূমায়িত হয়ে উঠছে। হয়ত শীঘ্রই আসবে একটা যুগান্তকারী অগ্নি-বিপ্লব আর তার মধ্যে জন্মলাভ করবে আমাদের অনাগত দিনের নূতন ইতিহাস।

লেখক-সংঘ পত্রিকা

১৯৬১

আধুনিক কবিতা

বাংলাকাব্য-সাহিত্যে 'আধুনিক কবিতা' কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। একে এখন গ্রহণ করাও কঠিন, বর্জন করাও কঠিন। সহজ পথে এ আসেনি; নানা দ্বন্দ্ব ও জিজ্ঞাসা সাথে নিয়ে এসেছে।

সর্বপ্রথম সমস্যা হচ্ছে এর সংজ্ঞা নিয়ে। 'আধুনিক কবিতা'র অর্থ কী? সাম্প্রতিক কবিতা? তাহ'লে কোন্‌খান থেকে কোনখান পর্যন্ত এর সীমারেখা? কেউ তা বলে দিতে পারবেনা। কারণ 'আধুনিক' কথাটা হল অপেক্ষিক। কোন নির্দিষ্ট সময়-রেখা দ্বারা সে চিহ্নিত নয়। আজ যা আধুনিক, কালই তা প্রাচীন; আবার আজ যা প্রাচীন একদিন তাও ছিল আধুনিক। নিরবচ্ছিন্ন একটানা স্রোতে বয়ে চলেছে কালের নদী; এ-নদীতে দুবার কেউ স্নান করতে পারে না। আধুনিক কবিতার দিনক্ষণ তাই পঞ্জিকা দেখে স্থির করা যাবে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে হয়, কাব্যের আধুনিকতা 'কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা।' সত্যি তাই। বয়সেই যদি হত, তবে এই আধুনিকতার বয়স হত এখন একশ বছরেরও ওপর। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশে এর জন্ম এবং খ্যাতনামা ফরাসী কবি বোদলেয়ার এর জন্মদাতা। 'ষোড়শীবালার' মতে একটা স্বপ্ন ভরা নামের যাদুমন্ত্র দিয়ে সে এখন পর্যন্ত তরুণদের মন জয় করে রেখেছে।

আধুনিক কাব্য ইউরোপের সৃষ্টি। বাংলা দেশে এর ঢেউ এসে পৌঁছায় প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পরেই। ১৯৩০ সালের কাছাকাছি সময়ে সুধীন দত্ত বোদলেয়ারের অনুসরণে 'কাব্যের মুক্তি' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করে তৎকালীন কবি-সাহিত্যিকদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেন। সেখান থেকেই বাংলা কাব্যে আধুনিক যুগের সূচনা। যাঁরা এ

www.pathagar.com

যুগকে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন, তাঁদের পুরোভাগে আছেন সুধীন দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে প্রভৃতি প্রগতিশীল কবিরা। বস্তুত ঃ 'কল্লোল' যুগের কবিরাই ছিলেন এই নূতন পথের দিশারী আর পশ্চিম-সাগর থেকেই এসেছিল এই নব-কল্লোল।

আধুনিক কবিতার পরিচয় দিতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু বলেন ঃ

"এই আধুনিক কবিতা এমন কোন পদার্থ নয়—যাকে কোন একটা চিহ্ন দ্বারা অবিকল ভাবে সনাক্ত করা যায়। একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের কবিতা, প্রতিবাদের কবিতা,—সংশয়ের ক্লান্তি সন্ধানের কবিতা।"

এর চেয়েও স্পষ্টতর পরিচয় দিয়েছেন আবু সাঈদ আইউব ঃ

"-কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রভাবমুক্ত (বা মুক্তি-পিয়াসী) কাব্যকেই আধুনিক বাক্য বলা যায়।"-(আধুনিক কাব্য পরিচয় ঃ দীপ্তি ত্রিপাঠী)

কথাটা ঠিক। তবে এর কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। আধুনিক কবিরা যে ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্র-বিরোধী, তা নয়; রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা ভাবধারা ও কাব্য-রীতিরই তাঁরা বিরোধী। এবং এই একই কারণে রবীন্দ্রনাথ যে-গোষ্ঠীর কবি, সেই গোষ্ঠীর (পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী) সবাইকেই তাঁরা সচেতনভাবে অবজ্ঞা করে চলেন।

আধুনিক কবিরা রবীন্দ্র-বিরোধী কে হলেন, তা বুঝতে হলে আধুনিক কবিতার জন্ম-কথায় আমাদের ফিরে যেতে হবে।

পূর্বে বলে এসেছি আধুনিক কবিতার জন্মদাতা হচ্ছেন বোদলেয়ার। তখন ইউরোপীয় সাহিত্যে ক্লাসিক-রোমান্টিকে দ্বন্দ্ব চলছে। এক ঘেঁয়েমি এবং অতিশয়োক্তি দোসে রোমান্টিক কাব্য তার আবেদন হারিয়েছে। এ কাব্যের অনেকখানিই ছিল মনোময় ও অবাস্তব। খনিজ পদার্থের মত প্রকৃত কাব্যের (poesia) সংগে অনেক অকাব্যও (non-poesia) মিশে থাকত। বোদলেয়ার পূর্বসুরিদের এই কাব্যরীতিতে সন্তুষ্ট হলেন না; তিনি চাইলেন অকাব্য থেকে কাব্যের মুক্তি। তিনি বললেন ঃ কবিতা হবে এমন বস্তু—যার সবটুকুই হবে কাব্যময়। প্রতিটি পংক্তি হীরার টুকরার মত জ্বল্‌জ্বল করবে, আর প্রত্যেকটি কবিতা হবে এক-একটি মণিহার। বাস্তব জীবনের গভীর সত্যানুভূতি ও বিচিত্র রহস্য-উদ্‌ঘাটনই হবে এ কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বলা বাহুল্য এই আদর্শকে রূপ দিতে গিয়ে কিছুকিছু আঙ্গিক পরিবর্তনেরও প্রয়োজন দেখা দিল। শব্দের যথার্থ প্রয়োগ ও মিতব্যয়িতা, উপমা অনুপ্রাস ও রূপকের নব প্রয়োগ দ্বারা নবনব চিত্রকল্প সৃষ্টি ইত্যাদি অনেক কিছুই নূতন ভঙ্গী ও রূপসজ্জার প্রয়োজন হল। এই নূতন ঢংএর প্রথম কাব্যগ্রন্থ হল বোদলেয়ারের 'ফ্ল্যর দ্যু ম্যল'। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এর প্রথম প্রকাশ এবং সেই থেকেই আরম্ভ হল কাব্যের নূতন যুগ।

www.pathagar.com

ইংরাজি সাহিত্যে সর্বপ্রথম এই কাব্যরীতির প্রচলন করেন আইরিশ কবি ইয়েটস্। তিনি ফরাসী জানতেন না। অনুবাদের সাহায্যে মোটামুটিভাবে বোদলেয়ারের কাব্য তিনি পাঠ করেন। Ezra Pound ও T. S. Eliot- ও পরে বোদলেয়ারের অনুসরণের নূতন ভঙ্গীতে কাব্য রচনা করেন। Ezra Pound বোদলেয়ারের কয়েকটি পুস্তকের অনুবাদও করেন। হুইট্‌ম্যানও ইংরাজী সাহিত্যে বিশিষ্ট আধুনিক কবিদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, ইয়েট্‌স্, এজরা, পাউণ্ড, হুইট্‌ম্যান বা এলিয়ট—এঁরা কেউ-ই আসলে ইংরাজ নন। এঁরা সবাই বিদেশী। আশ্চর্য যে, খাস কোন ইংরেজ কবিই আজ পর্যন্ত আধুনিক কাব্যে খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি। এজরা পাউণ্ড তাই বলেন ঃ We speak a language that was English" আভিজাত্যপূর্ণ বৃটিশ জাতের ধাতে হয়ত এই প্রগল্‌ভ আধুনিক কাব্য সহ্য হয় না। তাই এই বিড়ম্বনা।

এই হল আধুনিক কাব্যের গোড়ার কথা।

বোদলেয়ার কী ধরনের কবিতা রচনা করলেন, তার ২/১টা নমুনা সামনে রেখে কথা বললে আমাদের আলোচনা সহজবোধ্য হবে। বুদ্ধবেব বসুর অনুবাদ থেকে এখানে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

মহাপ্রাণ এক বৃদ্ধা দাসীর মৃত্যুতে বোদলেয়ার তাঁর মাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন ঃ

"মহাপ্রাণ সেই দাসী, তুমি যাকে ঈর্ষা করেছিলে
মগ্ন হ'ল ঘুমে আজ তুচ্ছ তৃণ-পল্লবের তলে।
তবু চল, কিছু ফুল দিয়ে আসি তাকে একদিন
আহা মৃত, মৃত ওরা, কী বিরাট কষ্টের অধীন।
যবে রিক্ত তরুদল নিশ্বসিত ম্লান অক্টোবরে।
মর্মর ফলক ঘিরে খেদময় বায়ু ঘুরে মরে।
তখন ঘুমোই যারা বেঁচে থেকে উষ্ণতার লীন,
কী কঠিনভাবে ওরা আমাদের, কী হৃদয়হীন!
ধরো, কোন সন্ধ্যায় যখন কাঠ অগ্নিকুণ্ডে ফেঁসে
যদি তাকে দেখি শান্ত অস্পষ্ট চেয়ারে আসে বসে,
যদি ডিসেম্বরে, কোন হিমস্রব নীল যামিনীতে
দেখি, সে কুঁক্‌ড়ে আছে এককোণে ঘরের নিভৃতে,
যদি উঠে আসে মৌন চিরন্তন শয্যাতল ফেলে
তার বুড়ো ছেলেকে আশ্রয় দিতে মাতৃচক্ষু মেলে
তা হলে স্খলিত অশ্রু দেখে তার পল্লবের তলে
সেই পুণ্য আত্মাকে উত্তর দেবো কোন্ কথা বলে?

কী মৌলিক ভাবগম্ভীর করুণ রসসিক্ত কবিতা! বাহুল্য নেই, অতিশয়োক্তি নেই; অস্পষ্টতা নেই, দুর্বোধ্যতা নেই; প্রতিটি শব্দ অপরিহার্য প্রয়োজনের সমুজ্জ্বল।

www.pathagar.com

প্রকৃতি সম্বন্ধে বোদলেয়ার কত উন্নত অনুভূতি ছিল, নিম্নের কবিতায় তা সুস্পষ্ট ঃ

"বলো আমাকে, রহস্যময় মানুষ,
কাকে তুমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো?
তোমার পিতামাতা ভ্রাতা অথবা ভগ্নীকে?
পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী কিছুই নেই আমার।
তোমার বন্ধুরা?
ঐ শব্দের অর্থ আমি কখনো জানিনি।
তোমার দেশ?
জানিনা কোন্ দ্রাঘিমায় তার অবস্থান
সৌন্দর্য?
পারতাম রটে তাকে ভালোবাসতে দেবী তিনি, অমরা।
কাঞ্চন?
ঘৃণা করি কাঞ্চন— যেমন তোমরা ঘৃণা কর ভগবানকে।
বলো তবে, অদ্ভুত অচেনা মানুষ, কী ভালোবাসো তুমি?
আমি ভালোবাসি মেঘ– চলিষ্ণু মেঘ....ঐ উঁচুতে ....ঐ উঁচুতে........
আমি ভালোবাসি আশ্চর্য মেঘদল।"

– (অচেনা মানুষ)

বোদলেয়ারের প্রেমের কবিতাও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা-প্রসূত। অনেকগুলিই তার আপন জীবনের প্রতিচ্ছবি। তার 'চুল' কবিতা এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

"অনেক অনেক্ষণ ধরে তোমার চুলের গন্ধ
টেনে নিতে দাও আমার নিশ্বাসের সাথে
আমার সমস্ত মুখ ডুবিয়ে রাখতে দাও তার গভীরতায়
ঝরণার জলে তৃষ্ণার্তের মত
সুগন্ধি রুমালের মত তা নাড়তে দাও হাত দিয়ে।–
তোমার চুলে সম্পূর্ণ একটি স্বপ্ন বিজড়িত
সেখানে পালের আর মাস্তুলের ভিড়
তার মধ্যে অনেক বিশাল সমুদ্র, যাদের উপর দিয়ে
মৌসুম বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যায় মোহময় দেশে,
আমাকে কামড়াতে দাও অনেকক্ষণ ধরে
তোমার ঘনকালো গুচ্ছ গুচ্ছ চুল
স্পিং-এর মত বেশামাল বিদ্রোহী তোমার চুল
আমি যখন দাঁত দিয়ে কুটকুট করে কাটি
আমার মনে হয় একটু একটু করে স্মৃতিগুলোকে খাচ্ছি।

www.pathagar.com

বোদলেয়ারের অশ্লীল কবিতাও অনেক আছে। বাস্তব জীবনের সেগুলি নগ্নরূপ—'পাপ থেকে নিংড়ে বের করা সৌন্দর্য'। কতিপয় অশ্লীল কবিতা প্রকাশের জন্য তাঁকে আদালতে অভিযুক্ত করা হয় এবং তাতে তাঁর কিছু অর্থদণ্ড হয়। কিন্তু শ্লীলতার সীমা লংঘন করলেও বা অত্যন্ত যৌনগন্ধী (Sexy) বা পর্ণগ্রাফিক হলেও, সে সব কবিতার মধ্যেও অপূর্ব কাব্য-সৌন্দর্য রয়েছে। গভীর পরিতাপের বিষয়, কবি অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলভাবে জীবন যাপন করেছিলেন এবং তার ফলে অকালে (মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সে) বহু দুঃখকষ্টের মধ্যে তাঁকে প্রাণত্যাগ করতে হয়েছিল।

আধুনিক বাংলা কবিতা

বোদলেয়ারের আলোকে এইবার আমাদের আধুনিক বাংলা কবিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক্।

আধুনিক বাংলা কবিতায় যেসব লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে, সেগুলি মোটামুটি এই ঃ

(১) বর্তমান জীবনে ক্লান্তি ও নৈরাশ্য
(২) ফ্রয়েডীর মনস্তত্ত্ব
(৩) দেহের কামনা ও বাসনার বাস্তব-রূপায়ণ
(৪) মার্ক্সীয় দর্শনের প্রভাব
(৫) আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাব
(৬) মননধর্মিতা
(৭) প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে (যথা প্রেম সুন্দর কল্যাণ ধর্ম ইত্যাদিতে সংশয় এবং অবিশ্বাস।
(৮) পূর্বসুরীদের কাব্যরীতির প্রতি অবজ্ঞা ও তাঁদের পন্থা বর্জন।
(৯) বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি, পুরাণ ও ঐতিহ্যের ব্যবহার।
(১০) উপমা প্রয়োগের নবকৌশল।
(১১) ভাব ও চিন্তাধারায় উল্লম্ফন
(১২) অব্যয় পদের বহুল এবং অনাবশ্যক প্রয়োগ
(১৩) দুরূহ শব্দের প্রয়োগ দ্বারা পাণ্ডিত্য প্রদর্শন
(১৪) বাকরীতি এবং কাব্যরীতির সংমিশ্রণ

–(দেখুন ত্রিপাঠীর কাব্য-পরিচয়)

এই সঙ্গে কয়েকটি আধুনিক কবিতা পাঠ করলেই উপরোক্ত মন্তব্যগুলির সত্যতা প্রমাণিত হবে ঃ

সুধীন দত্ত

"মহাশূন্যের মৌনে পরিস্ফীত
বিবিক্তি আজ বেষ্টনী বিরহিত
অধুনায় নিশ্চিহ্ন অতীত—আগামী

www.pathagar.com

নাস্তিতে নেতি স্বতঃসিদ্ধ প্রমা
অগতির গতি মনোরথ বৃথা লাগামই।"

–(প্রতীক্ষা ঃ দশমী)

"অবশ্য অপ্রতিকার্য অন্তিম কুম্ভক
অনুতার্য নাস্তির কিনারা
বৈকালিক ষড়যন্ত্রে তুল্যমূল্য তুঙ্গ ধ্রুবতারা
ও মগ্ন চুম্বক।

–(নৌকাডুবি ঃ দশমী)

"মোদের ক্ষণিক প্রেম স্থান পাবে ক্ষণিকের গানে
স্থান পাবে, হে ক্ষণিকা শ্লথনীবি যৌবন তোমার
বক্ষের যুগল স্বর্গে ক্ষণতরে দিলে অধিকার
আজি আয় ফিরিবনা শাশ্বতের নিষ্ফল প্রয়াসে।"

– (হৈমন্তী ঃ অর্কেস্ট্রা)

জীবনানন্দ দাশ

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে!
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে
আসে
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে?

–(মহাপৃথিবী)

"আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি এইখানে
বসে থাকি কামরাঙা লাল মেঘ যেন মৃত মনিয়ার মত
গঙ্গা-সাগরের ঢেউয়ে ডুবে গেছে, আসিয়াছে শান্ত অনুগত
বাংলার নীল সন্ধ্যা—কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে
আমার চোখের পরে আমার মুখের পরে চুল তার ভাসে।

–(রূপসী বাংলা)

"আমরা মেঘের মত হঠাৎ চাঁদের বুকে এসে
অনেক গভীর রাতে একবার পৃথিবীর পানে
চেয়ে দেখি, আবার মেঘের মত চুপে চুপে ভেসে
চলে যাই এক ক্ষীণ বাতাসের দুর্বল আহ্বানে
কোন দিকে পথ বেয়ে। আমাদের কেউ কি তা জানে!
চলে যাই কোন্ এক রুগ্নহাত আমাদের টানে।

www.pathagar.com

পাখীর মায়ের মত আমাদের নিতেছে সে ডেকে
আরো আকাশের দিকে—অন্ধকারে-অন্য কারো আকাশের থেকে।
– (অনেক আকাশ ঃ ধূসর পাণ্ডুলিপি)

"গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত ;
আমাকে কে জাগাতে চাও?
হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল,
হে স্মৃতি, হে হিম-হাওয়া,
আমাকে জাগাতে চাও কেন?
অরব অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছলচ্ছল শব্দে
জেগে উঠব না আর;
তাকিয়ে দেখব না নির্জন বিমিশ্র চাঁদ বৈতরণীর থেকে
অর্ধেক ছায়া গুটিয়ে নিয়েছে
কীর্তিনাশার দিকে।
ধানসিঁড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকবো
– ধীরে– পউষের রাতে
কোনদিন জাগবো না জেনে–
কোনদিন জাগবো না আমি– কোনদিন আর।
–(বনলতা সেন)

বুদ্ধদেব বসু

আকাশে জমেছে মেঘ, পথ নিরিবিলি
সব চুপ; রাত দু'পহর
বাড়িগুলি অন্ধকার—পথের দুধায়ে
ঘুমায় শহর।
হঠাৎ পথের মোড়ে একটি বাড়ির
নিচের ঘরের জানালায়
দেখিলাম, ম্লান নীল ইলেকট্রীকের
আলো দেখা যায়।
নিলাম তাহার ফাঁকে পলকের তরে
একখানি শাদা হাত দেখে
দুইটি কবাট এসে বুজিল তখনি
দুই দিক থেকে।
একখানা সাদা হাত, কয়টি আঙ্গুল
আংটির হীরার ঝলক

মণিবন্ধে সরু রুলি, ম্লান-নীল আলো
চোখের পলক।
আমার দুচোখ ভরে ঘুম নেমে এল
সকল পৃথিবী অন্ধকার
এই কথা না জেনেই মৃত্যু হবে মোর-
হাতখানি কার।

-(কঙ্কাবতী)

বিষ্ণু দে

"কবে বলো প্রাত্যহিক তোমার শরীর মনে ঘরে
আমার প্রাণের বাষ্প নীড় পাবে তোমার আকাশে
যেখানে হাওয়ায় ভাসে
কখনো একাগ্র ঝঞ্ঝা, কখনো উন্মানা শুকতারা
নিদ্রাহীন আমার আকাশে।

-(অন্বিষ্ট)

"মধ্যবয়সী, তবুও তনু তোমার
আশ্বিন আলো ছড়ায় আমার মনে।
ফেলে দিই ভয় ফেরার পীত বোমার
জীবন ঘনায় তোমার আলিঙ্গনে।
তোমার বাহুতে আমায় জীবন স্মৃতি
দ্বৈত-রচনা, গত-অনাগত প্রীতি।
উপমা তোমার খুঁজিনিকো আকিতেন
এলেওনেরে তো সহজিয়া ত্রুবাদুর
হেলেনকে চাওয়া উদ্বাহু ফাঁসি জেনে
দেহমনে মনজীবনের ভেদ-আতুর
রোমাঞ্চ-গান করিনি প্রেম তোমার
অলকানন্দা অনন্তগতি তার।

-(সন্দীপের চর)

আরও উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। অমিয় চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র—অনেকের কবিতাই উদ্ধারযোগ্য। কিন্তু স্থানাভাব বশত ঃ তা থেকে বিরত রইলাম। আমাদের আলোচনার জন্য উপরের উদ্ধৃতিগুলিই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।

www.pathagar.com

পূর্ব-পাকিস্তানের আধুনিক কবিতা

এইবার আমরা আধুনিক কবিতার চতুর্থ স্তরে নামছি। পশ্চিম-সাগর থেকে যে 'কল্লোল' ইংলন্ড হয়ে পশ্চিম বাংলায় এসে লেগেছিল, তার ঢেউ পদ্মা পাড়ি দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানেও এসে পৌঁছাল। দেখা যাক এখানে সে কোন্ রূপে কোন্ বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রকাশ করল।

আবুল হোসেন

"আমি কি জানতাম একদিন আমারও এ দশা হবে
রিক্সার কড়াই থেকে কলার খোসায় পা পিছলায়ে
টলোমলো সকাল-বিকেল হয়ে যাবে হাত-সাফাই
রেশন শপের ভীড়ে। আপিসের লাইনে দাঁড়িয়ে
রিফু করা জামার পালিসে ঢেকে হতাশার ছাই
করব ফেরি যা কিছু সাধের বলে শিখেছি শৈশবে
কিংবা ভুলতে হবে সেই পাঠ যা গলা চিরে ঘামে গলে
মুখস্ত করিনি শুধু পরীক্ষার কাজে লাগবে বলে?
কলকে পাই বর্তে যাই এরণ্ডের মাঝে বৃক্ষ বনে
সিংহের মেকাপে যত শেয়ালেরা আসর জমায়
আমিও তাদের সঙ্গে উঠি বসি।"

– (সংলাপ)

সৈয়দ আলি আহ্‌সান

"প্রতিদিন বারবার নিঃসন্দেহে একথা জেনেছি
জেনেছি সূর্যের সাক্ষ্যে কিছু নেই আশ্বাসের মতো
জীর্ণ হয়ে ঝরে গেছে সব স্বপ্ন, সমস্ত বিশ্বাস–
সমস্ত নিঃশেষ করে একটি সত্যের মধে হঠাৎ জেগেছি
উন্মুখ দেহের প্রাণে মৃত্যু নিয়ে হঠাৎ বেঁচেছি।"

–(অনেক আকাশ)

শামসুর রহমান

"জানিনা রাত্রির কানে কার নাম প্রার্থনার মতো
বল তুমি ঘন ঘন অন্ধকার নিশ্বাসের স্বরে,
পূর্বের জানালা খুলে গুণ্‌গুণ গান গেয়ে শেষ
যখন শয্যায় জ্বলে দেহ, কার মুখ ভেবে
তোমার চোখের হ্রদে নামে সব ঘুমের অপ্সরী

www.pathagar.com

কার স্বপ্ন দেখে, কার তীব্র চুম্বনের প্রতীক্ষায়
তোমার যুগল স্তন স্বর্গ হয়ে রাত্রির নরকে
শেষ ক্ষমা চেয়ে নেবে পরিচিত পৃথিবীর কাছে
কোন্ ক্ষণে, জান্‌বোনা কোনোদিন—কোনোদিন তবু।

–(প্রথম গান ঃ দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে।)

"ইচ্ছা আর অনিচ্ছায় জীবন ভোর কলাম ঠেলে
হায় রে তুমি কীই বা পেলে।
দিনরাত্রি পুঁথির শত পাহাড় খুঁড়ে দেখলে শেষে
পোড়া কপাল, মুষিক মেলে!
কালের শেষে অকাল সাঁঝ নিমেষে এর হঠাৎ ভেসে
দেখলে শেষে যৌবনের পরম গতি নিরুদ্দেশে।"

– (ঐ)

আলাউদ্দিন আল্ আজাদ

সহসা অবাক লাগে ছিপছিপে নদী আর উবু জনপদ
কাঁপে কার থরথর সজোর ঘোড়ার খুরে বনঝোপগুলি
কান খাড়া স্নেহাতুর হরিণ শিশুর মত খড়ের বাসায়
কোকিলের বলাবলি, কেন এত গান জমে গলায় গলায়,
হৃদয়ের ঢেউ ছুঁয়ে? নিশীথ রাতের তারা, তারা ফেটে যায়
কাকের ডিমের মত পরিমিত বেদনায় দালানের পিঠে
হতবাক হয়ে চাঁদের রূপালি খোসা।"

–(জলরং ঃ মানচিত্র)

আরো দু'চারজন আধুনিক কবির লেখা উদ্ধৃত করতে পারতাম, কিন্তু তাতে লাভ হবে না বিশেষ, কেননা আমার উদ্দেশ্য অন্যরূপ। আমি দেখাতে চেয়েছি পশ্চিম বঙ্গের তুলনায় এখানকার কবিরা কোন নিজস্ব পথ খুঁজে পেয়েছেন কিনা, অথবা 'সাতটা তারার তিমিরে' তাঁরাও ঘুরে মরছেন।

আধুনিক কবিতার দোষগুণ

আধুনিক কবিতার যে-পরিচয় উপরে দিলাম, তা থেকে এর দোষগুণ অনায়াসেই বুঝা যাবে। প্রথমেই এর দোষের কথা বলি। প্রথম এবং প্রধান দোষ হচ্ছে এর দুর্বোধ্যতা। আধুনিক কবিতা কেউ পড়তে চায় না। তার কারণ অনেকের কাছেই এ দুর্বোধ্য ও আবেদনহীন।

www.pathagar.com

কিন্তু আধুনিক কবিরা এবং তাঁদের সমর্থকেরা এই দুর্বোধ্যতার একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা বলেন ঃ এই দুর্বোধ্যতার জন্য লেখক যতটা না দায়ী, তার চেয়ে বেশি দায়ী পাঠক। আর এটা অস্বাভাবিকও কিছু নয়, এটা হচ্ছে যুগলক্ষণ। আজকার যুগ গতির যুগ। আজ যুগমানসে কোন ধৈর্য বা স্থৈর্যের অবকাশ নেই; চিন্তার গভীরতা নেই; উচ্ছ্বাস নেই, আবেগ নেই, আছে শুধু উদ্বেগ। আধুনিক কবিদের মনও তাই যুগমনের সঙ্গে একসুরে বাঁধা। কেমন করে তারা তবে যুগপ্রভাবকে অতিক্রম করবে? কবিরা ত যুগেরই প্রতিনিধি। পাঠক যদি যুগের সঙ্গে তাল রাখতে না পারে, তার জন্য দায়ী হবে কে?

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়েও আধুনিক কাব্য দুর্বোধ্য হতে বাধ্য। চিন্তার সংলগ্নতা বা সুসংগতি না থাকলেই কাব্য দুরূহ হয়। কিন্তু চিন্তার সংলগ্নতা আজ বিরল। আজ একই বিষয় নিয়ে বেশিক্ষণ চিন্তা করা আর সম্ভব নয়। বাইরের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের মন এখন চঞ্চল। কবিদেরও অবচেতন মনে ক্ষণে ক্ষণে কত চিত্রকল্পই না ভেসে ওঠে! ধরুন একজন তরুণ কবি চাকুরি করেন। অফিসের ফাইল ঘাটতে ঘাটতে হঠাৎ তার মনে গিয়ে উপস্থিত হল সিনেমাগৃহে ; সেখান থেকে এক রেস্তোরাঁয়, এমন সময় ক্রিং-ক্রিং ক্রিং বড় সাহেবের ফোনের ডাক—মুহূর্তে ভেঙে যায় রঙিন স্বপ্ন। আবার আসে তন্ময়তা। হঠাৎ জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় পথ-চলা এক সুন্দরী মেয়ের মুখ—বাধা পড়ে তার চিন্তায়। আধুনিক কবিতাও ঠিক এইরূপ। ধারাবাহিক কোন পূর্ণাঙ্গ চিত্র এতে পাওয়া যাবে না। দমকা হাওয়ার মত হঠাৎ এর আগমন, হঠাৎ এর প্রস্থান। স্বাভাবিকভাবে কবির অবচেতন মনে যেসব ভাব জাগে, তাই সে লিখে যায়। কাব্য এখন তাই ফিল্‌ম্‌-ধর্মী; উল্লম্ফন ও ইংগিতে ভর্তি। শূন্য স্থানগুলি পাঠককে পূরণ করে নিতে হয়।

এ যুগের পাঠককে তাই প্রস্তুত হয়ে আসতে হবে। অলস নিষ্ক্রিয় পাঠকের স্থান আর নেই। শুধু যে লেখকই বিনিয়ে বিনিয়ে সব কথার মালা গেঁথে দেবেন, আর অবসর মুহূর্তে পাঠক তা শুয়ে বসে উপভোগ করবেন, তা হবে না। পাঠককেও এখন মেহনত করতে হবে। আবৃত্তির যুগ চলে গেছে। ভাব-প্রকাশের বা ভাব-গ্রহণের দিনও চলে গেছে। এখন কবিতা পড়তে হবে বুদ্ধি ও অনুভূতির আলোকে নীরব নেত্রে। যারা অর্থ খুঁজতে যাবে, তারা এযুগের এক নম্বর বোকা পাঠক।

দুর্বোধ্যতার আর একটি কারণও আছে। মানব-জীবনের খানিকটা বাস্তব, খানিকটা স্বপ্ন; খানিকটা চেতন, খানিকটা অবচেতন। দুটো মিলিয়ে তবে আমাদের পূর্ণ-জীবন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে অবচেতন মনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা চলছে। কাব্য ও আর্টও সেই পরিপ্রেক্ষিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। বাস্তব ও অতি-বাস্তবের মধ্যে যে প্রাচীর ছিল, তা তলে দিয়ে দুটোকে এক করে দেখার চেষ্টা চলছে। অন্য কথায় জীবনকে এখন আর স্বতন্ত্রভাবে বাস্তব বা উর্ধ্ব-বাস্তব রূপে দেখা হচ্ছে না, সামগ্রিক রূপে দেখবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই পূর্ণ রূপকে সুররিয়ালিজম (Surrealism) বলে। কথাটা আসলে Super-realism, অন্য কথায় রোমান্টিসিজম্‌ ও রিয়ালিজমের এর সংমিশ্রণ।

www.pathagar.com

বলা বাহুল্য, আধুনিক কাব্যের এই প্রয়োগ-কৌশলের সঙ্গে সাধারণ পাঠক অপরিচিত, কাজেই এ-কাব্য তাদের কাছে দুর্বোধ্য হতে বাধ্য।

এই সব যুক্তির মধ্যে যে অনেকখানি সত্য আছে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু পাঠকদেরও ত কিছু বক্তব্য আছে। পাঠককে অত বোকা মনের করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। না পড়াশুনা করে যদি আধুনিক পাঠক না-হওয়া যায়, তবে কবিই বা হওয়া কেন? আধুনিক কাব্যের মূলে যে দর্শন আছে, তথাকথিত আধুনিক কবিদের ক'জন সে সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল? ক্লাসিসিজম্, রিয়ালিজম্ ইত্যাদি মতবাদ সম্বন্ধে ক'জন কবি সজাগ? মিল না রেখে দু-চারটে কঠিন শব্দ লাগিয়ে এলো-মেলোভাবে কিছু লিখেই অনেকে মনে করেন তাঁরা আধুনিক কবি বনে গেছেন। তাঁরা ভুলে যান যে আধুনিক কবিতা দুর্বোধ্য হতে পারে, কিন্তু দুর্বোধ্য হলেই আধুনিক কবিতা হয় না। কবিরা ঝাঁকড়া চুল রাখে, তাই বলে ঝাঁকড়া চুল রাখলেই কবি হওয়া যায় না। ইঞ্জিনিয়ারিং বল, ডাক্তারী বল, সঙ্গীত বল– সব ক্ষেত্রেই শিক্ষা ও পারদর্শিতার প্রয়োজন আছে, কিন্তু একমাত্র ক্ষেত্রকি আধুনিক কবিতা যেখানে ট্রেনিং-এর কোনই দরকার করে না? ছন্দের বালাই নেই, ভাবের বালাই নেই, নীতিধর্মের বালাই নেই, কেউ বুঝল-না-বুঝল তার জন্য মাথা ব্যথা নেই—লিখলেই কবিতা! পাঠক যদি কিছু না বোঝে, তবে উল্টে আরও চোখ-রাঙানি! চমৎকার!

এইবার দেখা যাক আধুনিক কবিতা যেসব প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল, তা সে কতটুকু পালন করেছে ঃ

(১) অকাব্য থেকে কাব্যের মুক্তি আধুনিক কাব্যের একটা বড় লক্ষ্য ছিল। কিন্তু আজকার কবিতা কি সেই মুক্তি এনেছে? আজকার কবিতা কি সবটুকুই নির্জলা কাব্য? এ যিনি বলতে পারবেন, তিনি পরম দুঃসাহসিক বলতে হবে।

(২) রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কেন? আজকার কাব্যে কি রোমান্টিকতা অনুপস্থিত? স্বয়ং বোদলেয়ারও ত রোমান্টিকতার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন না। তিনি শুধু এর বাড়াবাড়িকেই খর্ব করেছেন মাত্র। এ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু কী বলছেন দেখুন ঃ–

"আমি বলতে চাচ্ছি যে ক্লাসিক রীতি সত্ত্বেও অথবা সেই
জন্যেই বোদলেয়ার পরম রোমান্টিক। তাঁর কবিতা রোমান্টিকতার 'কামস্কট্‌কা নয়– 'কৈলাস'। রোমান্টিক ও
আধুনিক কবিতার নধ্যস্থলে তিনি অনন্যভাবে অবস্থিত।
তাঁর কাব্যে রোমান্টিকতা যেমন নেই, তেমনি নেই আধুনিক দুর্বোধ্যতা।"

– (বোদলেয়ারের কবিতা)

এ হল বোদলেয়ার সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর অভিমত। বুদ্ধদেব বসু একজন বিশিষ্ট আধুনিক কবি হওয়া সত্ত্বেও রোমান্টিসিজম সম্বন্ধে নিজে কী অভিমত পোষণ করেন, তাও দেখুন ঃ

"রোমান্টিকতার নিন্দা করা আমার অভিপ্রায় নয়, বরং আমি

www.pathagar.com

দুর্মর ভাবে রোমান্টিকতার পক্ষপাতী। রোমান্টিক বলতে
আমি বুঝি– শুধু একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন নয়, মানুষের
একটি মৌলিক স্থায়ী অবিচ্ছেদ্য চিত্তবৃত্তি।
রোমান্টিকতা বিশ্বসাহিত্যের এক বিরাট ঘটনা যা মানুষের চিন্তার পরতে
পরতে এমন ভাবে প্রবেশ করেছে যে আমরা নির্ভয়ে বলতে
পারি, সমগ্র আধুনিক সাহিত্যই রোমান্টিক।"

অথচ "অতি আধুনিক কবিরা' এই মূলমন্ত্র নিয়েই যাত্রা শুরু করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ—তথা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত রোমান্টিক কবিদের বিরুদ্ধাচরণ ও অবজ্ঞা করাই হবে তাঁদের কবিকীর্তির প্রধান লক্ষ্য।

রোমান্টিকতা কাব্যের এক প্রধান বৈশিষ্ট্যে। এ বৈশিষ্ট্য কোন বিশেষ যুগে সীমিত নয়। সর্বদেশের সর্বকালের কবিতাতেই রোমান্টিকতা লক্ষ্য করা যায়। কাজেই রোমাণ্টিক কবিতাকে অথবা রোমাণ্টিক কবিদিগকে যাঁরা অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা করবেন, তাঁরা ভ্রান্ত। বোদলেয়ার তাঁর পূর্বসূরিদের প্রতি কখনও ঐরূপ কোন বিদ্রোহ বা অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করেননি। বরং তিনি ছিলেন, "পূর্বসূরিদের অনুসরণে পরিশ্রমী" এবং তাঁদের প্রতি ব্যবহারে "বিনয়ীতম"। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর শিষ্যবৃন্দ প্রাচীনপন্থী কবিদের প্রতি অবজ্ঞতায় মুখর।

কাব্যে বা আর্টে ক্লাসিক, রোমান্টিক বা আধুনিক এরূপ কোন তারতম্য করাও অসঙ্গত। রূপ যা– তা সনাতন। পরিচ্ছদে বা প্রকাশ-ভঙ্গীতে যা কিছু তারতম্য। সত্যিকার কাব্য ক্লাসিক হলেও সুন্দর, রোমান্টিক হলেও সুন্দর, আধুনিক হলেও সুন্দর। কাজেই কোন কবিতাকে আধুনিক বলে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করার কোন মানে হয় না। যদি নারীদেহের সৌন্দর্যই আধুনিক কবিতার প্রধান উপজীব্য হয়ে থাকে, তবে অতীত যুগেও তার অভাব ছিল না। এমন কি তুলনা করলে দেখা যাবে, প্রাচীনেরাই অধিকতর আধুনিক ছিলেন। আমরা অবন্তী সান্যালের 'হাজার বছরের প্রেমের কবিতা' থেকে এখানে দু-একটি কবিতা উদ্ধৃত করছি; তা থেকেই পাঠক আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

সংস্কৃত

"তন্বীয় শ্যামা বিম্বাধরা শিখরিদশনা
ক্ষীণকটি নিম্ননাভি উচ্চকিত হরিণীনয়না
স্তনভারানম্র তনু শ্রোণীভারে মন্থর চরণা
বিধাতার আদিশিল্প নিরুপমা রমণীরচনা
হেন নারী যদি সেথা থাকে
আমার দ্বিতীয় সত্তা বিলি, মেঘ, জানিয়ো তাহাকে।"

www.pathagar.com

মিসরীয়

তুলনাবিহীন সে যে, সে শুধু একক
রূপময়ী জগতের সকলের চেয়ে।
দেখো, দেখো, সেই নারী দেবীর মতন
সর্বশুভ বৎসরের প্রথম প্রভাতে।
সর্বজয়ী রূপ তার, জ্যোতির্ময় দেহ
কমনীয় আঁখি দুটি যেদিকে তাকায়
কী মধু অধর-ওষ্ঠ বাক্যের উৎসায়,
ভাষা কই রূপ বর্ণনার!
দীর্ঘ গ্রীবা, দ্যুতিময় স্তনবৃন্ত দুটি
চুল তার অ-কৃত্রিম বৈদূর্যের ভার;
বাহু দুটি স্বর্ণেরও অধিক'
পদ্মের কলিকা যেন অঙ্গুলির যথার্থ উপমা
ক্ষীণ-মধ্য, নিবিড় নিতম্ব
পদযুগে রূপ উছলায়

আরবী

"ও-মেয়ে নির্ভয়
ও-মেয়ে হাওয়াকে তার আলিঙ্গন হানে।
ও-মেয়ে হাওয়াকে দেয় গজদন্তধবল বুকের
সেই স্তন, যা কেউ ছোঁয়ানি কোনদিন।
ও-মেয়ে হাওয়ার হাতে তুলে দেয় দীর্ঘ, সুগঠিত
মূর্তিখানি, তুলে দেয় শ্রান্ত, গুরুভার
পৃথুল নিতম্বখানি তার।"

এইরূপ অনেক কবিতাই আছে যা নিত্যকালের রস-সম্পদ। এইসব কবিতার সঙ্গে আধুনিক কবিতার কোন পার্থক্য আছে কি? এরা চিরদনি বেঁচে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন ঃ 'কাব্য বাঁচে তার বয়সের গুণে নয়—রসের গুণে।' রসের নিত্যতা অনস্বীকার্য।

(৩) অকাব্য থেকে কাব্যকে পৃথক করার ধারণাটাও উদ্ভট। সত্যিকার কাব্যে বাহুল্য ও শব্দবিন্যাসের দৌর্বল্য বর্জনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এ নিয়ে ত বাড়াবাড়ি করা চলে না। কতটুকু ছাঁটাই করতে হবে না হবে শিল্পীই তা ভালো জানে। শিল্পীর পরীক্ষাও এইখানে। "An artist is known by what he rejects." কাজেই নিয়ম করে কোন কিছু বর্জন করা যাবে না। ওটা শিল্পীর ব্যক্তিগত মেজাজ ও শিল্পবোধের উপর ছেড়ে দিতে হবে। এ ব্যাপারে সবাই যে একমত হবে তাও নয়। অপর পক্ষেরও কিছু বক্তব্য আছে।

www.pathagar.com

প্রতিটি কবিতার প্রতিটি পংক্তি এবং প্রতিটি শব্দ মার্জিত ও পরিমিত হবে—এ নিয়ম অস্বাভাবাকি ও কৃত্রিম। প্রকৃতিতে এত কাটছাঁট নেই, মাপাজোঁকা নেই। সহজ বিন্যাসেই সৃষ্টি এত সুন্দর। কেউ আগাছ, বর্জিত কেয়ারী-করা ফুলের বাগান সাজাতে চান সাজান, কিন্তু মনে রাখতে হবে বনফুলও সুন্দর। কোন্ অনাদিকাল থেকে বেচারী চাঁদের বুকে কলঙ্কের ছাপ পরে আছে। কিন্তু বিশ্বশিল্পী কোনদিন সেই কলঙ্ক চাঁদটাকে মুক্ত করল না। তাতে ক্ষতিই বা কী হয়েছে? ওই কলঙ্কী চাঁদই চির-সুন্দরের প্রতীক। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কাজই হচ্ছেই এই। বাছাই করা সেরা সেরা উপাদান সে চায় না। তাতে তার বাহাদুরি নেই। সামান্যকে সে অসামান্য করে, অসুন্দরকে সুন্দর করে। তাঁর মোহন তুলির যাদুস্পর্শে কুৎসিত ক্লেদও অনিন্দ্যসুন্দর নারীমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়। আবার অসামান্য রূপের লাবণ্যে অঙ্গবিশেষের দোষত্রুটি ঢাকা পড়ে যায়। সুন্দরীর মুখের একটি কালো তিলের জন্য কবি সমরখন্দ ও বুখারাকে লুটিয়ে দিতে চায়। কাব্যও এ-নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। একটা সুন্দর নূতন আইডিয়া গোটা কবিতাটিকেই তরিয়ে নিতে যেতে পারে। মেছো-হাটায় মেছুনী যখন ভাগা দিয়ে চুনোমাছ বিক্রি করে তখন প্রতিভাগে ২/৪টা বড় মাছ থাকলেই যথেষ্ট। নিতে হলে সবটাই নিতে হয়, বেছে নেওয়া যায় না। কাজেই কাব্যে অতটা ছুঁৎমার্গ থাকা আমি অনুচিত বলে মনে করি। পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা (Perfectionism) যখন সৃষ্টির কোথাও নেই, তখন কাব্যে তা আশা করা অন্যায়।

(৪) আধুনিক কবিরা যে কাব্যের জহুরী, তারই বা প্রমাণ কি? অকাব্য থেকে কাব্যের মুক্তি চাইবার অধিকার আধুনিক কবিদেরকেই বা কে দিল? তাদের বিচার যে ঠিক, তাই বা কে বলল? এটাও ত একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। তাছাড়া অকাব্য থেকে যদি কাব্যের মুক্তি দাবী করার অধিকার এবং রোমান্টিক কবিদের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করার স্পর্দ্ধা আধুনিক কবিরা দেখান, তবে অকবিদের থেকে কবিদের মুক্তিও আজ অপর পক্ষ দাবী করবে।

(৫) শব্দ ও ভাবের মিতব্যয়িতা অনেক সময় বাঞ্ছনীয়, কিন্তু অনেক সময় নিন্দনীয়। অমিতব্যয়িতা যেমন দোষের, কার্পণ্যও তাই। এর অবশ্যম্ভাবী ফল ভাব ও চিন্তার উল্লম্ফন, এবং তার ফলে দুর্বোধ্যতা, অস্পষ্টতা এবং অসংলগ্নতা। এটা অবশ্যই সত্য, কবিরা অনেক সময় সংযম হারিয়ে ফেলে; উচ্ছ্বাস ও আবেগ তাদের মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সেখানে মিতব্যয়িতার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই মিতব্যয়িতা কার্পণ্যে পরিণত হলেই বিপদ! মিতব্যয়ী কবিদের হাতে কাব্য কিরূপভাবে বিড়ম্বিত হতে পারে, তার বড় প্রমাণ সুধীন দত্ত। অত্যধিক সাধনার ফলে তাঁর কাব্যে বহু অনুপম শিল্পসুন্দর পংক্তি দৃষ্ট হয় সন্দেহ নাই; যেমন "অখণ্ড নির্বাণ-ভরা রমণীর তড়িৎ-চুম্বন", "অন্তরের অন্ধকারে অনঙ্গের লঘু পদধ্বনি", "শিপ্রার অপর তটে নেমে আসে, সুদীর্ঘ রজনী"— ইত্যাদি। কিন্তু এই কবির হাত দিয়েই ত আবার বেরিয়েছে ঃ "সে মৎসর অহংকার চিহ্নহীন অক্ষম ধিক্কারে", "লুপ্ত হল আঁধারবিন্দু বিশ্ব হতে খিল খসাল নাস্তি পুনর্বার", "রহস্যের অনচ্ছ অভিধা" "অবশ্য অপ্রতিকার্য অন্তিম কুম্ভক। অনুতার্য নাস্তির কিনারা"– ইত্যাদি অজস্র দুর্ভেদ্য ভাব ও ভাষা।

www.pathagar.com

(৬) আধুনিক কবিরা পাঠকের অযোগ্যতার দোষারোপ করেন। তাঁরা নিশ্চয়ই মনে করেন, আধুনিক কবিতা এমন চীজ যা বুঝা কঠিন, কিন্তু লেখা সহজ! এ এক চরম মূঢ়তা! আধুনিক কাব্য-রচনা অত সহজ নয়। ছন্দ ও সুরবোধ না থাকলে আধুনিক কবিতা লেখা যায় না। Ezra Pound সঙ্গীতের সঙ্গে কাব্যের তুলনা দিয়ে বলেছেন ঃ

"Do not imagine that the art of poetry is any simpler than the art of music, or that you can please the expert before you have spent at least as much effort on the art of verse as the average piano teacher spends on the art of music."

বস্তুত ছন্দ বর্জন করলেই আধুনিক কবিতা হয় না। মুক্ত ছন্দও আরেক প্রকারের ছন্দ। সেখানেও সঙ্গীত বিদ্যমান। কাজেই অসুর কবিদের পক্ষে মুক্তছন্দের কবিতা লিখতে যাওয়া অধিকতর বিপজ্জনক।

(৭) আধুনিক কবিরা চিরাচরিত নীতিধর্মকে আঘাত করবেন, এটাই বা কেমন কথা? আধুনিকতার নামে সত্য প্রেম নীতি ও ধর্ম কবিদের হাতে বিপন্ন হবে– এ এক অভিশপ্ত বিভ্রান্ত যুগের লক্ষণ। সুখের বিষয়, এ নীতিকে কেউ সুবিধাজনকভাবে কাজে লাগাতে পারছে না, কেননা এটা একটা নিছক স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপার। সুধীন দত্ত ও জীবনানন্দ দাশ সংশয়বাদী হতে পারেন, কিন্তু নাস্তিক নন। বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে—এঁদের বিরুদ্ধেও নাস্তিকতার অভিযোগ আনা চলে না। নিজ ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি এঁদের গভীর শ্রদ্ধাবোধ আছে এবং তা তাঁদের কাব্যে সঞ্চারিত। সুধীন দত্ত স্পষ্টই বলেছেন "ব্যক্তিগত মনীষায় জাতীয় মানস ফুটিয়ে তোলাই কবি-জীবনের পরম সার্থকতা।" 'দশমী' 'কস্মৈ দেবায়' 'মহাশ্বেতা' উর্বশীকান্ত' 'ফণিমনসার বন' 'ধরণী উমার মত', —ইত্যাদি বহু দৃষ্টান্তে হিন্দু-মন ও মানস প্রতিফলিত হয়েছে। জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' ত হিন্দু-সংস্কৃতির স্নিগ্ধরসে অভিসিক্ত। "বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে...", "যেইখানে এলোচুলে রামপ্রসাদের সেই শ্যামা আজো আসে", "বল্লাল সেনের ঘোড়া", "এ নদী কি কালীদহ নয়?"— এরূপ অসংখ্য পংক্তি উদ্ধৃত করা যায়, যাতে তাঁর ধর্মীয় ভাব অনুলিপ্ত। বিষ্ণু দে-র কবিতাও হিন্দু পুরাণ ও ঐতিহ্যের রেফারেন্সে ভরপুর। "উপমায় খুঁজেছি সান্ত্বনা। ওঁ উষা বা অশ্বস্য মেধ্যশ্ব শিবঃ", "এক হোক এককের বহু বহু বহুবার এক, সোহকাময়ত দ্বিতীয়ো মে আত্মা জায়েতেতি"– ইত্যাদি ধরনের বহু বচন তাঁর কাব্যে বিদ্যমান। এমন কি এলিয়টের কবিতা অনুবাদ করতে বসেও তিনি সংস্কৃত উদ্ধৃতির আশ্রয় নিয়েছেন। "কিমিত ত্বামহ স্মারামি কন্যকে" ইত্যাদিই তার প্রমাণ। এটা অবশ্য ইলিয়টেরই অনুসরণ। বুদ্ধদেব বসুও আপন ঐতিহ্যে দৃঢ় বিশ্বাসী। তাঁর বহু কবিতায় এর প্রমাণ আছে।

এটা কোন দোষের কথা নয়। বরং আধুনিক কাব্য পূর্বাপেক্ষা অধিক ঐতিহ্যবাহী, যদিও তার প্রয়োগ-কৌশল স্বতন্ত্র। অনিকেত ভাব (rootlessness) আজকার কবিতার বৈশিষ্ট্য হলেও নীতি হিসাবে গ্রহণীয় নয়। আধুনিক কবিদের প্রধান গুরু টি, এস্,

www.pathagar.com

ইলিয়টের কাব্য ত পুরাদর ঐতিহ্যভিত্তিক। ঐতিহ্যে ফিরে আসবার জন্যই তিনি কবিদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন। আধুনিক কবি হয়েও তিনি পুরাদস্তুর রোমান ক্যাথলিক। কাব্য ও ধর্মের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ

"Literary criticism should be completed by criticism from a definite ethical and theological standpoint."

অর্থাৎ কাব্যকে শেষবারের-বার নীতি ও ধর্মের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হবে। এর দ্বারা বুঝা যায় এলিয়ট কাব্যের চেয়ে বৃহত্তর মর্যাদা দিয়েছেন ধর্ম ও নীতিকে। বর্তমান যুগের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ আধুনিক কবির স্বরূপ ও প্রকৃতি এই। অথচ তাঁর ভক্তবৃন্দ আজ ধর্ম ও নীতিকে আঘাত করাকেই আধুনিক কাব্যের অন্যতম নীতি বলে মেনে নিচ্ছেন।

পূর্ব-পাকিস্তানের আধুনিক কবিতা

আধুনিক কবিতার দোষগুণ মোটামুটি ভাবে দেখলাম। এইবার পূর্ব-পাকিস্তানের আধুনিক কবিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক ঃ

উপরে আধুনিক কবিতার যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এবং যে সব বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে, তা দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে পূর্ব-পাকিস্তানে সত্যিকার আধুনিক কবিতা এখনও সৃষ্টি হয়নি। আবুল হোসেন, শামসুর রহমান, আলাউদ্দিন আল-আজাদ প্রভৃতি কবিরা অনেক ভালো কবিতা লিখেছেন বটে, কিন্তু সেগুলি সত্যিকার আধুনিক কবিতা হচ্ছে কিনা সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। দু-একজন ছাড়া অনেকেই বর্তমানে পশ্চিম-বঙ্গের সুধীন দত্ত, জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে-র "Surface imitation" বা খোসার অনুকরণ করছেন। তাতে কিছু কিছু যান্ত্রিক (mechanical) কবিতা উৎপন্ন হচ্ছে মাত্র। খোসার অনুকরণ এইজন্য বলছি যে, পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত আধুনিক কবিই নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে কাব্য রূপ দিতে প্রয়াস পাচ্ছেন, কিন্তু আমাদের কবিরা সেইখানে হীনমন্যতায় ম্রিয়মান। তাঁদের ভাষা প্রকাশভঙ্গী উপমা অনুপ্রাস অনেক কিছুই (না- বলে-) ধার করা। এমন হলে তাঁদের ভবিষ্যৎ কোথায়? একটা কিছু নূতন পথ তাঁদের খুঁজে বার করতেই হবে। কিছুটা নূতন দান তাঁদের দিতেই হবে—যা পশ্চিম বঙ্গের থেকে ভাবে ভঙ্গিমায় ও টাইপে হবে স্বতন্ত্র। এখানে এজরা পাউণ্ডের একটি মূল্যবান কথা মনে পড়ে ঃ

The scientist does not expect to be acclaimed as a great scientist until he has discovered something. He begins by learning what has been discovered already. He goes from that point noward. He does not bank on being a charming fellow personally. He does not expect his friends to applaud the results of his freshman class work. Freshmen in poetry are

www.pathagar.com

unfortunately not confined to a definite and recognisable class room. They are 'all over the shop'. Is it any wonder the public is indifferent to poetry?"

অতি সত্য কথা। কোন নূতন আবিষ্কার না-করা পর্যন্ত কোন কবিরই আধুনিক বলে দাবী করার কোন অধিকার থাকবে না। প্রচলিত বস্তুর অনুকরণের মধ্যে আধুনিকতা নেই, নূতন আবিষ্কারের মধ্যে আছে।

কাব্যের এই বিড়ম্বনা শুধু বাংলা-সাহিত্যেরই নয়, অন্য দেশের সাহিত্যেও ঘটে থাকে। কবি-সাহিত্যিকদের শ্রেণী বিভাগ করতে গিয়ে এজরা পাউণ্ড এক শ্রেণীর লেখকদের কথা বলেছেন, তাঁরা হচ্ছেন "Gongoras'—whose wave of fashion flows over writing for a few centuries or a few decades, and then subsides, leaving things as they were."

আধুনিক কবিদের প্রতি তাই আমার অনুরোধ ঃ আধুনিকতার নামে তাঁরা যেন বাড়াবাড়ি না করেন। শাশ্বত সুন্দর ও ধ্রুবের সাধনাই হবে আমাদের লক্ষ্য। নূতন আঙ্গিকে যাঁরা সেই চিরন্তনকে রূপ দিতে সক্ষম তাঁরা দিন; সে ত আনন্দেরই কথা; কাব্য ও সাহিত্য তাতে সমৃদ্ধই হবে। কিন্তু এই নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি যেন না হয়। ক্লাসিক কবিও কবি, রোমান্টিক কবিও কবি, আধুনিক কবিও কবি; শুধু আঙ্গিকের পার্থক্য মাত্র। আঙ্গিক নিয়ে তাই দল পাকিয়ে কোন লাভ নেই; আঙ্গিক দিয়ে প্রকৃত কাব্যের বিচার হয় না, হয় সৃষ্টির সার্থকতা দিয়ে। সেই নিত্যবস্তুর প্রতি লক্ষ রাখা আমাদের উচিত। আমার মনে হয়, আধুনিক কবিতার ভাল কবি (good poet) হওয়া যায়, কিন্তু মহাকবি (great poet) হতে হলে ক্লাসিক ও রোমান্টিক—এই দুই গুণেই গুণান্বিত হতে হবে। ক্রোচে ঠিকই বলেছেন ঃ

"A great poet is both classic and romantic."

লেখক-সংঘ পত্রিকা

১৯৬২

www.pathagar.com

সমালোচনার সমালেচনা

Ezra Pound এক জায়গায় বলেছেন ঃ "Pay no attention to the criticism of men who have never themselves written a notable work." অর্থাৎ সেই সব লোকের সমলোচনায় কান দিও না যারা নিজেরা কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ্ লেখে নাই।

কথাটা খুবই সত্য। এর তাৎপর্য এই যে, সমালোচনা একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ; কোন অপরিপক্ক লোকের দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়।

আশ্চর্যের বিষয় এই দায়িত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম আজকাল কিন্তু সেই সব লোকের দ্বারাই নিষ্পন্ন হচ্ছে—এজরা পাউণ্ড যাদের কথা শুনতে নিষেধ করেছেন। এখন বরং বলা যায় যে, "Critics are the men who have failed in art and in literature." অর্থাৎ যাদের কোন দান নেই, কবি বা লেখক হতে যারা পারেননি—তারাই সমালোচক সেজে সাহিত্যের বাজারে দালালি করেন। তারা জানেন, এই পন্থাই নিরাপদ, কেননা এতে কোন পুঁজির দরকার হয় না।

সাহিত্যে সমালোচনার কোন প্রয়োজন আছে কিনা, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সমালোচনায় ভালও হয় মন্দও হয়। বুদ্ধিদীপ্ত উন্নত সমালোচনা (learned criticism) সাহিত্যের প্রগতির পক্ষে অনুকূল। সাহিত্যক্ষেত্রে স্বভাবতই অনেক আগাছা জন্মে; মাঝে মাঝে সেগুলি সাফ করে দিতে হয়! সে কাজ সমালোচকের। T.S. Eliot ঠিকই বলেছেন ঃ

"From time to time it is desirable that some critic shall appear to review the past of our literature and set the poets and the poems in a new order."

কিন্তু এই সমালোচনাই যদি ব্যক্তিগত রুচি, পূর্বধারণা, ঈর্ষা অথবা দলগত নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, তবে তাতে প্রভূত অকল্যাণই হয়ে থাকে। এরূপ নজির ইতিহাসে বহু আছে। সর্বপ্রথমেই ইংরাজ কবি কীটসের কথা মনে পড়ে। Quarterly Review পত্রিকায় এক অর্বাচীন সমালোচক কবির ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর কটাক্ষ করে লিখলেন ঃ

"Go back to the shop, Mr. John, stick to plaster, pills, ointements etc."

অনেকে মনে করেন, এই রূঢ় সমালোচনাই কীটসের অকাল মৃত্যুর কারণ। অথচ আজ দেখা যায় কীট্‌স্ জগতের শ্রেষ্ঠতম কবিদের অন্যতম।

সমালোচকদের হাতে শেক্‌স্‌পিয়ার, শেলী, বায়রণ, গ্যেটে ,এঁরাও কম লাঞ্ছিত হননি। সমালোচকদের কারো কারো এমন ধারণা জন্মেছিল যে তাঁরাই যেন কবিদের জন্মদাতা; তাঁরা কবিদের উঠাতেও পারেন, বসাতেও পারেন। এই শ্রেণীর মাত্রাজ্ঞানহীন সমালোচকদের লক্ষ্য করেই গ্যেটে বলেছিলেন ঃ

"Kill the dog—he is a reviewer."

www.pathagar.com

শেকস্‌পীয়ারকে তাঁর সমকালীন সমালোচকেরা কবি বলে আদৌ স্বীকৃতি দেননি। তিন শ' বছর পর তবে তাঁর সে-স্বীকৃতি মিলেছিল। ওমর খৈয়ামকে প্রায় ৮০০ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। Fitzgerald- এর অনুবাদ প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত (১৮৫৯) ওরম খৈয়াম অজ্ঞাতই ছিলেন। পক্ষান্তরে এমনও দেখা যায় যে, অনেক কবি জীবদ্দশায় তৎকালীন সমালোচক বা সমঝদারদের বুদ্ধিজ্ঞানে উচ্চমর্যাদা ও সম্মান লাভ করেছিলেন। কিন্তু কালের প্রহারে পরে তাঁরা সে মর্যাদা হারিয়েছেন। Pope, Dryden, Tennyson প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ও ইকবালকেও প্রথম জীবনে যথেষ্ট বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছে।

এইসব কারণে সমালোচনা সম্বন্ধে লেখকদের ধারণা খুব প্রীতিপ্রদ নয়। মনে হয়, সাহিত্যক্ষেত্রে সমালোচনা ভালোর চেয়ে মন্দই করেছে বেশি। অনেকে তাই সমালোচনার উপরে খুব বিরূপ। তাঁরা বলেন ঃ বই সম্বন্ধে এত বই কেন লেখা হবে। আর পাঠকেরাই বা কেন অপরের সমালোচনা শুনে বা পড়ে কোন বই সম্বন্ধে নিজেদের মত গঠন করবেন? পরের মুখে কেন তাঁরা ঝাল খাবেন? কোন বইয়ের ভালমন্দ জানতে হলে মূল বইটা পড়লেই ত হয়। একজন আমেরিকান প্রফেসর ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। তাঁর এক প্রিয় ছাত্র তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "Timon of Athens সম্বন্ধে কার বই পড়ব, স্যার?" প্রফেসর উত্তর দিলেন ঃ "The best book you can read on Timon of Athens is—Timon of Athens." সত্যি ত! সমালোচনার প্রতি অত্যধিক অনুরাগ নিজের চিন্তা, অনুভূতি ও রসোপলব্ধির শক্তিকে খর্ব করে, জিজ্ঞাসা ও কৌতূহলকে নিবৃত্ত করে; জ্ঞানের সীমানাকে সংকীর্ণ করে। লেখককে পদে পদে বাধা দেওয়ায় বা শাসন করায় তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভাও আড়ষ্ট হয়ে আসে!

তবে সমালোচনার একটা ভাল দিকও আছে। সমালোচকের শ্রেষ্ঠ কাজ হবে লেখক ও পাঠকের মধ্যে মনের মিতালি ঘটিয়ে দেওয়া। সমালোচককে তাই ঘটকের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অথবা তার তুলনাটা দোভাষীর (interpreter) সঙ্গে হলেও মন্দ হয় না। লেখককের লেখায় যে কথা অব্যক্ত বা অস্পষ্ট থাকে, সমালোচক তা পরিস্ফুট করে পাঠকের মনের দুয়ারে পৌঁছে দেবেন।

সুষ্ঠু সমালোচনা সাহিত্যের নাম ও আদর্শকে উন্নত করতে পারে, রুচির সংস্কার সাধন করতে পারে এবং বিভ্রান্তির দিনে সত্য ও সুন্দর পথের নির্দেশ দিয়ে মানব-কল্যাণে সহায়তা করতে পারে।

কাজেই, সমালোচনা দ্বারা যে আদৌ কোন কাজ হয় না, তা নয়। তবে একথা মনে রাখতে হবে, সমালোচক যেন লেখককে আড়াল করে না দাঁড়ান বা না ভাবেন যে, লেখকের চেয়ে সমালোচকই বড়। এ সম্বন্ধে অসিত কুমার মুখোপাধ্যায় যা বলেছেন, তা গ্রহণযোগ্য ঃ

'সমালোচকের স্থান শিল্পীর নীচে—ওপরে নয়। এ কথা অবশ্য সত্য যে; সৃষ্টিশীল শিল্প-প্রতিভার চেয়ে শিল্প-বিচারের প্রতিভা ঊনার্থক। কে না জানে 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড' জিনিসের দাম নতুনের চেয়ে অনেক কম? সৃষ্টিকর্মের ব্যাখ্যাই যদি সমালোচকদের প্রধান

www.pathagar.com

কর্তব্য হয়, তা হ'লে সমালোচনা যে সাহিত্যকর্মের খিদমতগারের ভূমিকা গ্রহণ করবে, তা বাধ্য হয়েই মেনে নিতে হয়।" –(সমালোচনার কথা)

অবশ্য সৃষ্টিধর্মী সমালোচনা (Creative criticism) স্বাধীন সৃষ্টির মর্যাদাও লাভ করতে পারে; কিন্তু তা হলেও তাকে বড় জোর বলা যায় দ্বিতীয় সৃষ্টি (Second creation)–মৌলিক সৃষ্টি নয়। দ্রষ্ট কখনও স্রষ্টাকে অতিক্রম করতে পারে না। "Creative genius leads the way, criticism follows"–(Hudson). এইটেই চিরাচরিত নিয়ম।

সমালোচনার প্রকার-ভেদ

সমালোচনা কিরূপ হওয়া উচিত, তা নিয়ে মতভেদ আছে। ফলে সমালোচনা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মোটামুটি আমরা সমালোচনাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি ঃ (১) Sbjective criticism (ব্যক্তিপন্থী সমালোচনা) এবং (২) Objective criticism (বস্তুপন্থী সমালোচনা)। অন্য প্রকার শ্রেণীতেও আছে, যথা–(১)Judicial criticism, (২) Inductive criticism, (৩) Comparative criticism এবং (৪) Historic criticism. সমালোচকদের ভিতরেও অনুরূপ শ্রেণীভেদ দেখা যায়। কেউ বা ভাববাদী, কেউ বা বস্তুবাদী, কেউ বা সৌন্দর্যবাদী, কেউ বা জীবনবাদী–ইত্যাদি।

আমাদের সাহিত্যে ব্যক্তিপন্থী (Subjective) বিচারপন্থী (Judicial) সমালোচানই সমধিক প্রচলিত। এই সমালোচনায় সমালোচক তাঁর পূর্বসঞ্চিত ধ্যান-ধারণা, রুচি ও আদর্শ দ্বারা গ্রন্থের ভালমন্দ বিচার করেন। লেখকের কোথায় কোনটুকু ভাল হয়েছে,কোনটুকু মন্দ হয়েছে, কোথায় কতটুকু করা উচিত ছিল, কোথায় কোনটুকু করা উচিত হয়নি, অথবা কোথায় কি কি অভাব ঘটেছে, ইত্যাদি ধরনে সমালোচক তাঁর রায় (verdict) দিয়ে যান। সমালোচক এখানে ঠিক বিচারকের কাজ করেন। এই ধরনের সমালোচনায় লেখক অপেক্ষা সমালোচকই বেশি করে অত্মপ্রকট হন। লেখককে আড়াল করে সমালোচকই সামনে এসে দাঁড়ান। Moulton তাই ঠিকই বলেছেন ঃ "Judicial criticism is a revelation of the critic much more than of the literature." এমনি করে লেখকের চিন্তা রুচি ও সৃজনী-শক্তিকে সমালোচক পেছন থেকে কন্ট্রোল করেন এবং শুধু লেখকের উপর নয়, সমাজের উপরেও তাঁর আপন মতটি চাপিয়ে দেন।

বলা বাহুল্য এই Judical criticism-ই সবচেয়ে সহজ ও নিরাপদ, আবার এইটেই সবচেয়ে বেশি মারাত্মক। এই সমালোচনায় সত্যিকারের সাহিত্য-মূল্য ত বুঝা যায়ই না, পক্ষান্তরে বহু অকল্যাণের পথ এতে খুলে যায়। ব্যক্তিগত রুচি বা বিশেষ 'দৃষ্টিকোণ' থেকে সমালোচক হয়ত কোন গ্রন্থকারকে একদম কচু-কাটা করে ছাড়েন, না হয়ত উচ্ছ্বাসিত আবেগে এমন প্রশংসা করেন যে, লেখকের তাতে মাথা বিগড়ে যায়। তরুণ লেখকদের পক্ষে এ দুটোই খারাপ। অত্যধিক স্তুতিবাদের ফলে বহু প্রতিভাবান

www.pathagar.com

লেখকই অকালপক্কতা দোষে দুষ্ট হয়, ফলে বড়-কিছুই দান করা তাঁদের পক্ষে আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। সাধনা করে স্বাভাবিকভাবে যে-প্রতিভা সার্থক হতে পারত, সমালোচকের অত্যধিক আদরে বা অনাদরে তা আর সম্ভব হয় না।

বাংলা সাহিত্যে এই অভিশাপ এখনও বিদ্যমান। যাদের দান এখনো নিঃশেষিত হয় নি অথবা প্রতিশ্রুতি নিয়ে সবেমাত্র যারা সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে, কোন কোন আনাড়ী সমালোচক তাদের দানের উপরও চূড়ান্ত রায় দিয়ে বসেন। কেউ কেউ বা কবি না গদ্যধর্মী কাব্য-বিচারে হস্তক্ষেপ করেন। কার উপর কার প্রভাব পড়েছে, কে কার ভাবশিষ্য, এইসব নিম্নস্তরের আলোচনাই তাঁদের প্রধান অবলম্বন। তাঁরা ভুলে যান যে, সাহিত্য-বিচারে এ সব কথার বিশেষ কোনই মূল্য নেই। ছোটখাটো (Minor) কবিদের ত কথাই নেই, যারা সুকবি (Good poets) এবং যারা মহাকবি (Great poets)–সবাই অল্প বিস্তর তাদের পূর্বসূরী বা সমকালীন সতীর্থদের কাছে ঋণী। এতে কোন দোষ নেই। শেক্‌স্‌পিয়ার, মিলটন, দান্তে, গ্যেটে–প্রত্যেকেই তাঁদের গ্রন্থের উপাদান অপরস্থান থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। মিলটনকে ত "Greatest plagiarist" বলা হয়। বাংলা সাহিত্যে মাইকেল একাধিক ইউরোপীয় কবিদের কাছে ঋণী; রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল ও হাফিজের কাছে ঋণী; নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও সতেন্দ্রনাথের কাছে ঋণী; পক্ষান্তরে মোহিতলাল, জীবনানন্দ দাশ এবং আরও কেউ কেউ নজরুল প্রভাবে আক্রান্ত। আবার সুধীন দত্ত, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে প্রভৃতি আধুনিক কবিরা সকলেই বোদলেয়ার মালার্মে, টি. এস্, এলিয়ট এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য কবিদের ভাবশিষ্য। বিশ্লেষণ করলে এমনও দেখা যায়, বিভিন্ন কবি একই সূত্র থেকে একই উপাদান সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু সৃষ্টিতে গিয়ে তারতম্য ঘটেছে। কাজেই কোন্ উপাদান কোথা থেকে এল, সে খুব বড় নয়; বড় কথা হল কার সৃষ্টি কতখানি সার্থক হল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়ঃ "বিশ্লেষণে হীরকে-অঙ্গারে প্রভেদ নেই, সৃষ্টির ইন্দ্রজালে আছে।"

বিচারপন্থী সমালোচকেরা এসব কথা না ভেবেই যার যেরূপে অভিরুচি, মত প্রকাশ করে দেন। ফলে কারো মতের সঙ্গে কারো মত মিলে না। ক যদি বলে একরূপ, খ বলে তার বিপরীত, আবার হয়ত সম্পূর্ণ নতুন আর এক কথা বলে গ। তার ফলে বই সম্বন্ধে এত বই লিখতে হয়। শুধু তাই নয়। বই সম্বন্ধেও অনেক বই আছে বই কি! আরও বিড়ম্বনা দেখা দেয় তখন যখনই একই সমালোচক আগে এক কথা বলেন, পরে আরেক কথা বলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় টি. এস্. এলিয়টের কথা। কাব্যের আদর্শ সম্বন্ধে আগে তিনি যে-মত ব্যক্ত করেছিলেন, অধুনা সে মত বর্জন করেছেন। এতে তাঁর ভক্তবৃন্দের অবস্থাটা কিরূপ বিশ্রী হয়ে উঠেছে, দীপ্তি ত্রিপাঠীর মুখেই তা শুনুন;

"যে এলিয়ট তাঁদের দিশারী ছিলেন, তিনি ইতিপূর্বেই বদলাতে শুরু করেছিলেন। ১৯৩০-এ লিখিত 'Ash Wednesday' এবং ১৪৩৬-এ লিখিত 'Four Quartets'-এর মধ্যে দেখা গেল এলিয়টের ধ্যান-ধারণার বহুল বিবর্তন ঘটেছে। তিনি সংশয়ের সমুদ্র

www.pathagar.com

থেকে বিশ্বাসের দৃঢ়ভূমিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর নৈরাশ্য ও দুর্বলতা চলে গেছে। তিনি দেখলেন উপলব্ধির মুহূর্তের মধ্যেই সমস্ত কালের গতি স্তম্ভিত। এরই মধ্যে সমস্ত বিপরীত সংগতি লাভ করছে।"

কাব্যে যেমন, সমালোচনাতেও ঠিক তেমন। নানা জনের নানা মত। কে বিচার করবে? কার বিচারকে আমরা অভ্রান্ত বলে মেনে নেবো? কোন দুই ব্যক্তিই ত এক বই পড়ে না। "No two persons ever read the same bock." একজন যা পছন্দ করে, আরেক জন ত তা পছন্দ করেনা! কার কথা তবে বিশ্বাস করব?

"Ten men love what I hate.
Shun what I follow, slight what I receive;
Ten, who in ears and eyes
Match me, we all surmise
They this thing and I that; whom shall
my soul belive?"

তা হ'লে পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে ঃ Judicial criticism-এর কোন সত্যমূল্যই নেই। এক জনের মত আরেক জনের দ্বারা খণ্ডিত হয়ে যায়, কেউ টিকতে পারে না, একজন আরেক জনের গলা কেটে দেয়।

এই সব দেখে শুনে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি বলেছেন ঃ

"Criticism, as a whole, has proved a mere self-cancelling business and has accomplished little or nothing towards any final establishment of literary values."

বস্তুপন্থী সমালোচনা

বিচারপন্থী সমালোচনায় লেখকের চেয়ে সমালোচকই বেশি করে আত্মপ্রকট হন দেখে এ পন্থা অনেকে বর্জন করতে পরামর্শ দেন। তাঁদের মতে সমালোচককে হতে হবে ব্যক্তি নিরপেক্ষ বা বস্তুনির্ভর। সমালোচক তাঁর ব্যক্তিগত রুচির কথা না বলে, বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করবেন এবং তার ঠিক ঠাক ব্যাখ্যা (interpretation) দেবেন। লেখার মধ্যে যেখানে যে সৌন্দর্য আছে, তাই তিনি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরবেন। লেখার সাথে তার থাকবে সহানুভূতি–সহানুভূতিও। Burton বলেন ঃ "The critic should be on the poet's side." লেখকের ত্রুটির দিকে নজর না দিয়ে বরং তিনি তাঁর ভালো দিকটাই দেখাবেন। Hudsonও ঠিক এই কথাই বলেন ঃ "The true critic ought to seek rather excellencies than imperfection."

যুক্তিপন্থী সমালোচনা

কেউ কেউ সমালোচনাকে অন্য ভাবে দেখতে চান। তারা বলেন, বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিতর্ক দ্বারা বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যকে বিশেষ থেকে নির্বিশেষে বা সাধারণ সত্যে নিয়ে যাওয়াই হ'বে বিদগ্ধ সমালোচকের কাজ। ইংরেজিতে একে Inductive

www.pathagar.com

criticism বলে। এই সমালোচনায় মনের সংকীর্ণতা দূর হয়, জ্ঞানের সীমানা সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু এ সমালোচনা সহজ নয়। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অগাধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা না থাকলে কেউ এ পথে সার্থকতা অর্জন করতে পারবে না। এই সমালোচনায় কিছুটা মৌলিক সৃষ্টির অবসর আছে। এইখানে সমালোচনা খানিকটা স্বাধীন সৃষ্টির মর্যাদা পেতে পারে। কিন্তু আগেই বলেছি, হাজার ভাল হলেও সে সৃষ্টি হবে 'Second Creation' অর্থাৎ দ্বিতীয় সৃষ্টি।

কিন্তু এ সমালোচনা খুব কার্যকরী হয় না, সার্থকও হয় না। তার কারণ পূর্ব-সংস্কার, ব্যক্তিগত রুচি ও ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ বর্জন করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

দোভাষীর কাজ

সমালোচককে অনেকে বলেন দোভাষীর (Interpreter) কাজ করতে। তিনি হবেন নির্বিকার ভাষ্যকার। লেখক যা বলতে চেয়েছেন, তিনি তাই বিশ্বস্তভাবে সকলকে বুঝিয়ে দেবেন। "The inspire the uninspird"–অর্থাৎ যারা স্বল্প-অনুপ্রাণিত তাদেরকে তিনি প্রেরণা দেবেন। একাজও কঠিন। লেখক যতটা উঁচুতে উঠেছেন বা যতটা গভীরে গিয়েছেন, সমালোচককেও ঠিক ততটা বা তার কাছাকাছি বিন্দুতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, তবেই লেখক সম্বন্ধে তিনি কিছু বলবার অধিকারী হবেন। খণ্ড খণ্ড রূপে গ্রন্থপাঠ নয়, সামগ্রিক রূপে গ্রন্থকারকে পাঠ না করে কারো সম্বন্ধে কিছু বলা অন্যায়। সমালোচক দেখেবেন "the `work'—not the 'works' of the author". এই তুলনায় আমাদের সমালোচক ও সমালোচনা কত নিম্নস্তরের! সেই উদারতা—সেই catholicity of mind কই? দোভাষীর কাজ করতে গেলেও সমালোচক তাতে আপন মনের রং মিশিয়ে দেন, নয়ত কিছুটা বলেন, কিছুটা বলেন না।

সনাতনপন্থী সমালোচনা

সনাতনতপন্থীরা কতকটা ঐতিহাসিক ধারাকে বজায় রাখতে চান। প্রাচীন যুগ থেকে ভাষা, ভাব, ছন্দ, রস, আঙ্গিক সম্বন্ধে বৈয়াকরণিকেরা যে নিয়ম-কানুন বেঁধে দিয়েছেন, এঁরা সেই অনুযায়ী লেখককে বিচার করেন। একটা বিধিবদ্ধ নিয়মের নিক্তিতে লেখকের দোষগুণ ওজন করা যায় বলে এঁদের পন্থা কিছুটা বৈজ্ঞানিক বলা যেতে পারে। কিন্তু আধুনিক যুগের সঙ্গে এ পদ্ধতি খাপ খায় না বলেই সমাজে এর কোন আদর নেই।

এখানেই শেষ নয়। সমালোচনা আরও কয়েক প্রকারের আছে, যেমন Comparative criticism. Historic Criticims ইত্যাদি। এর উপর আবার বহু নূতন নূতন মতবাদ এসে সমালোচনার ঘাড়ে চেপেছে। যেমন ভাববাদ, নীতিবাদ, প্রকাশবাদ, দাদাবাদ (Dadaism), জীবনবাদ, অতিবাস্তববাদ (Surrealism) ইত্যাদি। ভাগের উপরে ভাগ, তার উপরে ভাগ। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়, যেমন কবিতায়, তেমনি সমালোচনায় এক নৈরাজ্যের সূচনা হয়েছে। এটা একটা 'no-man's hand,' এখানে যার খুশি যা, তাই সে করতে পারে। -(আধুনিক বাংলা কাব্য-পরিচয়)

www.pathagar.com

দৃষ্টিকোণের পার্থক্য

সমালোচনার বহু বিচিত্র রূপের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম। এখন কথা হচ্ছে ঃ এই সব পদ্ধতির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ? কোনটি আমাদের গ্রহণযোগ্য? বলা কঠিন। প্রত্যেকেরই দোষগুণ আছে। যে-Judicial criticism-এর এত নিন্দা করা হল, বহু দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ঐটেই কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য প্রক্রিয়া। নৈর্ব্যক্তিক হতে চাইলেও হওয়া যায় না। আমাদের রক্তে আছে যুগসঞ্চিত ধ্যানধারণা ও আদর্শের ছাপ। তা থেকে কেমন করে আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত হব? কাজেই সমালোচনার শেষ মাপকাঠি দাঁড়ায় ঐ ভালমন্দের বিচারে। এই কারণে মতবিরোধও হয়েও ওঠে অনিবার্য। সাধারণের কথা ত দূরে থাকুক, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমালোচকদের মধ্যেও কারো মতের সঙ্গে কারো মতের মিল নেই। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ঃ-

শেকস্‌পিয়ার একজন বিশ্বকবি। সেইরূপ টলস্টয়ও বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম চিন্তাশীল মনীষী। টলষ্টয় শেকস্‌পিয়ার সম্বন্ধে কিরূপ মত পোষণ করতেন, দেখুন-

"I remeber the astonishment I felt when I first read Shakespeare. I had expected to receive a great aesthetic pleasur, but on reading one after another the works regarded as his best, King Lear, Romeo Juliet, Hamlet and Macbeth,not only did I not experience pleasure, but I felt inseparable repulsion and tedium and a doubt whether I lacked sense, since I considered works insignificant and simply bad, which are regarded as the summit of perfection by the whole educated world."

মোপার্সাঁ সম্বন্ধে টলষ্টয়ের মন্তব্য ঃ

"Maupassant possess talent .... He was also master of a beautiful style. He was also master of that condition of ture artistic production without which a work of art does not produce its effect viz. sincerity. But unfortunately lacking the first and perhaps the chief condition of worthy artistic production—a correct moral relation to what he described, that is to say, a knowledge of the difference between good and evil—he loved and described things that should not have been loved and described."

বোদলেয়ার ও ভেরলেন সম্বন্ধেও টলষ্টয় অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন

".....in their least bad productions one sees more of Baudlaire or Verlaine than of what they were describing. But these two indifferent versifiers form a school and leads hundreds of followers after them. ....

www.pathagar.com

There is only one explanation of this fact : it is that the art of the society in which these versifiers lived is not a serious, important matter of life. but a mere amusement."

T. S. Eliot এ-যুগের অন্যতম প্রধান কবি ও সমালোচক। Milton সম্বন্ধে তিনি কী বলেন দেখুন ঃ

"Milton writes English like a dead language.......... His language is, if one may use the term without disparagement, artificial and conventional ....

Milton has done damage to the English language from which it has not wholly recovered."

এইরূপ ভুরি ভুরি প্রমাণ দেওয়া যায়।

কার মত তা হ'লে আমরা গ্রহণ করবো? মিলটন বা শেকস্‌পীয়ার জগদ্বিখ্যাত কবি ; পক্ষান্তরে টলষ্টয় ও টি. এস. এলিয়টও বিশ্ববরেণ্য। তাঁদের মতই বা কি ক'রে আমরা অবজ্ঞা করি?

সমালোচনার আপেক্ষিকতা

অবস্থা যখন এইরূপ, কারও মতের সঙ্গে যখন কারও মত মেলেনা, তখন একটি মাত্র পথেই আমাদের মুক্তি আছে। সেটি হচ্ছে আইনস্টাইনের 'Law of Relativity.' ঘোষণা ক'রে দেওয়া হোক যে "There is no standard criticism, all criticisms are relative." অর্থাৎ সমালোচনার কোন ধ্রুব আদর্শ নেই, সব সমালোচনাই আপেক্ষিক।

এই নীতি মেনে চললে কারও কিছুই ক্ষোভের কারণ থাকবে না। সমালোচকও খেয়াল মাফিক যা-খুশি বলতে পারবেন, লেখক ও পাঠকও সেগুলিকে ব্যক্তিগত খামখেয়ালির মূল্যে গ্রহণ করবেন। কোন পুস্তক সমালোচনা করতে গেলে সমালোচক আগেই বলে নেবেন 'প্রিয় পাঠক পাঠিকা! অমুকের অমুক বইকে উপলক্ষ করে আমার নিজের পরিচয় খানিকটা দিচ্ছি শুনুন।' আনাতোল ফ্রান্স ঠিক এমনই একটা উক্তি করেছিলেন ঃ

"a lecturer on literature, if he were really honest, instead of using the time-honoured exordium 'Gentlemen, I am going to speak to you to-day about Pascal, or Racine or Shakesrpeare, should rather begin his discourse with the words—"Gentlemen,I am going to speak to you to-day about myself in relation to Pascal or Racine or Shakespeare."

অতি চমৎকার! সমালোচকদের এর থেকে পাঠগ্রহণ করা উচিত। তাঁদের কোন কথাই যখন সত্য হয় না, আজ যাকে তাঁরা 'যুগস্রষ্টা' বলছেন, দু'দিন পরে সে যখন

www.pathagar.com

'যুগসৃষ্টি'তে নেমে আসছে, আবার আজ যাকে তাঁরা অবজ্ঞার অন্ধকারে ফেলে রাখছেন কালই সে যখন উজ্জ্বল মহিমায় প্রকাশ পাচ্ছে, তখন তাদের সতর্ক হওয়া উচিত। তাঁদের মনে রাখা উচিত ঃ

"Again and again history has proved that the best interests of literature have been subserved by open defiance of the critics—'this will never do.'

লেখকদেরও একটা কথা মনে রাখতে হবে। সমালোচকদের নিন্দাবাদে তাঁরা যেন নিরুৎসাহ না হন, আবার তাঁদের স্তুতিবাদে আত্মহারাও যেন না হন। সমালোচকদের কোন কথারই যখন স্থায়ী মূল্য নেই এবং সৃষ্টিধর্মী কোন শিল্প বা সাহিত্য যখন সমালোচকদের মুখাপেক্ষী নয় তখন তাঁদের কোন কথায় কান না দিয়ে আপন সৃষ্টির প্রতি মনোযোগী হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। মহাকালই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিচারক। সেই নিত্যকালের হাতে সাহিত্যকে তুলে দেওয়াই হবে লেখকদের পক্ষে সবচেয়ে সঙ্গত ও নিরাপদ।

লেখক-সংঘ পত্রিকা

১৯৬২

www.pathagar.com

বরিশাল সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

*

ইসলামী সাহিত্য-শাখার সভাপতির

অভিভাষণ

*

সভাপতি

কবি গোলাম মোস্তফা

*

বরিশাল

১০ ই মার্চ, ১৯৫৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামী সাহিত্য

বন্ধুগণ,

আমাকে ডাকা হয়েছে 'ইসলামী সাহিত্য' সম্বন্ধে কিছু বলার জন্যে। ইসলামী সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে গোড়াতেই এ-কথা খোলাসা হওয়া দরকারঃ ইসলামী সাহিত্যের সংজ্ঞা কী, প্রকৃতি কী এবং এর পরিসর কতদূর।

অনেকেই বলবেনঃ ইসলামী সাহিত্য হলো সেই সাহিত্য– যাতে আল্লাহ-রাসূল, রোজা-নামাজ, মাছলা-মাছায়েল বা ইবাদৎ-বন্দিগীর কথা থাকবে, কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা থাকবে না বা প্রেমের কথাও থাকবে না (থাকলেও আগে নিকাহ্ পড়িয়ে দিতে হবে?)–। এ সাহিত্যের ভাষা এবং আঙ্গিকও হবে ইসলামী কায়দার। তবেই সে হবে ইসলামী সাহিত্য। এক কথায়ঃ ইসলামী সাহিত্যকে হতে হবে রূপরস-বর্জিত নিছক Puritan-মার্কা সাহিত্য–মিলন-বিরোধী এবং বাহিরের জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও অপাংক্তেয়।

কিন্তু আমি যদি বলিঃ ইসলামী সাহিত্য ঠিক এর উল্টো? অর্থাৎ বাইরের সাহিত্যেই রয়েছে সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা ও একদেশদর্শিতা, আর ইসলামী সাহিত্যেই রয়েছে বিশ্বজনীন উদারতা ও মানবতার আবেদন ? ইসলাম নিজেই যখন মিলন ও সমন্বয়-প্রয়াসী; তখন ইসলামী সাহিত্য কেন হবে সংকীর্ণ ও অনুদার? ইসলামী কোন জিনিসই সংকীর্ণ বা অনুদার নয়। দেশই হোক, জাতিই হোক, ধর্ম হোক, সংস্কৃতি হোক, সমাজ হোক, সাহিত্য হোক, সঙ্গীত হোক, শিল্প হোক–ইসলাম সর্বত্রই মিলেছে ও মিলিয়েছে। খণ্ডতা ও ক্ষুদ্রতার স্বপ্ন যেখানেই ভীড় জমিয়েছে, সেখানেই প্রয়োজন হয়েছে ইসলামের। সকলের স্থান সংকুলন করাই হল ইসলামের কাজ। নিজেও থাকবে, অপরকেও থাকতে দেবে–এই তার নীতি। ইসলাম ধর্ম নূতনত্বের দাবী রাখে না। পূর্ববর্তী কিতাব সমূহকে সে স্বীকার করে, ভিন্ন ধর্মের পয়গম্বরদিগকে সে মানে। ইসলামের ধাতুগত অর্থই হল আপোষ বা মিলন। দ্বন্দ্ব ও বৈষম্যের মধ্যে সে শোনায় মিলন বা সমন্বয়ের বাণী। শুধু ধর্মে-ধর্মে নয়, ধর্ম ও কর্মের মধ্যেও সে ঘটিয়েছে অপূর্ব মিলন। ইসলামে জাতিভেদ নাই। সব জাতিকে সে তার বুকে টেনে নিয়েছে; সাদাকালা, বাদশা-গোলাম, কাফ্রী-ইরানী, আফগান-তুরানী, আরবী-হিন্দুস্থানী–সব এক করে দিয়ে বৃহত্তর মানব-গোষ্ঠী সে রচনা করেছে। বিশ্বমানবতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন রয়েছে তার চোখে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তার একই মনোভাব। ইসলামী কালচার শুধু আরবী কালচার নয়; সেমিটিক, হেলেনিক ও এরিয়ান কালচারের এ এক অপূর্ব সমন্বয়। অন্য কথায় ঃ সব কালচারের সঙ্গে ইসলাম করেছে মিতালি। প্রাচীন গ্রীক কালচার ধ্বংস হয়ে যেত। ইসলামই তাকে বাঁচিয়েছে। বস্তুতঃ ইসলাম যে-পথ দিয়ে যেখানে গিয়েছে, সেখানেই সে স্থানীয় কৃষ্টি ও সভ্যতাকে আপন করে নিয়েছে। গেল সে স্পেনে, সেখানে সে রচনা করল মুর-সভ্যতা। এল সে পারস্যে; নিল সে দুহাত ভরে যা কিছু তার দরকার। এল সে ভারতে। আর্য-সভ্যতার থেকেও সে বেছে নিল তার উপকরণ। গেল সে আফ্রিকায়;

www.pathagar.com

সেখানেও সে কাফ্রীদের হাতে হাত মিলালো। এমনি করে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে সে ঘটাল অদ্ভুত এক সংযোগ ও সমন্বয়।

ইসলামের এই উদার দৃষ্টি-ভঙ্গী ও মিলনের মনোবৃত্তি সবচেয়ে প্রকাশ পেয়েছে কৃষ্টি ও জ্ঞান-কর্ষণার ক্ষেত্রে! গ্রীকের প্লেটো ইসলামের আফলাতুন, তার সক্রেটিস আমাদের বোখরাত। অগ্নি-উপাসক ইরানবাসীর পেহলবী ভাষা এখন ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। মওলানা রুমীর মসনবীকে বলা হয় 'পেহলবী ভাষার কুরআন!

'মসনবী-এ মানবী-এ মৌলভী
হাস্ত কুরআঁ দর জবানে পেহলবী"।

এই ভাষাতেই লেখা হল'শাহনামা'–জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহা-কাব্য। কর্ডোভা, গ্রাণাডা, বাগদাদ, দিল্লী, আগরা, সর্বত্রই একই সুরঃ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান, বৈষম্যের মধ্যে মিলনের সন্ধান। ইসলামের কোথায় তবে সংকীর্ণ রূপ ? সঙ্গীতেও শিল্পে দেখুন! ভারতীয় সঙ্গীতের কথাই ধরা যাক। ধ্রুপদের লৌহ-প্রাচীর ভেঙে সে যখন ঢুকলো, তখন ধ্রুপদকে সে উচ্ছেদ করল না; তার সঙ্গে মিতালি করে সে সৃষ্টি করল আরও তিনটি শাখাঃ খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী। বর্তমানে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী–এই চারটে মিলেই ভারতীয় সঙ্গীত। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এখন এগুলোকে আমরা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষা করি। ইসলামের হাতেই সৃষ্টি হল উর্দু ভাষা–যার উপকরণ লওয়া হল সব ভাষা থেকে আর যার দুয়ার রইল সকলের জন্য খোলা।

স্থাপত্য-শিল্পেও 'তাজমহল' এই সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক। দর্শনের দিক দিয়ে দেখলেও ইসলামকে দেখবেন মিলন-ধর্মী। ইহকাল-পরকালকে সে মিলিয়েছে। আল্লাহ ও রাসূলকে সে মিলিয়েছে। শুধু দর্শন নয়। রাষ্ট্র-দর্শনেও তার একই রূপ। তের-চৌদ্দ শত মাইল দূরবর্তী দুইটি ভূভাগ মিলিয়ে একটি রাষ্ট্র রচনা করার নজির ইসলামেই আছে।

ইসলামে পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ নাই। ইসলামের কোন frontier বা সীমান্ত নাই। ইংরাজ কবি যেখানে বলছেন ঃ

"The West is West, the East is East
The twain shall never meet,"

ইসলামের কবি সেখানে বলছেন ঃ

"চীন ও আরব হামারা হিন্দুস্তান হামারা
মুসলিম হ্যাঁয় হাম্‌ ওতান হ্যায়, সারা জাহা হামারা।"

এত যায়গায় ইসলাম উদার হতে পারল, পারল না কি তবে শুধু বাংলা সাহিত্যের বেলায়? 'ইসলামী সাহিত্য' বললেই কি সেখানে বুঝতে হবে অন্যরূপ? এই বাংলা ভাষাকে ত ইসলামই দিয়েছে মর্যাদার আসন। শব্দ দিয়ে, ভাব দিয়ে, গঠন দিয়ে এ ভাষার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাই করেছে ইসলাম। বাংলা ভাষাকে কে আগে চিনত? কে আগে স্বীকার করতো? ব্রাহ্মণেরা এ ভাষাকে অনার্য ভাষা বলে দস্তুর মত ঘৃণা করেছেন। শুধু তাই নয়। যারা এ ভাষার চর্চা করবে, তাদের জন্যে' রৌরব' নামক নরকেরও ব্যবস্থা তাঁরা করেছিলেন।

www.pathagar.com

সেই অনাদৃত বাংলা ভাষাকে রূপ দিয়েছে ইসলাম। ইসলামকে বাদ দিলে বাংলা ভাষা নেই। গোড়াতে হিন্দু কবি-সাহিত্যিকদের সৃষ্টিতে বাংলা ভাষায় কোন মানবীয় উপাদান ছিল না; শুধু দেবদেবীর মাহাত্ম্য ও লীলা-কীর্তনই ছিল এ ভাষার বিষয়-বস্তু। মুসলমানেরাই একে মানবধর্মী করেছে। মানুষের ব্যথা-বেদনা সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না দিয়ে দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে সহজবোধ্য করে এ ভাষাকে তারাই গড়ে তুলছে। পাঠান ও মোগল আমলে ইসলামী বাংলা-ভাষা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলন ঘটিয়েছে। ভারতচন্দ্র রায়ের ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গি দেখলেই তা আপনারা বুঝতে পারবেন। শুধু তাই নয়। হিন্দু কবিরা ইসলামী বিষয়-বস্তু নিয়ে ইসলামী কায়দায় পুথি লেখাও আরম্ভ করেছিলেন। উমাচরণ মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের 'গোলে বকাঅলি' ও রাধাচরণ গোপের 'জঙ্গনামা' তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

বাংলা গদ্য-সাহিত্যেও ইসলাম হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলন-ক্ষেত্র রচনা করেছিল। নিম্নে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা দুই খানা পত্রের নকল উদ্ধৃত করছি। তা থেকেই বুঝবেন ভাষা তখন কিরূপ ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা (১৬৭২ খৃঃ)

"শ্রীজসোমাধব ঠাকুর কুমড়াল গ্রামে দেবালয়ত আছিলা। রামসর্মা ও গয়রহ সেবকেরা আপনার ২ ওয়াদা মাফিক সেবা করিতেছিল। রাত্রদিন চৌকী দিতেছিল। শ্রী রামজীবন মৌলিক সেবার সরবরাহ পুরুসানুক্রমে করিতেছেন। ইহার মধ্যে পরগণা পরগণাতে দেওতা ও মুরুত তোড়িবার আহাদে -----থাকিয়া আর আর পরগণাতে দেওতা ও মুরুত তোড়িতে আসিল।--- তাহার পর ২৭ মহরম মাহে ২৮ জৈষ্ঠ ঠাকুর দেখিবার প্রাতেঃকালে সকল লোক গেল---।

--শ্রী মনোমোহন ঘোষের 'বাংলা গদ্যের চার যুগ' (১১পৃ.)

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা (১৭৮৬)

"শ্রীযুক্ত ওলন্দেজ কোম্পানীতে আড়ঙ্গ বিরভূমের গঞ্জে খরিদের দাদনী আমি লইয়া ঢাকা আড়ঙ্গ চালানী করিয়াছি আপরেল মাহাতে এবং মোকাম মজকুরের গোমস্তা কাপড় খরিদ করিতেছিল এবং কাপড় কথক ২ আমদানী হইয়াছে এবং হইতেছিল দাস্ত কথক ২ তৈয়ার হইয়াছে এবং মবলক কাপড় ধোবার হাতে দাশতর কারণ রহিয়াছে তাহাতে সংপ্রীতি মেঃ গেল সাহেবের তরফ পেয়াদা আসিয়া খামখা জবর-দস্তী ও মারপিট করিয়া ঘাট হইতে ধোবা লোককে ধরিয়া লইয়া গেল আমার তরফ হইতে গোমস্তা পেয়াদা যাইয়া সাহেব মজকুরকে হাজির করিলো তাহা সাহেব গৌর না করিয়া আমার লোককে হাকাইয়া দিলেক এবং কহিলেক তোমরা আইয়াছ সাজাই দিব আমার কমবেষ ৪০০০ চারি হাজার থান কাপড় ধোবার ঘাটে দাস্ত বেগর পচিতে লাগিল ইহা সেওয়ায় কোরা কাপড় কাচীতে তইয়ার অতএব আরজ ইহার তদারক মেহেরবাণী করিয়া করিতে হুকুম হয়---।"

www.pathagar.com

পত্রখানি ওলন্দাজ কোম্পানীর ডিরেক্টরের কাছে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে লেখা হরিমোহন বর্মার আরজি থেকে গৃহীত।

কিন্তু এর পরে বৃটিশ আমলের প্রারম্ভে শ্রীরামপুরে পাদ্রীরা কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে মিশে যে কাণ্ডটি করলেন, তাতেই ত দেখা দিল সংকীর্ণতা ও অনুদার মনোভাব। বাংলা ভাষা সেখানেই ত দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গেল। ইসলামী শব্দ ও বিষয়-বস্তু বর্জন করে তারা যে ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টি করলেন, তা হ'ল একদম সংস্কৃত- ঘেঁষা, সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক। ইসলামের হাতে যতদিন ছিল, ততদিন ত বাংলা ভাষায় সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি গজায় নি! তখন ছিল, 'co-existence'-এর ভাব। কিন্তু অনৈসলামিক যেই হল, অমনি এল বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির অভিশাপ। 'দুর্গেশ নন্দিনী' 'আনন্দ-মঠ' ইত্যাদি ধরনের পুস্তক নিশ্চয়ই মুসলমানেরা লেখেনি বা ইসলামী আমলেও লেখা হয় নি। এই ভিন্ন-গোঠ রচনা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন তাঁর "ইসলামী বাংলা সাহিত্যে" বলছেন ঃ

"১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ থেকে বাংলা দেশে শাসন কার্যে ফারসীর স্থান নিল বাংলা। সেই থেকে আরবী-ফারসী শব্দের আমদানি ত বন্ধ হলই, উপরন্তু সল্প-পরিচিত আরবী-ফারসী শব্দের রপ্তানিও শুরু হল। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হল সংস্কৃত শিক্ষিতদের দ্বারা। এদিকে ফারসী-উর্দু জানা মুসলমান লেখকেরা পুরানো রাস্তা ধরেই চললেন। তার ফলে ইসলামী বাংলা সাধারণ সাহিত্যের ভাষা থেকে যেন দূরে সরে গেল।"

ঠিক তা নয়। এজমালী ভাষা থেকে পৃথক পণ্ডিতী ভাষা হল।

এই ভাষা রূপান্তরিত হয়ে গণমানুষের কাছ থেকে এখন কত দূরে সরে গেছে, তা আপনারা জানেন। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের লেখ্য ভাষার সঙ্গে কথ্য ভাষার মিল নেই। এর ব্যাকরণও নিজস্ব নয়, সংস্কৃত ব্যাকরণ এর ঘাড়ে চাপান হয়েছে। আধুনিক বাংলা ভাষাকে তাই বলা যেতে পারে আভিজাত্যপূর্ণ বুর্জোয়া ভাষা। প্রোলেটারিয়েটের সঙ্গে এর নাড়ীর যোগ নেই। ইসলাম-নিরপেক্ষ-বাংলা সাহিত্যের এই ত পরিণতি।

তা হলে দেখা যাচ্ছে ঃ 'ইসলামী বাংলা-সাহিত্য' বললে সাধারণত যে গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতার ভাব মনে জাগে, আসলে তা মোটেই নয়। বরং তার উল্টো? মিলন, সমন্বয় ও ব্যাপকতা বুঝাতেই কোন-কিছুর পূর্বে 'ইসলামী' বিশেষণ দেওয়া যেতে পারে- সংকীর্ণতার জন্য নয়।

আধুনিক যুগে আসা যাক। মুসলমানের হাতে এলেই যে যে-কোন বস্তু বিশ্বজনীন ও কল্যাণরূপ লাভ করে এবং প্রশস্ততর হয়, তার এক বড় প্রমাণ নজরুল ইসলাম। হিন্দু-সেবিত বাংলা ভাষায় যেই তিনি ঢুকলেন, অমনি রচনা করলেন তিনি এক অপূর্ব মিলন-সেতু। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র সাহিত্য রচনা করা ত দূরে থাকুক, হিন্দুর বেদ-পুরাণ রামায়ণ-মহাভারত ও প্রাচীন ঐতিহ্যকে তিনি তার সাহিত্যে এত ব্যবহার করেছেন যে ভাবলে অবাক হতে হয়। দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন।

তা হলে এই কথাই কি সত্য নয় যে, এই গণতন্ত্রের যুগে ইসলামী সাহিত্যই আদর্শ সাহিত্য এবং এই সাহিত্যই গণমানুষের সাহিত্য, আর এরই মধ্যদিয়ে আস্‌বে বৃহত্তর জনকল্যাণ?

www.pathagar.com

ইসলামী বিজ্ঞান

এতক্ষণ সাহিত্য ও শিল্পে ইসলাম কী দিয়েছে, সকলকে তা দেখান হল। এইবার বিজ্ঞানের দিক দিয়েও দেখা যাক ইসলাম সেখানে কোন স্থান পেতে পারে কিনা।

আমরা এখন নিশ্চিত রূপে এক নূতন যুগে এসে পড়েছি। এ-যুগ হচ্ছে নভোভ্রমণের যুগ (The age of space-flight and interplanatory journey) পূর্বের বহু বৈজ্ঞানিক মতবাদ এখন উল্টে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা এখন নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। এরোপ্লেন এখন ছ্যাঁক্ড়া গাড়ি হয়ে গেল। এখন রকেট-শিপে বা স্পেস-শিপে (spacespip) চড়ে মানুষ কি করে চন্দ্রলোকে ও মঙ্গল গ্রহে যাবে, তারি ব্যবস্থা করছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় এর জন্যে ব্যাপক চেষ্টা চল্‌ছে। জার্মনির নভোবৈজ্ঞানিক ভন্ ব্রাউন (Von Braun) ঘোষণা করেছেন ঃ আগামী দশ বৎসরের মধ্যেই তারা চন্দ্রলোকে অভিযান করবেন।'

সময় (Time) সম্বন্ধেও এখন বৈজ্ঞানিকেরা নূতন কথা বলছেন। 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম' (Standard time) বলে কিছু নেই, সব টাইমই লোকাল (All time is local)- এই তথ্যই তারা আবিষ্কার করেছেন। তারা আরও বলছেন ঃ গতির (Velocity)-র উপর সময় নির্ভর করে। গতির তারতম্যে সময়ের তারতম্য ঘটে যায়। আলোকের সমগতিতে কেউ যদি যায়, তবে সে দেখবে সময় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; আলোকের চেয়ে কম গতিতে গেলে দেখবে জগত সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, অর্থাৎ রবির পরে সোম, সোমের পরে মঙ্গলবার আসছে;কিন্তু আলোকের চেয়ে বেশী গতিতে (super-light velocity)-তে কেউ যদি যেতে পারে, তবে সে দেখবে সময়ের কাঁটা উল্টো দিকে ঘুরছে। অর্থাৎ রবির পরে শনি, শনির পরে শুক্রবার আসছে। মহাকর্ষ (gravity) সম্বন্ধেও এখন পূর্ব-ধারণা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেনঃ যতই উর্দ্ধে উঠবে, ততই বস্তুর ওজন কমতে থাকবে। ২৫০০০ মাইলের উর্দ্ধে গেলে সেখানে আর ভারত্ব বলে কিছুই থাকবে না; সেখানে একদম Zero gravity, অর্থাৎ না পড়বে, না উঠবে। বৈজ্ঞানিকেরা এখন সেখানে গিয়ে 'space station' করবে। সেই ষ্টেশনে থেমে তারা চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ইত্যাদি গ্রহে যাত্রা করবে। পৃথিবী থেকে ১৮,০০০ মাইল উর্দ্ধে তারা একটি কৃত্রিম গ্রহ চালাবে। প্রতি দুই ঘণ্টায় সে পৃথিবী পরিক্রম করবে।

আপনারা ভাবছেন উপরের এই সব কথার মধ্যে ইসলাম কোন রকমেই ঠাঁই পেতে পারে না। কিন্তু শুনে অবাক হবেনঃ ইসলামের কাছেই জগৎ সর্বপ্রথম এসব কথা শুনেছে। অন্য কথায়ঃ এই সব আবিষ্কারের উৎস মূলই হল ইসলাম। রাসূলুল্লাহর মিরাজের সঙ্গে এই সব কথা মিলিয়ে পড়ুন। দেখবেন ঃ রাসূলুল্লাই হচ্ছেন এই নূতন বৈজ্ঞানিক যুগের

www.pathagar.com

অগ্রদূত। সশরীরে তিনি বুরাকে চড়ে নভোভ্রমণ করেছিলেন–একথা আজকের দিনে কেউ যদি অস্বীকার করে, তবে তাকেই বলব গোঁড়া মোল্লা। তথাকথিত মোল্লারাই এখন প্রগতিশীল। রাসূলুল্লাহর 'বুরাক' আজ রকেটে রূপান্তরিত। 'সিদরাতুল-মুনতাহা যেখান পর্যন্ত জিব্রাইল উঠে আর উঠতে পারেন নি–এবং রাসূলুল্লাহ্ একাই যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন– সেখানকার নাম আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় হয়ত বা 'space-frontier.'[১]

সময় সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা আরও যে-সব অদ্ভুত কথা বলেছেন, তা সব শুনে নিন, তারপর আমার কথাটি বলব। উপরে বলেছি, গতির তারতম্যে সময়ের তারতম্য ঘটে যায়। কি ভীষণ ভাবে ঘটে, দেখুন— সাইরিয়াস নক্ষত্রপুঞ্জ পৃথিবী থেকে ৯ আলোক বছরের পথ। কেউ যদি রকেটে চড়ে আলোকের গতির কাছাকাছি গতিতে যাত্রা করে, তবে তার ৯ বছর যেতে লাগবে, ৯ বছর আসতে লাগবে; অর্থাৎ মোট ১৮ বছর কেটে যাবে। বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করে দেখেছেন, লোকটি যদি সকাল বেলা ৮ টার সময় চা খেয়ে যাত্রা করে, তবে সাইরিয়াস গ্রহে সে যখন পৌছবে তখন তার ঘড়িতে সে দেখবে বেলা ১টা বেজেছে। অর্থাৎ সেখানে গিয়ে সে 'লাঞ্চ'(lunch) খেতে পারবে। লাঞ্চ খেয়ে বেশী দেরী না করে সে যদি ফেরত আসে, তবে তার ঘড়ি অনুসারে সে পৌছবে রাত্রি ৮/৯টায়; অর্থাৎ 'ডিনার' খাবার সময়। কিন্তু পৃথিবীতে যেই সে পদার্পণ করবে, অমনি সে দেখবে এখানকার ঘড়ি অনুসারে তার ১৮টি বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেছে, আর ইত্যবসরে তার পরিজনেরা মোট ৬৪৮০টি ডিনার খেয়ে ফেলেছে!

আর একজন বৈজ্ঞানিক বলছেন ঃ কোন লোককে যদি রকেটে করে শূন্যে ছুঁড়ে দেওয়া যায় আর রকেটটি যদি কোন একটা ধুমকেতুর খপ্পরে পড়ে, আর সে যদি তাকে এক পাক ঘুরিয়ে এনে পৃথিবীতে নামিয়ে দিয়ে যায়, তবে লোকটি দেখবে তার দুই বৎসর সময় লেগেছে, কিন্তু পৃথিবীর হিসাবে দেখা যাবে ২০০ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে !

এইবার দেখুন ইসলাম কি ভাবে এই সব কথার ভিতর ঢুকে বসে আছে। কুরআন শরীফে সুরা বাকারার ২৫৯ আয়াত দেখুন। সেখানে আছে ঃ একজন বোজর্গ লোক গাধার পিঠে চড়ে একটা নগরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় নগরটি ধ্বসে পড়ে গেল। লোকজন সব চাপা পড়ল।

লোকটি আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আল্লাহ, কেমন করে তুমি আবার এই লোকদেরে জীবিত করবে ? 'আচ্ছা দেখ' বলেই আল্লাহ্ সেই লোকটিকেও চাপা দিয়ে মেরে ফেললেন ? ১০০ বছর পর আল্লাহ্ তাকে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কতক্ষণ এখানে ঘুমিয়ে ছিলে ? লোকটি বললেন ঃ একদিন বা তারও কম। আল্লাহ্ বললেনঃ না,

---

১. (এখন থেকে অর্ধশত বছর আগের কথা। এরমধ্যে মানুষ চন্দ্র পদানত করেছে এবং মঙ্গলে যাবে যাবে করেছে। – সম্পাদক)

www.pathagar.com

তুমি এখানে ১০০ বছর ঘুমিয়ে ছিলে। বিশ্বাস না হয় তোমার গাধার দিকে চেয়ে দেখ। দেখা গেল ঃ গাধাটি মরে পচে ভূত হয়ে গেছে, শুধু তার হাড্ডি কখানা আছে। অথচ তার রুটি ও পানির দিকে চেয়ে তিনি দেখলেন, সেগুলি তখনও অবিকৃত রয়েছে। এর দ্বারা সময়ের আপেক্ষিকতাই (relativity) প্রমাণিত হচ্ছে। অর্থাৎ কারো টাইমের সাথে কারো টাইম মিলে না। বৈজ্ঞানিকদের কথা কুরআনের কথার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে নাকি ? সুরা 'কাহাফে' আসহাব-কাহাফের কাহিনীও অনুরূপ। তিনশ বছর গুহার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকার পর যখন তারা জাগল, তখন তারা ভাবল তারা স্বাভাবিক ভাবেই এক রাত্রির মত ঘুমিয়ে ছিল।

সূরা বাকারার ২৬০ আয়াতে আর একটি ঘটনা দেখুন হযরত ইব্রাহিম আল্লাকে যখন বললেন ঃ তুমি কেমন করে মৃতকে আবার সশরীরে পুনর্জীবিত করবে, তা আমাকে দেখাও। আল্লাহ বললেনঃ কেন, তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না? হযরত ইব্রাহিম বললেন ঃ বিশ্বাস হবে না কেন? তবে যদি একটু দেখাতে, তা হ'লে মনটা খুশি হত। তখন আল্লাহ বললেন, তুমি চার-জাতের চারিটি পাখী পোষো; তারপর তাদের মাথা কেটে গোশ্‌ত্‌গুলি টুকরা টুকরা করে মিশিয়ে চারটি পাহাড়ের উপর রেখে আসো। হযরত ইব্রাহিম তাই করলেন। তখন আল্লাহ বললেন ঃ এইবার পাখিগুলির প্রত্যেকটিকে তার নাম ধরে ডাকো। নাম ধরে ডাকা মাত্র প্রত্যেকটি পাখী স্বশরীরে উড়ে তার হাতে এসে বসল। তখন আল্লাহ হযরত ইব্রাহিমকে বললেনঃ তুমি পাখিগুলির স্রষ্টা নও, শুধু পোষ মানিয়েছ মাত্র; তোমার ডাকেই যখন তারা নিজ নিজ দেহ নিয়ে উড়ে এল, তখন আমি আল্লাহ–বিশ্বনিখিলের স্রষ্টা ও পালয়িতা–আমার ডাকে কি রোজ-হাশরে জড় উপাদানসমূহ সাড়া দিবে না?

এর থেকেই ইংগিত পেয়ে বৈজ্ঞানিকেরা আজ কী বলছেন, শুনুন। তাঁরা বলেন ঃ এমন দিন শীঘ্রই আসছে–যেদিন মানুষের আত্মা তার দেহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে মুহূর্ত মধ্যে যেখানে খুশি চলে যাবে, আর সেখানকার জড়-প্রকৃতি থেকে তার দেহের উপাদান সংগ্রহ করে স্ব-মূর্তিতে আবির্ভূত হতে পারবে। ডাকলেই উপাদানগুলি তার চার পাশে ঘণীভূত হয়ে তাহার দেহ রচনা করবে। পুনরায় সেখানে দেহ রেখে সে নিজস্থানে ফিরে আসতে পারবে। অন্য কথায়ঃ বিজ্ঞানীরা এই কথাই বলে দিচ্ছেন যে, জড়-উপাদান আত্মার অধীন। এ কথা ইসলামের কাছে আদৌ নূতন নহে। ১৪০০ বছর আগেই কুরআন ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ চন্দ্র-সূর্য দিবারাত্রি সাগর-নদী সব কিছুই মানুষের তাঁবেদার (subservient) করে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা ইব্রাহিম ৩২-৩৩ আয়াত এবং সূরা নহ্‌লের ১২ আয়াত দেখুন।)

এইরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

তা হ'লে এইবার আপনারা বলুন ঃ ইসলামী সাহিত্য কোন্‌টুকু, আর অনৈসলামিক সাহিত্যই বা কোন্‌টুকু? কাব্য-সাহিত্য দর্শন-বিজ্ঞান–কোন্‌খানে ইসলাম নেই? ইসলামের

www.pathagar.com

জন্য খাস করে ত কোন বিষয় বস্তু মার্কা-মারা নেই। দু হাত প্রসারিত করে রেখেছে ইসলাম। সবাইকে সে তার বুকে স্থান দিতে পারে আর তার সোনার কাঠির যাদু স্পর্শ পেলেই যে- কোন বস্তু সুন্দর হয়ে প্রশস্ত হয়ে বৃহত্তর কল্যাণ রূপে দেখা দেয়। একদিকে তার যেমন কুরআন-হাদিস রয়েছে, অপর দিকে তেমনি আছে আলিফ-লায়লা, শাহনামা, রুমীর মসনবী, হাফিজের দিওয়ান, ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ, মুতাজেলাদের দর্শন, আবু-সিনা, আল-ফারাবী, আল-জাবের ইত্যাদি মনীষীর বিজ্ঞান সাধনা, ইবনে খলদুনের ইতিহাস, ইবনে বতুতার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, নিজামীর রস-রচনা ইত্যাদি ইত্যাদি। বস্তুতঃ ধর্ম, নীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য, উপন্যাস, ভ্রমণ-কাহিনী, ইতিহাস, লোক-সঙ্গীত, পুঁথি-সাহিত্য, সর্বত্রই রয়েছে ইসলামের অবাধ গতি ও অধিকার। বাকী ছিল আধুনিক বিজ্ঞান। সেখানেও দেখা যাচ্ছেঃ চৌদ্দশ বছর আগেই সবার অলক্ষ্যে সে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে ! তা হলে আপনারা যা ভেবে রেখেছিলেন, তা আর হল না। ইসলামী সাহিত্য চোঙ্গের ভিতরে আবদ্ধ হয়ে আর রইল না। আপন ক্ষমতায় সে বেরিয়ে এল! শাখা এখানে মূল হল, মূল এখানে শাখা হ'ল! অন্য কথায়ঃ আমিই হলাম আপনাদের এই সম্মেলনের মূল সভাপতি! তাই নয় কি?

দায়ী কে?

এখন কথা হচ্ছে ঃ ইসলামী সাহিত্যের এই বিকৃত অর্থ ও ধারণার জন্য দায়ী কে ? দায়ী প্রকৃত পক্ষে মুসলমানেরাই। মুসলমানেরা ইসলামকে সংকীর্ণ করে রেখেছে। এর উদার পরমাশ্চর্য রূপ তারা নিজেরাও দেখেনি, অপরকেও দেখাতে পারেনি। বাইরের প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়ে ঘরের কোণায় এসে তারা মুখ লুকাচ্ছে। বিধর্মীরা আজ কুরআন থেকে ইংগিত ও প্রেরণা পেয়ে নব নব সৃষ্টি দিয়ে জগতকে স্তম্ভিত করে দিচ্ছে, অথচ মুসলমানেরা সেই মান্ধাতার আমলের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কুরআন পাঠ করছে। আমরা মিরাজকে শুধু আমাদের বিশ্বাসের বস্তু করেই রেখে দিয়েছি, আমাদের কবিরা একে নিছক 'ইসলামী-সাহিত্য' বলে স্পর্শ করে নি, অথচ এই মিরাজের পরিকল্পনা নিয়েই ইতালির মহাকবি দান্তে 'Divine Comedy' লিখে জগতে অমর হয়ে রইলেন। কাজেই আমাদের এই অজ্ঞতা মূর্খতা ও হীনমন্যতার জন্য অন্য কেউ দায়ী নয়- আমরাই দায়ী। আমাদের জানতে হবে ঃ শুধু কুরআন-কিতাব বা পুঁথি-পত্রই ইসলামী-সাহিত্য নয়। গল্পে, নাটক-উপন্যাসে, কাব্য, সাহিত্যে, দর্শন-বিজ্ঞানে, গবেষণায়, প্রত্যেক বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যাই সৃষ্টি করা হবে, তাই হবে ইসলামী সাহিত্য। ইসলামী সাহিত্যে অ-মুসলমানদেরও ভয় করবার কিছু নেই। তাদের জন্যও এখানে সম্ভাবনার দুয়ার খোলা রয়েছে। 'ইসলামী রিপাবলিকে' হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ.খৃষ্টান সবারই যেমন স্থান আছে, ইসলামী সাহিত্যও তেমনি থাকবে সকলের সম-মর্যাদা ও সম-অধিকার।

www.pathagar.com

উপসংহার

ইসলামী-সাহিত্যের উদারতা, ব্যাপকতা ও তার বিশ্বজনীন রূপের পরিচয় এতক্ষণ আপনাদিগকে দিলাম। এর থেকে আমি বলতে চাই যে, যে-কোন ক্ষেত্রেই ইসলামী সাহিত্য রচনা করার প্রচুর সম্ভাবনা ও অবসর আছে। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, আমাদের একদল কবি-সাহিত্যিক এখনও এ-সত্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। দেশ-বিভাগ হবার পরও তারা 'বাঙ্গালী' রয়ে গেছেন। এই উৎকট পরাণ্করণ-প্রিয়তা নিয়ে তারা কোন দিন আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবেন না। সাহিত্যের প্রধান ধর্ম-আত্মপ্রকাশ। আপনার অন্তরের সত্যকেই রূপ দিতে হয়। সেই সত্যই বিশ্বসত্য হয়। গভীর উপলব্ধি থাকলে ব্যক্তিই নৈর্ব্যক্তিক হয়ে বিশ্বমনের প্রতিনিধিত্ব করে। তা না হলে সাদী, হাফিজ, রুমী, খৈয়াম, ইকবাল-এরা কেউ বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে ঠাঁই পেতেন না। আমাদের কবি-সাহিত্যিকেরা হিন্দু বা ইউরোপীয় সাহিত্যিকদিগের অনুকরণ ও অনুসরণ করতে চান। ভাল কথা। কিন্তু তারা তাদের বাহিরের দিকটাই অনুকরণ করেন, আসল spirit-কে ত অনুকরণ করেন না! হিন্দু-সমাজ ত তাদের সাহিত্যে, কাব্যে, নাট্যে, ছায়াচিত্রে-তাদের জাতীয় ঐতিহ্য ও ধ্যান-ধারণাকে রূপ দিচ্ছে। তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি-সম্মেলনে ত কোনদিন 'হিন্দু-সাহিত্য-শাখা' দেখিনি। সর্বাত্মক ভাবে তারা তাদের জাতীয় আদর্শের অনুসরণ করছে বলেই ঐরূপ একটা শাখার প্রয়োজন তাদের হয় নি। পশ্চিম পাকিস্তানেও 'ইসলামী উর্দু' নেই। তাদের উর্দু-মুশায়েরায় অনেক হিন্দু কবিও যোগ দেন। আমাদের এখানে যে স্বতন্ত্র করে ইসলামী সাহিত্যের কথা ভাবতে হচ্ছে-এর থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে আমাদের কবি- সাহিত্যিকেরা যা সৃষ্টি করেন, তাতে ইসলামের সার্থক রূপায়ণ নেই বা হচ্ছে না। অন্যথায়, আমাদেরও 'ইসলামী-সাহিত্য' বলে স্বতন্ত্র কোন বিভাগের প্রয়োজন হতনা, বা হবে না। কিন্তু এখন আমরা সে কথা বল্তে পারছি না। আজ দশ বছর থেকে সংবাদপত্রে 'প্রদেশের সংস্কৃতি-সংবাদ' বলে যা বেরুচ্ছে, তা পড়ে দেখলেই আপনারা বুঝবেন-আমাদের কবি-সাহিত্যিকেরা সমাজকে কোথায় নিয়ে চলছে।

সুখের বিষয়, কিছুদিন থেকে আমাদের তরুণ-সমাজের মনে নূতন চেতনা ও মর্যাদা-বোধ জেগেছে। তাঁরা আত্মস্থ হয়েছেন। তাঁদের এই নবজাগরণ ও আত্মদর্শনকে আমি সারা প্রাণ দিয়ে অভিনন্দিত করি। প্রত্যেক দেশের সাহিত্যই তার আপন ঐতিহ্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

মিলটন, গ্যেটে, দান্তে, শেক্সপিয়ার-সকলেই এই পথের অনুসারী। এমন কি বর্তমান কালের কবি-সাহিত্যেকেরাও এই পথ বেছে নিয়েছেন। T.S.Elliot তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশে জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ হিন্দু কবি-সাহিত্যিকেরাও অতীতের ঐতিহ্যকে তাদের সাহিত্যে রূপ দিচ্ছেন। আমাদের কবি-সাহিত্যিকেরা কেন তা করবেন না? একদল

www.pathagar.com

আত্মবিশ্বাসী তরুণের আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন। কোল্‌কাতার "মহামেডান স্পোর্টিং" এর মত তারা সাম্প্রদায়িক নাম রেখেই মুক্ত-মাঠে প্রতিযোগিতায় নামবেন। তারপর অপূর্ব নৈপুণ্য ও চমৎকারিত্ব দেখিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করবেন। এই কঠিন পরিচয় তরুণদের দিতে হবে।

জানি জোর করে কোন-কিছু সৃষ্টি করা যায় না। সৃষ্টি স্বতস্ফূর্ত। কিন্তু সৃষ্টির বেদনা না জাগলেও ত কোন সৃষ্টি সম্ভব হয় না। কতরাতের তপস্যায় একটা নার্গিস বা লালা ফুলের হৃদয় পাপড়ি উন্মুক্ত হয়, তা কেউ জানে!

পাকিস্তানের কবি-সাহিত্যিকদের মন থেকে ইসলামের নামে অহেতুক বিভীষিকা দূর হোক, শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে ইসলামকে তারা নবরূপে উপলব্ধি করুন-এই কামনা করি।

www.pathagar.com

সুহৃদ প্রকাশন